Marali Mannige

by

SRI KARANTA

(a novel)

Translated from Kannada

by

Dr. Vishnupada Bhattacharya

Sahitya Akademi

blems as are dwelt upon in this book of mine, are almost similar to those in any other part of India". I would say, life in other parts of India is not just "almost similar", but it is practically "identical" in all parts of India. Apart from the basic things relating to human nature, the colour and tempo of life in the whole of Hindu India, saturated as they are with the spirit of the *Vedas*, the *Ramayana*, the *Mahabharata* and with the *Bhagavata* and other *Puranas*, are the same. The language and terms of expression are based on Puranic tales and ideas ; the little usages and practices and "superstitions", the little gestures in moving and talking, are the same, and they are as true for us in Bengal as they are in Sri Karanta's own home-state.

I feel I should close this little appreciation of Sri Karanta's novel by quoting *in extenso* from his Preface to the English Translation :

"I have tried to picture in this book the life and struggles of three generations of my people, who inhabited the ever-beautiful strip of land on the West Coast of India. In the first generation the rich natural beauty of the land, the river and the sea with its varied smiles and frowns, acted just as a dumb background, to the deep struggle of the people for existence. It was almost a primitive condition of life. The advent of Western civilization, during the emergence of the second generation, while bringing knowledge from the West, enticed the young to white-collar jobs. The toiler in the mud lost what little respect he had, in the eyes of the so-called elite.

"It is only when the third generation faced the problem of unattractive city life, and bleak unemployment, that a few desparate youngsters of the generation turned back to the soil. To youths like 'Rama' of this novel, going back to the soil, thus recompensed the land for neglect. For all the sweat that he poured into its rich nature, the blue sky, the bluer sea and the stalwart palms—spiritually upheld him, and what joy the first and the second ganeration missed, the third generation hoped to get, because of its love for nature.

"When offering this humble translation to my readers, who have read greater sagas of life than this, I am painfully conscious of my own limitations. But to me, it is not my literary achievement that is so important, as the hard struggle of my ancestors, to whom I owe my very existence. If I have succeeded in giving a slight glimpse into their noble lives, I shall feel richly compensated."

I feel very happy that this modern masterpiece of literature from Kannada has been published by the *Sahitya Akademi.* The translator, Dr. Vishnupada Bhattacharya, is on old and esteemed pupil of mine, and he has translated *Marali Mannige* directly from the original Kannada. He is fully qualified to do this. He is one of a very limited number of scholers in India who has access to most of our great literary languages, both Aryan and Dravidian. He is a good student of Tamil, which he reads, writes and speaks fluently. He knows also Malayalam, Kannada and Telugu, besides Marathi, Gujarati, Panjabi, Oriya, and of course Hindi and Urdu. He is an M. A. of the University of Calcutta in Bengali and is now a lecturer in Bengali in the Faculty of Modern Indian Languages in the University of Delhi. He is writer of a good racy style in Bengali, his mother-tongue. Already the *Sahitya Akademi* has published a selection of a few short stories translated from Kannada into Bengali by Sri Beltangadi Gopala-Krishna Rao, I. C.S. Retired, (who is from South Kanara in Karnataka and whose mother-tongue is Konkani, and Kannada he studied both at school and college) and his wife Srimati Amiya Rao, whose mother-tongue is Bengali. We are now fortunate in having the present translation of *Marali Mannige* into Bengali by a native speaker of Bengali who is also quite at home with Kannada. He has already written and published a number of valuable books in Bengali on the Bhakti and other religious movements in the various languages of India both Aryan and Dravidian. He has successfully fulfilled in this translation one great objective of the *Sahitya Akademi* as "the

National Academy of Indian Literature" (which inspite of the diversity of languages presents a Single Entity in Spirit, Ideals and Expression) *viz.* to bring together the literatures in the various languages by a series of interlingual translations of its great masterpieces.

5th November 1959,
Udipi, Karnataka

Suniti Kumar Chatterji

লোকে বলে—'পারোতি'। কিন্তু ওর আসল নাম পার্বতী। গত অগ্রহায়ণে ও চব্বিশ পেরিয়ে পঁচিশে পা দিয়েছে। তাও প্রায় ছমাস হতে চলল।

এখন জ্যৈষ্ঠ মাস। ইতিমধ্যেই প্রবল বর্ষণ শুরু হয়ে গেছে এ অঞ্চলে। সেই যে-বছর পার্বতীর বিয়ে হয়—তাও এমনি জ্যৈষ্ঠ মাসে। সেবারেও কিন্তু ভারি বর্ষা নেমেছিল।

পার্বতীর বাপের বাড়ি 'মনূরু' গ্রামে—সমুদ্রের কোল-ঘেঁষা বালিয়াড়ির কাছেই। চারিদিকে সারি সারি কাজু বাদামের গাছ। তারই মধ্যে ওদের ওই বাড়িতে চালটুকু—টালি নয়, খাপরা নয়, কেবল খড়ের ছাউনি মাত্র। যখন শোঁ শোঁ করে সমুদ্রের হাওয়া বয় তখনও যে সেই খড়ের চালের ঘরখানি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে এটাই একটা আশ্চর্য। তাতে আবার পার্বতীর বিয়ের সময়ে যা ঘটা হয়েছিল সে কথা মনে পড়লে আরও আশ্চর্য হতে হয়।

নারায়ণ ময়্য-র একমাত্র কন্যা পার্বতী। ভদ্রলোকের কোন পুত্রসন্তানও নেই। কাজেই তিনি মনে করলেন—মেয়ের বিয়েতে একটু সমারোহ করলে মন্দ হয় না। এই ভেবে ঘরের উত্তর দিকে উঠোনে একটি ছোটখাট ছাপরাও তৈরি করে ফেললেন।

মাটির দেয়ালের ঘর। সারা বছর রোদ-বৃষ্টি থেকে সেই মাটির দেয়ালকে আগলে রাখার জন্য ঘরের চারিদিকে দেয়ালের গা ঘেঁষে ঝোলানো থাকে সারি সারি তালপাতা। কিন্তু বিয়ের দিনে বাড়িটাকে একটু ভদ্রগোছের করে তোলার আকাঙ্ক্ষায় গৃহকর্তা তালপাতাগুলি খুলে ফেলে বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে স্তূপীকৃত করে রেখেছেন।

খুলে ফেলার আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। সে কথাটা এখানে বলা দরকার। এ অঞ্চলে সানাইবাদক কোরগ-এর খুবই নাম ডাক। পার্বতীর বাবা ভাবলেন—মেয়ের বিয়েতে কোরগ-কে বায়না দিলে কেমন হয়। কিন্তু কেবল বায়না দিলেই তো হবে না। কারণ সমুদ্রের হাওয়ায় হাওয়ায় যখন

মানুষও চোখে পড়ে না—দিনের বেলায় এমনি ঘন অন্ধকার। এই অবস্থায় বরযাত্রীদলকে যথাস্থানে নিয়ে আসা ইতস্তত ছিটকে পড়া গবাদি পশুকে গোয়ালে ফিরিয়ে আনার মতোই বেশ শক্ত হয়ে উঠেছিল। বরানুগামী বাদ্যকরেরা বরযাত্রীদের আগেভাগেই কনে-বাড়ির দাওয়ায় এসে আশ্রয় নিল। বরযাত্রীদলে এমন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি একজনও ছিল না, জীবনে যে কখনো কাপড়ের ছাতা মাথায় দিয়েছে। কোডিগ্রামের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা কোদণ্ডরামকে পূর্বাহ্নেই খবর পাঠিয়েছিলেন যে বৃষ্টি বাদল যদি বন্ধ থাকে, তবে তাঁরা বরের গৃহে 'আরতি', অক্ষত' প্রভৃতি শুভানুষ্ঠানের দিনে উপস্থিত থাকবেন, কিন্তু এই দুর্যোগে বরযাত্রী সেজে কনের বাড়িতে যাওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

বরযাত্রীদের সাদর অভ্যর্থনার কাজটি কনেবাড়ির উঠোনেই সম্পন্ন হল। বাড়ির সামনেকার মাঠে হলেই রীতিসম্মত হত—শুকনোগণ্ডার দিনে যেমন হয়ে থাকে। কিন্তু এখন তো ওখানে এক হাঁটু জল। তবে একটি কথা। বরুণদেবের আশীর্বাদে বাড়ির আঙিনায় ও মাঠে আর কোনো তফাৎ নেই। ছাপরা-টাপরা উড়ে গিয়ে আচ্ছাদন বলতে সেখানে কিছুই নেই—খালি উঠোনটাই পড়ে আছে। সেখানেই অতিথিদের অভ্যর্থনার আয়োজন হল।

তারপরে তাঁদের নিয়ে তোলা হল ভিতরের বারান্দায়। ছোট একটি বারান্দা। তার অর্ধাংশ ছেড়ে দিতে হয়েছে বিয়ের আসরের জন্য। বাকী অর্ধাংশ জলকাদা পায়ে লোকজনের চলাচলে রীতিমত কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছে। তারই মধ্যে মাদুর বিছিয়ে পিঁড়ি পেতে বরযাত্রীদের বসবার ব্যবস্থা করা হল।

বিয়ের আসরে যজ্ঞের আগুন জ্বলে উঠলে বর বেচারীকে আর ভিজে বেড়ালের মতো বসে থাকতে হত না, অন্তত খানিকটা আগুন পোয়াতে পারত। কিন্তু আগুনের বদলে খালি ধোঁয়া আর ধোঁয়া। ধোঁয়া, হাওয়া আর বৃষ্টি—এই হল সেদিনকার গীত, সেদিনকার মন্ত্র। বিয়ের ভোজটা বসে হল, না দাঁড়িয়ে হল—কে তার খবর রাখে ?

বিয়ের চারটে দিন একই ভাবে কাটল। কনের বাড়িতে আত্মীয় কুটুমদের আনাগোনা সবই ঝরা আকাশের নীচে। লোকজন যাঁরা এসেছিলেন, তাঁদের অনেকেই যে-যার বাড়ি বিদায় নিলেন, অর্ধেকও শেষদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন না। চতুর্থ দিনে পান-প্রদানের অনুষ্ঠান শেষ হল। এবার নববধূকে নিয়ে বরকর্তার স্বগৃহে যাত্রা। রওনা হওয়ার মুখে, কী আশ্চর্য, বৃষ্টি একেবারে বন্ধ

হয়ে গেল। ফিরতি পথের যাত্রী কেবল নব দম্পতি, বরের পিতামাতা এবং ডুলি বাহকের দল।

গ্রামে পৌঁছে বরবধূর গৃহপ্রবেশ। যে মুহূর্তে বধূ বরণ, সেই মুহূর্তেই শুরু হল ধারা বর্ষণ। মোট কথা, বরের বাড়িতেও ইন্দ্রদেবের করুণাধারার কিছু অপ্রতুল ছিল না। বাড়ির অনতিদূরেই একটি মোহানা। কোদণ্ডরামের বাড়ির পশ্চিমে সমুদ্র, পূবদিকে নদী, আর দক্ষিণে সেই নদী ও সমুদ্রের সঙ্গম।

পার্বতীর বিয়ের বছরে কোডিগ্রামে কেবল বৃষ্টিই নয়, সমুদ্রের জলও উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। কোদণ্ড পুরোহিত যখন ছেলের বিয়ের ব্যাপারে মনূরু গ্রামে ব্যতিব্যস্ত, ঠিক তখনই কিনা তাঁর বাগান থেকে ছ-সাতটা নারকেল গাছ সমুদ্রের জলে লোপাট হয়ে গেল। জীবৎকাল পর্যন্ত কোদণ্ড ওই কথাটি স্মরণ করে বলে বেড়াতেন—'ওরে ব্‌বাবা, এমন খেপা সাগর তো আমার ঠাকুরদার বয়সেও দেখিনি।'

ঘরে পুত্রবধূ পেয়ে কোদণ্ড খুব খুশি। আরতি-অক্ষতের দিন দশজন বৈদিক ব্রাহ্মণ ও গৃহস্থ পরিবারকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে হবে। কোদণ্ডের উৎসাহের সীমা নেই। কিন্তু এমন আনন্দ উৎসাহ মাটি করে দেওয়াটা কি সমুদ্রের উচিত কাজ হল? বছরে প্রায় হাজারখানেক ফল ধরে, এমন সব ফলকর বৃক্ষ কিনা সেই একটি দিনেই সমুদ্র মহারাজের আহুতি হয়ে গেল?······

এ সমস্ত ঘটনা ঘটেছে আজ অনেক বছর হয়ে গেল। যেন কত কালের পুরোনো 'পরণ-কথা' বলে মনে হয়। ইতিমধ্যে পার্বতীর দাম্পত্যজীবনের পনেরোটি বছর কেটে গেছে। বিয়ের তিন বছরের মধ্যে পার্বতী তার বাপকে হারায়। মা তো তার বিয়ের আগেই মারা যান। শ্বশুর কোদণ্ড ঐতালও আর বেশীদিন বাঁচেন নি—পুত্রবধূ ঘরে আসার পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনি শিবলোক প্রাপ্ত হন। শাশুড়ীও আর ইহলোকে নেই। ঐতাল পরিবারে এখন পার্বতীই গৃহিনী। সংসারে তারা গোনাগুণতি তিনজন মাত্র। একজন—ওঁর নাম তো মুখে আনা যায়না, কোদণ্ডের একমাত্র পুত্র রাম ঐতাল। দ্বিতীয় জন হল—রাম ঐতালের ছোট বোন সরস্বতী। বাল্যকালেই স্বামীকে হারিয়ে তদবধি সে ভাইয়ের সংসারের অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় ব্যক্তি পার্বতী নিজে। এই তিনজন ছাড়া ঘরে আর ছেলেপুলেও নেই।

বাড়িতে তাহলে পার্বতীর সময় কাটে কী করে? না সেটা কোনো

ভাবনার কথা নয়। রাম ঐতাল এগাঁয়ে সে-গাঁয়ে পুরুতগিরি করে বেড়ায় এবং তার দিনের বেলাকার আহার সাধারণত যজমান গৃহেই সম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করে ঐতাল যখন বাড়ি ফেরে, তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল প্রায় চারটে। ফেরার সময়ে কখনো সে খালি হাতে আসে না। কিছুটা নৈবেদ্যের চাল, দু' একটা নারকেল, যা-হোক-কিছু তরি-তরকারি নিয়েই আসে। সেগুলো রেখে দিয়ে হাত-পা ধুয়ে বারান্দার লাল পাথরের মেজের উপর শরীরটা এলিয়ে দিয়ে আরামসূচক ভঙ্গীতে বলে ওঠে—'আঃ'। আর খানিক পরেই শুরু হয় ঘণ্টাখানেকের জন্য প্রবল নাসিকা গর্জন। দিবা নিদ্রাটি শেষ করে গ্রামের তদারকী ও খবরাখবর সংগ্রহের জন্য বেরিয়ে গিয়ে আবার যখন সে বাড়ি আসে, রাত্রি তখন একপ্রহর হয়ে যায়। যজমান গৃহে যেদিন মধ্যাহ্ন ভোজনটা একটু বেশি রকম গুরুভার হয়, সে দিন অপরাহ্নে বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ে স্ত্রীকে সম্বোধন করে বলে—'পারোতি, আজ একবেলা।' কথাটার তাৎপর্য পার্বতীর জানা আছে। 'এক বেলা' অর্থাৎ রাত্রিতে ভোজনং নাস্তি। সরস্বতী বিধবা। তার তো নিত্যই 'একবেলা'। পার্বতী ভাবে—সকলেই যদি একবেলা খেয়ে কাটাতে পারে তবে তার এমন কী 'সম্ভ্রম' যে সে পারবে না? সেদিন রাত্রে পার্বতী আর রান্নাবান্নার ঝামেলা পোহায় না। খানিকটা চিঁড়া ভিজিয়ে খেয়ে নিলেই হল। কোনো কোনো দিন আবার দুপুরের ভাতে জল ঢেলে রেখে রাতের হাঙ্গামটা চুকিয়ে দেয়। অপরাহ্নের আলো সরে গিয়ে সন্ধ্যা হয়ে এলে জপের মালাগাছি হাতে নিয়ে 'শিব শিব, রাম রাম' এই মন্ত্র জপ করতে করতে তন্দ্রাবিষ্ট পার্বতীর ঢুলনি এসে যায়।

এক প্রহর রাতে ঐতাল ঠাকুর দুমদাম শব্দে বাড়ি ফিরে এলে পার্বতী কোনোদিন বা টের পায়, কোনো দিন বা পায় না। টের পেলেও স্ত্রীর পক্ষে 'ঘরের লোক'-কে কখনো জিজ্ঞাসা করা চলে না—'কখন এলে?' সেই যে জপমালা ঘুরোতে ঘুরোতে বসে বসেই পার্বতীর ঢুলুনি শুরু হয়, হয়ত সেখানে সেই অবস্থায় সে নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ে।

পার্বতীদের নিকটতম প্রতিবেশী—ব্রাহ্মণ নয়, শূদ্র। সেজন্য পার্বতীদের আচার বিচার রক্ষার ব্যাপারে কিছুটা নিয়ম ভঙ্গ হলেও ওই শূদ্র বাড়ির মোরগগুলি দিয়ে একটা বিশেষ উপকারও কিন্তু হয়। অতি প্রত্যুষে—ভোরের আলো না ফুটতেই—ওরা তীক্ষ্ণকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে। আর সঙ্গে সঙ্গে

ঘুম থেকে উঠে পড়ে পার্বতী ও সরস্বতী। উঠে ওদের প্রথম কাজই হল এঁটো থালা-বাসন বাইরে এনে ঘস্‌ঘস্‌ করে সেগুলি মেজে ফেলা। বাসি কাজ শেষ হলে পূজার পঞ্চপাত্র ইত্যাদি ধোয়া মোছার কাজ। তারপরে ঘর ঝাঁট দিয়ে লেপা-পোঁছা শেষ হয়ে গেলে নিশ্বাস ফেলার একটু অবকাশ মেলে।

ততক্ষণে রোদ উঠে যায়। গোয়ালে গোরু বাছুরের দল আওয়াজ করে যেন জানিয়ে দেয়—তাদের প্রাতঃভোজন এখনও এসে পৌছল না। আগের দিন দুপুর বেলায় যে খোল-মাখানো জাব তৈরি করা হয়েছিল, তা এনে গোরুর ডাবায় ঢেলে দেওয়া হয়। এবং তার প্রতিদানে পার্বতী যখন দুধ দুইতে বসে, তখন তার ঘটিতে পোয়াটাক দুধ দিতে তারা কার্পণ্য করে না। অন্তত এইটুকু দুধ না দিলে গরু-মোষের আর 'মর্যাদা' কী? ওটুকু না পেলে গৃহদেবতার দৈনিক পূজায় যে দুধের অনটন পড়ে যাবে। দুধ দোওয়া শেষ হলে পার্বতী দুগ্ধবতী গাভীটিকে এবং সেই সঙ্গে আরও দু'একটা বুড়ো গোরুকে চরে খাওয়ার জন্য বালিয়াড়ির দিকে ছেড়ে দেয়। ওরা বেরিয়ে গেলে গোয়াল ঘরের গোবর কুড়িয়ে সারগাদায় ফেলে দেওয়ার পরে সকাল বেলাকার ঝামেলা খানিকটা যেন মেটে।

তারপরে শুরু হয় বাইরের কাজ। বাইরের কাজ মানে ক্ষেতখামারের কাজ। বর্ষাকালে সে কাজের রীতি এক রকম। অন্যকালে অন্যরকম। ঐতাল-পরিবারের যে পরিমাণ জ্বালানি কাঠের প্রয়োজন, তা জোগাড় করতে প্রাণান্ত। বাড়ির চারিদিকে তাদের নিজস্ব সীমানার যে-সব শুকনো পাতা ঝরে পড়ে—কাজুবাদাম ও হোন্নে গাছের পাতা—সেগুলি ঝাঁট দিয়ে যথাসময়ে কুড়িয়ে আনা চাই। নয়ত যার চোখে পড়বে সে-ই নিয়ে যাবে। হেঁসেলের উনোন ধরাতে, বাইরে গোরু-বাছুরের ফেন-বিচালির জন্য চুলো জ্বালাতে এই শুকনো পাতাগুলি খুব কাজে লাগে। আগুন ধরাবার পরে বাকি যে অল্পস্বল্প পাতা বেঁচে যায়, সেগুলো নিয়ে ফেলে রাখা হয় গোয়াল ঘরের মেজেতে। কারণ গোবরের সঙ্গে শুকনো পাতা না মেশালে সারের কাজ ভাল হয় না।

সারা বছরের বাইরের কাজের মধ্যে এই জ্বালানি সংগ্রহের কাজই সব চেয়ে বড় কাজ। এজন্য বর্ষাকালে যে কষ্টটা হয়, তা বলে আর শেষ করা যায় না। কাঁচা কাঠ আর ভিজে পাতা জ্বালতে গেলেই বাড়িসুদ্ধু ধোঁয়া আর ধোঁয়া। ধোঁয়ার জ্বালায় পার্বতীর চোখ প্রায় জবা ফুলের মতো লাল হয়ে ওঠে,

মল্লিকা ফুলের মতো সাদা রংটুকু আর দেখাই যায় না। তার উপর চোখের যন্ত্রণাটাও বড় কম নয়। তবে কোনো কোনো বছর বর্ষাকালে বরুণদেব খুশি হলে ছ মাসের কাঠ হয়ত একমাসের মধ্যেই জুটে যেতে পারে। কিন্তু সে কাজটি বড়োই কঠিন। তাছাড়া, এ গ্রামে তো তারাই একেলা বাস করে না, আরও বাসিন্দা রয়েছে।

নদী যেখানে গিয়ে সমুদ্রের সঙ্গে মিশেছে, সেই মোহানা থেকে রাম ঐতালের বাড়ি খানিকটা উত্তরে। ওখানে ওই সঙ্গমের কাছে গিয়ে জলে পা দেওয়া আর যমরাজের বাড়িতে খাজনা দিতে যাওয়া একই কথা। এমনি প্রচণ্ড জলের টান। বর্ষাকালে সেই ক্ষিপ্র নদীর প্রবল জলধারা বহুদূরের পার্বত্য অরণ্য থেকে অজস্র গাছপালা ভাসিয়ে আনে। সেগুলি ধরে নিয়ে আসার কাজটি বড় সহজ নয়। সেজন্য সঙ্গম ছেড়ে সমুদ্র কিনার ধরে আরও মাইল দুয়েক উত্তরে এগোতে হয়। যেমন বর্ষাই নামুক না কেন, ভোরবেলাকার অস্পষ্ট আলো আঁধারিতে সমুদ্র কিনারে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে দেখা যায়— বরুণদেব ওদের জন্য কী বস্তু নিয়ে আসছেন। গাছের ডালপালা ভেসে আসে, ভেসে আসে বড় বড় কাঠ। কোথাও একটু চিহ্নমাত্র চোখে পড়লেই 'হুস্' করে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢেউ এর সঙ্গে যুঝতে যুঝতে সেটা করায়ত্ত করা চাই। খানিকক্ষণ ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে ঈপ্সিত বস্তুগুলি ভাসতে ভাসতে আপনা আপনি পারের কাছে আসে বটে। কিন্তু ততক্ষণে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের উপর এক-একখানি হাত রেখে ওর দখলিস্বত্ব নিয়ে 'আমার আমার' বলে বহু শরিকের ঝগড়া লেগে যায়। কাজেই যে ব্যক্তি দুঃসাহস বলে আগেভাগেই ঝাঁপ দিয়ে টেনে আনতে পারে, তারই লাভ। এসব কাজে পার্বতীর তুলনায় সরস্বতী খুব পাকা-পোক্ত। পুরুষকেও হার মানায়। এই ধরনের কাষ্ঠ সংগ্রহের কাজে রাম ঐতাল মাঝে মাঝে হাজির থাকে। ওরা তিনজনে গিয়ে দাঁড়ালে একমাসের কাজ পনেরো দিনেই শেষ হয়ে যায়।

একদিন একটা বড় মজার ঘটনা ঘটে। সেদিন সাত সকালেই ঐতাল-পরিবার গিয়ে সমুদ্রতীরে উপস্থিত। গিয়ে দেখে ওদেরও আগে বিশ-পচিশ জন কাঠের ভরসায় এসে দাঁড়িয়ে আছে। নদীতে তখন ভরা প্লাবন। এই বানের সময়ে কাঠ যা আসে পর্যাপ্ত। কিন্তু সেই সঙ্গে ঝড়ের ঝাপটা, বৃষ্টির তীক্ষ্ণ ধারা তাও কিছু কম নয়। এরই মধ্যে রাম ঐতাল গিয়ে সমুদ্রের জলে নামল।

হাঁটু সমান জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে বহুদূরে বাজপাখীর সন্ধানী দৃষ্টি পাঠিয়ে সে অপেক্ষা করছে। প্রায় একশ গজ তফাতে কালোমতো একটা কাঠের খণ্ড ভেসে আসছে না? সাহসে ভর করে ঝাঁপিয়ে পড়ল রাম ঐতাল। কালোমত ওই কাষ্ঠখণ্ডের উপর বাঁ হাতটা রেখে আবার সে পারের দিকে ফিরে আসছে। প্রায় আধ ঘণ্টা যাবত ঢেউএর সঙ্গে লড়াই করতে করতে পারের কাছে এসে ক্লান্ত ঐতাল হাতটা ছেড়ে দিতেই একটা প্রচণ্ড ঢেউ এসে তার কষ্টার্জিত কাষ্ঠখণ্ডকে বালির উপর ছিটকে ফেলে দিল। বেশ ভারি কাঠ। ওজন অনুমান করে রাম ঐতাল খুব খুশি হয়েছিল। একবারের চেষ্টাতেই প্রায় পঞ্চাশ পাঁজার মতো কাঠ জুটে গেল। কিন্তু হা ঈশ্বর, ঐতাল যা এত কষ্টে নিয়ে এসেছে, সেটা তো গাছ নয়, একটা বিরাট মোষের মৃতদেহ ; যা সে হাত দিয়ে ধরেছিল, সেটা গাছের ডাল নয় মোষের শিং মাত্র। ঐতালের দুর্দশায় পারের লোকগুলি একসঙ্গে হেসে উঠল। কিন্তু পার্বতী? হাসি চেপে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেও সে চেপে রাখতে পারল না। দলের মধ্যে পড়ে তারও মুখ থেকে কখন খানিকটা অবাধ্য হাসি বেরিয়ে এল। ঐতালের তা দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু লোকসমক্ষে সে টু শব্দটি করল না। বাড়ি ফিরে এসে ঐতাল সেদিন অগ্নিশর্মা হয়ে পত্নীর উপর যেভাবে তার গাত্রদাহ মিটিয়েছিল, তিন মাস পর্যন্ত সে কথা ভেবে ভেবে পার্বতী চোখের জলে দাওয়া ভিজিয়েছে।

এই হল ওদের জ্বালানি কাঠ সংগ্রহের ধারা। দু' একবার সরস্বতী ও পার্বতো সমুদ্র-সমাধি থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পায়। তা বলে কি মৃত্যু ভয়ে কাজ ছেড়ে দেওয়া চলে? এই ভাবে যে টুকরা-টাকরা কাঠ ও গাছের ডালপালা পাওয়া যায়, সেগুলি তখনই বাড়িতে বয়ে এনে রোদে বিছিয়ে দিতে হয়। রোদ উঠলে বিছানো, আবার মেঘ ঘিরে আসার আগেই তাড়াতাড়ি সেগুলি গুছিয়ে রাখা।

তা সে যাই হোক, গরমের দিনে কোনো হাঙ্গাম নেই। কিন্তু বর্ষাকালে আগুন জ্বালবার ঝকমারি বলে শেষ করা যায় না। চেলা চেলা কাঠ নিয়ে শুকোবার জন্য উনুনের চারদিকে মাচানের উপর সাজিয়ে দিতে হয়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে রোদই বা কতটা পাওয়া যায়, আর কাঠই বা কী করে শুকোয়? তাই ভিজে কাঠের ভরসা ছাড়া উপায় নেই।

মনূরু বা কোডি যে গ্রামেরই লোক হোক না কেন, নিজস্ব বাগান না

থাকলে কাঁচা কাঠ, ভিজে কাঠ জেলে জেলেই বর্ষাকালে আগুন ধরায়। গ্রামের মেয়েদের চোখের দিকে তাকালেই বলা যায় কার ঘরে শুকনো কাঠ আছে, কার ঘরে নেই—এই একটি কথা ভেবে ভেবেই, পার্বতীর শিশুবয়স থেকে তার বাবা নারায়ণ ময়্য মাঝে মাঝে বলতেন—'আমার মেয়েকে যেন এই কাঠের ঝক্কি না পোহাতে হয়। ওকে সমুদ্রের পারে নয়, পূর্ব পরগণার কোথাও বিয়ে দিতে পারলে অন্তত এদিক থেকে মেয়ে আমার সুখে থাকবে।' এই কথা বলতেন আর মাঝে মাঝে ভাবতেন বেলুরু (বেলুর) প্রভৃতির দিকে কোথাও না-কোথাও তাঁর মেয়ের জন্য বর তৈরি হয়েই আছে। কিন্তু ওই যে কথায় বলে—'লোনা জলের ঋণ এড়ানো কঠিন'—পার্বতীরও হল সেই দশা। কোথায় বেলুর, কোথায় পূর্বপরগণা, মনূরু গ্রাম থেকে শেষ পর্যন্ত তাকে স্বামীর ঘরে আসতে হল কোডিগ্রামে।...

জ্বালানি কাঠের জোগাড় হলেই কি ঘরের কাজ শেষ হল? রান্না-বান্না আছে না? শূদ্র হয়ে জন্মালে না-হয় মাছ টাছ, কাঁকড়া-টাকড়া ধরে আনা যেত। কিন্তু ব্রাহ্মণের ঘরে যখন জন্মেছে, তখন ওই তরকারি খেয়েই জীবন কাটাতে হবে। আর ব্রহ্মাঠাকুর যখন তার কপালে এই কথাটাই লিখে দিয়েছেন, তখন তরকারি চাষ ছাড়া উপায় কী? যাজনিক কাজের ফলে রাম ঐতালের গৃহে চাল বা নারকেলের অভাব নেই সত্য। মাঝে মাঝে ভোজ্যপত্রে তরি-তরকারিও মেলে। কিন্তু কেমন সে তরকারি? শশা, কেবল পাকা শশা। নববর্ষ থেকে শুরু করে বর্ষাকাল শেস না হওয়া পর্যন্ত তরকারি বলতে ওই একটাই—শশা। ঘরের খুঁটিতে, বাঁশের আড়ায় সারি সারি ঝুলছে। খেয়ে খেয়ে একেবারে অরুচি ধরে যায় পার্বতী আর সরস্বতীর।

তাই ওদের বাড়ির পূবদিকে কাঠা পাঁচেক জমির উপর যে কলাই ফেলেছিল, সেটা উঠে গেলে পরদিন ওরা মাঠের শিকড়গুলিকে উপড়ে ফেলে চারিদিকে আল-বাঁধার কাজ শুরু করে দেয়। সেই আলের উপর মাটি নরম করে তার উপর পোঁতা হয় কাঁটার বেড়া। কাঁটার বেড়া না দিলে শাক-সব্জি কিছুই থাকবে না। এ সমস্ত কাজে পার্বতী ও সরস্বতী দুজনেই পাকা। সরস্বতী আবার খন্তা-শাবল ধরতেও পটু।

খিড়কির ক্ষেতে বেড়া দেওয়ার কাজ শেষ হয়ে গেলে চারা গাছ এনে লাগিয়ে দিলেই হল। মাটির মধ্যে গর্ত খুঁড়ে সেই গর্তের মধ্যে ওগুলি পুঁতে দাও।

তার পরে উনুনের পোড়া মাটি ও ছাই এনে চারাগাছগুলির গোড়ায় ঢালো। খিড়কির কাছেই একটি ডোবা। সেই ডোবা থেকে জল তুলে মাঝে মাঝে সেচের কাজও করতে হয়। এই সমস্ত কাজ বেশির ভাগ চলে বিকেলের দিকে। ক্বচিৎ কখনো রাম ঐতালও স্ত্রী ও বোনের কাজে এগিয়ে আসে।

সকালে কিন্তু তার কিছুমাত্র অবকাশ নেই। তার নিত্য কর্ম হল—ভোরে উঠেই দন্তধাবন। এবং এ কাজটি সমাধা করতে তার একটি-দুইটি নয়, ষোলটি আম্রপত্রের প্রয়োজন। পাতাগুলি দাঁতে ঘষে ঘষে ক্ষয় করে পরিপাটি করে মুখ-প্রক্ষালন। অতঃপর গৃহসম্মুখস্থ পুষ্করিণীতে স্নানার্থে অবতরণ। প্রথমে পূর্বমুখী হয়ে নাসা বন্ধ করে অবগাহন, পরে গাত্র মার্জন। আর সেই সঙ্গে একই ভাবে চলতে থাকে উচ্চকণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণ—'শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুম্' থেকে শুরু করে একেবারে 'আকাশাৎ পতিতং তোয়ম্' পর্যন্ত। যদি মন্ত্রোচ্চারণে কোথাও ত্রুটি ঘটে, আবার গোড়া থেকে শুরু করে শুদ্ধ মতে শেষ করা চাই। অতঃপর ১০৮ বার গায়ত্রী, ১০৮ বার অষ্টাক্ষরী মন্ত্র, ১০৮ বার পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র— এই সমস্ত জপ শেষ করে তবেই সে পুকুর থেকে উপরে উঠে আসে এবং সিক্ত বস্ত্রখানি ঝেড়ে দিয়ে ঠাকুর ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে। ততক্ষণে বেলা এক প্রহর হয়ে যায়। ওদিকে গৃহিনী ঘরের মেঝে লেপে-পুঁছে, খিড়কির কাজ শেষ করে, তাড়াতাড়ি স্নানটা সেরে নিয়ে নৈবেদ্যের চাল ভিজিয়ে দেয়। ঐতালের গৃহদেবতার এই একটি মহৎগুণ যে অন্নের নৈবেদ্যে তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই, কেবল চাল ভিজিয়ে সাজিয়ে দিলেই যথেষ্ট।

বাড়ির ঠাকুর-পূজা শেষ হতেই রাম ঐতাল পুরোহিতের বেশ ধারণ করে যজমান বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। পরণে একখানি ছোটখাট ধুতি, হাঁটুর নীচে নামে না ; মাথায় পাগড়ির মতো করে বাঁধা একটা সবুজ রঙের চাদর ; গলায় রুদ্রাক্ষের মালা ; হাতে একটা লম্বা হাতলের তালপাতার ছাতা। যেদিন ঐতালের যাজনিক কাজকর্ম থাকে, সেদিনটা পার্বতীর পক্ষে একটু বিশ্রামের দিন। কারণ সেদিন আর রান্নাঘরে যাওয়ার তাড়া নেই। দুটো চাল যেমন খুশি সিদ্ধ করে নিলেই হল, ইচ্ছা মতো যখন খুশি খেলেও কোনো বাধা নেই। কিন্তু যেদিনটা কোনো যাজনিক কাজ থাকে না, সেদিন ঠাকুর পূজা শেষ হলে নৈবেদ্যের চাল নিয়ে হাঁড়ির গরম জলে ছেড়ে দেওয়ার আগেই ঐতালের জঠরাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে পার্বতীর হাতে-পায়ে যেন খিল ধরে যায়। রান্নাঘরে শিল-নোড়ার আওয়াজ হতেই ঐতাল বলে ওঠে—

'আরে ব্বাবা, কী এমন মহারান্না আজ ?' খানিকক্ষণ পরে গরম তেলে ফোড়ন দেওয়ার শব্দ শুনে নিজের হাতেই সে পাতা-পিঁড়ি পেতে নেয়। এর পরেও রান্নার বিলম্ব হলে অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—'কি। কাল সেই দুপুরে খেয়েছি বলে কি সাত দিনের মধ্যে আর খিদে পাবে না ভেবেছ ?' অবশ্য যাজনিক ক্রিয়াকর্ম যেদিন না থাকে, সেদিন সরস্বতী তার বৌদির সাহায্যে এগিয়ে আসে। সরস্বতী কাছে থাকলে দাদার গলা বেশি জোর দেখাতে পারে না। ঐতাল যদি তাড়া দিয়ে বলে—'বলি, রান্না হল কি ?' সরস্বতী তখন বৌদির হয়ে জবাব দেয়—'দাদা, তুমি একবার খিড়কিটা দেখে এসো তো, গোরু বাছুর-গুলো ফিরল কিনা।'

মধ্যাহ্ন ভোজনটা যা হোক করে শেষ হয়ে গেলে আবার শুরু হয় ঘরের কাজ, বাইরের কাজ। সংসারে যে কত কাজ আছে, আর কী যে নেই! বেলা যখন একটু পড়ে আসে, আবার গোরু বাছুরগুলোকে নিয়ে চলো মাঠে, ফেরার পথে বয়ে নিয়ে এসো নদীর শুকিয়ে-আসা পলিমাটি, তারপরে সেই মাটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাও নিজেদের হাতে চাষ-করা জমিটুকুতে। এখানেই কি শেষ ? ওই যে বীজধান থেকে কচি চারাগুলি গজিয়েছে, বাঁশের দুনী দিয়ে ধীরে ধীরে ওখানে জল ছেঁচাও দরকার।

এই সব করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। গোরু বাছুরগুলি বালিয়াড়ির ওপার থেকে গোয়ালে এসে আশ্রয় নেয়। বাছুরগুলি গোরুর বাঁটে মুখ দেওয়ার আগেই চার পোয়া দুধ দুইয়ে রাখা দরকার। তারপরে ওদের জন্য ফেন-বিচালির ব্যবস্থা করে দিয়ে স্নানটা সেরে শুদ্ধ বস্ত্রে ঠাকুর ঘরে গিয়ে পিলসুজের প্রদীপটা জ্বালানো। তারপরেই চিন্তা শুরু হয়—রাতে কী রান্নার ব্যবস্থা হবে ?

এই হল পার্বতীর জীবনের একটি সাধারণ দিনের কথা। সরস্বতীরও তাই। বিবাহিতা পার্বতী পুষ্পবতী হয়ে স্বামীর ঘর করতে আসার পর থেকে তার প্রাত্যহিক কর্তব্যে কোনো ব্যতিক্রম নেই। মাঝে মাঝে অবশ্য পিত্রালয়ে যেত সে। সেখানেও সেই একই কাজ। কেবল তফাৎ এই যে বাপের বাড়িতে এই কাজগুলি করত পিতাপুত্রী দুইজনে; এখানে করে বৌদি ও ঠাকুরঝি মিলে। ঐতাল কাজের ধারে এলো কি এলো না তার কোনো স্থিরতা নেই। আর প্রত্যাশাও বিশেষ কিছুই নেই। কারণ পার্বতী একথা ভালো করেই জানে—'উনি যা করছেন, সেই ঢের!'

এ সমস্ত পুরোনো দিনের কথা। আজ সকালে পার্বতী নদীর পারে এসে দেখতে পেল বৃষ্টির জল অসম্ভব বেড়ে গেছে। তাই পার থেকে অনেকটা দূরে দাঁড়িয়েই সে নদীর দিকে চেয়ে আছে। পার্বতীর কাছে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে নিত্যসঙ্গিনী সরস্বতী। বৃষ্টির আর বিরাম নেই, সমানে ঝরে ঝরে পড়ছে। ভিজে ভিজে ওদের কাপড় একেবারে লেপ্‌টে গেছে গায়ে। ঠাণ্ডায় ওরা দুজনেই বুকের কাছে হাত গুটিয়ে পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে আছে আর মাঝে মাঝে দৃষ্টি ফেরাচ্ছে ভরা নদীর দিকে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত কারও মুখে কোনো কথা নেই। শেষে সরস্বতী শ্রান্ত হয়ে বাড়ির দিকে পা বাড়িয়ে বলল—'আয় পারোতি।' পার্বতী বলল—'দেখছ ঠাকুরঝি, কী বেপর্যায়! আমাদের এই রোয়ার ক্ষেতের চারাগুলি হেজেমেজে মাটি না হওয়া পর্যন্ত এ পোড়া বৃষ্টি থামবে বলে মনে হচ্ছে না।'

সত্যই, এবছরের মতো ধারাবর্ষণ, কখনো নাকি হয়নি। প্রতি বছরই ওদের ধানের ক্ষেতে বন্যার জল আসে। যেমন আসে, তেমনি নেমেও যায়। মোহানার কাছাকাছি বলে এখানে বানের জল ফুলে ওঠে যেমন তাড়াতাড়ি সরে যায় তেমনি ত্বরিত বেগে। কিন্তু জ্যৈষ্ঠ মাসেই এত জল-প্লাবন কোনোবারে দেখা যায় নি। এক এক বছর রোয়া-বোনার কাজ শেষ হয়ে গেলে বান এসে চলে যায়। এবারে কিন্তু বোনার কাজ শেষ না হতেই বন্যা এসে দেখা দিয়েছে —তার কী করা যায়? মাঠ ও নদী সব জলে জলাকার। নদীর জলের একটা দিক বালিয়াড়ির কাছাকাছি, আর একটা দিক গিয়ে ছুঁয়েছে পূব দিকের রাস্তা। পায়ে হেঁটে নদী পার হওয়া দূরে থাক, নৌকাও যে চলবে এমন মনে হচ্ছে না। কী প্রবল জলস্রোত।

সেইদিনই সকালে যাজনিক কাজের জন্য ঐতালকে একবার নদীর ওপারে যেতে হবে। তিন তিন বার নদীর পারে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে— শেষকালে কি বানের স্রোতে প্রাণটা হারাবে? নাঃ, সে যাবে না। তার পরলোকগত যজমান নাগপ্পার বাৎসরিক শ্রাদ্ধ সেদিন। কাজের দায়িত্ব ঐতাল পুরোহিতের। কিন্তু যদি সে না যায়? শ্রাদ্ধানুষ্ঠান কি স্থগিত রাখা সম্ভব? মৃত যজমানের আত্মার মুক্তির কথা ভেবে সসঙ্কোচে পার্বতী বলল—'আপনি না গেলে হয়ত যজমানের প্রেতাত্মা এসে উপবাসী থাকবে।'

'তা হলে নামছি জলে'—এই বলে অসম সাহসে ভর করে মাথার উপর

পূজার পঞ্চপাত্র ইত্যাদি চাপিয়ে চাদর দিয়ে শক্ত করে বেঁধে নিল ঐতাল। ঠাকুরের উৎসবে মূর্তির উপর যেমন ছাতা ধরে, তেমনি নিজের মাথার উপর ঐতাল ছাতাটা ধরে, যে-ঘাট দিয়ে নদী পারাপার করা হয় সেই ঘাটে গিয়ে নামল। স্বামীর দুরন্ত নদী পার হওয়ার দৃশ্যে পার্বতীর গলার মঙ্গলসূত্রটি বুঝি আশঙ্কায় কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঐতাল জলের মধ্যে অনেকটা দূর এগিয়ে গেলেও এখনও সেখানে হাঁটু অবধি জল। তার পরেই 'চুঙ্গি' কাঁটার ঝোপ। পার্বতীর ভয়—উনি যদি ওই কাঁটার ঝোপে পারাপারের পথ হারিয়ে ফেলেন। সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে ঐতাল জলের উপর জেগে থাকা চুঙ্গি কাঁটার সরু ডগাগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে অগ্রসর হতে থাকে। কারণ ওই কাঁটার ঝোপগুলির মধ্য দিয়েই নদী পার হওয়ার পথ। সেই পথে প্রথম পদক্ষেপ করার আগে ঐতাল বার বার চিন্তা করে অবশেষে 'যা করেন শালিগ্রামের নরসিংহ ঠাকুর' এই ভেবে সাহস করে পা বাড়ায়। নদীর জল ক্রমে ক্রমে কোমর, বুক, গলা পর্যন্ত উঠে আসছে। প্রবল প্রবাহে জল ঢুকে যাচ্ছে নাকে মুখে। চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে সাঁতার কাটার ভঙ্গীতে কিছুক্ষণ ধরে সে দুহাত দিয়ে জল সরাতে থাকে। কিন্তু তার তালপাতার ছাতাটি নৌকার পালের মতো তাকে সামনের দিকে না নিয়ে পিছনের দিকে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে। ইতিমধ্যে যদি নিমেষের জন্যও তার পা মাটি থেকে আলগা হয়ে যেত, তাহলে এতক্ষণে ঐতাল পুরোহিত স্রোতের টানে পৌঁছে যেত একেবারে 'হাঙ্গার কট' বন্দরে অথবা মোহানা পেরিয়ে 'তোন্‌সে' নামক গঞ্জে। এতক্ষণে ঐতালের চৈতন্য হল যে সমুদ্র দেবতা বরুণদেবের সামনে মানুষের জারি জুরি খাটে না।

ঐতাল যে সাঁতার জানে না তা নয়। নদী-সমুদ্র মুলুকের লোক পাকা সাঁতারু। কিন্তু তার আশঙ্কা সাঁতার দিতে গেলেই তার নতুন কেনা তিন টাকা দামের চাদর খানা যা তার মাথায় পাগড়ী হয়ে শোভা পাচ্ছে—নোনা জলের স্পর্শে নষ্ট হয়ে যাবে। সেটা কি আর তার যজমান বাড়ির লোকেরা কিনে দেবে তাকে?

অনেক গড়িমসি করে সাঁতার দিতেই খানিক পরে মাটিতে গিয়ে পা ঠেকল। নদীর আসল স্রোত পেরিয়ে ঐতাল ওপারে গিয়ে পৌঁছাল। কিন্তু ঘাটে ওঠার রাস্তাটা খুঁজে পেল না। সামনে কেবল চুঙ্গি কাঁটার ঝোপ-ঝাড়। ঐতাল মনে মনে হিসেব করে দেখল ঘাটের পথ থেকে সে কয়েক গজ দূরে এসে

পড়েছে। খানিক পরে পারাপারের পথটা খুঁজে পেতেই ঐতাল তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে নদীর উদ্দেশে বলে উঠল—'ভারি নদী, এমন হাজার হাজার নদী পার হওয়া আমার কাছে কিছুই নয়।' এই বলে সে ধীরে ধীরে পারের দিকে উঠতে থাকল। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও স্থির করে ফেলল যে বিকেলের দিকেও যদি নদীতে এতটা জল থাকে, তবে রাত্রে সে আর বাড়ি ফিরবে না।

নদী পার হয়ে ঐতাল যতক্ষণ না মাঠের আলের উপর গিয়ে পৌছল, ততক্ষণ পর্যন্ত এপারে অপেক্ষারত দুটি রমণী উদ্বিগ্ন চোখে চেয়ে রইল। তারপরে তারা উচ্চকণ্ঠে জানিয়ে দিল—জল যদি না কমে, তবে যেন বাড়ি ফেরার চেষ্টা না করে এ রাতটা সে যজমান বাড়িতেই থেকে যায়। কিন্তু কথাগুলি যার উদ্দেশে বলা, সেই ঐতাল আর পিছন ফিরে তাকাল না। শন্‌শনে হাওয়া আর শপ্‌শপে বৃষ্টির শব্দে রমণী দুটির ক্ষীণকণ্ঠ বোধ করি তার কানে পৌছায়নি।

পার্বতী বলল, 'সবই তাঁর লীলা, ভগবানের লীলা। তা নাহলে, যাদের দরকার আছে এমন সব লোককে ছেলেপিলে না দিয়ে, যাদের দরকার নেই তাদের ঘরে সংসার ভরে দেয়!'

কথাটা পার্বতীর মুখ থেকে আপনা আপনি বেরিয়ে এল। বেরিয়ে আসার পরে তার খেয়াল হল—নিজের নিষ্ফল দাম্পত্য জীবনের বেদনাদায়ক অনুভূতি তাকে দিয়ে বলিয়েছে। সেই সঙ্গে তার মনে উদিত হল গোপী গাইর ছয়টি বাছুরের বৃত্তান্ত। স্বামীর সেই কথাটা মনে এল—'পারোতি, এই গোপী গাই একটি গাভীরও জন্ম দিল না, সবগুলোই এঁড়ে বাছুর?' স্বামীর সেই কথাটা নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে পার্বতী ভাবল—'আমার তো ছেলেও নেই, মেয়েও নেই। আমার যদি এতটা লাগে, স্বামীর মনে তাহলে কতটা লাগতে পারে? কাল যদি মরে যাই, মুখে জলটুকু দেওয়ার মতো অন্তত এক রত্তি ছেলেরও দরকার নেই কি?'

খুবই উৎকট চিন্তা সন্দেহ নেই। সত্যি তো, তাদের অভাব কিসের? ঘরে খাবার আছে, সম্পত্তি আছে বাগ-বাগিচা কিছু রয়েছে, দু'চারটে গোরু-বাছুরও আছে! স্বচ্ছল অবস্থা না হলেও একথা ঠিক যে তাদের ভিক্ষে করে খেতে হবে না। কিন্তু এই সমস্ত কতদিন? মৃত্যু পর্যন্ত মাত্র। সেই অন্তিম ক্ষণ উপস্থিত হলে সন্তানের হাতে এক ঝিনুক 'গঙ্গোদক' মুখে পড়ার মতো ভাগ্য হবে না, এমনি ভাবেই চলে যেতে হবে? এই সব কথা মনে হতেই পার্বতীর চোখ দিয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল এবং তা সরস্বতীর দৃষ্টি এড়ায় নি। পার্বতী যখনই এই প্রকার দুঃখবোধ করে, সরস্বতী জানে তার এই বেদনা সন্তানহীনতার জন্য। দিনের পর দিন সান্ত্বনার কথা বলে বলে সরস্বতী এখন ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তবু সে বলল—'বৌদি, মাসে তুমি ছয়বার করে 'অরম' দেবতাকে প্রদক্ষিণ করেছ; প্রতি সংক্রান্তিতে 'আনে' পাহাড়ে গিয়ে গণপতি দেবতাকে দর্শন করে এসেছ। কোন্ কোন্ ব্রত করেছ, আর কোনটা যে করো নি, তা জানি না বাপু। তুমি যতবার অশ্বত্থ দেবতার পরিক্রমা করেছ, তা একসঙ্গে যোগ করলে কাশীযাত্রার পথ হত। এই সমস্তই যখন ব্যর্থ হয়ে গেল, তখন বুঝতে হবে দেবতার ইচ্ছা অন্যরকম। তার আর কী করবে? এখন তোমার পেটেরই ছেলে হওয়া চাই এমন কী কথা আছে? আমি বলি কি পুষ্যি নিলে ক্ষেতি কী?'—এই বলে সরস্বতী পার্বতীকে সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করল।

সরস্বতীর আশা ছিল, তাদের পার্বতী আজ না হোক কাল; কাল না হোক পরশু, একদিন-না-একদিন ছেলেপুলের মা হবেই। কিন্তু এতকাল অপেক্ষার পরে নিরাশ হয়ে অবশেষে সে এই উপায়ের কথা ভাবল। একথা শোনা মাত্রই পার্বতীর মনে হল—তাইত। কী আশ্চর্য, তার মোটা বুদ্ধিতে এই সহজ কথাটা আগে কেন জাগল না? পুষ্যি হলেও সে যখন আমাদের বাড়িতে আসবে, তখন কি মৃত্যুর পরে তার হাতে আমার সদ্‌গতি হবে না? সে কি তখন 'আমার মা, আমার বাবা' এই বলে আমাদের শ্রাদ্ধতর্পণ করবে না?

এই নতুন চিন্তা উদয়ের ফলে পার্বতীর মনের ভার খানিকটা হালকা হল। আর ঠিক পার্বতীর মনের মতোই জমাট বাঁধা মেঘ সরে গিয়ে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেল। পনেরো দিন যাবৎ যে সূর্যের মুখ দেখা যায় নি, আজ তার রোদ আঙিনায় ছড়িয়ে পড়ল। আর তক্ষুণি বারান্দায় শুয়ে থাকা পার্বতী ও সরস্বতী সচকিত হয়ে উঠল। 'চলো, চলো। জ্বালানি কাঠগুলো এনে রোদে বিছিয়ে দিই। সূর্যদেব যে এত কৃপা করেছেন এই যথেষ্ট। যতটা পারি শুকিয়ে নিই।'—এই বলে ওরা কাজে লেগে গেল। গোয়ালঘরের বারান্দায় রক্ষিত রাশীকৃত ডালপালা, জ্বালানি কাঠ, পাতা ও অন্যান্য আবর্জনা সমস্ত এনে উঠোনে ফেলে ছড়িয়ে দিল। গত পনেরো দিনের নিরন্তর বর্ষণে সমস্ত জ্বালানি কাঠ ভিজে এমন অবস্থা হয়েছে যে আগুন জ্বালানো প্রায় যজ্ঞানুষ্ঠানের মতোই একটা বৃহৎ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। এই যে আজ রোদটুকু উঠেছে একি হেলায় নষ্ট করা যায়?

জ্বালানি কাঠ শুকোতে দেবার কাজ শেষ হয়ে গেলে উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সরস্বতী এমনভাবে চিন্তা করছিল যে কী যেন একটা দরকারী কাজের কথা মনে আসি-আসি করেও আসছে না। পার্বতী বলল—'ঠাকুরঝি, তুমি চান করতে যাও। তোমার পিছনে আমিও এলাম বলে।' সরস্বতীর এখন স্নানে যাওয়ার মন নেই। তার কাজ রয়েছে। রোদ উঠলে কী কী করতে হবে—এসব কথা সে কতদিন ধরে ভেবে আসছে। কিন্তু কাজগুলো যে কী সে কথা মনে না পড়ায় সে উঠোনেই দাঁড়িয়ে রইল। 'কী কাজ, কীরকমের কাজ...' ইত্যাদি প্রশ্ন করে করে হয়রান হয়ে পার্বতী অবশেষে পুকুর পাড়ে চলে গেল। জলের মধ্যে শাস্ত্র মেনে পরপর তিনটি ডুব দিয়ে স্নান পর্ব শেষ করে খুব ব্যস্ততার সঙ্গে ফিরে এল। মনে তার উদ্বেগ—উনুনের উপর চাপিয়ে রাখা ভাত এই

কাজকর্মের ঝামেলায় সিদ্ধ হয়ে হয়ে যদি ফেনাভাত হয়ে যায় তবে কী উপায় হবে? এই সব ভাবতে ভাবতে ছুটে এসে দেখে—সরস্বতী তখনো হতবুদ্ধির মতো উঠোনে দাঁড়িয়ে।

সরস্বতীকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পার্বতী বলল—'ঠাকুরঝি, এখন আমার মনে পড়ছে। রান্নাঘরের মাচার উপর তুলে রাখা পাঁপড় ও বড়াগুলো এই ঠাণ্ডায় পচে দুর্গন্ধ হয়ে গেছে। ওগুলো বের করে রোদে দিলে হয় না?' সরস্বতী বলল—'হ্যাঁ, যা বলেছ। দেখলে, কীরকম ভুলো মন?' তোমাকে এখন আর মাচানে চড়তে হবে না। আমিও আবার বাসি কাপড়ে ওগুলো ছোঁব না! যাই চট্ করে একটা ডুব দিয়ে আসি।' এই বলে সে স্নানে গেল।

যখন সে স্নান সেরে ফিরে আসছে, রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে পার্বতী বলল—'ঠাকুরঝি, একটা কাজ ভালই হয়েছে।' 'কী কাজ?' 'আর কী? বেশি সেদ্ধ হয়ে ভাত একেবারে দলা বেঁধে গেছে। ফেন যে গালব, তার জলই নেই। ওই কাইভাতগুলো তুমি কী করে খাবে?' 'ওরে একটা দিন কাইভাত খেলে আমি মরে যাব না।'—এই বলে সরস্বতী মাচানে চড়ে পার্বতীর সাহায্যে পাঁপড় বড়ার হাঁড়িটাকে নীচে নামাল। হাঁড়ির মুখ খোলা মাত্রই ভক্ করে একটা দুর্গন্ধ বেরিয়ে এল। না এসে পারে? পনের দিন ধরে বর্ষার স্যাঁৎসেতে ঠাণ্ডায় সারা পাঁপড়ে দাড়ি-গোঁফ গজিয়েছে। হাঁড়িটা গড়িয়ে গড়িয়ে বাইরের বারান্দায় আনার পরে আকাশে আবার কালো কালো মেঘ দেখা দিল। পার্বতী বলে উঠল—'হা কপাল! এই বৃষ্টিরও, দেখো, নখরা কত। পাঁপড় শুকোতে দেবে বলে নীচে আনলুম আর এই মেঘগুলোর ভারি দেমাক হল। ঠাকুরঝি, এখন জ্বালানি কাঠগুলো কুড়িয়ে রাখতে হবে না? নৈলে যেটুকু শুকিয়েছে সব বেকার।'

সরস্বতী বলল—'তুমি চুপ করো। ওগুলো শুকোলেও যেমন, ভিজলেও তেমনি থাকবে। থাক্ এখন। সন্ধ্যাবেলায় তুলব। আমি কেবল এই পাঁপড়-গুলোর কথাই ভাবছি। চট্‌করে খেয়ে নিয়ে উনুনের চারিদিকটা লেপে পুঁছে পরিষ্কার ক'রে ওর উপর তো শ'খানেক পাঁপড় শুকোনো যাবে।' দুজনেই যখন আহারের জন্য ভিতরে যাচ্ছিল এমনসময়ে হঠাৎ গোপী গাইর 'অম্বা' রব শোনা গেল। অবিশ্রান্ত বৃষ্টির জন্য আজ এক সপ্তাহ হল গোপী গোয়ালঘরের বাইরে

আসতে পারেনি। আজ বোধ করি সে রৌদ্র মেঘের খেলা দেখতে পেয়ে ভাবছিল কেউ-না-কেউ তাকে বাইরে ছেড়ে দেবে। কিন্তু বাড়ির লোকজন যে-যার নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে তাকে ভুলে আছে বলে সে 'অম্বা' রবে ডাক দিয়ে মনে করিয়ে দিল। গোপী যতই আস্তে শব্দ করুক, পার্বতী তা শুনতে পায়। গোপীর ডাক শুনে সরস্বতীকে বলল—'ঠাকুরঝি, গোপী বোধ করি বাছুরের জন্য ডাকছে।' পার্বতীকে গোয়ালঘরের দিকে আসতে দেখে গোপী তার গলার দড়িটাকে টেনে টেনে ডাকাডাকি করতে লাগল। 'দাঁড়া' বলে পার্বতী গোপীর গলার দড়িটা খুলে দিতেই সে বাছুরের মতো লাফাতে লাফাতে উঠোনে এসে পৌঁছল। গোপীর বোধ করি ইচ্ছা হচ্ছিল এতদিন ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে খিল-ধরা পাগুলোকে একটু আল্‌গা করে দিতে। ওদিকে একটা দমকা বাতাসে পুঞ্জীভূত মেঘগুলি ছিন্নভিন্ন হাওয়াতে আবার ছড়িয়ে পড়ল প্রখর রোদ।

'গোপী, আমি দুটো খেয়ে নিই, তারপরে তোকে উঁচু মাঠে নিয়ে যাব'—এই বলে পার্বতী গোরুটাকে একটা গাছের ছায়ায় বেঁধে ওর মুখের সামনে খোল-মাখানো জাব রেখে নিজে রান্নাঘরে খেতে গেল। বলল—'ঠাকুরঝি, গোপীকে একবার ছেড়ে দেওয়া দরকার। আমি দুটো খেয়ে নিয়ে ওকে মাঠে দিয়ে আসি। রোদটা এই রকম থাকলে তুমি পাঁপড়গুলো রোদে মেলে দিও।' খেতে খেতে গল্পগুজবের মধ্যে সরস্বতীর খেয়ালই হল না যে ভাতটা দলা বেঁধে গিয়েছিল। খেয়েদেয়ে পার্বতী গোপীর কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু গোপী তো একা নয়। গোয়ালে আরও দুটো শীর্ণ গোরু রয়েছে, ওদের আর দুধ দেওয়ার ক্ষমতা নেই, বয়স হ'য়ে গেছে। 'তোরাও গোপীর সঙ্গে হাত-পা চালিয়ে আয়'—এই বলে পার্বতী ওগুলোকে সঙ্গে নিয়ে বালিয়াড়ির দিকে পা বাড়াল। বাড়ির পিছনদিকে বালির টিলাটা পার হয়ে গেলে একটা উঁচুমতো বড় মাঠ। বৃষ্টির জলে সারা মাঠ সবুজ ঘাসে ঢাকা—যেন একখানি গালিচা পাতা রয়েছে। সেই সবুজ রঙের উপর রোদের নৃত্য। আর তারই অদূরে বর্ষাকালের গাঢ় নীল সমুদ্রের গর্জন। এই সমস্ত দেখে শুনে পার্বতী এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সে কি প্রকৃতির সৌন্দর্যের জন্য ? হায়, এই গ্রাম্য নিরক্ষর রমণীর মনে নিসর্গের মোহ কোথা থেকে আসবে ? ওই সমুদ্র, ওই মোহানা, ওই নদী, ওই বালির তটভূমি —এই সমস্ত তার জীবনের নিত্যকার বস্তু। কিন্তু সে জানে না যে ওই সমস্ত

বস্তুর সৌন্দর্য বলে আলাদা একটা কিছু আছে। তবু সেই মুহূর্তে তার মন যেন উদ্বেল হয়ে উঠছে। গোপী গাই যে গোরু, সে পর্যন্ত ছাড়া পেয়ে সেই উঁচু প্রান্তরে কচি বাছুরের মতো সহর্ষে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। ঘাসের দিকে মন নেই তার। আহার ছেড়ে ল্যাজ তুলে এদিক ওদিক ঘুরছে। গোপীর উৎসাহের ছোঁয়া লেগে ওই শীর্ণ বৃদ্ধ গোরু দুটি পর্যন্ত দৌড়োদৌড়ি করছে। পার্বতী হেসে বলে—'ওঃ, এ দুটোকেও পাগলামিতে পেয়েছে। এই গোপী, সেই যে কথায় বলে সাঁকো ভেঙে স্নান, রোদ থাকতে থাকতে মুখে দুটো ঘাস দিয়ে নে। তা নয়, খুব নেচে বেড়াচ্ছ? যদি বৃষ্টি নামে তখন? গোপী যেন পার্বতীর এই সাবধান বাণীর তাৎপর্য বুঝতে পেরেছে। ছুটোছুটি ছেড়ে দিয়ে সে গব্‌গব্‌ করে ঘাস খেতে লাগল। কী দ্রুত চিবোচ্ছে। কী তার চোখের দীপ্তি! ছ মাস ধরে শুকনো খড় চিবিয়ে চিবিয়ে গোপীর কাছে এই সবুজ তাজা ঘাস যেন একটা নেমন্তন্নের ভোজ! গোপীর বুড়ো সঙ্গীদের ভারি অসুবিধা। তাদের দাঁতগুলি পড়ে গেছে। ঘাস চিবোতে আর তেমন মজা নেই। তবু ওরা মহাসুখে চরতে লাগল।

রোদ তখনও বেশ কড়া ছিল। পার্বতী প্রথমে ভেবেছিল যে রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে মাথার উপর হাত রেখেই সে রাখোয়ালি করবে। কিন্তু খানিক পরেই তার মনে হল—'বাপস্! বর্ষাকালের রোদ!' একপাশে সরে গিয়ে হোয়ে গাছের শীতল ছায়ায় বসে চরমান গোরুগুলিকে সে দেখতে লাগল। কিন্তু এমনি চুপ করে বসে থাকতে পার্বতীর ভালো লাগছে না বলে সে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। 'পাশেই যে হোয়ে গাছের কাঁচা ফলগুলি পড়ে আছে, ওগুলো কুড়োই না কেন?'—এই ভেবে সে এগিয়ে গেল। হোয়ে গাছের ফলে তার শাড়ীর আঁচল ভরে যেতে বেশি সময় লাগল না। 'এত ফল না কুড়িয়ে কেউ থাকতে পারে কি?'—এই ভেবে পার্বতী তার ভুলো মনের জন্য নিজেকে গালি দিতে লাগল। আঁচল ছিঁড়ে পড়ার মতো ফল কুড়োনো হলে সেখানেই এক পাশে স্তূপীকৃত করে রাখল। এবং সেই রাশি রাশি ফলের দিকে তাকিয়ে মনে পড়ে গেল গোবিন্দ কলুর কথা। আগেকার ফলগুলি এখনও গোবিন্দকে দেওয়া হয়নি। প্রতি বছর পার্বতী ও সরস্বতী মিলে যে পরিমাণ হোয়ে ফল সংগ্রহ করে রাখে তাতে তাদের সংসারে প্রয়োজনীয় হোয়ে তেল পেতে কোনো অসুবিধা হয় না। এখন যে ফলগুলি

পাওয়া গেল, আগেকার কুড়োনো ফলগুলির সঙ্গে যোগ করলে এবছরেও যথেষ্ট হতে পারত। বর্ষার আগেই ফলগুলিকে ভেঙে রোদে রাখলে তখন তখনি গোবিন্দ কলুকে দেওয়া চলত। পার্বতীর কি ভুলো মন। হঠাৎ যদি একদিন ঘরের জমানো তেলটুকু খরচ হয়ে যায়, তখন ঠাকুরের প্রদীপ জ্বালতে গিয়ে মনে পড়বে কার কাছে একটু তেল ধার পাওয়া যেতে পারে।

বাড়িতে প্রদীপ তো একটাই নয়। ঠাকুরের প্রদীপ, দেরখো প্রদীপ, কালু গুড্ড, হাত-লেম—সব কিছুই হোন্নে তেল দিয়ে জ্বালাতে হয়। তার ভুলো মনের জন্য ঘরের প্রদীপ আর জ্বলবে না মনে করে পার্বতী নিজেই নিজেকে অপরাধিনী ভেবে ব্যথিত হল। এবং নিজেকে এই বলে দুষতে লাগল—'কেন, কিসের জন্য আমার এই ভুলো মন? দিনে দিনে এই ভুল তো বেড়েই যাচ্ছে।' সে স্থির করে ফেলল—পরদিনই ফলগুলি গোবিন্দ কলুর বাড়িতে পৌঁছে দেবে। কিন্তু রোদে না রাখলে ভেতরের বীজ থেকে তেল কি তেমন বেরুবে? রোদ এখন আর কবে আসবে? আজকের মতো আর একটা রোদ পেলেই হয়ে যেত।

পার্বতী হোন্নে তেলের চিন্তা করতে করতে ওদিকে সূর্যদেব ঢলে পড়লেন। অন্তত এক প্রহর সময় তার এখানে কাটানো দরকার ছিল। দিব্যি কেটে গেল। হঠাৎ সুপ্তোত্থিতের মতো উচ্চস্বরে ডাক দিয়ে উঠল—'গোপি, ঢের চরেছিস। এই কেংপি, এই চম্পি, বাড়ি চল্। ডাক শুনে ওরা পার্বতীর কাছে এসে দাঁড়াল। ওদের তাড়িয়ে নিয়ে পার্বতী বাড়ির দিকে পা বাড়াল। গোয়ালঘরে গোরুগুলিকে বেঁধে রেখে এসে বলল—'ঠাকুর ঝি, দেখলে আমার পোড়া মন? হোন্নে ফল গোবিন্দ কলুকে দেওয়াই হয়নি। কী যে আমার মনে হয়েছিল—এ বছর তেলের দরকার নেই বুঝি?' উঠোনো বসে পার্বতী পাঁপড়ের 'ছাতা' ঝেড়ে ঝেড়ে পাঁপড়গুলিকে গুছিয়ে রাখছিল। জবাব দিল—তোমার মনে ছিল না তো কী হয়েছে? আমার তো মনে ছিল। গোবিন্দকে ডেকে দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু বাগানে গেলে আরও ফল পাওয়া যাবে মনে হয়। এই পোড়া বৃষ্টির জন্য আমি তো আর ওমুখো হতে পারলুম না।'

'ঠাকুরঝি, আমি ওখানে অনেক 'হোন্নে' জড়ো করে রেখে এসেছি। এখন গিয়ে ঝুড়িতে করে নিয়ে আসি?'

'আমার পাঁপড়ের কাজ এই শেষ হল বলে। আমি তো শীগ্গিরও ওদিক পানে যাই নি। আজ না হয় একবার যাই, আসার সময়ে ফলগুলো নিয়ে আসব।

ঠাকুরের কৃপায় একটা রোদ তো ভালোই হয়েছে, না? চেলা কাঠগুলো না শুকোলেও পাতাগুলো শুকিয়ে বেশ কড়কড়ে হয়েছে। কাঠগুলোতে আর একটা রোদ লাগবে। কখনও যদি এই রকম রোদ ওঠে, হয়ে যাবে।' পার্বতীর মনে হল—'কাল ওঠে উঠুক, না-ওঠে না-উঠুক, আজ যে উঠেছে তাতেই চার দিনের চোখের জল বেঁচে গেল।'

পার্বতী উঠোনের শুকনো পাতাগুলি এবং অন্য আবর্জনাগুলি জড়ো করতে লাগল। সরস্বতী রওনা হল ঝুড়ি হাতে বালিয়াড়ির হোন্নে বাগানের দিকে।

পার্বতী চেলাকাঠগুলি তুলে তুলে গোয়ালঘরের বারান্দায় নিয়ে ফেলতে লাগল। ফেলতে ফেলতে সন্ধ্যা হয়ে এল। গোরুগুলির ফেন বিচালি সকালেই গরম করা হয়েছিল। তারই খানিকটা একটা হাঁড়িতে ভর্তি করে গোরুর ডাবায় এনে ঢেলে দিল।

ওদিকে হোন্নে বাগানে গিয়ে সরস্বতী ভারি খুশি হল মাঠের গাঢ় সবুজ রঙ দেখে। 'ফলগুলি তো পার্বতীই জড়ো করে রেখেছে। আমার আর কী কাজ? আমি না-হয় শুকনো পাতাগুলো ঝাঁট দিয়ে রাখি, রোদে বেশ শুকিয়ে গেছে'— এই ভেবে সরস্বতী গাছের কাঁচা ডালপালা দিয়ে কাজ চালাবার মতো একটা ঝাড়ু তৈরি করে শুকনো পাতা ঝাঁট দিতে থাকল। এই ভেবেই সে মহাখুশি যে বসে বসেই তিন চুপড়ি শুকনো ঝরা পাতা পাওয়া গেল। ঝুড়িতে করে হোন্নে ফলগুলি বাড়িতে নিয়ে বারান্দার এক কোণে ঢেলে রেখে ফেরার সময়ে একটা বড় চুপড়ি নিয়ে তার মধ্যে শুকনো পাতাগুলি ভরে ফেলল। চেপে ঠেসে গাদিয়ে ভর্তি করে চুপড়িটা মাথায় তুলল সরস্বতী।

বাড়িতে এসে বলল—'দ্যাখ পারোতি, আমরা না আনলে এতগুলো শুকনো পাতা নষ্ট হয়ে যেত না?

সন্ধ্যাকালে বারান্দায় প্রদীপ রাখার সময়ে পার্বতীর আবার মনে পড়ে গেল হোন্নে তেলের কথা। সরস্বতীকে বলল—'ঠাকুরঝি, গোবিন্দকে হোন্নে ফল দিয়েছিলে বললে না?'

'হ্যাঁ'

'সে যে তেল দিয়ে গেছে, মনে তো পড়ছে না।'

'দেবে ধীরে সুস্থে। তার কাজ সে করে রেখেছে। আমাদের যখন দরকার

হবে, তাকে একবার মনে করিয়ে দিলেই হল। গোবিন্দের বাড়িতেই থাকল বা আমাদের বাড়িতেই থাকল—তফাৎ কী ?'

'তা না। ঘরে আমাদের খরচের তেল আছে কি না তাই বলছি।'

'আধা বেলের বেশিই আছে। ফেলে ছেড়ে পনেরো দিন যাবে। আর, এই হাওয়ার মধ্যে তিন-তিনটে কুপি জ্বালিয়ে রাখাই বা কেন ? ওর থেকে কি মুক্তো ঝরে ?'

পার্বতীর মনটা হালকা হয়ে গেল। হোন্নে তেলের মহাসমস্যা মিটে গেছে। ধীরে সুস্থে গোয়ালে গিয়ে গোরুর দুধ দুইয়ে এনেছে। ঠাকুর ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয়েছে। সারাদিনের নোংরা অশুচি কাপড় চোপড় ধোওয়ার জন্য আর একবার স্নান করতে হবে। দুজনেই পুকুর পাড়ে গেল। এখনও মেঘ এসে জড়ো হয় নি। হাওয়া তখনও গরমই ছিল। কাজেই ঠাণ্ডা জলে ডুব দিতে এই সময়টায় ভালোই লাগে। গলা-সমান জলে দাঁড়িয়ে গা ধুতে ধুতে দুজনে কথাবার্তা শুরু করল। রাতে রান্নার দরকার আছে কি না এই নিয়ে আলোচনা। পার্বতী বলল—'তোমার তো খাওয়া নেই। আমারও তেমন খিদে আছে বলে মনে হচ্ছে না। বোধ করি দুপুরে কাইভাতগুলো খেয়েছি বলে...।

মাঝখানে সরস্বতী বাধা দিয়ে পার্বতীকে খেপাবার জন্য বলল—'হ্যাঁ, তুমি যে কী উপোস শুরু করেছ! এমনি উপোস করে করেই শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেলে। তোমার কত্তা যজমান বাড়িতে চুপ করে নেই। সে যখন ওদিকে হাপুস হুপুস করে পায়স-পরমান্ন গিলছে, তখন কি তুমি একটু ফেনা ভাতও সিদ্ধ করে খেতে পারো না ? রাতে রান্নার হাঙ্গাম পোহাতে না চাও দুপুরে একমুঠো চাল বেশি নিলে জল-দেওয়া ভাত খেতে পারতে। বেশ ঝাল ঝাল আচার রয়েছে। তাতে তেল নুন দিয়ে খেলে সোয়াদ লাগে না ?'

সাধারণত স্বামী যেদিন যজমান গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজন করে এসে বলে যে রাত্রিতে ভোজনং নাস্তি, সে সব দিনে পার্বতী দুপুরের ভাতে জল দিয়ে রাখে। কিন্তু এখন বর্ষাকাল বলে পার্বতী বলল—'ঠাকুরঝি, যখন এই পোড়া বর্ষার ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে শুরু করে, তখন জল-দেওয়া ভাত মুখে দিতে গেলে মনে হয় যেন নাড়ি-ভুঁড়ি সুদ্ধ উল্টে আসে। গরমের দিনে জল-দেওয়া ভাত সত্যি বেশ ঠাণ্ডা, খেতেও সোয়াদ।'

সরস্বতীর মনে পড়ে যায় ছেলেবেলাকার কথা। কপালের সিঁদুর যেদিন

মুছে গেল, সেদিন থেকেই সে রাতের খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। সেদিন থেকে জল দেওয়া শীতল ভাতের স্বাদও মিটে গেছে তার। পার্বতীর কষ্টের কথা ভেবে সরস্বতী বলল—'পাগলামি কোরো না বৌদি। তুমি খুব শ্রান্ত। ধীরেসুস্থে চানটা সেরে নিয়ে শিব মন্ত্র জপ করো। আমি গিয়ে রান্নাটা সেরে ফেলি। দুপুরের সাম্বার কিছু আছে কি?' এই কথাটা জিজ্ঞাসা করে সরস্বতী তাড়াতাড়ি স্নান সেরে উঠে এল।

'দরকার নেই, ঠাকুরঝি। তুমি আবার কেন ঝামেলা পোহাবে? দুপুরের সাম্বার কিছু নেই। কাঁচা আমের সঙ্গে শশা দিয়ে সাম্বার করেছিলাম। খেতে বেশ স্বাদ হয়েছিল বলে এক মুঠো ভাত বেশিই খেয়ে ফেলেছি। মাঝে মাঝে পেট কামড়াচ্ছিল। ভাবলুম—কেন ছাই এমন হচ্ছে? আসলে ওই কাঁচা আমের সাম্বার খেয়েই এই বিপত্তি...।'

সরস্বতী কিন্তু পার্বতীর কথা শোনার জন্য অপেক্ষা না করে রান্নাঘরে গিয়ে উনুন ধরিয়ে জল গরম চড়িয়ে দিল। পার্বতী স্নান সেরে গা মুছে ফেলে যখন শুকনো কাপড়ের জন্য এদিক ওদিক খোঁজাখুঁজি করছে, তখন সরস্বতী আপন মনে বলছিল যে ভাতের সঙ্গে ব্যানোন্ কী করা যায়। উঠোন থেকেই পার্বতী উচ্চস্বরে জানিয়ে দিল—'গোজ্জু গিজ্জু কিছু চাই না আমার। আচার আছে আর আমি আছি। সরস্বতী বলল—'তোমার কি এতই দারিদ্র্য? আমরা যে আমের মোরব্বা তৈরি করে রেখেছি, তার বৈয়ামের মুখ এখনও খোলা হয়নি।' এই আমের মোরব্বা গরমের সময়ে তৈরি করে বৈয়ামে ভরে রাখা হয়েছে এবং সে বৈয়ামের মুখ যে খোলা হয়নি একথাও সত্য। আর ঠিক এই কারণেই ওই জিনিসটা আজ খাওয়া পার্বতীর অনুচিত মনে হল। বলল—'ঠাকুরঝি তোমার দাদার আগেই কি আমি ওটা মুখে দিতে পারি?' সরস্বতী রেগে বলল—'চুলোয় যাক তোমার শাস্তর্। দাদা ছ্যাখো গিয়ে, কত যজমান বাড়িতে আমের মোরব্বা পরখ করেছে। যাকগে। সিদ্ধ আম দিয়ে একটা গোজ্জু করে দিই, কেমন?'

'হ্যাঁ, তা করতে পারো।' পরক্ষণেই দুপুর বেলায় কাঁচা আম খাওয়ার কথা মনে পড়াতে পার্বতী বলল–'দরকার নেই ঠাকুরঝি। কিছু লাগবে না। দুপুর বেলাকার কাঁচা আমটা পেটের পক্ষে ভালো হয়নি। এখন আবার আমের 'গোজ্জু' (অনেকটা কাঁচা আমের ডালের মতো) খেলে পেট গরম হতে পারে।'

ভ্রাতৃবধূর কথা শুনে সরস্বতী কী করবে ভেবে পেল না। আপন মনে বলতে থাকল—'কিছুই করার দরকার নেই। খালি ভাত ও আচার খাওয়াই এর অদৃষ্টের লেখন। দাদাকে হাজার বার বলেছি,—'গোপী গাইটা বুড়ো হয়েছে, শুকিয়ে গেছে। অন্তত চারপোয়া মতো দুধ দেয় এমন একটা মোষ নিয়ে এসো। আর কিছু না হোক, খানিকটা ঘোলের জল তো দেখতে পাব।' দাদার আর কী, যে-বাড়িতে যায় দুধ দই খায়। পারোতি যে একটু দুধ-ঘি না খেতে পেয়ে শুকিয়ে কাঠি হয়ে গেছে একথা তার বিশ্বাসই হয় না।'

সরস্বতীর স্বগতোক্তি পার্বতীর কানে গেল। সে বলল—'ঠাকুরঝি, তুমি কেন তাঁকে মিছেমিছি মন্দ বলছ? এই বয়সে ঘোলের জল খেলে কি আমার স্বর্গলাভ হবে?'

আসলে সন্তানহীনতার বেদনাই পার্বতীকে আহারে-বিহারে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ করে রেখেছে। সরস্বতী জানে—এসব ব্যাপারে পার্বতীর মতামত [illegible] করে লাভ নেই। তাই সে হাতায় করেই কয়েকটা বড়া ভাজল এবং ঝাল-মেশানো বিউলি ডালের তিনখানা পাঁপড়ও সেঁকে নিল। তারপরে জপে বসল। জপ করতে করতে উনুনে চড়ানো জলটা বেশ ফুটে উঠল। 'শিব শিব' 'ওঁ নমঃ শিবায়' এই মন্ত্রগুলি শেষ করে হাতের জপমালা ফেরাতে ফেরাতেই রান্না শেষ হল। পার্বতীকে ডেকে বলল—'থালা পাতো, এইটুকু তো রান্না। এ আবার একটা কাজ? কাঠ যদি শুকনো হয়, রান্না হতে কতক্ষণ? এই দেখ, দুদণ্ডও লাগেনি।'

ননদের স্নেহের কথা ভাবতে ভাবতে পার্বতী খেতে বসল। সরস্বতী পাঁপড় ও বড়া ভেজে রেখেছে বলেই খাওয়ার একটু ইচ্ছা হল। থালার দিকে তাকিয়ে দেখল—তিন তিনখানা পাঁপড়ই তাকে দেওয়া হয়েছে। একখানা পাঁপড়ের উপর দু'একটি বড়া হাতে নিয়ে এক ঘটি জল সমেত পার্বতী বাইরে এল।

বারান্দায় বসে সরস্বতী তখনও জপ করছে। কোনো প্রদীপ ছিল না সেখানে। অন্ধকারে পার্বতীর পায়ের শব্দ শুনে বলল—'পারোতি, এখনও খাওনি?' পার্বতী উত্তর দিল—'ঠাকুরঝি, আমায় কি রাহুতে ধরেছে যে তিন তিনটে পাঁপড় আমি একাই খাব? ত্যাখো অন্তত একখানা তুমি খাও।' এই বলে পাঁপড় খানা তার সামনে রেখে পার্বতী চলে গেল। সরস্বতীর জপ শেষ

না হওয়া পর্যন্ত পাঁপড়খানা সেইভাবেই পড়ে থাকল। প্রত্যহ রাতে সরস্বতী একহাজার আটবার পঞ্চাক্ষর জপ শেষ করে তবে শুতে যায়, তার আগে নয়। আজ পাঁপড়ের জন্য সে কি ব্রতভঙ্গ করবে? তার জপ শেষ হওয়ার মধ্যে পার্বতী খেয়ে নিয়ে এঁটো জায়গাটা লেপে পুঁছে ফেলল। রান্নাঘর থেকে কুপিটা বাইরে এনে বলল 'এখনও পাঁপড়খানা মুখে দিয়ে উঠতে পারোনি?' 'জপটা শেষ করেই খাব।' জপ শেষ হলে সরস্বতী সেই পাঁপড়খানাকে দুভাগ করে আধখানা পার্বতীকে খাইয়ে তবে ছাড়ল।

রাতটি সুন্দর। ফুর্‌ ফুরে হাওয়া বইছে। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ভাব। বর্ষার মেঘ এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে। তারই মধ্যে বেচারা চাঁদের উঁকি ঝুঁকি। উঠোনে জ্যোৎস্না দেখে সরস্বতী বলল—'বৌদি, প্রদীপ আর কিসের জন্য? বাইরে কেমন চাঁদের আলো!' এই বলে প্রদীপটা নিভিয়ে দিয়ে পার্বতীর মুখোমুখি খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে সেই বছরের তরি-তরকারির ফলন সম্পর্কে কথাবার্তা শুরু করল। পার্বতী বলল—'ঠাকুরঝি, এবছর তরকারি বীজ যা পুঁতেছিলাম, তার একটিও নেই। যে চারাগুলি বা গজিয়েছিল, অশ্রান্ত বৃষ্টির ফলে সব পচে গিয়েছে। আর একবার যে বীজ লাগাব তা বীজ দেবে কে? ভিণ্ডির চারাগুলি কী সুন্দর উঠেছিল, না?'

পার্বতীর কথায় সায় দিয়ে সরস্বতী বলল—'যা বলেছ। শশা দিয়ে আর কত দিন চলবে? বড় জোর একমাস। তখন নতুন বীজ পুঁতে চারা গজিয়ে তরকারি পেতে পেতে 'চতুর্থী' পার হয়ে যাবে। সে পর্যন্ত কী সেদ্ধ করব?'

পার্বতী বলল—'তরকারি নেই বলে যদি পাঁপড়, বড়া, আমের মোরব্বা বের করি তোমার দাদা আবার রেগে যান। আর যদি নারকেল দিয়ে একটু 'সাম্বে' কি 'পালন্ত' করি তবে বলবেন—'সমস্ত নারকেলগুলো খরচ করে ফেল আর কি। ধুয়ে মুছে বাগান থেকে যা নারকেল পাব তা ত এই কটি। তাই দিয়ে খাওয়া, তেল তৈরি করা আবার বিশেষ পাল-পার্বনের ব্যবস্থা করা।'

'হ্যাঁ। দাদার কাজের ধারা ত এই রকমই। খেতে বসে কত বাহানা। মুখে ভালো লাগা চাই! আজ যা তৈরি হল, কাল আর তা করা যাবে না। জিনিসপত্তর আসুক না-আসুক, রান্নাটি পরিপাটি হওয়া চাই। ছ্যাখো, গত বছর আমাদের কী বুদ্ধিই যে হয়েছিল! আমাদের নীচু জমিগুলোকে ওভাবে পতিত ফেলে না রেখে অন্ততপক্ষে তিলও যদি বুনে দেওয়া যেত, কম করে

ত্‌ু 'বেলে' তিল ত পেতাম। তখন দাদা বললে কিনা—দরকার নেই। এখন নারকেল তেল খরচা হলে হৈ চৈ করে। করে করুক—কী আসে যায়?'

কথা বলতে বলতে সারাদিনের ক্লান্তিতে দুজনেরই ঝিমুনি আসে, গলার আওয়াজ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়, কথা আর পরস্পরের কানে পৌঁছায় না। ওইভাবে বসে থেকে থেকে দুজনেই কাৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। ঘুমও এসে যায়।

কখন এক সময় নিত্য প্রথামতো সদর দরজার দিক থেকে ঐতালের কণ্ঠ ধ্বনিত হয়—'সাংবশিব সাংবশিব।' উঠোনে এসে মাটির উপর পা দিয়ে থপ্‌ থপ্‌ শব্দ করে পায়ের ধুলো ঝেড়ে ফেলে দেয়। ছাতা ও চাদর বারান্দায় রেখে দিয়ে পুকুর থেকে পা ধুয়ে এসে বলে—'কী ব্যাপার? নিদ্রা এসে গেল? একটা প্রদীপও কি জ্বেলে রাখতে নেই?'

পার্বতী ধড়মড় করে উঠে পড়ল—'ঠাকুরঝি, তোমার দাদা এসেছেন।' এই বলে প্রদীপ জ্বেলে আনতে রান্নাঘরে গেল। সরস্বতী তার দাদাকে বলল—'এই অন্ধকারে নদী পার হওয়ার কী দরকার ছিল? বানের জলে খেলা?'

ঐতাল উত্তর দিল 'অন্ধকার? কোথায় অন্ধকার? কী অপর্যাপ্ত জ্যোৎস্না! তাছাড়া সঙ্গে ছিল 'কণ্যান' গ্রামের সুব্বুরায়। আজ হাটবার না? সে গিয়েছিল কুন্দাপুরের হাটে। সেখান থেকে ফেরার পথে দেখা হয়ে গেল, তোমার ওই কোটার বাজারে। দুজনেই হনহন করে পা চালালাম। জল তেমন নামেনি এখনও, সকালের মতোই আছে। কাল ভোর বেলা নাগাদ নেমে যাবে আর কি। বিষ্টি ধরেছে দুই প্রহর হল না? এবারে জল নামবে।'

'খুব জল হয়েছে?'

'জলে জলাকার! হোক না, ভালইত। কে আর হাত দিয়ে মাপে? আমার মন ছিল সুব্বুরায়ের কথার দিকে।......সরসোতি, আমাদের সুব্রায়ের একটি ছোট বোন আছে না? বিয়ে হয়েছিল ঐরোডি গ্রামে। মেয়েটা এখন দুটো অন্নের জন্য ওর দাদার সংসারে রয়েছে। তার একটি মেয়ে ছিল—কী নাম যেন? সে এখন কোথায় আছে—এখানে না ঐরোডিতে? তাকে এই এতটুকু দেখেছি মনে পড়ে—তার নাকি বিয়ে।'

'এতটুকু আর কি? সাবিত্রীর বয়স দশ তো পূর্ণ হল। আসছে অঘ্রানে দশ পেরিয়ে এগারোয় পা দেবে। তবে মেয়েটা খুব ভালো। কী সুন্দর

কুকুরটার উদ্দেশে কাকুতি মিনতি করে, 'ছু আতু ছু চুপ্ আতু চুপ্।'... আবার কুকুরের মালিকের উদ্দেশে ধমক দিয়ে বলে, 'এই সুরো, সুরো, ডাকছি যে শুনতে পাস নে?' এইভাবে কিছুক্ষণ চলার পরে নিরুপায় ঐতাল যখন সিদ্ধান্ত করল যে সুরোর কুকুরটার যে সজাগ বোধ আছে, সুরোর তা নেই— ঠিক এমনি সময়ে ভিতর থেকে গলার সাড়া পাওয়া গেল।

ঐতাল তার কাজের কথাটা সুরোকে জানিয়ে নিদ্রাজড়িত চোখে ঝিমুতে ঝিমুতে বাড়ি পৌঁছে 'হা সাম্বশিব' বলে সটান মাদুরের উপর শুয়ে পড়ল। ক্লান্তি বা শ্রম হলে এইভাবে 'সাম্বশিব' বলে ডাক ছাড়া ঐতালের স্বভাব। তাই পার্বতী খুব মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে—'খুব ক্লান্ত বোধ হচ্ছে?' ভ্রূ কুঞ্চিত করে ঐতাল জবাব দেয়—'ওব, বাবা তুমি দেখছি নখরা শুরু করে দিলে। ক্লান্ত হয়েছি তো তাতে কী? তাছাড়া খাওয়াটাও হয়েছে অসময়ে। খালি হাই আসছে।' বলতে বলতেই ঘুমঘুমো চোখে ঐতালের কণ্ঠ থেকে একটা হাই বেরিয়ে আসতেই বলল—'হুঁ, শুয়ে পড়োগে!' পোষ্যগ্রহণের প্রসঙ্গটা পার্বতীর জিহ্বাগ্রে এসে গেলেও স্বামীর মেজাজে শান্ত হয়ে সে স্থির করল—'না, এখন নয়।' এইভেবে সে চুপ করেই রইল।

এদিকে বাড়ির দেয়ালগুলির সঙ্গে ঝোলানো তালপাতার খস্ খস্ শব্দকে পরাভূত করে ঐতালের নাসিকা গর্জন শুরু হয়ে গেল। আবার ঐতালকে অতিক্রম করার চেষ্টায় এক নাগাড়ে গর্জন করছিল বর্ষাকালের সমুদ্র। ঐতালের নাসাধ্বনি, তালপাতার খস্ খস্ শব্দ আর সমুদ্রের গর্জন—এই তিনটি বস্তু মিলে বেশ একটা ঘুমপাড়ানিয়া ঐকতান সৃষ্টি হল।

তিন

রাম ঐতাল যা বলেছিল, তা-ই হল। পরদিন ভোরের আগেই তার অধিকাংশ ক্ষেতের জল নেমে গেল। ভোরবেলায় সরস্বতী ঘুম থেকে উঠে প্রথমে নদীর পারে গিয়ে দেখল জল সত্যসত্যই নেমে গেছে। তখন সে সেখান থেকে সোজা সুরোদের বাড়ি গিয়ে হাজির। সরস্বতীর গলা শুনে সুরোর স্ত্রী জেগে উঠে জিজ্ঞাসা করল—'কে? মাঠাকরুণ? কী ব্যাপার?' সরস্বতী তার আগমনের উদ্দেশ্য জানিয়ে দিলে সুরোর স্ত্রী বলে উঠল, 'বাপরে! এই বামুনগুলো কোনো কিছু ধরলে তার আর নিস্তার নেই।' সুরোর স্ত্রী এমন কথা বলছে কেন ভেবে সরস্বতী খুব বিস্মিত হল। ততক্ষণে সে বাইরে এসে বলল—'ঠাকুর মশাই কালরাতে এসে বলে গেলেন। তারপরে একটু চোখে বুজতেও পারিনি এমন সময়ে আপনি এলেন। হাল চায় তো ভোরবেলায়, না? রাত্তিরে এত তাড়া কিসের?' দাদার দিগ্‌বিজয়ের বৃত্তান্ত সরস্বতী কিছুই জানত না। এতক্ষণে তার মুখে হাসি দেখা দিল। 'নে তুই যত পারিস আমায় গাল দে। এই একটা বছর হালের কাজ শেষ হলে আগামী বছর পর্যন্ত তোদেরকে আর জ্বালাতন করব না।'

সুরো কথার খেলাপ করেনি। সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সে হাল নিয়ে গিয়ে ক্ষেতে নামল। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় আর ঝির ঝিরে বৃষ্টির তালে তালে ঠিকসময়ে শেষ হয়ে গেল সুরোর কাজ। কিন্তু রোয়ার মাঠ থেকে ধানের চারাগুলো উপড়ে আনার কাজে খানিকটা ব্যাঘাত দেখা দিল। কারণ একাজে সুরোর স্ত্রী ছাড়া ঐতাল আর কাউকে খুঁজে পেলনা। তা বলে সে কি দমবার পাত্র? স্ত্রী ও বোনকে কাজে লাগিয়ে স্বয়ং সে রোয়ার মাঠে নেমে পড়ল। তিনটি রমণী বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে ধানের চারাগুলো উপড়ে নিয়ে নিয়ে মুঠো করে করে ছুঁড়ে মারল। ঐতাল মনে মনে ভাবল—'হ্যাঁ, কী এমন মহাকার্য! এই আবার একটা কাজ?' এই ভেবে লম্বা লম্বা পা ফেলে চারা গাছের আঁটিগুলোকে নতুন চষা মাঠে নিয়ে গেল। মনে করলে রাম ঐতাল পারে না

হেন কাজই নেই। যতগুলি চারা তোলা হয়েছিল, সন্ধ্যার মধ্যেই সবগুলোকে মাঠে রোপণ করে দেওয়া হল।

এ বছরের চাষ বাসের কাজে বড়ো গোলমাল দেখা দিল বানের জল ক্ষেতে ঢুকে যাওয়ায়। প্রথম পনেরো দিন কারও কোন কাজ কর্ম হয়নি। দেরি হয়ে গেলে রোয়ার মাঠের চারাগুলিতে গাঁঠ বেধে যেতে পারে আশঙ্কা করে সকলেই একসঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠল। সকলের চাষবাস একই সময়ে চলতে থাকায় দরকারমতো কাজের লোক পাওয়াই গেল না। তাই চারা তোলা ও চারা রোপণের কাজের আধাআধি ভার ঐতাল পরিবারের উপর গিয়ে পড়ল। বাইরের লোক বলতে মাত্র দুজন—লাঙল চালাতে সুরো, রোয়ার কাজে তার স্ত্রী। আবার সুরোর ক্ষেতে কাজের সময়ে সরস্বতী যেচে গিয়ে সাহায্য করে ঋণশোধ করে দিল। সুরোর স্ত্রী যেন একথা না বলে বা না মনে করে যে সকলের বাড়ি বেগার খেটে তাদের ক্ষেত নষ্ট হয়ে গেছে।

জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম দিকে পশ্চিম দিকের যে মাঠকে মনে হচ্ছিল একটা বিশাল দীঘি বলে, এখন রোয়ার কাজ শেষ হলে সেই মাঠে ঘন সবুজের সমারোহ। আর সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাস যেন ঢেউএর উপর ঢেউ দিয়ে যায় দূর বিস্তৃত ধানের ক্ষেতে। ঐতালের বাড়ির বালিয়াড়িতে দাঁড়ালে পূর্ব পশ্চিম দুটো দিকই অবারিত চোখে পড়ে। পশ্চিম দিকে তাকালে চির পরিচিত সমুদ্র তার নীল নীল রূপে কখনো সবুজের আভা এনে গর্জন করে চলেছে। আর, সেই সমুদ্রের তটে উচ্ছ্বসিত ফেনা ছড়িয়ে বার বার আছাড় খেয়ে পড়ছে বড় বড় ঢেউ। পূবদিকে তাকালে দেখা যায়—ওই সমুদ্রের মতোই বিশাল বিস্তৃত খেতে সবুজের ঢেউ যেন গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে।

এ বছর বর্ষার শুরুতে চাষীদের খুব অসুবিধা হলেও পরবর্তী দিনগুলিতে তাদের প্রত্যাশামতোই বৃষ্টি হল। কেবল তাই নয়, বন্যার জলে আর একটা সুবিধাও দেখা দিয়েছে। গত কয়েক বছরের তুলনায় এবার প্রায় সকলের ঘরে তিনগুণের মতো জ্বালানি কাঠ এসে গেছে। ঐতালের বাড়িটা মোহানার খুব কাছাকাছি বলেই তারা সমুদ্রে গিয়ে নামতে খুব সাহস পায় না। মোহানা থেকে যারা একটু দূরে থাকে, তাদের খুব সুবিধা। তাদের জ্বালানি কাঠ নিজেদের প্রয়োজন মিটিয়ে কিছু বেচার মতোও হয়েছে। জলে ভেসে-আসা বড় বড় গাছের খণ্ডগুলিকে সমুদ্রের কিনারেই গেড়ে লুকিয়ে রেখে ধীরেসুস্থে গোপনে

বিক্রি করবার মতো লোকও আছে। সরস্বতী-পার্বতীদের তেমন কোনো লোভ নেই। প্রয়োজনীয় কাঠ পাওয়া গেছে—এতেই তারা খুশি। এখন তারা অপেক্ষা করে আছে প্রথম একাদশীর জন্য।

দেখতে দেখতে সেদিনটিও এসে গেল। গ্রামে ভাগবত-রামায়ণ পাঠ শুরু হয়ে গেছে। সরস্বতী ও পার্বতী যেমন আশা করেছিল, কথকঠাকুর সেখান থেকেই শুরু করলেন—যেখানে অক্রুর এসে কৃষ্ণ বলরামকে বৃন্দাবন থেকে নিয়ে গেল মথুরায় কংসের প্রাসাদে। আষাঢ়-শ্রাবণ দুটো মাস যে কীভাবে কেটে গেল তারা টেরও পেল না।

ভাদ্র মাস শেষ হতেই মাঠে মাঠে ধানের শীর্ষে সোনালী রং ধরে সমস্ত ধান গাছ শরশয্যায় শায়িত ভীষ্মের মতো শুয়ে পড়েছে। কামারদের ঘরে ঘরে কাস্তের দাঁতে ধার দেওয়ায় সময়। ধানকাটা আসন্ন। ইতিমধ্যে কোথা থেকে আকাশে পুঞ্জীভূত মেঘের গর্জন। চাষীরা কাস্তে নিয়ে ধানের গোছাটা মুঠোয় ধরার মধ্যেই মুষলধারে বৃষ্টি ও বিদ্যুতের আবির্ভাব। দিনের বেলাতেই অন্ধকার। সমুদ্র থেকে পূর্বঘাট পর্যন্ত বিদ্যুৎলতাগুলি এঁকেবেঁকে ঝিলিক মারে। চোখের সামনেই যেন কোথায় বজ্রপাত হয়, কোথায় যেন বাজ পড়ে তালগাছ দগ্ধ হয়ে যায়।

একদিন ফসল কাটার জন্য সরস্বতী ও পার্বতী মাঠে নেমে কাস্তে হাতে নিতেই তাদের এক শ গজ দূরে একটা বজ্রপাত হল। সমস্ত শরীরে ঝিম ধরে গিয়ে দুজনেই অকস্মাৎ হতবুদ্ধি হয়ে পড়ল। হাতের কাস্তে মাটিতে খসে পড়ল। হুস হতেই কাতর কণ্ঠে সরস্বতী বলতে লাগল, 'ধনঞ্জয়, ধনঞ্জয়।' পার্বতীকে বলল—'পারোতি, ধনঞ্জয় বলো, তিনিই রক্ষা করবেন।' পার্বতীও সরস্বতীর মতো ধনঞ্জয় মন্ত্র আবৃত্তি করতে থাকে। ওরা দুজনে পিছন ফিরে দেখে—বালিয়াড়ির ছ' সাতটি তাল গাছ জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেছে। পরমুহূর্তেই ওরা মাঠ ছেড়ে বাড়ির দিকে ছুটল, সেদিন আর মাঠে দাঁড়াতে কারো সাহসে কুলোল না। শাবল-কুড়ুল, কাস্তে উঠোনে ফেলে দিয়ে ওরা আবার ধনঞ্জয় জপ শুরু করে দিল।

মেঘের খেলা সেইদিনই শেষ। তার পরে শুধু রোদ আর রোদ। ছ' সাত দিনের মধ্যে গ্রামের হলুদ রঙ্‌ ভরা মাঠ আবার কালো হয়ে আসে। নাবাল জমিতে একটা একটানা ও-ও-ও ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সুরোর বলদ দুটো কাঁধে

জোয়াল টানছে। ঐতালের বাড়ির আঙিনায় সরস্বতী, পার্বতী ও সুরোর স্ত্রী মাথায় কাপড় বেঁধে 'ধান চেড়ে পাটা'র উপর ধানের ছড়া আছড়ায় আর মাঝে মাঝে সোৎসাহে বলে ওঠে—'হোলি আয় আয়! হোলি ছুটে আয়!' বস্তুত সমস্ত চারা জলে পচে গিয়ে এ বছরের ফসল নষ্ট হয়ে গেল বলে যারা একদিন চোখের জল ফেলেছিল, এখন তারা ধানের ঢিবি দেখে মহাখুশি। সরস্বতী বলল, 'এবছর অন্তত দশ 'মুড়ি' (১ মুড়ি=৪২ সের) ধান বেশি হবে।' পার্বতী সায় দিল—'তা হবে।' ঐতাল রেগে গিয়ে বলল—'তোদের পোড়া মুখে অলক্ষুণে কথা। কেবল কি দশ 'মুড়ি' বেশি? এক 'কোর্জি' (=৪২ মুড়ি) বল না কেনে?' ঐতালের মনেও সেই একই চিন্তা যে ধান এবার বেশিই হয়েছে, কিন্তু মুখে সে কথা স্বীকার করতে নারাজ! তাই সেদিন যে ধান মাপার জন্য 'ধামা ও দণ্ড' নিয়ে এসেও ধান না মেপেই রেখে দিল।

দীপাবলীর পরে একদিন সরস্বতী ও পার্বতী বাড়ির বাইরে গিয়েছে, বাড়িতে ঐতাল একা। এই সুযোগে সে 'ধামাদণ্ড' বের করে পুরো ধানটা মেপে দেখল। একা একা মাপতে খুবই পরিশ্রম হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে কী? ধান সত্যিই বেশি হয়েছে—দশ নয়, পনেরো 'কলসে' বেশি অর্থাৎ সরস্বতী যতটা আন্দাজ করেছিল তার চেয়েও দেড়গুণ বেশি। ঐতালেরধান মাপা শেষ না হতেই সরস্বতী ও পার্বতী বাড়ি ফিরে এল। সরস্বতী জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন দাদা, গত বছরে যা হয়েছিল, এবারেও তাই তো? ঐতাল উত্তর দিল, 'তোদের পোড়া মুখের কথায় দুই 'কলসে' কম।'

কিন্তু সরস্বতীও কম যায় না। ঐতাল বাড়িতে নেই এমনি এক দিনে পার্বতীর সঙ্গে যুক্তি করে নিজেরাই ধান-টান মেপে এই ভেবে নিশ্চিন্ত হল যে তাদের আনুমান মোটেই মিথ্যা নয়। সরস্বতী বলল—'বাপরে! লোক বটে আমার দাদা! বাড়ির লোকের কাছেও মিছে কথা? এলে জিজ্ঞেস করব, 'গতর খাটানোর সময়ে আমরা, কিন্তু কতটা ধান হল সে কথাটুকু জানার অধিকারও আমাদের নেই? পারোতি, খড়ের আঁটি দেখেই আমার মনে হয়েছিল যে, গত বছরের চেয়ে কম করেও তিনশ আঁটি বেশি হবে। কিন্তু এই আমার দাদা?'

পার্বতী বলল—'আমাদের যে বেশি ফসল হয়েছে একথা জানতে পেলে পাছে আমরা যার তার সামনে বলে বেড়াই, তাই বোধ করি লুকিয়েছেন?'

'সেটুকু বুদ্ধি আমাদের নেই বুঝি? ফসল কাটা শেষ হতেই খবরটা সারা গাঁয়ে রটিয়ে বেড়াব, কেমন?'

'যাক ঠাকুরঝি, আসল কথা তো আমরা জানতেই পারলুম।' সরস্বতী প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল—'এ বছর আমাদের খড়ও আছে, ধানও আছে। দাদাকে বলব অবশ্যই যেন একটা মোষ কিনে আনে।'

'তুমি আমার জন্য মোষের কথা তুলো না ঠাকুরঝি। আমার এখন আর ঘোল মাখন খেয়ে মোটা হবার দরকার নেই।'

'বেশ ত, দাদাও দুধ ঘোল খেলে তো আর শুকিয়ে যাবে না। ছ্যাখ্ পারোতি, খাওয়া-পরাই যদি না থাকে, তবে সম্পত্তি কিসের জন্য?'

কেবল যে ঐতালের ক্ষেতেই ধান বেশি হয়েছে তা নয়। মোটামুটিভাবে সকলের ঘরেই ভাল ফসল উঠেছে। তাই ধান কাটার সময়ে মাঠ-কে-মাঠ আনন্দ উৎসাহে পরিপূর্ণ ছিল। তারপরে বৃষ্টি থেমে যাওয়ার দিন থেকে পরবর্তী পনেরো দিন পর্যন্ত গাঁয়ের চারদিক থেকে কেবল একই আওয়াজ—'আয়রে হোলি চলে আয়! হোলি ছুটে আয়!' সকল বাড়ির উঠানে উঠানে ধান ঝাড়ার কাজ, আঁটি আঁটি খড় নিয়ে গাদা তৈরির কাজ, গোলায় গোলায় ধান তোলার কাজ। 'ধান-চেড়ে পাটা'-র সামনে দাঁড়িয়ে গ্রামবাসীরা যে এক সময়ে প্রার্থনা জানিয়েছিল 'ধানে চালে ভরুক ঘর' তাদের সেই প্রার্থনা বৃথা যায় নি। এ বছরের দেয়ালি উৎসবে সব বাড়িতেই যেন একটা নতুন শ্রী ফুটেছে। জমিদারেরা বুঝেছে যে এবছর বাকিদার চাষীরা ফসলী খাজনা দিতে বোধ হয় কসুর করবে না।

কিন্তু ঐতালই হোক, সুরোই হোক, সুব্বুরায় হোক অথবা কোডিগ্রামের যে কেউ হোক, যদি জিজ্ঞাসা করা যায়—'এবছর ফসল কেমন?' তবে উত্তর শোনা যাবে—'টাকায় বারো আনা। বানের জলটা না এলে টাকায় আঠার আনা হত।' কিন্তু একথা কারও মনে এল না যে বানের জলে যে পলিমাটি এসেছিল, তাতেই এবার সোনা ফলেছে।

এখন শেষ বর্ষাও কেটে গেছে। ফসলকাটার সময়ে সমুদ্র খানিকটা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেও এখন আবার শান্ত হয়েছে, যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে—'বৃষ্টি এখন অনেক দূরে'। ঐতাল আজকাল প্রত্যহ একবার করে তার নারকেল বাগান দেখতে যায়। এ বছর তার বাগানের ও গাছপালার কোনো ক্ষতি হয়নি। বয়স্ক

কয়েক বছর আগেকার এক বন্যায় যে বাগানের মাটি ভেসে গিয়েছিল, এবারকার বন্যায় সেখানে নতুন মাটি এসে জমা হয়েছে। সেই বাগানের সামনে কম করে তিন একরের মতো পলিমাটির চর জেগে উঠেছে। আর, তার বদলে মোহানার কোপটা গিয়ে পড়েছে নদীর দক্ষিণ পাড়ে। ওদিককার অনেকগুলি বাগান যে কেবল বৃক্ষশূন্য হয়েছে তাই নয়, কিছু বাড়ি ঘরও নাকি ভেসে গেছে। ঐতাল মনে মনে বলল, 'অন্তত একটা বছরও কি এই মোহানা মানুষকে না জ্বালিয়ে চুপ করে থাকতে পারে না ?'

নিজের বাগান সীমানায় দাঁড়িয়ে ঐতাল একবার দূরের দিকে তাকাল—কোনো বাগান আধাআধি, কোনোটা বা পুরোপুরি প্লাবিত হয়ে গেছে। সেদিকে তাকিয়ে থেকে ঐতাল আন্দাজ করবার চেষ্টা করছে—'ওটা কার বাগান হতে পারে ? ওহো, ওটা নিশ্চয়ই কিট্টপ্পা নায়কের বাগান। আর একটা বাগান, ওটা বুঝি সুন্দর-শ্যানুভাগের (শ্যানু ভাগ=গ্রামের গোমস্তা) ? হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

বাড়ি ফিরে এসে ঐতাল আপনা থেকেই বলতে লাগল—'সরসোতি, ঠিক যা বলেছি, তাই। কাল তোকে বলিনি যে কোডিগ্রামের ওদিকটাতে দিন কয়েক আগে একর-তিনেক নারকেল বাগান শূন্য হয়ে গেছে ? ওদের মধ্যে একটা হল গিয়ে তোমার ওই কিট্টপ্পা নায়কের, আর একটা হল গিয়ে সুন্দর শ্যানুভাগের।'

ব্যথিত কণ্ঠে সরস্বতী বলল—'আহা ! ওদের কত পয়সা জলে গেল ?'

'তুই কি পাগল হলি নাকি ? যার-তার মাথায় ঝাড়ি মেরে কামানো পয়সা ! ওদের মধ্যে আবার ওই সুন্দর-শ্যানুভাগ। চর এলাকায় যত চাল চালান দেয়, আজ পর্যন্ত কোনোদিন তার ৪২ সেরে 'মুডি' হয় নি। ৩৯।৪০ সেরের বেশি তার 'মুডি'ই হয় না। কথায় বলে পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে।'

সরস্বতী উষ্ণ হয়ে বলল—'তোমার আর কী ? এবছর পনের 'মুডি' ধান বেশি পেয়েছ বলে তোমার খুব দেমাক হয়েছে। ওদের বাগানের ক্ষেতি হয়েছে, বললে কিনা পাপের টাকা। বছর দশক আগে যখন তোমার বাগানটা নষ্ট হয়েছিল, সেটাও তাহলে পাপের টাকা বলো। এবাড়ি সেবাড়ি দক্ষিণা কুড়িয়ে... 'অসমাপ্ত বাক্য দাদাকে তিরস্কার করে সরস্বতী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ছোটবোনের ভর্ৎসনা ঐতালের মনে খুবই লাগল, কিন্তু উত্তর দিতে তার মুখ সরল না। কেবল বোনের কথাগুলো ভাবছে আর ভেবে ভেবে নিজের দুঃখে নিজেই মগ্ন হয়ে আছে। এই মানসিক বিমর্ষের মধ্যে হঠাৎ তার খেয়াল হল— আচ্ছা, এবার যে আমাদের পনেরো 'মুডি' ধান বেশি হয়েছে একথা সরস্বতী জানল কী করে? নিশ্চয়ই ও ধান মেপে দেখেছে। ছোটবোন হয়ে দাদাকে বিশ্বাস করতে পারেনি? নানা চিন্তা ঐতালকে দগ্ধ করতে থাকলেও সরস্বতীর সামনে উচ্চকণ্ঠে মুখ খোলার সাহস তার নেই। তাই সে আপনমনে বিড়্ বিড়্ করতে লাগল—'কথায় বলে, নড়ে বসতে মরে বুড়ি, তার কত জারিজুরি; এও হয়েছে তাই…' এই বলতে বলতে ঐতাল স্নানের জন্য বেরিয়ে গেল।

সেদিন তার জপের কোনো মাথামুণ্ডু ছিল না। জলের মধ্যে ডুব দিচ্ছে তো দিচ্ছেই। প্রাণায়াম করতে নাক টিপল তো টিপেই রইল। দশ দশ বার 'গুরুর্দেবো গুরুর্বিষ্ণুঃ' বললেও দশ দশবারই মন্ত্রের খেই হারিয়ে ফেলল। ঠাকুরের পূজায় কখন ঘণ্টা বাজাল কি বাজল না কিছুই খেয়াল নেই। এই সমস্ত করে ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে দেখল তার আহারের জন্য পার্বতী আসন ও পাতা সাজিয়ে রেখেছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ঐতাল বলল—'পারোতি, আমি একবার মনুরু ঘুরে আসি। তোমরা খেয়ে নিও।' পার্বতী বলল— 'পাতা দিয়েছি। রান্নাও হয়ে গেছে। খেয়ে গেলে হত না?' পার্বতী এই কথা বলতেই ঐতাল জবাব দিল, 'তোমাদের ওই পনেরো 'মুডি ধান' আগে খরচ হোক, তার পরে আসব।' এই বলে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেল।

সরস্বতী সেখানে ছিল না বলে দাদার এই অগ্নিমূর্তি দেখতে পেল না। সে তখন গোয়াল ঘরে। তাদের এক বুড়ো গাই-র জীব যাত্রা প্রায় শেষ হয়ে এল। সেই মুমূর্ষু পশুর কাছে বসে সরস্বতী কেবল চোখের জল ফেলতে লাগল।

ঐতাল বেরিয়ে যেতেই পার্বতী ব্যস্তসমস্ত হয়ে এসে বলতে যাচ্ছিল 'ঠাকুরঝি, তোমার দাদার আবার কী হল?' কথাটা বলতে গিয়ে আর একটা দৃশ্য তার চোখে পড়ে গেল। ছুটে এসে দেখল—তাদের কেম্পি গাই মৃত্যুপথ-যাত্রী। পার্বতীর চোখে জল এসে গেল। গোপী ও চম্পির দিকে তাকিয়ে বলল—'তোরা দাঁড়িয়ে আছিস কেন? যা, সন্ধ্যাবেলা ঘরে ফিরবি।' এই বলে গোরু দুটোকে গোয়াল থেকে বের করে দিল। ওরা কিন্তু বার বার ভিতরে আসবে বলে তাকাচ্ছিল। পার্বতী তাই গোয়ালের দরজা বন্ধ করে দিল।

সরস্বতী প্রশ্ন করল : 'দাদা কোথায় ?'

'উনি তো রাগ করে বাইরে চলে গেলেন। পনেরো 'মুড়ি' ধানের কথা শুনিয়ে সাজানো পাতা পিঁড়ি দেখেও না খেয়ে চলে গেলেন। কারো উপর রাগ করেছেন বোধ হয়।'

'করে করুক। রাগলে গরীব, মরবে পেট। তার অগ্নিমূর্তিকে আমি ভয় করি ? আমি যেখানে খুশি পেটে-ভাতে থাকব।'

সরস্বতী খানিক পরে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'পারোতি, তুই বাড়ির ভিতরে যা। মরা গোরুকে কি আর বাঁচানো যাবে ? আমাদের জলের ঋণ ওর শেষ হয়ে গেছে।...আমি চামারদের আসতে বলি গিয়ে।' এই বলে সে দ্রুতপদে চামারপট্টির উদ্দেশে রওনা হল।

যথাসময়ে সরস্বতীর পশ্চাতে তিনজন চামার ও একজন চামারনী এসে হাজির। গোয়ালের দরজা খোলা হলে সেখান থেকে কেম্পির মৃতদেহটা তুলে নেওয়া হল। সরস্বতী ও পার্বতী গোয়ালঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কোম্পকে শেষ বিদায় দিল। আর, তাদেরই পাশে দাঁড়িয়ে গোপী ও চম্পি গলা বাড়িয়ে দেখছিল - কোথায় তাদের সাথীকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

চোখের জল ফেলে পার্বতী গোপী গাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—'আয় তোরা ভেতরে। তোদের ফেন-বিচালি তৈরি হয় নি। এখন শুধু ফেনের জল এনে দিচ্ছি।'

রান্নাঘরের ভিতরে গিয়ে পার্বতী ফেনের বদলে তার নিজের জন্য রাখা ভাত এনে গোরু দুটোর সামনে ঢেলে দিল। ওরা সেই রাশীকৃত ভাতের গন্ধ শুকলো বটে, কিন্তু একটি ভাতও স্পর্শ না করে শূন্যদৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রইল। বিমর্ষ চিত্তে সরস্বতী ও পার্বতী পুকুরে গিয়ে ডুব দিয়ে এসে চুপচাপ দাওয়ায় বসে রইল। সরস্বতী বলল—'দাদার যখন এ বাড়িতে প্রয়োজন নেই, আমারই বা কিসের প্রয়োজন ?' পার্বতী তেমনি নীরব হয়ে থাকল।

রাম ঐতাল যখন বাড়ি ফিরে এল—মনুরু থেকে কি অন্য কোথাও থেকে তা ভগবান জানেন—তখন সূর্য ডুবু ডুবু। প্রভাতের কোপাগ্নির জ্বালায় তখনও তিনি উত্তপ্ত। কারও সঙ্গে কোনো বাক্যালাপ না করে, উঠোনের মধ্যে বারচারেক চক্কর লাগিয়ে অবশেষে গোয়ালঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। কেম্পিকে গোয়ালঘরে এখনও ফিরে আসতে না দেখে ঐতাল এবার মুখ খুলল—

'এই বাড়ির কোনো কিছুতেই কারও কোনো প্রয়োজন নেই মনে হচ্ছে। নৈলে সন্ধ্যে হয়ে এল, ওদিকে গোরুটা ঘরে ফিরল কি ফিরল না এটা দেখারও কি দরকার নেই? কর্তব্য কাজে কারও কোনো খেয়াল নেই, অথচ অনাবশ্যক ব্যাপারে মাথা ঘামানো আছে।' এই বলে সে গোয়ালঘরের চারদিকে বারকয়েক ঘুরে ফিরে তখনও কেম্পিকে আসতে না দেখে অবশেষে পুকুর পাড়ে গিয়ে ডাকতে আরম্ভ করল, 'কেম্পি, আয় আয় · ···।' ঘরের মধ্যে কী একটা কাজে পার্বতী ব্যস্ত ছিল, স্বামী ফিরেছেন বুঝতে পেরে বাইরে এসে শুনল, স্বামী আবার ডাকছেন—'কেম্পি. আয় আয়।' ঠাকুর ঘরের বারান্দা থেকে সরস্বতী বলে উঠল—'কেম্পিও আসবে, আরও কেউ আসবে।' পার্বতী বুঝল, এখন কারও মেজাজ সুস্থ নেই, দু পক্ষেই জ্বলে ওঠার সময়। অন্তত তার নিজের পক্ষে ধৈর্য ধরে শান্ত থাকা উচিত ভেবে পার্বতী পুকুর পাড়ে এসে ভয়ে ভয়ে বলল—'কেম্পি বেঁচে নেই। মিছামিছি তাকে ডাকছেন।'

কথাগুলোর অর্থ যেন তার মাথায় ঢুকল না। ঐন্তাল কেবল পার্বতীর কথাটাই বারবার বলতে থাকল—'কেম্পি বেঁচে নেই। মিছামিছি তাকে ডাকছেন। কেম্পি বেঁচে নেই···।'

'নাঃ, নেই। দুপুরে মারা গেল। কাল থেকেই ও ঘাস, জল কিছুই ছোঁয়নি—কাল রাতে আপনাকে বলেছিলাম।'

'কী, কী বললে তুমি? কেম্পি নেই? মারা গেছে? তোমরা মেরে ফেলেছ তাকে। বেশ এইভাবে সকলেই চলে গেলে উত্তম। মান-মর্যাদা নিয়ে আর এ বাড়িতে থাকা চলবে না।'

স্বামীর কোনো কথাই পার্বতী বুঝতে পারল না। সকাল থেকেই সকলে তপ্ত হয়ে আছে, কিন্তু কেন এই হম্বিতম্বি তা সে জানে না। ব্যাপারটা যে কী সেকথা জিজ্ঞাসা করবার মতো সাহসও তার নেই। জিজ্ঞাসা করতে গেলে যদি ওঁর ক্রোধ দ্বিগুণ হয়ে ওঠে তখন উপায় কী হবে? এই সব ভেবে পার্বতী চুপ করে রইল। ওদিকে সরস্বতীও মৌন হয়ে আছে। পার্বতী একাই ঘর দোরের কাজ শেষ করে গোয়ালঘরে গেল। কিন্তু গোপী গাই আজ দুধ দিল না। 'কী করে দেবে? মৃত্যুর বেদনা সকলের কাছেই সমান।' এইভেবে পার্বতী খালি হাতে ফিরে এল।

স্বামীর শুকনো মুখের দিকে তাকিয়ে পার্বতীর বুঝতে বাকী রইল না যে

মধ্যাহ্নে তাঁর খাওয়া হয়নি। সরস্বতী ও পার্বতীও অবশ্য কিছু মুখে দেয় নি। খানিকটা সাহস সঞ্চয় করে পার্বতী স্বামীর কাছে এসে বলল—'রান্না তো করাই আছে। যা-হোক কিছু খেয়ে নিলে হত না?' ঐতাল দপ্ করে জ্বলে উঠল, বলল—'খাওয়া? এই শ্মশান গৃহে?'

স্বামী আহারে অসম্মতি জানালেও পার্বতী নিজের কর্তব্য বিবেচনা করে পাতা সাজিয়ে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। কখন একসময়ে 'মন্ মন্' করে মন্ত্রপাঠ করতে করতে ঐতাল এসে পাতার সামনে আসন পরিগ্রহ করল। খাওয়ার সময়ে মাঝে মাঝেই তাকে অন্যমনস্ক দেখা যাচ্ছিল। পাতার সামনে অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে ফল হল এই যে খাওয়াও চলল অনেকক্ষণ ধরে। ঐতালের গুরুভোজনের পরে সরস্বতী ও পার্বতীর জন্য দ্বিতীয় বার রান্নার দরকার হয়ে পড়ল। পার্বতীর সেদিন খুব খিদে পেয়েছিল সন্দেহ নেই, নইলে রাতের বেলা রান্নার ব্যাপারে সে বড় একটা আগ্রহী নয়। রান্না শেষে ননদের কাছে এসে পার্বতী বলল—'ঠাকুরঝি সারাটা দিন খাওনি অন্তত এখন এসে দুটো মুখে দাও।' সরস্বতীকে অনুরোধ জানাতে গিয়ে পার্বতীর গলা রুদ্ধ হয়ে চোখ সজল হয়ে এল। ভ্রাতৃবধূর এই স্নেহের সামনে 'আমার খাওয়ার দরকার নেই' এই রূঢ় কথাটা সরস্বতী বলতে পারল না। নিস্পৃহ কণ্ঠে শুধু বলল—'তুমি খাওগে, বৌদি। এ বাড়ির তত্ত্বতালাশেও আমার দরকার নেই, এখানে খাওয়ারও দরকার নেই।'

ইতিমধ্যে বারান্দায় নিদ্রিত ঐতালের নাসিকা গর্জন প্রবল হয়ে উঠল। কে বলবে আজ দিনের বেলায় এই মানুষের সেই অগ্নিমূর্তি হয়েছিল? রাত তখন দ্বিপ্রহর। ঐতাল হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দেখল যে বারান্দার প্রদীপটা তখনও মিটমিট করে জলছে। ঐতাল ভাবতে চেষ্টা করল—ব্যাপারটা কী। দিনের বেলার ভাবনাগুলি তাকে বিচলিত করলেও একটা পাকা ঘুম দিয়ে ওঠার ফলে ঐতালের মন অনেকটা কচি শিশুর মতো হল। এক এক করে তার মনে নানা কথা উদিত হচ্ছে—'এখন রাত কত? ওখানে ওই প্রদীপটা কেন জ্বলছে?...' কোনো কিছুই ঠিকমতো বুঝতে না পেরে অবশেষে স্ত্রীকে ডাক দিল—'পারোতি।' অর্ধ-নিদ্রিত চোখে পার্বতী উঠে এল।

'ব্যাপার কী? এখনও প্রদীপ জ্বলছে?'

পার্বতী নীরব।

'তোমাদের খাওয়া-দাওয়া কি হয় নি ? রাত এখন কত হল ?'

'কী জানি কত হল ?'

'তোমাদের খাওয়া হয়নি ?'

'না'

'আজ যে খেতে এত দেরি ?'

'আমি একাই খাব নাকি ? ঠাকুরঝি দুপুর থেকে না খেয়ে আছে। আপনি তাকে কী বলেছেন। সে বলল যে এই বাড়ির তত্ত্বতালাশি সে আর করতে পারবে না, আর এ বাড়ির জলের ঋণও শেষ হয়েছে তার। আপনিও না খেয়ে বেরিয়ে গেলেন। আপনার রাগের ফলে যেন কেম্পি গাইটাও চলে গেল।'

এখন আর ঐতালের ক্ষুধা নেই। একটা ঘুম দেওয়ার ফলে কোপের মাত্রাও হ্রাস পেয়েছে। একে একে তার সব কথা মনে পড়তে লাগল। সরস্বতীকে কথা শোনানো, সরস্বতীর প্রত্যুত্তর, রাগ করে বাড়াভাত না খেয়ে তার বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া, তারপরে কেম্পি গাইর মৃত্যু, স্ত্রী ও বোনের সারাটা দিন অভুক্ত থাকা—এই সমস্ত ঘটনা একে একে মনের মধ্যে খেলে গেল।

'তুমি খাওনি কিছু ?'

'আপনি পাত সাজানো দেখেও না খেয়ে চলে গেলেন। এরপরেও আমি ভাত খাব, জীবনে কি ভাতের দানা চোখে দেখিনি ?'

পার্বতীর কথায় ঐতাল একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বলল—'পারোতি, সংসারে একজন যদি হঠাৎ একবার মাথা গরম করে বসে, সকলেই কি তাই করবে ? সরসি কোথায় ? আমি গিয়ে বলছি তাকে। সে যদি বাড়ি ঘর দেখা শোনা না করে, তবে আমার কি সময় আছে করবার ? আমি তো গ্রামে গ্রামে যজমানি কাজ করে ঘুরে বেড়াই...' এই বলে ঐতাল সরস্বতীর কাছে গেল। দাদার কথাগুলো সরস্বতী আগেই শুনতে পেয়েছিল, সুতরাং তাকে বেশি সাধ্যসাধনা করতে হল না, তার মনটাও সহজে নরম হয়ে এল।

ঐতাল বলল—'সরস্বতী, যাও, খাও গিয়ে। তোমার দাদা যদি মাথা গরম করে একটা কথা বলেই ফেলে, তোমারও কি উচিত রাগ করা ? আমার দুর্ভাগ্য আর কি ?'

ঐতাল অলস ভঙ্গীতে বারান্দায় পা ছড়িয়ে বসে আছে দেখে সরস্বতী তার কাছে এসে বলল—'কী ভাবছ, দাদা ?'

ঐতাল জিজ্ঞাসা করল· 'কিছু বলবি নাকি ?'

'হ্যাঁ একটা কথা বলব। আমার কোনো স্বার্থের জন্য বলছি না। শুনতে হয় শোন, না শুনতে হয় না শোনো।'

'আহা, কথাটা কী বলা যায় না ?'

'বলছি কি, এ সংসারে চিরদিনের জন্য কে এসেছে ? কাল যদি কেউ চোখ বোজে, একটা পিণ্ড দেওয়ার মতো লোকও কি ঘরে থাকতে নেই ? আজকাল তোমার জমিজমা বাগান ভগবানের কৃপায় যথেষ্ট। তোমার চাষবাসের আয় উপার্জন দেখে কেউ কি তোমাকে একটি ছেলে পুষ্যি দেবে না ?'

ঐতাল কিন্তু ভাবতেই পারেনি যে এমন একটা কথা সরস্বতীর মুখ থেকে আসবে ? এ বিষয়ে সে নিজে ইতিপূর্বেই অনেক ভেবে চিন্তে একটা উপায় স্থির করে রেখেছে। ভাই বোনের মধ্যে পোষ্য গ্রহণের কথাটা উঠেছে শুনতে পেয়ে ভিতর থেকে পার্বতী এসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। সে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে—স্বামীর মুখ থেকে কী উত্তর আসে।

ঐতাল বেশ ধীর কণ্ঠে বলল—'সরসোতি, কোন্-না-কোন্ ঘরের কাগের বাচ্চাকে ঘরে এনে কোকিলের বাচ্চা বানাতে বলছ ? তা কি সম্ভব ? ছাখ্ আমি কত গাঁয়ে কত ঘরে নিজেই উপনয়ন পোষ্যগ্রহণ এই সব কাজ করিয়েছি। সব জায়গায় এক কথা। পুষ্যিছেলের স্বভাব চরিত্র দেখে কারও মনে শান্তি নেই। তুই যে বলছিস তা আমাদের জানাশোনা পরিবারে কোনো ছেলে থাকলে সে আলাদা কথা।'

সরস্বতী বলল—'তাহলে পুষ্যি নেওয়ার কথা না তোলাই ভাল ?

'ভগবান যদি আমার কপালে লিখেই থাকেন, তবে আমার ঘরেই ছেলে জন্মাতে পারে।'

খানিক পরে পার্বতী মৃদুকণ্ঠে বলল—'একদিন তো আপনিই বলেছিলেন যে আমার কুষ্ঠিতে সন্তানের জন্ম নাকি লেখা নেই।'

'তোমার কুষ্ঠিতে লেখা নেই, তাতে কী ? ব্রহ্মা যে আমার কপালে তিন সন্তানের যোগ লিখে রেখেছেন সেটা কি মিথ্যে হবে ?'

অতঃপর এবিষয়ে ননদ ও ভ্রাতৃবধূ কারও মুখে কোন কথা যোগাল না। দুজনেই নীরব রইল। ঐতাল তার বোন ও স্ত্রীর মন প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যাবার জন্য কৌশল করে বলল—'আচ্ছা সরসোতি, গত বছরের মাঠেই কি এবছর রবিশস্য বুনবো ?'

সরস্বতী বলল—'ওখানে রবিশস্য বুনলে একটি দানাও পাওয়া যাবে না। গত বছরের কথা মনে নেই ? যা বোনা হয়েছিল, তার বারো-আনা ফসল যার-তার বাড়ির মুর্গীর পেটে গেল। তাই শূদ্র পাড়ায় আমরা রবিখন্দ করলে কিছুই বাঁচবে না।

ঐতাল উত্তর দিল, 'গত বছর যে ক্ষেতে শশা লাগিয়েছিলাম, এ বছর সেখানে ধান বুনবো। আর ওর একটা দিকে শশাও থাকবে। তারপর শশা ও ধানের ক্ষেত মিলিয়ে বেড়া দিলেই হবে। আর গত বছর যেখানে রবিখন্দ করেছিলাম, এবার সেখানে কলাই বা তিল বোনা যাক। দানা না পেলেও গোরু বাছুরের জাবের জন্য খন্দ-কুটোও হতে পারে।

পরদিনই শশা ও রবিশস্যের মাঠে বেড়ার কাজ শুরু হয়ে গেল। স্ত্রী ও বোনকে নিয়ে ঐতাল বাঁধ দেওয়ার কাজে লেগে যায়। মাটির বড় বড় চাকা-গুলিকে লাইন করে পেতে তার চারদিকে নালা কেটে দিতে তিন তিনটা দিন লাগল। নালা কেটে মাটির ডেলার উপর লেপা-পোঁছার কাজ শেষ করে তার উপর কাঁটা পুঁতে বেশ পাকাপোক্ত বেড়া তৈরি করা হল। সেখানে প্রথমে ধানের বীজ বুনে, বাকী দুটো ক্ষেতে কলাই ও মাষকলাইর বীজ বুনে দিল। ঐতাল আগেই ভেবে রেখেছিল যে, তিল বোনার কোনো প্রয়োজন নেই। তিল তেল সে একদম পছন্দ করে না। যদি কোনোদিন 'চিত্রান্ন' (পোলাও জাতীয় ভাত) তৈরির জন্য তিল তেল দরকার হয়, কারও কাছ থেকে আধ-পোয়াটাক চেয়ে-চিন্তে আনা যাবে। প্রদীপ জ্বালাতে তো হোম্রে তেলই আছে। খন্দকুটোর জন্য কলাই-মাষকলাইর ঝাড়-ঝুড়ের চেয়ে তিল কি আর বেশি ? সরস্বতী আবার ওরই মধ্যে পাঁচ সেরের মতো 'অব্ড়ে' বুনে বসল—যাহোক কিছু শাকসব্জী পাওয়া যাবে।

কলাই, মাষকলাই, 'অব্ড়ে' যখন পাকতে শুরু করবে তার আগেই সেই ক্ষেতগুলির চারদিকে বেড়া দেওয়া দরকার। কারণ আশ-পাশ গ্রামের লোকগুলি হয়ত ইচ্ছা করেই গোরু-বাছুর ছেড়ে দেবে। আর, যখন ফসল

কাটার সময় হবে, তখনত পূব গ্রাম থেকে দলে দলে ঘোষ নদী পেরিয়ে আসবে।

রবি ফসল ওঠার সময়ে ঘন্টার পর ঘন্টা মাঠের কাছে আসা-যাওয়া করতে হয়। সরস্বতী তখন খালি মাথায় হাতে একটা লাঠি নিয়ে ঘুরে বেড়াতে না পারলে তার শান্তি নেই। যার মাঠেই হোক না কেন যে কোনো একটি বাছুর দেখলেই হল। সেটাকে অন্তত ক্রোশখানেক দূরে তাড়িয়ে দিয়ে তবে সরস্বতী নিবৃত্ত হয়।

এ বছর একটা বিষয়ে ঐতালের ভাগ্য খারাপ বলতে হবে। ধানের দর বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু রবিখন্দ ঘরে আসতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যে তাদের সকলেরই প্রাণ ওষ্ঠাগত। শূদ্র পাড়ার মুর্গীগুলোর অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য শশার ক্ষেতের পাশে রবিশস্য বুনে এখন নাজেহালের একশেষ। কারণ তাদের সেচের পুকুরটা যেখানে, গত বছর রবিশস্য বুনেছিল তার কাছেই। কিন্তু এবছর দূর থেকে জল তুলে ঢেলে ঢেলে তাদের প্রাণান্ত হল। পুকুরের জল যাতে ক্ষেতে গিয়ে পৌঁছায়, সেজন্য তিন শ' ডুনি জল প্রয়োজন। অতদূরে আর কারো ক্ষেত ছিল না। সুতরাং এক ডুনি জলের পরে দ্বিতীয় ডুনি জল ঢালতে ঢালতে জলের পুর শুকিয়ে গিয়ে যতটা জল ঢালা হয়েছে তার সমস্তটাই শুকনো মাটির টানে শুষে যায়।

এত বছর কপি কলের সাহায্যে জল সেচের ব্যবস্থা ছিল। এবার তা করা সম্ভব হল না। এবছরের কৃষি কাজে ডুনিই দরকার বলে ডুনি তৈরি করে নিল। কেরোসিন তেলের একটা ক্যানেস্তারকে পিটিয়ে পিটিয়ে ঠিক করে একটা বংশখণ্ডকে টিনের মুখে দুদিকে জুড়ে দিয়ে ডুনি তৈরি করা হল। পার্বতী তার মাসিকের দিনগুলিতে ঘরে বসে দড়ি পাকিয়ে দিল। আর ভাই-বোনে মিলে পুকুর থেকে মাঠ পর্যন্ত জলের নালা খুঁড়ল।

পরদিন পার্বতী যখন গোপী ও চম্পিকে উঁচু গোচরণ মাঠে নিয়ে যাচ্ছে, দেখে কি পুকুর-পাড়ে ভাইবোনে ডুনিটাকে দুহাত দিয়ে ধরে পালোয়ানের মতো দাঁড়িয়ে। অবিশ্রান্তভাবে ডুনিটাকে একবার পুকুরে নামানো, একবার জল উঁচুতে তোলা, তারপর সেই তোলা জলটা নালার মুখে ছিঁচে দেওয়া। সেদিন বেলা দুপুর থেকে কাজ শুরু করে যখন শেষ করল, তখন রাত্রি একপ্রহর হয়ে গেছে। সারাদিনের খাটুনিতে ঐতালের কাঁধ, কোমর, হাত যন্ত্রণায় টাটাতে

লাগল। ওই নিয়েই ঐতাল তিন-তিন বার গিয়ে দেখে এসেছিল জল। ঠিকমতো মাঠে পড়ছে কিনা। কিন্তু জল কি সহজে পৌঁছায়? প্রথমবার যখন গিয়েছিল, নতুন মাটি সমস্ত জল শুষে নিতে নালার শেষ মাথায় জল আদৌ পৌঁছয়নি।

সেদিন রাতে যদিও ভাই বোনের মোটামুটি সিদ্ধান্ত হল যে কপিকলের চেয়ে জল সেচের কাজে ডুনিটাই সহজ, তবু ভোর হতে-না-হতেই ঐতাল দেখল—হাত দিয়ে আর কোনো কাজই করা সম্ভব নয়। বসে বসে তাই হাতে তেল মালিশ করতে লাগল। তাদের আগে ঠিক হয়েছিল যে একদিন অন্তর একদিন সেচের কাজ হবে। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত পাল্‌টে দিয়ে ঐতাল এখন স্থির করল যে তিন দিন পর একদিন জল দিলেই যথেষ্ট।

সরস্বতী বুঝতে পারল দাদাকে দিয়ে এই কাজ হবে না। ঐতালও ক্রমান্বয়ে ওজর দেখিয়ে কাজে ফাঁকি দিতে শুরু করল—আজ তাকে পারম্পল্লী যেতে হবে, কাল একবার মনূরু যাওয়া দরকার, পরশু তো সালিগ্রামে না গেলেই নয়। স্বামীর শূন্য স্থানে পার্বতী এসে যোগ দিল। স্বুরোর ছোট ছেলেকে গিয়ে বলল—'এই শোন্ তুই আমাদের গোপী চম্পিকে যদি এখানেই কোথাও চরাতে পারিস, তবে তোকে কত কী পাঁপড়-টাঁপড় দেব।' বামুন বাড়ির পাঁপড় খাওয়ার লোভে ছোকরাটা পার্বতীর কথায় রাজী হয়ে গেল।

নিজেরা যতই শ্রান্ত ক্লান্ত হোক না, ননদ-বৌদি সেচের কাজটা কিন্তু অন্যলোকের হাতে দিল না। অন্যকে টাকা দিয়ে কাজ করালে কী আর বাকী থাকবে?

মকর সংক্রান্তির সময়ে রবিশস্য পেকে উঠল। এদিকে কলাই ডাল তোলা হল। 'অব্‌ডে' পাতার রান্না প্রতিদিন সমানে চলতে লাগল। দিনের পর দিন ওই একই বস্তুর 'পণ্য' (এক প্রকার সব্‌জী)। খেলে রুচি হয় বলে ঐতাল দু'একদিন পরখ করে দেখল। কিন্তু ধীরে ধীরে 'অব্‌ডে' পাতায় তার অরুচি ধরে গেল। এখন সেই পাতা দিয়ে আর কী করা যায়? ঘরের মেঝের লাল পাথরগুলোকে ঘষে ঘষে চকচকে করার কাজে লাগানো হল।

এবছর ঐতালের ঘরে আনন্দের মাত্রা একটু বেশিই। ধানের দর যতটা বাড়বে বলে আশা করেছিল, তাই হল। সুন্দর-শ্যামভাগ 'মুড়ি' (=৪২ সের) প্রতি পাঁচ সিকা দর দিতে চাইলেও ঐতাল তার কথায় রাজি হয়নি। সেই

ধান পরে মকর সংক্রান্তির সময়ে ছয় সিকা দরে বিক্রী করে দিল। এবছর গোলায় নাকি খুব চাল চালান হচ্ছে। যে দর চাওয়া হয় সেই দামেই নাকি দ্বীপবাসীরা চাল কিনে নিচ্ছে। কলাইর দামটাও বেশ ভালো পাওয়া গেছে। অল্প কিছু ঘরের জন্য এবং কিছুটা বীজের জন্য রেখে বাকী সবটাই বিক্রী করে দেওয়া হয়। মাষকলাই অবশ্য ভাল হয়নি। 'অব্‌ড়ে'র ফেঁকড়িগুলি তুলে ফেলার সময় হয়েছে। মাষকলাই ও অব্‌ড়ের ফেঁকড়ি বাড়ির খরচের জন্যই দরকার।

মোটের উপর কেবল কৃষিকাজ থেকেই ঐতাল ঠাকুর ফস করে পাঁচশখানি মোহর রোজগার করেছেন।—সুরোর ধারণা হল এই। তাই বলে সুরো ঠাকুরের এক মুড়ি খাজনাও বাকী রাখল না। সব মিলিয়ে ঐতালের জীবনে এবছর খুবই আনন্দের বছর।

এমনি সময়ে একদিন সরস্বতী স্থির করল, দাদার কাছে এবার মোষ কেনার কথাটা তোলা দরকার। কিন্তু কথাটার উল্লেখমাত্রেই দাদা তত্ত্বকথা শুরু করে দিল—'ঘোল না খেয়ে এত দিনই তো কেটে গেল। এখন মোষের দই খেয়ে এমন কী লাভ হবে ? গোময়ের জন্য গোরু আছে যথেষ্ট। আমাদের গোরুগুলি গোয়ালঘরের লক্ষ্মী। ওরা থাকতে আবার মোষের দরকার কী ?'

সরস্বতী কেবল একটি কথা বলে ক্ষুণ্ণ চিত্তে চুপ করে রইল—'দাদা আমার জন্য কোনো দই-ঘোলের দরকার নেই।'

চার

মকর সংক্রান্তি শেষ হল। সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে সরস্বতী পার্বতী ওরা সকলেই সালিগ্রামের মেলায় গিয়েছিল। মন্দিরে নারকেল-কলা অর্পণের সময়ে সরস্বতী এ বছরের প্রচুর ফলনের কথা মনে না এনে পারে নি। 'ঠাকুর, আগামী বছরেও তুমি এই ভাবেই দিও'—এই বলে মন্দিরের দেবতা হনুমানজীর কাছে প্রার্থনা জানাতেও সে ভোলে নি।

মকর সংক্রান্তির মাস খানেকের মধ্যেই ঐতালের যাবতীয় কৃষিকর্ম শেষ হয়ে গেল। কলাই, মাষকলাই তুলে ফেলার পরে জমি একেবারে ফাঁকা। 'অব্ড়ে' শাকের ফেঁকড়িগুলি (কচি কোমল ডগাগুলি) বার কয়েক কেটে কেটে পরিশেষে ঝাড় সুদ্ধ্‌ উপড়ে ফেলা হল। বাকী রইল শুধু পাছ দুয়ারে শশার কাজটুকু।

কিন্তু এদিকে দিনে দিনে রোদের উত্তাপ বেড়েই চলেছে। মাটির উপর পা পাতাও প্রায় অসম্ভব। সন্ধ্যাবেলায় শশাগাছের গোড়ায় জল ঢেলে পরদিন উঠে দেখা যায় সমস্ত ঝাড় শুকিয়ে বিবর্ণ। এমনি মাটির জলতৃষ্ণা। এই উত্তাপ, এই মাটির রঙ দেখে সরস্বতী উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে—যদি এই ভাবেই চলতে থাকে তবে পুকুরে জল থাকবে কি? পার্বতী সান্ত্বনা দিয়ে বলল—'তুমি কি ক্ষেপেছ ঠাকুরঝি এই ফাল্গুন মাসেই তুমি এতটা উতলা হচ্ছ কেন? রোয়ার মাঠে বীজ বোনার এখনও একমাস বাকী। ভগবান করলে, তার মধ্যে দু'এক পশলা বৃষ্টি হবে নাকি? নতুন বছরে বৃষ্টি হওয়াই তো রীতি।'

বৌদি-ননদে মিলে শশাগুলিকে ঘরে নিয়ে এল। খিড়কীতে দুএকটা চাল কুমড়োও হয়েছে। শশাগুলিকে তালপাতা দিয়ে ঢেকে সারিবদ্ধভাবে ঘরের খুটিতে ও আড়ায় ঝুলিয়ে রাখা হল। তবু প্রায় শখানেক শশা বাকী রয়ে গেল। সরস্বতীর ইচ্ছা নয় যে এই অতিরিক্ত ফলগুলি মাটিতে গড়াগড়ি করে নষ্ট হয়ে যাক। কারও সঙ্গে ওগুলি বিনিময় করলে কেমন হয়? কুন্দাপুরের হাটে পাঠাতে পারলে ভাল দর পাওয়া যেত। কিন্তু ১০।১২ মাইল পথ বয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো লোক কোথায়?

সরস্বতী এক সময়ে সুরোর কাছে কথাটা পাড়ল। সুরো কী মনে করে গোবিন্দ তেলিকে বলল। সে নাকি আগামী শনিবার কুন্দাপুরের হাটে যাবে।

আর কথা নেই, গোবিন্দকে দিয়ে শশাগুলি হাটে পাঠাবার ব্যবস্থা করে সরস্বতী বলে দিল যে, শশা বিক্রী করে টাকার দরকার নেই, চার মণ মিষ্টি আলু এনে দিলেই হবে। গোবিন্দ তেলি তরকারিগুলো বিক্রী করে পরদিন ভোরে মিষ্টি আলু এনে দিয়ে বলল—চার মণ পেলাম না মা, তিন মণ পাওয়া গেল।'

মিষ্টি আলু যখন এসে গেছে তখন আর পাঁপড় বানাতে হাঙ্গাম কী? মাষকলাই ডাল আর 'অব্‌ডে' পাতা বেঁটে নিলেই হল। খিড়কী থেকে পাওয়া চালকুমড়োগুলিরও একটা গতি হওয়া চাই। সে গুলোকে মাষকলাই বাটার সঙ্গে মিশিয়ে বড়া করে রাখতে হবে। রোয়ার কাজ শুরু হওয়ার আগেই আচার তৈরি করে বৈয়মে মজুত করতে পারলে সুবিধা হয়। এ সমস্ত ব্যাপার অবশ্য স্ত্রীলোকের কাজ।

ওদিকে রাম ঐতালেরও বিশ্রাম নেই। মকর সংক্রান্তি থেকে এক নাগাড়ে চলেছে বিবাহ, গ্রহশান্তি, স্বস্ত্যয়ন, অন্নদান। তাকে এখন বাড়ি বাড়ি, গ্রামে গ্রামে ঘুরতে হচ্ছে। বেলা মাথার উপর এলেও তার পা যে পুড়ে যাচ্ছে মনে হয় না। পূজার জন্য যজমান বাড়িতে সে সকালে গিয়ে হাজির হয়। আর যে বাড়িতে আহারের ব্যবস্থা সেখানে উপস্থিত হয় মধ্যাহ্নকালে। নৈশ ভোজনের জন্য তার কোনো চিন্তা নেই বলে বাড়ি ফিরতে রাত এক প্রহর হয়ে যায়।

সমস্ত ফাল্গুন মাস ধরে সরস্বতী ও পার্বতী দুজনে মিলে পাঁপড় ও বড়া তৈরি করার কাজে ব্যস্ত। শস্যের দানাগুলি ধোয়া, শুকোনো, গুঁড়ো করা, বাটা—দুজনে মিলে করলেও কাজ কি এগোয়? এসব কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিত্য কর্মগুলিও তো করা চাই। দুধের টানাটানি হলেও গোরুগুলিকে তো লালন পালন করতেই হবে। এই সমস্ত ঝক্কি-ঝামেলার মধ্যে আচার তৈরি করা আর সম্ভব হল না। ঐতালের নিজের কোনো আম গাছ নেই। কোথাও থেকে কাঁচা আম যোগাড় করা চাই। এ বছর অকালেই মেঘ জমতে আরম্ভ করেছে বলে বালিয়াড়ি বরাবর কারও বাগানে আমের গুটি দেখা দেয়নি। কিন্তু এখন যদি আচার করে না রাখা যায়, তবে বর্ষার দিনগুলিতে কী খেয়েদিন কাটবে? এখনকার জন্য শশা-সেদ্ধ করে রাখা হয়েছিল, তা শেষ হয়েছে। কাঁঠালের বীচি-সেদ্ধ করা হয়েছিল, তা ও প্রায় শেষ হয়ে এল। বর্ষা দূরে থাক, টেনেটুনে গরমের দিনগুলি কাটনোই শক্ত।

সরস্বতীর ভারি ভাবনা শুরু হয়ে গেল। একদিন ননদ-বৌদি মিলে পরামর্শ

করছে এমন সময়ে সুরো এসে হাজির। সরস্বতী বলল—'সুরো, এবছর আচার বুঝি আর হল না।'

হাসতে হাসতে সুরো উত্তর দিল, 'এই বামুন ঠাকরুণদের সোয়াদের বহরখানা ছাখো। আজ্ঞে, মা ঠাকরুণ, আমরা কি আচার খেয়ে বেঁচে আছি?'

পার্বতী এগিয়ে এসে বলল—'হ্যাঁ সুরো, যখন এসে বল,—'মাঠাকরুণ, তেষ্টা পেয়েছে, জল দিন' তখন আচার ছাড়া খালি জল দিলে তোমার বিস্বাদ লাগে কি না।'

'তা ঠিক, মাঠাকরুণ। একটুকুন আচার হলে দুই-পোয়া চালের ভাত মেরে দিতে পারি। কিন্তু এবছর গুটি আমের মুখ কে দেখেছে বলুন। এ বছর তো শিবরাত্রি পর্যন্তও ঠাণ্ডা পড়ল না। মকর সংক্রান্তিতে আমি গিয়েছিলাম পূব পরগণায়। সেখানে কিন্তু রাতে শোয়ার সময়ে গরম কম্বল লেগেছিল। কেবল আমাদের গ্রামেই এবছরটা গরম আর গরম। আকাশে কেবল মেঘ আর মেঘ, দিনে মেঘ, রাতে মেঘ। এত মেঘ বলেই এখানকার সব আমের বোল ঝরে গেছে।'

সরস্বতী বলল—'সুরো তুমি যা বললে তাই যদি সত্য হয় তবে পূবের পরগণার কোথাও কি গুটি আম মেলে না? ওখানেও কি কচি আমের দুর্ভিক্ষ? কোথাও-না-কোথাও আছেই। পূব পরগণায় এতই আমের ফলন হয় যে একেবারে ছড়াছড়ি। আমের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। যেদিকে চোখ ফেরাও, খালি আমের বন। সেই আমের কড়া আনলে হয়। কিন্তু কম করে হলেও চারক্রোশ সাড়ে চার ক্রোশ পথ হাঁটতে হবে, তাই না?'

যে গ্রামে সরস্বতীর শ্বশুরবাড়ি তারই খানিকটা পূর্ব দিকে দু একটা টিলায় সরস্বতী কবে একসময়ে অপর্যাপ্ত আমগাছ দেখেছিল বলে মনে পড়ে। ওখানে একবার যেতে পারলে যত খুশি আম আনা যায়। অবশেষে সরস্বতী সুরো ও তার স্ত্রীকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের দুদিনের খোরাকীর প্রতিশ্রুতি দিয়ে পূব পরগণায় যাওয়া স্থির করে ফেলল এবং পরদিন অতি প্রত্যূষে উঠে ওদেরকে ডেকে নিয়ে রওনা হল। যখন ভোর হল, তখন তারা বারকুরি গ্রামে পৌঁছে গেছে। বারকুরি থেকে ঈশান কোণ ধরে দুক্রোশ পথ এগিয়ে আম গাছের টিলাগুলি পাওয়া গেল। ঘুরে ঘুরে দেখে বিশ্বাস হল তাদের হিসাব মিথ্যা হয় নি। তিনজন লোক বয়ে আনতে পারে এমন পরিমাণ আম তারা আকশি

দিয়ে পেড়ে পেড়ে গাছের তলা ভরে ফেলল। এসব গাছের কোনো মালিক নেই। তাছাড়া, এতই আম জন্মে যে পাকলে বানরেরও অরুচি জন্মে।

আম পাড়া শেষ হতে সূর্য ঠিক মাথার উপর উঠে এল। তখন আমের ঝুড়িগুলি মাথায় নিয়ে সেই প্রখর রোদে ঘর্মাক্ত কলেবরে তারা খুঁজে বেড়াতে লাগল—ধারে-কাছে কোথাও বামুনবাড়ি পাওয়া যায় কিনা। সূর্যের আগুন-ঢালা উত্তাপে চেনা রাস্তাও ভুলে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আবার সেই আমবাগানের কাছে এসে পৌঁছল। মনে মনে সেই জায়গাটাকে খুব গালি দিয়ে পশ্চিম দিক লক্ষ্য করে খানিকটা পথ হেঁটে গিয়ে একটি বামুন বাড়ি পাওয়া গেল। সেই বাড়ির উঠোনে বোঝাগুলি নামিয়ে বাড়ির লোকের কাছে একটি ঘটি চেয়ে আনল। কুয়া থেকে জল তুলে মুখ চোখ ধুয়ে নিয়ে ঘটিতে করে পানীয় জল নিয়ে এল। এদের আরও মুখের দিকে তাকিয়ে বাড়ির লোকেরা করুণাবশে জলপানের জন্য খানিকটা গুড় এনে দিল।

সরস্বতী বলল—'সুরো, আগে একটু জল খেয়ে নে। আমি বাড়ি থেকে কিছুটা চিঁড়ে সঙ্গে এনেছি। ভিজিয়ে খেয়ে নিলে দেখবি পেট ভরে গেছে।' প্রথমে জল খাওয়া এবং তার বেশ কিছুক্ষণ পরে জলে ভেজানো চিপিটক সেবাও শেষ হল। এইভাবেই সেই বাড়ির ছাপরা দেওয়া উঠোনে কাৎ হয়ে দু'একটা ঝিমুনি দিতে গিয়ে ঘুম এসে গেল। ঘুম থেকে উঠে সরস্বতী খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। 'ইস্ সূয্যি একেবারে ঢলে পড়েছে। রাতে তো জ্যোৎস্নাও নেই। এই সুরো, সুরো, ওঠ্ ওঠ্ বাবা…এই বলে সরস্বতী সুরো ও সুরো গৃহিনীকে জাগিয়ে যে-যার বোঝা মাথায় নিয়ে রওনা হয়ে দেখল—তপ্ত মাটির উপর পা ফেলা যাচ্ছে না। মাথার উপর ভারি বোঝা, পায়ের নীচে মাটির উত্তাপ—এই দুয়ে মিলে এক ক্রোশের পথ দু ক্রোশের চেয়ে দীর্ঘবোধ হল। সমস্ত শরীর নির্জীব। ক্লান্ত দেহে হাঁটতে হাঁটতে পথে যেখানেই একটু ছায়া পেয়েছে সেখানে একটু জিরিয়ে নিয়ে যখন তারা কোনো রকমে সাস্তা গ্রামে পৌঁছল, সূর্য তখন ডুবুডুবু। বাড়ি পৌঁছতে এখনও এক ক্রোশ পথ বাকী। সুরো আর দৈহিক ক্লান্তির কথাটা লুকোতে না পেরে বলে উঠল—'মাঠাকরুণ, আচার করব বলে আমের খোঁজে বেরিয়ে আজ আমরাই যে আচার হয়ে গেছি।' সুরোর কথায় সকলেই হেসে উঠল। সরস্বতী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'সুরো, একটা ছোট বৈয়মের এক বৈয়ম আচার তোকেও দেব। খেলে

পরে দেখবি, আসছে বছর আমার আগে তুই পুবপরগণায় আম কুড়োতে যাবি।'

সুরোর হাসি পেল। হেসে বলল—'আসছে বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকলে তবে তো?'

সরস্বতী প্রশ্ন করল, 'অমন কথা বলছ কেন?' জবাব দিল সুরোর স্ত্রী 'হ্যাঁ মাঠাকরুণ, আচার হলেই হল? পেটের জন্য চালের দরকার নেই? বিষ্টির দিনে মোরা কাঁঠালের বীচি আর মিষ্টি আলুর গেঁড় সেদ্ধ করে খাই। মোদের আবার আচার লাগবে কোন্ কম্মে?'

সরস্বতী: 'এ বছরেও অমন কথা বলছিস? তোরা দুই 'মুড়ি'র ক্ষেত চাষ করিস। আগের চেয়ে এবছর কম করেও তিন 'মুডি' চাল বেশি পাবি না?' সুরো সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন শস্যাদির হিসাব দিয়ে বলল, 'ধানে-পানে খাজনা দিয়ে গরীবদের হাতে বাকী খাসভূষি, মাঠাকরুণ।' সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে সুরো তার কথাটা যে সত্য তা সরস্বতীকে বোঝাবার চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত সরস্বতীকে একথা স্বীকার করতে হয় যে এই পশ্চিম ঘাট অঞ্চলে খাজনার হার খুব বেশি।

ওরা যখন বাড়ি এসে পৌছল, রাত তখন এক প্রহর হয়ে গেছে। বোঝা-গুলো উঠোনে নামিয়ে রেখে যখন দাঁড়াল মনে হল যে একটি কঠিন সাজা থেকে মুক্তি পেয়েছে। সরস্বতী ডাক দিয়ে বলল—'পারোতি, আগে সুরোদের খানিকটা গুড় ও জল এনে দে। বাবাঃ, ওরা ভাবছে কাঁচা আমে দণ্ডবৎ, আচারেও নাকে খৎ। শুধু কি ওদের? আমারও ওই রকম।'

গুড় জল খেয়ে প্রাণ শীতল হলে সুরো ও তার স্ত্রী তাদের বাড়িতে চলে গেল। সরস্বতী পার্বতীকে জিজ্ঞাসা করল—'দাদা কি এখনও ফেরে নি? 'কখন ফিরবেন কে জানে? যাওয়ার সময়ে কিছুই না বলে সোজা হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলেন।' পার্বতীর এই উত্তর শুনে সরস্বতী বলল—'দাদার কাছে বাড়ির মেয়েরা যেন আবর্জনা। নৈলে বাড়ি থেকে বেরুবার সময়ে 'অমুক জায়গায় যাচ্ছি, অমুক সময়ে ফিরব'—এই সামান্য কথাটা বলতে কি তার ধন-দৌলত খরচা হয়?'

পার্বতী: 'ঠাকুরঝি, তুমি এখন চান করতে যাও। বোঝা টেনে টেনে শরীরটা নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত। আচ্ছা, একটু গরম জল করে দেব? গা-গতর ব্যথার পক্ষে ভাল নয় কি? চান করে ঠাণ্ডা হয়ে দুখানা 'চট্টি' মুখে দাও

এসে। তুমি খাবে কি খাবে না ভেবে আমি মাষকলাই ডাল বেঁটে 'কেসু' পাতা (সালুক জাতীয় পাতা) ঝিরিঝিরি করে কেটে তোমার জন্য দু'খানা 'চট্টি' বানিয়ে রেখেছি। খেতে স্বাদ হয়েছে কিনা কে জানে?'

'স্বাদ হবে না কেন? কড়াইতে পরিমাণ মতো তেল দিয়ে 'চট্টি' বানালে বেশ মুখরোচক হয়। তোমার খাওয়া হয়েছে তো, না কি হয় নি?'

'আলিস্যি করে আমি আর রান্নার হাঙ্গামা করিনি। তোমার জন্য দুখানা, সেই সঙ্গে আমার জন্য দু'খানা—মাত্র চারখানা 'চট্টি' বানিয়ে রেখেছি। তুমি এলে পরে একসঙ্গে বসে খাব, তাই পথের দিকে চেয়ে বসে আছি। এর মধ্যে একশবার পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র শেষ হয়েছে। একটু ঘুমও এসেছিল। তুমি পা ধুয়ে এস। হাঁড়িভর্তি জল রয়েছে। আগুনটা ধরিয়ে দিয়ে আসি। অল্প সময়ের মধ্যে জল গরম হয়ে যাবে।'

'না গো মহারানী, গরম জল দরকার নেই। এই গরমে ঠাণ্ডা জলে স্নান করলে প্রাণটা জুড়োয়।'

'না ঠাকুরঝি, তোমার শরীর ঘামে ঘামে একাকার। এর মধ্যে ঠাণ্ডা জলে ডুব দিলে সর্দি লেগে যেতে পারে। গরম জল না হোক, ঈষদুষ্ণ করে দিই।' এই বলে পার্বতী একটি লম্ফ হাতে নিয়ে স্নানের ঘরের কাছে গেল। তার পশ্চাতে সরস্বতীও এল। উনোনের সামনে বসে পার্বতী শুকনো পাতা জ্বালাচ্চে, আর সেখানেই কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সরস্বতী বর্ণনা করছে তাদের গুটি আম সংগ্রহ করার রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। 'আজ আমরা কম করে হলেও বারোক্রোশ পথ হেঁটেছি। তা-ও কীরকম রোদের মধ্যে জানো? সে কথা থাক্। এই পশ্চিম পরগণায় আমরা গুটি আম নেই বলে চেঁচিয়ে মরি। আর দেখো গিয়ে পূবপরগণায়, সেখানে বানরে পর্যন্ত আমের গন্ধ শোঁকে না। ঝাঁকে ঝাঁকে গুটি আম, ডাল ভেঙে নুয়ে পড়ার মতো।'

পার্বতী সায় দিয়ে বলল—'পূব অঞ্চলে ওই রকমই। ওখানকার মাটির গুণই আলাদা। আম, কাঁঠাল, কলা—সেখানে যাই লাগাক প্রচুর ফলে। এক, তোমার ওই বানরের উপদ্রব। ওটা না থাকলে পূব পরগণা তো স্বর্গ।'

সরস্বতী বলল—'বানরগুলোর উৎপাত না হয় সওয়া যায়। কিন্তু ওই ম্যালোরি জ্বরের দুর্গতি কে সইবে? বছরে ছ মাস শুয়ে থাকতে হয় ম্যালোরি

জ্বরে। জ্বরের কথা মনে হলে আমার তো বাপু ভয়ই লাগে যে কি করে আমি কচি আমের পাগলামিতে পড়ে পূবপরগণায় গিয়েছিলাম।'

পার্বতী এবারে প্রতিবাদ করল, 'তোমার যত পাগলামো ঠাকুরঝি। জ্বর-জারির কথা যদি বলো তবে পূব-পশ্চিম সব জায়গাই এক রকম। ম্যালোরিয়ায় পড়ে কাৎরাতে হবে—একথা যদি ব্রহ্মা কপালে লিখে থাকেন, তবে যেখানেই যাওনা কেন রেহাই নেই।'

এইভাবে গল্প গুজব হতে হতে ঈষদুষ্ণ জল অতি মাত্রায় গরম হয়ে গেল। তাতে একটু আঙুল ডুবিয়ে সরস্বতী বলে উঠল—'আরে বাবা কথায় কথায় জল যে কখন ফুটে গেছে টেরই পাইনি। এখন কে বাবু এই গরমজল ঠাণ্ডা করবার জন্য আবার জল আনবে? থাক বাবু কাজ নেই, গরম হয়েছে, গরমই সই। গায়ে ঢাললে চামড়া তো আর পুড়ে যাবে না।' এই বলে সে স্নানের জন্য প্রস্তুত হল। প্রথম ঘটি জল ঢালতেই সরস্বতীর মুখ থেকে বেরিয়ে এল—'ওরে ব্‌বাবা।' পার্বতী ব্যস্তসমস্ত হয়ে দুই কলসী ঠাণ্ডা জল চট্‌পট্ করে নিয়ে এসে হাঁড়িটা পূর্ণ করে দিতে গরম জলটা নাতিশীতোষ্ণ হয়ে গেল।

স্নানের সময়েও তাদের কথাবার্তার বিরাম ছিল না। স্নান শেষ হলে দুজনেই রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ল। সরস্বতী তাড়াতাড়ি করে রোজকার মতো একশ আটবার 'ওঁ শিবায় নমঃ' মন্ত্র শেষ করে মাষকলাই ডাল ও 'কেসু' পাতার তৈরি 'চট্টি'র স্বাদ গ্রহণে প্রবৃত্ত হল। খেতে খেতে সরস্বতী বলল—'সোয়াদ হয়েছে বলে কিনা জানি না এরকম দু'খানা 'চট্টি'তে পেটের এক কোণও ভরে বলে মনে হয় না।' পার্বতী ততক্ষণে খাওয়া শেষ করে ঢেঁকুর তুলছে আবার সেই ঢেঁকুর উপসমের জন্য বারবার জল পান করছে। সরস্বতীর কথা শুনে পার্বতী হাসিমুখে বলল, 'তোমার তো দুপুরে খাওয়া হয় নি। আমি একটা আস্ত বোকা। হিসেব করে মাত্র চারখানা 'চট্টি' করা উচিত হল?' এই বলে তাড়াতাড়ি খানিকটা চিঁড়ে জলে ধুয়ে নিয়ে নুন ঝাল মেখে আনল। জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন, দুটো কাঁচালঙ্কা বেটে দেব নাকি আচারের রস দিয়ে মেখে দেব?'

'অ্যাই ভ্যাখো পুণ্যবতী আমি কীরকম পেটুক'—এই বলে সরস্বতী নিজের সঙ্কোচ ব্যক্ত করলেও পার্বতীর দেওয়া চিঁড়ে-ভেজায় আচারের রস মিশিয়ে তৃপ্তিসহকারে পেটভরে ভোজন করল। আচারের ঝালের ফলে তার হিক্কা এসে গেল।

আহারান্তে যে শুতে যাবে তার উপায় নেই। গুটি আমের কুড়িগুলি চোখের উপর জল্‌জল্‌ করছে। আমগুলি পুকুর থেকে ধুয়ে মুছে বারান্দায় বিছিয়ে দেয়। ঝুড়ির মধ্যে থাকলে নাকি গন্ধ হয়ে যেত। আসলে আমগুলি নিয়ে ননদ-ভ্রাতৃবধূ এতই উৎসাহিত যে, যদি কেউ একটু উসকে দিত তবে বোধকরি সেই রাতেই আমের আচার তৈরি হয়ে যেত। কিন্তু সরস্বতী অতিমাত্রায় ক্লান্ত। এক-একটা মাদুর টেনে নিয়ে ওরা শুয়ে পড়ে এবং বিছানায় গা দিতেই সরস্বতীর নিদ্রা এসে যায়।

পার্বতীর মনে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। আচারের জন্য যে লবণ প্রয়োজন তা কি দোকান থেকে কেনা হবে, না নদীর জল জ্বাল দিয়ে বানাবে ? সরস্বতীকে গভীর নিদ্রায় অভিভূত দেখে পার্বতী মনে মনে বলে—'আহা কতই না জানি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল।' ঘুমিয়ে পড়বার আগে সরস্বতীর জন্য পার্বতীর মন সহানুভূতিতে ভরে ওঠে।

পরদিন ভোর থেকেই আচার তৈরির উদ্‌যোগ শুরু হয়ে যায়। প্রথম চিন্তা—দোকানের লবণ কিনে পয়সা দণ্ড দেওয়া ঠিক নয়, বরং নদীর জল জ্বাল দিয়ে লবণ তৈরি করা হোক। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই এই পথটা আর মনঃপূত হল না, কারণ আমের গুটিগুলো চোখের সামনেই রয়েছে অথচ নদীর জল দিয়ে লবণ তৈরি করতে সময় লেগে যাবে। সুতরাং দোকান থেকে আনা যে লবণটা ঘরে জমা রয়েছে, আচার তৈরির অধীর আগ্রহে সেই লবণটাই ব্যয় হয়ে যায়।

গুটি আমে লবণ মাখানো শেষ করে সরস্বতীর বোধ হল যে বর্ষাকালের অর্ধেক ভাবনাই যেন মাথা থেকে নেমে গেছে। বাকী অর্ধেক নেমে যাবে সেই লবণ-মাখানো আমের মধ্যে গোলমরিচ মশলা ইত্যাদি মেশাবার পরে।

গ্রীষ্মের রোদ উত্তরোত্তর প্রখর হয়ে উঠেছে। নববর্ষ শুরু না হতেই মধ্যাহ্নের মৃত্তিকা তপ্ত কটাহের মতো হয়ে উঠল। চৈত্র শেষ হয়ে বৈশাখের পরে তো কথাই নেই। রোদের তাপে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আকাশ ধূসর বর্ণ। আবার মাঝে মাঝে আকাশ মেঘলা হয়ে থাকে বলে ঘরের ভিতরে ও বাইরে একই অবস্থা—দর দর বেগে ঘামের ধারা। রাতে অবশ্য বাড়ির পিছন

দিককার বালিয়াড়িতে কাপড় বিছিয়ে শুয়ে থাকলে ফুরফুরে হাওয়ায় চোখ লেগে আসে। ঐতালের বাড়ির চারদিকে রাশি রাশি বালি, দিনের বেলায় তাদের কষ্ট অবর্ণনীয়।

এই উৎকট গ্রাষ্মে পার্বতী সরস্বতীর চিন্তা এসব নিয়ে নয়। রোয়ার জমিতে ধানের যে কচি কচি চারা দেখা দিয়েছে, ওগুলির কী গতি হবে? জল ঢালার বিরাম নেই, তবু মাটির উপরে জল দেখাই যায় না, সবটাই শুষে যায়। ওদিকে পুকুরের জল শুকিয়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে খুচান জাল দিয়ে মাছ ধরার পক্ষে জেলেদের পোয়াবারো। বৃষ্টির প্রত্যাশায় কোমল অঙ্কুরগুলি শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে। আর সরস্বতী এই রোদের মধ্যে বারবার রোয়ার মাঠের কাছে গিয়ে ফিরে এসে পার্বতীকে বলে—'গোটা গ্রাম যে শ্মশান হয়ে গেল পারোতি। এবছর হয়ত বর্ষাকালে আর একবার বীজ ছড়াতে হবে, কিন্তু ঘরে বীজ কোথায়?'

এমন দুর্দিনে রাম ঐতালের হঠাৎ সখ হল কিনা ঘরবাড়ি মেরামতের। সেদিন কোথাও অন্নদান গ্রহশান্তি স্বস্ত্যয়ন ইত্যাদির নিমন্ত্রণ ছিল না। তাই গৃহেই মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ করে বারান্দার মেঝেতে গা এলিয়ে দিয়ে বলে উঠল—'এঃ কী যে যাচ্ছেতাই গরম পড়েছে।' মুখে একথা বললেও ভাতের নেশায় ঘুম আসতে বেশি দেরী হল না। ঘণ্টা দুয়েক দিবা নিদ্রার পরে হাই দিতে দিতে উঠোনের ছাপরার উপর একবার চোখ বুলিয়ে বোনকে কাছে ডেকে বলল—'সরসোতি, এই এক বিঘৎ পরিমাণ ছাপরা থাকাও যা, না থাকাও তাই। বাড়িতে নারকেল পাতার কোনো টানাটানি নেই। যদি কম পড়ে, কারো কাছ থেকে চেয়ে আনা যাবে। আমি বলি কি জানো উঠোন জোড়া একটা বড় ছাপরা বানিয়ে উঠানের মাটিটাকে লেপে-পুঁছে বেশ ঝক্ ঝকে তক্ তকে করে তোলা দরকার।'

সরস্বতীর চোখে মুখেও তখন দিবানিদ্রার ভাব। সেও দাদার মতো হাই তুলতে তুলতে বলল—'তোমার কি অন্য কোন কাজ নেই? বাড়িতে কি কোনো কাজ নেই? বাড়িতে কি কোনো বিয়ে-পৈতে যে উঠোন সুদ্ধ ছাপরা খাটাতে হবে? দাদার মাথায় যা এক-একটা বুদ্ধি আসে!' সরস্বতীর কথা শেষ হতে না হতেই রাম ঐতাল নিজের হাই তোলা মুখের সামনে আঙুলের তুড়ি দিতে দিতে উঠে দাঁড়াল। কোমরে একটা গামছা বেঁধে আর একটা

গামছা মাথায় জড়িয়ে রোদের মধ্যেই বাড়ির সামনে পিছনে একোণে ওকোণে ঘোরাঘুরি করতে লাগল! প্রখর রোদে ঐতালের রোমকূপ থেকে দরদর বেগে ঘর্মবিন্দু বেরিয়ে আসছে। এর মধ্যেও তার বিশ্রাম নেই। বাড়ির সমস্ত আনাচ-কানাচ খুঁজে খুঁজে খুঁটি, বাঁশ, বাঁখারি ইত্যাদি টেনে টেনে একজায়গায় জড় করছে। সরস্বতী বুঝল ছাপরার কথা দাদা কেবল মুখেই বলে নি, কাজেও করে ছাড়বে। কিন্তু কেন এই পাগলামি একথা জিজ্ঞাসা করবার আগেই ঐতাল বলল—'সরসোতি যা বলব তার উত্তর করবি নে, চুপ করে থাকবি। তোরা কতগুলি 'ভূতপরংগি'র ডগা কেটে আন্ দেখি। বলা মাত্রই বেশ বাধ্য ছেলের মতো ননদ-বৌদি দুজনেই সেই রোদের মধ্যে দা হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। সন্ধ্যানাগাদ যখন বাড়ি এসে পৌঁছাল, তখন যে কেবল উঠোনের মধ্যে নারকেলের বাইল বাঁশ ইত্যাদি নানা সরঞ্জাম সংগৃহীত হয়েছে তাই নয়, ঐতাল ছাপরার খুঁটিগুলোকে পোঁতার জন্য শাবল দিয়ে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে চলেছে।

সূর্য অস্ত গেল। সমুদ্রের দিক থেকে তখন হাওয়া বইতে শুরু করেছে। সরস্বতী তার দাদাকে বলল—'পুকুরে যদি খানিকটা জল উছলে থাকে, আমি আর পারোতি মিলে রোয়ার মাঠে ঢেলে আসি। তুমি একটু উনুনের উপর ভাতের হাঁড়িটার দিকে খেয়াল রেখো'। পার্বতীকে নিয়ে সরস্বতী চলে গেলে ঐতাল মনে মনে গজর গজর করতে থাকল। শুক্ল পক্ষের প্রথম দিকে শিশু চাঁদের আলো এসে পড়েছে উঠোনে। সেই আলোতেই ছাপরার খুটি পোঁতা আড়ার বাঁখারি সাজানো, 'ভূতপরংগি'র ছোবা দিয়ে আড়ার সঙ্গে বাঁশের কঞ্চি বাঁধা—একে একে এই সমস্ত কাজ এগিয়ে চলে। কাজের ফাঁকে ঐতাল দুএকবার রান্নাঘরে উঁকি মেরে দেখে আসে।

দণ্ড পাঁচেক পরে জল সেচনের কাজ শেষ করে ননদ-বৌদি ফিরে এল। পুকুরের মধ্যেই একপ্রান্তে খোঁড়া একটা গর্তের মধ্যে ডুব দিয়ে স্নান করে ঘরে এসে পা দিতে, রান্নাঘর থেকে ভাত পোড়ার গন্ধ পেল। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখল হাঁড়ির আদ্ধেক ভাত পুড়ে গেছে, বাকী আদ্ধেকও খাওয়ার উপযুক্ত নেই। ক্রুদ্ধকণ্ঠে সরস্বতী বলে উঠল—'তোমাকে আজ রাহুতে পেয়েছে, রাহুতে। কী এমন ছাপরার কাজ তোমার? ভাতগুলোকে একেবারে অখাদ্য করে ফেলেছ।"

যাকে উদ্দেশ করে বলা কথাগুলি তার কর্ণগোচর হল না কারণ ঐতাল তখন উঠোনের কাজ সেরে পুকুরের মধ্যস্থ গর্তের জলে নেমেছে। যথারীতি স্নানসমাপনান্তে যেন দৈহিক শ্রম লাঘবের জন্যই ক্রমক্ষীয়মাণ কণ্ঠে 'ওঁ নমঃ শিবায়, ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্রপাঠ করতে করতে আবার হঠাৎ একবার সেখানেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মন্ত্রপাঠের কণ্ঠস্বর চড়িয়ে দিলেন। ঠিক এমনি সময়ে বাতাসের এক ঝাপটায় পোড়াভাতের গন্ধ সেখানেও এসে তার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করল। দ্রুতপদে রান্নাঘরের দাওয়ায় এসে হুংকার দিয়ে বলল—'এটা কি আহারের অন্ন পাক হচ্ছে, না ভূতপ্রেতের পিণ্ডি', সামনে দাঁড়িয়ে ছিল পার্বতী। স্বামীর এই কঠিন বিদ্রূপের উত্তরে কোনো কথা না বলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ঐতালের তর্জন গর্জন সরস্বতীর কানে গেলে সে বাইরে এসে বলল—'যাবার সময়ে বলে গেলাম—হাঁড়িটা দেখো। কথাটা তোমার কানে গেল না। এখন ভাত পুড়ে গেছে তো কে কী করবে? আমাদের ফিরে আসার আগেই ভূতের পিণ্ডি হয়ে হয়ে গেছে। এখন এসে খেলেই হয়।'

সরস্বতী এখানেই থামল না। সমানে বলে চলল—'হ্যাঁ, ছাপরার নেশায় আমাদের কথা কি শুনতে আছে? ভাত পোড়া লাগল তো লাগুক। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যে কেটে গেল সেদিকে খেয়াল নেই। তোমার কী দরকার? না একটা উঠোনজোড়া মস্ত ছাপরা। সরকারের লোক আসবেন—এই বাড়িতে জমাবন্দী করবার জন্য! আজ তিন দিন ধরে বৌটার হাত কামড়াচ্ছে 'জুমুজুমু' করে। তাই নিয়ে গেল সেচের কাজে। আর তুমি এখানে বনে বসে ছাপরা বানাচ্ছ!' ভগিনীর এইরূপ প্রতি-হুঙ্কার শুনে ঐতাল সন্ত্রস্ত হয়ে কথাটি না বলে চুপ করে রইল। খানিকপর একটা খুঁটিতে হাত দিয়ে 'রাম রাম হরি হরি' বলে জপ করতে আরম্ভ করল।

সরস্বতী আবার রান্নাঘরে গিয়ে দ্বিতীয় বার ভাত রেঁধে একটা 'গজ্জু' তৈরি করে, গোটাকয়েক বড়া ভেজে পাতা পেতে দিলে ঐতাল তখন নীরবে এসে দুটো মুখে দিয়ে বাইরে চলে গেল। তার সেই উগ্র নরসিংহ মূর্তি একেবারে চুপসে গেছে। কেবলই মনে হচ্ছে—এখন কোনো রকমে যথাস্থানে গিয়ে শুয়ে পড়তে পারলেই হয়। বস্তুত করলও তাই। আর সঙ্গে সঙ্গেই নিদ্রাভিভূত হয়ে শুরু করে দিল তার অতি প্রবল নাসিকা গর্জন।

উঠোনে রাশীকৃত হয়ে পড়ে ছিল নারকেল গাছের বাইলগুলি। ছাপরার

ছাউনির জন্য ওই বাইলগুলির পাতা গাঁথতে হবে। খাওয়া শেষে ননদ-বৌদি মিলে বসে বসে একে একে নারকেল পাতাগুলো গাঁথতে লাগল। ঐতালের এই ছাপরা তৈরির পাগলামো তারা কিছুই বুঝতে পারল না। কাজ করতে করতে এক এক বার তারা তন্দ্রায় ঢলে পড়ছে, তবু একটি মাত্র মনের তৃপ্তি নিয়ে ওরা কাজ করে চলেছে—রাম ঐতাল বোধ করি শীঘ্রই পোষ্য গ্রহণের কথা স্থির করে থাকবে এবং এই সমস্ত আয়োজন সেদিনকার উৎসবের জন্য। কথাটা প্রথমে সরস্বতীই বলল এবং পার্বতী দ্বিতীয় কোনো কারণ অনুমান করতে না পেরে ননদের কথায় সায় দিয়ে বলল—'তা-ই ঠিক, ঠাকুরঝি।'

ভোর না হতেই কাশির আওয়াজে বোঝা গেল ঐতাল মহাশয় ঘুম থেকে উঠেছে। 'করাগ্রে বসতে লক্ষ্মীঃ, করমধ্যে সরস্বতী। করমূল তু্গোবিন্দঃ, প্রভাতে করদর্শনম্।'—অন্ধকারে নিজের করতলদ্বয় দর্শনের পরে ভাগবতের 'গজেন্দ্রমোক্ষণ' অধ্যায়ের প্রভাতী গান গুন্‌গুন্ করে গাইতে গাইতে বাইরে এসে দেখল—ছাপরার ছাউনি গাঁথবে বলে কাল রাতে যে নারকেল পাতাগুলি ছড়িয়ে রেখেছিল, সেগুলি যেন তখনই ছাপরায় ওঠার জন্য প্রস্তুত। বোন ও স্ত্রীর কাজে ঐতাল খুশি হল বটে, কিন্তু মনে মনে আবার চিন্তা করল—'এই ছাউনিতেই কি কুলোবে, না আরও নারকেল পাতা প্রয়োজন? এই কথা মনে আসা মাত্রই ঐতাল কাল বিলম্ব না করে প্রজাদের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হল। আকাশে তখন শুকতারা উঠেছে মাত্র। তবু সে সেই সাত সকালেই গিয়ে হাঁক দিল—'ও সুরো, ওরে কালো, তোরা সব এক এক বোঝা নারকেল পাতার চাটাই, যেখান থেকে হোক, নিয়ে আসবি। একদিন তোদের পান-তামাক খাইয়ে দেবো। পাতার জন্য পাতা চাস, ধান চাস, যা চাস তাই দেব। মোট কথা, একটা খুব বড় ছাপরা না হলে চলবে না।'—এই কথা ঘোষণা করে ঐতাল প্রস্থানের উদ্‌যোগ করল।

প্রজাদের মধ্যে যে দুএকজন একটু বাচাল, ফাজিল, তারা বলল—'নারকেল পাতার চাটাই কিসের জন্য ঠাকুরমশাই? ছাপরার জন্য? তবে তো দেখছি খ্যাঁট একটা নিশ্চয়ই হবে। হুঁ হুঁ, 'বহ্মাঠাকুর তাহ'লে বাম্‌ভন বাড়ির পায়েস আমাদের মতো গরীবের কপালে নিশ্চই লিখেছেন।' ঐতাল হেসে বলল—'শূদ্রদের ললাট লিপিই ওই। ছাপরার কথা বললেই পায়েসের জন্য মুখ হাঁ হয়ে ওঠে।'

দিনের আলো না ফুটতেই ঐতাল বাড়ি ফিরে এল এবং রোদ না উঠতেই পাঁচ সাত বোঝা নারকেল পাতার চাটাই তার উঠোনে এসে জড় হল। চাটাই যারা নিয়ে এসেছে তাদেরই একজনের নাম কালো। কালোকে ডেকে ঐতাল তার সঙ্গে একযোগে ছাপরাটা ছেয়েও ফেলল। ওটা এখন বেশ ধনী গৃহের বিবাহোৎসবের ছাপরার মতো জমকালো দেখাচ্ছে। খুশি মনে ঐতাল কামিলা কালোকে আপ্যায়িত করার জন্য স্ত্রীকে ডেকে বলল—'ওগো শুনছ, এই কালোকে এক ঘটি জল, দুটুকরো আচার দাও।' পরে কালোর দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, 'ওহে কালো, তোমার কি আচার চাই, না গুড়?' কালো হাসিমুখে জবাব দিল, 'গুড় তো ঠাকুরমশাই সবজায়গাতেই পাই, কিন্তু বামভন ঘরের কচি আমের আচার কতদিন মুখে পড়ে নি। তার মধ্যে, মাঠান, আপনকাদের ঘরের আচারের সোয়াদ এই 'কোটা' পরগণার চৌদ্দখানি গাঁয়েও পাওয়া যাবে নি।'

পার্বতী নতুন করে লঙ্কা মাখানো কয়েকটা কচি আমের আচার এক টুকরো কলা পাতায় করে এনে কালোর সামনে রেখে দিল। সেই সঙ্গে এক ঘটি জল। আর কালো? ভূতগ্রস্ত মানুষের মতো অত বড়ো ঘটির এক ঘটি জল এক মুহূর্তেই ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ঘটিটা খালি করে ফেলল। বলল—'মাঠান, আপনাদের জলটাও কি মিষ্টি! আর একটু জল চাই মা। এই গরমের দিনে খাওয়া না মিলুক, ক্ষেতি নেই; কিন্তু জল ছাড়া যে বাঁচন দায়' এই বলে আরও অতটা জল খেয়ে সমস্ত আচারগুলোকে নিঃশেষ করে পার্বতীর দিকে চেয়ে বলল—'মা, গরীবের ছেলেপুলোকে একটা নারকেলের মালাইতে করে চার টুকরো আচার দিয়ে দিন। বাড়ি গিয়ে আজ দুফরে আপনার নামে একটা বড় রকমের ভোজ খাব।'

পার্বতী জানে যে কালো আজ যে-কাজ করে দিয়েছে, এই সমস্ত কাজের জন্য তাকে কোনো মজুরী দেওয়া হবে না। তাই কালোর দ্বিতীয়বার আচার প্রার্থনায় পার্বতী ভাবল একটু আচার দিয়েই না হয় কালোর ঋণ শোধ করা যাক। কিন্তু নতুন আচার দিতে তার মন সরল না। বৈয়মের মধ্যে রাখা খানিকটা পুরোনো আচার একটা শুকনো কলাপাতায় রেখে ভাঁজ করে দিল। ভাগ্যক্রমে কালো সেই আচারের পুঁটুলিটা সেখানে বসে খোলে নি। খুললে একথা নিশ্চয়ই বলত—'মাঠান আমায় যা দিয়েছিলেন এটা তো তা নয়।'

এখন কিন্তু উঠোন ঘষে আয়না করার জন্য ডাক পড়েছে সেই জঞ্জালগুলোর। অথচ 'কেন কি জন্য'—এই কথাটুকু মাত্র আমাদের কাছে বলার দরকার নেই।' অত্যন্ত বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে সরস্বতী কথাগুলি শেষ করল।

পরবর্তী কয়েকটি দিন ওদের আর বিশ্রাম ছিল না। হাতে সময় মাত্র তিন দিন। এরই মধ্যে আঙিনাটাকে আয়নার মতো চক্‌চকে করে তুলতে হবে। তার জন্য যা যা প্রয়োজন—লাল মাটি, এঁটেল মাটি, লাল পাথর—এইগুলি যোগাড় করা; কার সঙ্গে কোথায় গিয়ে কেমন করে যোগাড় করা—এই সমস্ত ভাবনা চিন্তা ও কাজের মধ্যেই ননদ-বৌদি মগ্ন হয়ে রইল।

পাঁচ

আঙিনার কাজের ভার পড়েছে সরস্বতীর উপর। এখন পার্বতী কী করবে? সত্য বটে তার পতিদেবতার হুকুম হয়েছে যে সে যেন কোনো কাজকর্মে না যায়। কিন্তু তাই বলে কি সে অমনি চুপচাপ বসে থাকতে পারে? 'উঠোনটা যেন আয়নার মতো ঝকঝকে হয়'—তার মানে সেটা নিশ্চয়ই বিয়ে পৈতার মতো কোনো শুভকার্যের জন্যই হবে। তাহলে শুভ কাজের মতো পাঁপড়-বড়া তৈরি করতে হবে না? দৈনিক আহারের পাঁপড়-বড়া কি উৎসবের কাজে লাগানো যায়? পার্বতীর মনে এই ভাবনাটা খুব বড় হয়ে দেখা দিল। তাই ঐতাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবার পরেই পার্বতী খুব উৎসুক হয়ে সরস্বতীকে এসে জিজ্ঞাসা করল—'ঠাকুরঝি, কতটা মাষকলাই রোদে দেব? চিঁড়ের ধান কতটা বের করব?' সরস্বতী উত্তর দিল—'কী করে বলব কতটা? কাকে জিজ্ঞেস করব? শুভকাজটা কী, কতলোকের খাওয়ার ব্যবস্থা—এ সব কথা যখন দাদা বলে যায় নি, তোমার কেন তা নিয়ে মাথাব্যথা? যে কাজের কথা বলে গেছে, সেটুকু করে রাখব।' পার্বতী বলল—'তিনি নাইবা বললেন, যখন আমাদেরই বাড়ির কাজ, তখন না-করে উপায় আছে কী?' নিরুপায় হয়ে তারা আলোচনা করতে লাগল উঠোনে কতখানি আন্দাজ পাতা ধরে। স্থির হল যে দু তিন শ পাতা ধরবে। কিন্তু কতটা বৈঠক পড়বে এবং খাওয়াটাই বা কী ধরনের হবে এসব না জানার ফলে তাদের অনুমান বিশেষ ফলপ্রসূ হল না। তবু তারা স্থির করল যে অন্তত হাজার লোকের জন্য পাঁপড়-বড়া করা দরকার।

অতটা কাজ কেবল নিজেরাই পেরে উঠবে না ভেবে, সাহায্যের জন্য প্রতিবেশী উপাধ্যায়পত্নী অক্কম্মাকে ডাকবার কথা ভাবল। কিন্তু পরক্ষণেই সরস্বতী সংশয় প্রকাশ করে বলল—'বেশ, তাকে না-হয় ডাকলুম। সেও তাড়াতাড়ি বাটনা বাটা, কুটনো কোটা, পাঁপড় বানানো সব কাজ করে দিয়ে যাবে। কিন্তু যখন সে জিজ্ঞেস করবে—এ সমস্ত কিসের জন্য, তখন তাকে কী উত্তর দেব?' পার্বতীর মুখখানি ছোট হয়ে গেল। সত্যিই তো বাড়িতে আমাদের মান-মর্যাদা কতটা প্রতিবেশীকে ডেকে এনে তা দেখাবার একটা উপলক্ষ্য

হবে মাত্র। সরস্বতীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। নিজেদের বাড়িতে নিজেদের দুরবস্থার কথা ভেবে দাদার বিরুদ্ধে অনেক কটূক্তি করল সে। বলল—'পারোতি, তোমার তো কোনো কাজ নেই। দাদাই বলে গেছে তোমাকে যেন না-খাটাই। চুপ করে শুয়ে থাকো তুমি। উঠোনের কাজটা করে দেব বলেছি। তাই করে দেব। আদিখ্যেতায় আমাদের কী প্রয়োজন? পাঁপড়-বড়ার দরকার হলে মুখ ফুটে সেটা বলে যেত। বোধ করি এখনও অনেক সময় হাতে আছে। কবে-না-কবে কী-না-কী হবে তার জন্য এখন থেকেই উদ্যোগ আয়োজন। তিন দিন পরেই তো আসছে। এসে হয়ত বলবে। তখন করলেই হল।' মুখে এতসব সান্ত্বনা বাক্য বললেও সরস্বতীর মনে অশান্তির আগুন জ্বলছে। তার বদ্ধমূল ধারণা যখন মেয়ে হয়ে জন্মেছে, তখন এজন্মে মান-সম্মান আর কিছুই জুটবে না।

পরদিন সরস্বতী সুরো ও তার স্ত্রীকে ডাকিয়ে উঠোনের মাটি লেপা পোঁছার কাজ করছিল। কাজ করতে করতেই তার মনের মধ্যে একটা তির্যক চিন্তা খেলে গেল। পার্বতী ভিতরে বসে ছিল, তাকে ডেকে বলল 'পারোতি, কেন জানি না শ্বশুর বাড়ির কথা খুব মনে পড়েছে। কিছুদিন আগে সালিগ্রামের রথ হয়ে গেল, তখনই আমার যাওয়া উচিত ছিল। তিন বছর হয়ে গেল সেখানে যাইনি। তাঁরা আমার খোরাকির চাল পৌছে দেন বলে আমি যে তাঁদের ওখানে একবারও ঘুরে আসছি না এটা ঠিক নয়। একদিনের জন্য যাই। ইচ্ছা হলে না-হয় কয়েকদিন থেকে আসব। দাদার যাওয়ার পর থেকে আমার মনে কেবল সেখানকার চিন্তাই জাগছে।'

তিন দিনের মধ্যে কোনো রকম উঠোনের কাজ শেষ হল। সুরোর বাড়ির লোকজন এসেছিল। কালের বৌ ও মেয়ে সকলে বেশ করে মাটি লেপে-পুঁছে পালিশ করে দিয়ে যায়। এবং এইভাবে ঐতাল-গৃহের প্রাঙ্গণ-দর্পণ-সংস্কার সম্পূর্ণতা লাভ করে। সরস্বতীর তখন মনে হল যে উঠোনের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে তার নিজের কাজও শেষ হল।

অপরাহ্ণের আলো না মেলাতেই যে-যার কাজ করে বাড়ি চলে যায়। উবু হয়ে কাজের জন্য পিঠে ব্যথা হয়েছে বলে সরস্বতী গা-মোড়া দিতে দিতে হাই তুলে মুখের সামনে তুড়ি মেরে স্নানের জন্য পুকুরের দিকে গেল। স্নান করে ফিরে এসেই, বিশেষ উপলক্ষ্যে বাইরে যাওয়ার সময় পরিধেয় একখানি ধোয়া

পরিষ্কার কাপড় সে পরিধান করল। পার্বতীকে ডেকে বলল—'পারোতি 'কেন' 'কী' এই সব প্রশ্ন আমায় জিজ্ঞেস কোরো না। দাদার কথা মতো কাজ শেষ হয়েছে। আজ রাতেই সে বাড়ি ফিরবে। সে এলে পরে ওখানে আমার আর যাওয়া হবে না। সে তার বিত্তান্ত শোনাতে বসবে, তা শুনলে তো আমার চলবে না। আমি এক্ষুনি চললাম। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব। তারও আগে যদি আমার আসা দরকার মনে হয় তবে যেন খবর পাঠায়।' এই বলেই সে উঠোনে নেমে পড়ল। এদিকে পার্বতীর ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছে, বুকে ঝিম ধরে আসছে। তবু সে সাহস করে বলে উঠল—'ঠাকুরঝি তুমি ওর ওপর রাগ করেছ বলে মনে হচ্ছে। রাগ কেন দিদি? মেয়ে হয়ে জন্মালে কোন্ বাড়িতে কী সুখ পাওয়া যায়? তুমি কি শ্বশুর বাড়ি গিয়ে সুখ শান্তি পাবে? উনি তো আজই আসবেন। এলে পরে যেও। ফিরে এসেও যদি উনি না বলেন কেন এই ছাপরা উঠোনের আয়োজন, তখন না হয় যেও।'

সরস্বতীর উত্তর খানিকটা রুক্ষই শোনাল। নীচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরে সরস্বতী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল—'পারোতি' তুমি বাধা দিও না। দাদাকে তুমি ভয় করবে তার বাধ্য হয়ে চলবে—এতো স্বাভাবিক কথা। কিন্তু আমি কারও ধার ধারি না। যেদিন বাবা আমার বিয়ে দিলেন, সেদিন থেকেই এ বাড়ির ঋণ আমার ছিন্ন হয়ে গেছে। দাদা বলে বিশ্বাস করেই আমি এখানে এসেছি, তার অন্নের মুখাপেক্ষী হয়ে আসি নি। শ্বশুরবাড়ি থেকে আমার ভরণপোষণের জন্য যা দেয়, আমার একার পক্ষে ঢের। আর অমি না চাইতেই তারা দিয়ে আসছে। আপন মনে করে দাদার বাড়িতে এলাম। ভাবলাম—'ছেলেপিলে নেই, কেন সেখানে পড়ে থাকব? শত হলেও এ আমার দাদা, একই পেটের ভাইবোন আমরা। এই সমস্ত ভেবে এলাম বলে আমি এখন তার কাছে অনাদরের বস্তু হয়েছি। বাড়ির কুকুরের মতো দিন রাত খাটা খাটুনি করি। যদি জানতে চাই—ছাপরাটা কি জন্য হল, তবে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে পাড়াপ্রতিবেশীদের কাছে কিংবা রায়ত প্রজাদের বাড়িতে। তাই না?' অবিরল জলধারার মতো সরস্বতীর কথাগুলি বেরিয়ে আসছিল। তাকে থামিয়ে দিয়ে কথা বলার মতো সাহস পার্বতীর হল না। সরস্বতী ইতিমধ্যে হন্ হন্ করে চলতে শুরু করলে পার্বতীও নিঃশব্দে তার পিছনে পিছনে চলল। ননদ-

ভাজকে যারা এই অবস্থায় দেখল তাদের মনে হল ওরা দুজনে বোধ করি খিড়কীর শশা ক্ষেতে জলসেচের জন্য যাচ্ছে।

খিড়কীর পরে খোলা মাঠ, শশা ক্ষেতের পরে নাবাল জমির আল। পার্বতীর হঠাৎ মনে পড়ে গেল—এই তিনদিনের হুড়-হাঙ্গামায় খিড়কীর শশাক্ষেতে জল দেওয়া হয় নি। পিছন থেকে সে ডেকে বলল—'ঠাকুরঝি, শশাগাছগুলি শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। পরশুদিনই জল দেওয়া উচিত ছিল। তাতে, কালও দেওয়া হয় নি।'

সরস্বতী এ কথায় পিছন ফিরল না, চলতে চলতেই জবাব দিল—'আমার কুলগোত্র ভিন্ন, ওই খিড়কীর মালিকের কুলগোত্র ভিন্ন। যত দিন এ বাড়িতে জলের ঋণ ছিল, ততদিন এখানে ছিলাম। এখন চললাম।' এই বলে অগ্রসর হতে থাকলে পার্বতীও তার পাশ্চাতে ছায়ার মতো চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে তারা যেখানে এসে দাঁড়াল সেখান দিয়ে হেঁটে নদী পার হওয়ার পথ। ভাঁটার জল সমুদ্রের দিকে নেমে যাচ্ছে। পার্বতী চোখ তুলে তাকাবার আগেই সরস্বতী জলে নেমে স্রোত পেরিয়ে এক মুহূর্ত পিছনের দিকে মুখ করে বলল—"পারোতি, সমস্তই ঋণানুবন্ধ। তুমি কেন মিছামিছি দাঁড়িয়ে আছ, বাড়ি যাও।' এই বলে পুনরায় সে অগ্রসর হল। যেন সমস্ত সংসারবন্ধন কেটে এগিয়ে চলেছে।

পার্বতী যেখানে ছিল সেখানেই স্থির হয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার কপাল দুটি অশ্রুসিক্ত না হলে তাকে একটি শিলামূর্তি বলেই ভ্রম হত। সরস্বতী নদীর ওপারের মাঠে ধীরে ধীরে একটি বিন্দুর মতো চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত পার্বতী সেখানেই বেহুঁস হয়ে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপরে অস্ফুট কণ্ঠে বলল'—সত্য সত্যই চলে গেল!' অন্যমনস্কভাবে নদীতীরবর্তী চুঙ্গি কাটার কচি গুল্মের উপর হাত বুলোতে গিয়ে কাঁটার খোঁচায় সে একবার 'উঃ' করে উঠল। তার মন আকাশের মতোই শূন্য। ওদিকে অস্তগামী সূর্য, এদিকে উদীয়মান কয়েকটি নক্ষত্র—গোধূলির এই আলো-আঁধারিতে পার্বতীর মন রিক্ত প্রান্তরের মতো ছড়িয়ে পড়ল।

পশ্চিম আকাশ রক্তিম হয়ে ধীরে ধীরে তার রঙ ক্ষীণ হয়ে এল। মনুষ্যশরীর এখন কেবল ছায়ার মতো বোধ হয়—ঠিক চেনা যায় না। এমন সময়ে কালোর বৌ পোম্মি তাদের একটা হারানো বাছুর খুঁজতে খুঁজতে সেই পথে এসে

উপস্থিত হল। পাথরের মতো দণ্ডায়মান পার্বতী-মাকে দেখে পোম্মি বলে উঠল—'মাঠান, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবছ গো ? সরস্বতী মায়ের জন্য অপেক্ষা করছ বুঝি ? উনি কি ওপারে গেছেন ঘাস আনতে ?'

পার্বতীর কোনো সাড়া না পেয়ে পোম্মি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হ'য়ে 'মাঠান নয় ?' এই বলে সামনে এগিয়ে এসে দেখল—সত্যিই তাদের মাঠাকরুণ। গাল দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, আর সেই জল খানিকটা চিক্‌চিক্ করছে দেখে পোম্মি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল—'কাঁদছ কেনে গো মাঠান ? এই ভর-সন্ধ্যায় চোখের জল ফেলছ, কী হয়েছে তোমার ? এই সময়ে বাড়িঘর ছেড়ে এখানে কেন দাঁড়িয়ে ?'

পার্বতীর যেন তপোভঙ্গ হল। হঠাৎ নিদ্রোত্থিতের মতো বলে উঠল—'অ্যাঁ' ! একে একে সমস্ত ঘটনা মনে পড়ে গেল। বড়ই বিলম্ব হয়ে গেছে, এখন বাড়ি যেতে হবে—এই ভেবে পিছন ফিরতেই পোম্মিকে দেখে প্রশ্ন করল—'কে ? কালোর বৌ ? তুই এ সময়ে এখানে কেন রে ?'

পোম্মি জবাব দিল—'আজ একটা বাছুর ঘরে ফেরেনি বলে খুঁজতে এনু। দেখনু আপুনি এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী ভাবছো ? কথা বলনু, ডাকনু কিন্তু আপুনি আমায় চিনতেই পারলে না গো।'

'তুই আমায় ডেকেছিলি ?'

'হ্যাঁ, মাঠান। দেখনু আপুনি একা একা কী সব ভাবছ ?' ইতিমধ্যে পোম্মি তার হারানো বাছুরের কথা ভুলে গিয়ে বলল—'মা, আঁধার হয়ে এল, বাড়ি চল। আজ তো জ্যোৎস্না নেই। পথে কোনো সাপখোপ থাকতে পারে। চলো যাই।'

'তুমি যাও, তোমার বাছুর খোঁজো গে। আমি বাড়ি যাচ্ছি। সত্যি তো অন্ধকার হল।'

'বাছুর এখন আর কোথায় খুঁজবো ? আসবে যখন হোক—রাতে, না-হয় কাল সকালে। চলুন যাই।' পোম্মির কথায় পার্বতী বাড়ির দিকে রওনা হলে পোম্মিও তার পিছন পিছন অগ্রসর হল। পার্বতীর মুখে কোনো কথা নেই, কিসান বৌ ও চুপ করে রইল। পার্বতী তার বাড়ির উঠোনে পৌছে গেছে দেখে পোম্মি তার নিজের বাড়িতে গেল। পার্বতী কিন্তু টের পায় নি যে পোম্মি তার সঙ্গে থেকে তার বাড়ি পর্যন্ত এসেছিল।

গৃহে প্রবেশ করে হতবুদ্ধির মতো প্রদীপটা জ্বালিয়ে পার্বতী সেই প্রদীপের

সামনে জপের মালা নিয়ে বসল। প্রথম কিছুক্ষণ মুখ দিয়ে 'নমঃ শিবায়' বেরোয়, জপের সঙ্গে ঠোঁটও নড়তে থাকে এবং জপমালার গুটিকাগুলি আঙুলের উপর পর্যায়ক্রমে ওঠা-নামা করতে থাকে। ধীরে ধীরে মুখের শব্দ ক্ষীণ হয়ে আসে। তখন কেবল জপমালার আবৃত্তি। কয়েক মুহূর্তে পরে জপমালাও নিশ্চল হয়ে আসে। এক দৃষ্টিতে দীপশিখার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে পার্বতীর চোখদুটি থেকে অশ্রুজল গড়িয়ে গড়িয়ে তার কপোলদেশে বর্ষিত হতে থাকে।

ঐতালদের বাড়ির উঠোনে জ্যোৎস্নার আবছা আলো পড়েছে। সগু ফেন-খাওয়া মোষের বাছুরের মতো দেখতে অপূর্ণ চাঁদ। সে যেন এই কথাই ভাবছে—আকাশপথে আর সে এগুবে কিনা। চাঁদ এখন আকাশধনুর তৃতীয়ভাগে। আর একটি ভাগ পার হলেই তার পরিক্রমা পূর্ণ হয়ে সে অস্ত যাবে। এত শত ভ্রমণেরই বা কী প্রয়োজন, মোষের শাবকের মতো এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রোমন্থন করলে ক্ষতিটা কী? জগৎপ্রপঞ্চ তো তার উপর নির্ভর করেই চলছে না। যে-সমস্ত রাতে সে আকাশে থাকে না, যেমন অমাবস্যায়, তখন দুনিয়ার কাজকর্ম কি বন্ধ থাকে? এই বিশ্ব-প্রপঞ্চে সূর্য যদি হয় স্বামী, সে তবে স্ত্রী। স্বামী ছাড়া গৃহ অচল, কিন্তু স্ত্রী না হলে সে রকম কিছু বিশৃঙ্খলা হয় না—ওই চাঁদ যেন এমনি কিছু কথা মনে মনে বলে থাকবে। পার্বতীর দুঃখকষ্ট দেখে চাঁদও সেই রকম চিন্তা করতে আরম্ভ করেছে কি না কে জানে?

রথচক্রলগ্ন প্রাণীর মতো চন্দ্রের ভ্রমণ অব্যাহত থাকল—জলস্রোতের মধ্যে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের মতো। পাতলা মেঘের আড়ালে সাঁতার দিতে দিতে সে পশ্চিম সমুদ্র কিনারে আত্মগোপনের জন্য অগ্রসর হল। শেষে একটি টিমটিমে প্রদীপে পরিণত হয়ে, একেবারে শেষে বুড়ির ঘরের নিঃশেষি তেলের প্রদীপের মতো সে দিগন্তেই নিভে গেল।

পার্বতীর সামনে রাখা প্রদীপটিও তেল ফুরিয়ে যেতে নির্বাপিত হল। সলতে জ্বলে গিয়ে—ধুঁয়ো উঠলেও পার্বতীর নাকে সেই পোড়া গন্ধ পৌঁছয়নি। সেটা পুড়ে ছাই হয়ে নিভে যাওয়ার পরে—পার্বতী ধড়মড় করে উঠে পড়ে বলল—'হুঁ প্রদীপটা নিভেই গেল।' কিন্তু একথা তার মনে জাগল না যে প্রদীপটায় আবার তেল ঢেলে জেলে নিয়ে রাতের রান্না-বান্না শেষ করতে হবে। 'হুঁ, নিভে গেছে তো নিভেই যাক, বাইরে জ্যোৎস্না আছে'—এই ভেবে সে আগের

মতোই বসে রইল। তন্দ্রাচ্ছন্ন পার্বতী কী করে জানবে যে বাইরের প্রদীপ ঘরের প্রদীপের আগে নিভে গেছে? সে খানিকটা উদাসীন ভঙ্গীতে শরীরটা নেড়ে চেড়ে প্রদীপের কাছেই শুয়ে পড়ল। হাতটা প্রদীপের খুঁটিতে গিয়ে বাড়ি লাগলেও নিজের অঙ্গখানি যে সরিয়ে রাখবে এমন চিন্তাও হল না তার।

ঠিক এমনি সময়ে সদর দরজার অনতিদূরে ঐতালের কণ্ঠ শোনা গেল—'ও শীন, তাহলে কাল সকালেই আসবে, কেমন। দেখো তুমি তো জানো আমার বাড়িতে আমি ছাড়া আর কোনো পুরুষ নেই। ঘরে থাকার মধ্যে আছে আমার স্ত্রী আর ছোট বোন। তাদের দিয়ে আর কতটা কাজ হতে পারে? তাই বলছি, শীন, কাল থেকে আগামী এক সপ্তাহ পর্যন্ত তুমিই আমার বাড়ির মালিক —এই কথাটা মনে রেখেই সব কাজকর্ম করিয়ে তুলিয়ে দেবে।' ঐতাল এইভাবে স্বীয় প্রতিবেশী শীনময়্যর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। ওরা দুজনে এক্ষুনি কোথা থেকে একসঙ্গে এসেছে। ঐতালকে বাড়ির কাছে পৌছে দিয়ে শীন তার বাড়ির দিকে যাচ্ছিল। ঐতাল পুকুরে নেমে পা ধুয়ে নিয়ে পুনরায় শীনকে ডেকে তাগিদ দিচ্ছিল। শীন ততক্ষণে অনেকটা দূর চলে গেছে। সে তার বাড়ির পথের উপর থেকেই বলল—'তাই হবে, বাবা, তাই হবে। আমার কি আর কোনো কাজ আছে? একটা বিবাহ আমরা ধূমধামের সঙ্গেই সম্পন্ন করব। মনে করুন, যদি কেউ বলে—'বৈদিক বামুন বাড়ির বিয়ে, নারকেলের নাড়ুর উপর কি আর খাজা গজা হবে?', একথা কেউ বললেই তার মুখ বন্ধ করে দিতে হবে।'

ঐতাল—'আমি বলছি কি এখন সব তোমারই হেফাজতে? কর্ণকে যেমন সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করা হয়েছিল, তেমনি এই বিবাহ ব্যাপারে তুমিই হলে 'রণাগ্রভট' (সেনাপতি)। 'সুক্কিনুড়ে' (নারকেলের নাড়ু)—এ সমস্ত হল শ্রাদ্ধের জন্য, বিয়ের জন্য নয়। পূরণপুরীই হোক কিংবা চিলুবে নাড়ুই হোক, খুব ধূমধাম করে করব—পড়ুমুনূরুবাসীদের সামনে যেন খেলো না হয়ে যাই।'

বারান্দায় নিদ্রিত পার্বতীর কানে ঐতালের কণ্ঠস্বর যেতেই সে ধড়মড় করে উঠে পড়ল। 'ওমা, দীপটা গেল কোথায়? নিভে গেছে নাকি?' এই ভেবে সে উঠে বসলেও তখনও ঘুমের ঘোর কাটেনি তার। ঝিমোতে ঝিমোতে রান্নাঘরে ঢুকে দেশালাইর বাক্সটা খুঁজতে লাগল। উনুনের চারপাশে এবং মাচানগুলি খুঁজে খুঁজে নিরাশ হয়ে অবশেষে দরজার মাথায় চৌকাঠের উপর হাত

দিতে বাক্সটা পাওয়া গেল। তার থেকে কাঠি বের করে নিয়ে মেঝেতে ঘষে আগুন জেলে দীপের কাছে এসে ধরল। তৈলবিহীন সেই প্রদীপ আর জ্বলবে মনে হল না। আবার তেলের জন্য ঘুরে ফিরে অন্ধকারে প্রদীপের তেল আধা-আধি মেঝেতে ঢেলে, বাকী অংশ দিয়ে প্রদীপটা স্নান করিয়ে 'আইয়ো! কী পোড়া ঘুম!' এই বলে নিজেকে গালি দিতে দিতে প্রদীপটা জ্বালল।

সেই ঘুমের ঘোরে স্বামীর ও শীনময়্যর কণ্ঠস্বর পার্বতীর কানে গেল। 'পূরণপুরী, চিলুমে নাড়ু.. ধুমধাম করব" এই কথাগুলি শুনে হাই তুলতে তুলতে উঠোনে নেমে পার্বতী সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ঐতাল-শীনময়্যর বেতার বার্তালাপ তখনও চলছে।

পুকুর পাড় থেকে ঐতাল এই বলে একটা হুকুম জারি করল—'তবে ওই কথা রইল। যাও, গিয়ে শুয়ে পড়ো। আমারও হেঁটে হেঁটে বিলক্ষণ ক্লান্তি হয়েছে।'

প্রত্যুত্তরে শীন তার বাড়ির বালিয়াড়ির কোণ থেকে বলল—'ঐতাল মশাই বেশ চালাক লোক বাপু! বিয়েটা স্থির না হওয়া পর্যন্ত কারও কাছে একটি কথাও ফাঁস করেন নি। এখন দেখছি আপনার উঠোনে ছাপরাটা বেশ জম্‌জম্ করছে। তা যাক। লগ্নটা এত তাড়াতাড়ি কেন রেখেছেন? পাঁপড়-বড়া তৈরি করতে হবে না? তার সময় কই?'

ঐতাল—'ওটা এমন কি ভারি কাজ শীন? সরস্বতীকে বললে চট্ করে বানিয়ে ফেলবে। একটা রাতে ও একটা দিনে সব হয়ে যাবে। শুকোবার জন্য রোদের অভাব নেই।'

পুনরায় বেতার মারফত বার্তা এল—'ঐতাল, দেখ কেউ বলতে পারবে না যে এ 'শিবল্লি'-র (=শিবল্লি শ্রেণীর বৈদিক ব্রাহ্মণের) মেয়ে; দেখতে অবিকল 'কোট' পরিবারের (=কোট শ্রেণীর বৈদিক ব্রাহ্মণের) মেয়ে। কপালে 'শিবল্লি' মেয়েদের মতো ওই খাড়া কুঙ্কুম না দিয়ে যদি আড়াআড়ি ভাবে কুঙ্কুম লাগায়, তবে আর কেউ ধরতেই পারবে না যে সে 'কোট' পরিবারের মেয়ে নয়।'

ঐতাল—'আইয়ো শীন, তুমি ভেবেছ বুঝি যে পড়ুমূনূরু গ্রামের মাধপ্পা মশায় শিবল্লি ব্রাহ্মণ? মোটেই নয়। এই মাধপ্পার প্রপিতামহ ছিলেন 'শানাতি'-ব্রাহ্মণ (শানাতি গ্রামের অধিবাসী, কোটশ্রেণীর বৈদিক ব্রাহ্মণ)। তাঁর জন্য

মেয়ে আনা হয়েছিল শিবল্লি গ্রাম থেকে, শিবল্লি শ্রেণীর বৈদিক বামুনের মেয়ে। তারপরে গ্রহের ফেরে তিনি 'শানাতি' ছেড়ে (শানাত্তির বাস তুলে দিয়ে) উঠে এলেন পড়ুমুনূরু গ্রামে। এখানে চারিদিকেই তো শিবল্লী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। কাজেই এই পরিবারের মেয়েরাও কপালে খাড়া কুঙ্কুম রেখা টানে। এরও কপালে তাই, বুঝলে কিনা শীন, কুঙ্কুমের খাড়া টান। পড়ুমুনূরু গ্রামের লোকেরা ওদেরকে কী ব'লে ঠাট্টা করে জানো ? বলে কিনা—কোট-শিবল্লি অর্থাৎ খোটা-শিবল্লি, তার মানে, খাঁটি শিবল্লি নয়। কিন্তু তাতে কী আসে যায় ? বিয়ের সম্বন্ধ হতে বাধা কিসের ? কী বল শীন ?'

শীন—'এ তো সোনার সম্বন্ধ। এ সোনায় খাদ নেই। আপনার খাতিরে, যা হোক, আমারও একটা ভারি সম্মান হল। আপনি হলেন গিয়ে জামাতা, আর আমি জামাতার সহচর। সত্যি বলছি ঐতাল, জীবনে আজ পর্যন্ত আমি এমন ধারার আদর-আপ্যায়ন দেখিনি। সমস্তই যেন সচ্ছল গৃহস্থের মতো। আপনিও দেখছি মাছ দেখে ফাঁদ পাততে খুব হুঁসিয়ার। আপনারও ধরুন বয়স হয়েছে। কনেও পাওয়া গেছে বেশ বয়স্থা, সমানে সমান হবে।...যাক্ সে কথা। গয়না-গাঁটি কতটা দেবে কিছু স্থির হল কি ?'

ঐতাল—'সোনা-গয়না নিয়ে আমি দর-কষাকষি করি নি। ওসব করা আমার ভালোও লাগে না। সোনা দিক-না-দিক, কনেই তো একটি সোনা ভগবানের দয়া হলে, একটা হার হয়ত তারা দেবে। আর খালি হাতে খালি কানে কখনও মেয়েকে পাঠাবে বলে মনে হয় না।'

শীন—'আচ্ছা ঐতাল, আপনার এই দ্বিতীয় দার পরিগ্রহের চিন্তাটা এত বিলম্বে এল কেন ? প্রথম পক্ষে যখন সন্তানাদি হল না, তখনই স্থির না করে এত দীর্ঘকাল পরে...'

ঐতাল—'কেন শীন, এখন কি আমার দাড়ি পেকেছে ? মুখ ফোকলা হয়েছে ? ছাখো শীন, বিবাহে এখনও আমার আগ্রহ নেই। তবে কি না আমাদের সরস্বতী এই কয়েক বছর যাবত 'পুষ্যি নাও, পুষ্যি নাও' বলে জিদ ধরেছে। পুষ্যি নেওয়ার ব্যাপারটা আমার ভালো লাগে না। কার-না-কার ঘরের ফণিমনসার চারা এনে আমার বাড়ির 'কেতকী' করা সম্ভব কি ? ফণিমনসা ফণিমনসাই, কেতকী কেতকীই। অন্তিমকালে মুখে একটু গঙ্গাজল দেওয়ার কথাই যদি ধরো, তবে নিজের ছেলে হলে সে এক কথা। পোষ্যপুত্রের

হাতে যে স্বর্গলাভ হবে তা এমন কিছু নয়। এই সমস্ত সাত-পাঁচ ভেবেই আমার, ধরো, এই চল্লিশ-বিয়াল্লিশ…'

শীন—'আমাদের হংদট্টু গ্রামের ওই যে হনুমৈতাল, ওর যখন তৃতীয়বার বিবাহ হয় তখন তো পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। সেই তৃতীয় পক্ষে তার তিন সন্তান হল। তার সামনের দাঁত পড়েছে এই তো সেদিন। তা না হলে, বিয়াল্লিশ সেরী চালের বস্তা দাঁত দিয়ে কামড়ে তোলার শক্তি এখনও কি নেই?'

ঐতাল—'হনুমৈতাল তো আমাদের আত্মীয়। কিন্তু আমি কি পাল্লা দিতে পারি তাঁর সঙ্গে? হনুমৈতাল যা খান, তার অর্ধেক ভাত খাওয়াও আমার সাধ্যে কুলোবে না।'

শীন—'ঐতাল, আপনার স্ত্রী যে এই বিবাহে সম্মতি দিয়েছে, এটা খুব সুখের কথা।'

ঐতাল—'শীন, আমাদের বাড়ির বিধি ব্যবস্থা তুমি জান না। আমাদের ঘরে একজন কর্তা তো একজনই কর্তা। স্বামী এক কথা বলবে, স্ত্রী বলবে আর এক কথা—এ সব ব্যাপার আজ পর্যন্ত ঘটেনি। আমাদের 'পতুকেরে' গ্রামের 'পরমন' বাড়ির মতো, স্বামী স্ত্রী সারাদিন ঝগড়া করে সারা গ্রামে ঢোল সহরৎ করার মতো রীতিনীতি আমাদের বাড়িতে একেবারেই নেই। ওই একটি বিষয়ে আমাদের পারোতি অবিকল সীতাদেবী। গ্যাখো, কেন জানি না ভগবান ওর কপালে সন্তানের যোগ লেখেন নি। এই একটিমাত্র খুঁত ছাড়া…তা না হলে আমার কিসের অভাব বলো…পরে তুমি দেখতে পাবে—নতুন বৌ ঘরে আসার পরে পার্বতী তাকে নিজের মেয়ের মতো করে দেখবে—তা তুমি দেখে নিও।'

শীন—'যান ঐতাল, শুয়ে পড়ুন গে। নইলে কথায় কথায় ভোর হয়ে যাবে। ভাল কথা, আজ সকালে রোয়ার মাঠে আমার জল সেচার কথা ছিল, আপনার পাল্লায় পড়ে সে সব কথা ভুলেই গেছি। কাল সকালে অন্তত সে কাজটা না করলেই নয়।'

ঐতাল—'শান, রোয়ার মাঠে জল সেচার অছিলায় বেলা করে এসো না যেন। তোমার ভরসায় এক রাশ কাজ পড়ে আছে।'

শীন—'তার জন্য ভাবনা কী? রোদ উঠতেই আপনার বাড়িতে গিয়ে হাজির হব। আপনি এই রাত্রিতেই সব ভেবে-চিন্তে রাখুন—কাকে কাকে নিমন্ত্রণ করা চাই, কুন্দাপুরের হাট থেকে বাকী জিনিসপত্র আনা দরকার, কাপড়-

চোপড় কী কী কিনতে হবে—এই সমস্তের একটা তালিকা করে ফেলুন। সব কিছুই জমকালো রকমের হবে, কোনো ভাবনা নেই।' এই বলে শীন তার বাড়ির মধ্যে চলে গেলে ঐতাল পুকুরে নেমে সন্ধ্যাবন্দনায় রত হল।

উঠোনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পার্বতী সব কথাই শুনতে পেল। ওঁদের এই কথাবার্তা আলাপ আলোচনা শুনে তার চোখের সামনে একটা নতুন জগৎ ভেসে উঠল—একটা বিরাট অজানা জগৎ। প্রথমে সে ভেবেছিল—কার-না-কার বিয়ের ব্যাপার নিয়ে ওরা আলোচনা করছেন। অবশেষে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে বাড়িতে তার সপত্নী আসছে।

মনের গহনে যে সুখদুঃখের তরঙ্গগুলি আবর্তিত হয়ে উঠছে, তারই মধ্যে একটা অদ্ভুত চিন্তা দেখা দিল পার্বতীর। তার জীবনে যে সপত্নীর কাঁটা আসছে সে চিন্তা নয়, সপত্নী কোট না শিবল্লি শ্রেণীর মেয়ে সেই চিন্তা। 'কেন, আমার স্বামী কি খাঁটি কোট পরিবারের মেয়ে পেতে পারেন না? বৈদিক ব্রাহ্মণ হয়ে নেশায় মেতে যারা পাল্‌টি ঘর নয় এখন নিষিদ্ধ শ্রেণীর মেয়ে আনা ঠিক হবে কি? এই কথা ভেবে ভেবে পার্বতীর মন বিচলিত হয়ে উঠছিল। এমন সময়ে তার চিন্তা-সূত্র হঠাৎ ছিন্ন হয়ে গেল স্বামীর একটি কথায়—'বুঝলে শীন, যা দরকার সরস্বতী একটি দিন ও একটি রাত্রির মধ্যে সেই পরিমাণ পাঁপড় বড়া তৈরি করে দিতে পারবে।' পার্বতীর মনে হল—'আইয়ো, সরস্বতীর কথা শুনে আমি মাষকলাই রোদে দিই নি!' ততক্ষণে মনে পড়ল, সরস্বতী ঘরে নেই, বাইরে চলে গেছে। বাড়িতে এই যে নতুন গোলযোগ ঘটে গেল, সে কথাটা গৃহকর্তাকে কী করে বলা হবে চিন্তা করে—পার্বতী সন্ত্রস্ত বোধ করল। তার দেহটা উঠোনে খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে রইল সত্য কিন্তু মনের ভিতর ওলট-পালট চলছিল আষাঢ় মাসের উত্তাল সমুদ্রের মতো। মনে হচ্ছিল তার কানে যেন আষাঢ় মাসের অমাবস্যায় সমুদ্রের জোয়ার উচ্ছ্বসিত হয়ে আসছে। সন্ধ্যা-জপ সেরে ঐতাল পুকুর থেকে এসে সামনে দাঁড়ালেও পার্বতীর কোনো হুঁসই ছিল না সেদিকে।

এই অভূতপূর্ব ব্যাপারে ঐতাল প্রথমটায় চমকিত হল। পরক্ষণেই তার পুরুষ-হৃদয়কে কঠিন করে প্রশ্ন করল—কে? তুমি? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনেছ বোধ করি। মেয়েদের কপালের লেখনই ওই—পুরুষমানুষ কী বলাবলি করে সেই কথা কান খাড়া করে শোনাই তাদের অভ্যাস। কবে যে দূর হবে

তোমার এই জঘন্য মনোবৃত্তি?' এইভাবে স্ত্রীকে শাসিয়ে পা বাড়াতেই সহসা সাপ মাড়াবার মতো ঠাণ্ডা বোধ হল পায়ে। ঘাবড়ে গিয়ে 'ওম্‌মা' বলে আর একদিকে পা রাখলে সেখানেও সেই অবস্থা। 'পক্' করে হাসি এল ঐতালের মুখে। 'উঠোনটা লেপে-পুঁছে বেশ মসৃণ করেছে, অ্যাঁ। তাছাড়া কিছু একটা পাতা-টাতা দিয়ে ঘষেও থাকবে। মাটিটা তাই এত ঠাণ্ডা। যাকগে, একটা তো করেছে।' এই ভেবে অশান্তির মধ্যেও খানিকটা শান্তি পেল ঐতাল।

দাওয়ায় উঠতে গিয়ে ঐতালের মন খুশিতে ভরপুর—'সরস্বতী, তুই হলি একটা দেবী। বেশ খাসা করেছিস উঠোনটাকে।' এই বলে একটা মাদুর হাতে নিল। মেঝের উপর মাদুর বিছাতে বিছাতে ঐতাল বলল—'ক'জন মজুর নিয়ে কাজ করেছিস, সরসোতী? আহা, সমস্ত গা-গতর ভেঙে গুঁড়ো হয়ে থাকবে। যাক্ সে কথা। তুই কোথায় শুয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছিস? আর জেগেই বা থাকবি কোন্ কাজে? থাক্, শুয়ে থাক্। আহা সারাদিনের খাটুনি।' এইভাবে বোনকে কিছু মিষ্টি কথা শোনাল ঐতাল।

পার্বতীর তখন মনে হল—সরস্বতীর বৃত্তান্তটা অবিলম্বে স্বামীকে জানানো উচিত। স্বামী যেখানে মাদুর বিছিয়ে শুয়েছেন, ধীর পদক্ষেপে পার্বতী সেখানে এসে দাঁড়াল। পায়ের শব্দ শুনে ঐতাল ধমক দিয়ে বলল—'কে? তুমি? বারান্দায় একটা প্রদীপ জ্বেলে রাখতে পারনি?' পার্বতী তাড়াতাড়ি ভিতরের ঘর থেকে প্রদীপটা এনে বারান্দায় রেখে দিতে ঐতাল বলে উঠল—এখন কোন্ কম্মে এই আলো? আমি মাদুর পেতে শুয়ে পড়েছি, তার পরে? যত সব নি-ভাতিয়ার আচার।' (অর্থাৎ ভাত খাওয়া হয়ে গেলে যে আচার নিয়ে আসে)

ক্ষুব্ধচিত্তে পার্বতী ফিরে এসে প্রদীপটাকে দূরে সরিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগল। স্ত্রীর ভাব গতিক বুঝতে পেরে ঐতাল বলল—'এঃ, তোমার মর্যাদায় আঘাতটা একটু বেশিই দিয়েছি বোধ হচ্ছে। তুমি যে পুরুষদের কথায় আড়ি পাত, সেটা কিছু দোষের নয়। আমি একটু কথা বললেই সেটা বেশি হয়ে যায়। বাবাঃ, এ বাড়িতে একবার কথা বললে কারও কানে ঢোকে না, দ্বিতীয়বার বললে বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। কী করব বাপু?' মৃদুকণ্ঠে পার্বতী বলল—'আমি তো তার জন্য কিছু বলিনি।' ঐতাল

বিদ্রূপ করে বলে উঠল—'তুমি কিসের জন্য কী কথা বলিতেছ মহারানী? হেঁটে হেঁটে আমার পায়ে খিল ধরে গেছে, ঠ্যাং দুটো ব্যথায় টন্ টন্ করছে! ঘুমে চোখ ভেঙে আসছে। শুধু কি তাই? কাল সকাল সকাল উঠতে হবে। হাজারো কাজ পড়ে আছে। তোমার তো এক তামাসা।'

স্বামীর এই মাথা মুণ্ডুহীন কথাবার্তা শুনে পার্বতী একটু শক্ত হল। তার কোনো দোষ নেই, তবু তার উপর স্বামী অকারণ রুষ্ট হয়েছেন বুঝতে পেরে পার্বতী কিছুটা রুক্ষ কণ্ঠে বলল—'আমি কোনো উপকার চাই না। আপনি আপনার বোনের কথা তুলেছেন, পাঁপড়-বড়ার কথা বলেছেন। সেই কথা বলতে এসেছি।'

'কী বললে? তোমাদের দিয়ে পাঁপড়-বড়া হবে না—সেই কথাটা বলতে এসেছ নাকি? যাক গে। সব কিছুই অন্য বাড়ি থেকে বানিয়ে আনতে হবে, তাই নয় কি? যাও শোও গে।'

'আপনি আমাদের বিষয়ে কী ভাবেন জানি না। তার জন্য যখন তখন যা খুশি বলছেন। উঠোনের কাজকর্ম শেষ করে ঠাকুরঝি সন্ধ্যার সময় মংদর্তি চলে গেল। বলে গেছে দরকার হলে খবর দিতে।' এই সংবাদটুকু জানিয়ে পার্বতী আর সেখানে দাঁড়াল না। পাছে আর এক প্রস্থ রামায়ণ হয় এই আশঙ্কায় সে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

ঐতাল খুব ঘাবড়ে গেল! বুঝতে পারল বাড়িতে একটা কিছু বিপর্যয় ঘটে গেছে, যার ফলে সরস্বতী রাগ করে শ্বশুরবাড়ি চলে গেছে। ঐতাল বেশ ভালভাবেই জানে যে, সরস্বতী না থাকলে বাড়ির কোনো কাজকর্মই ঠিক মতো হবে না। কাজেই খুব বিচলিত হয়ে স্ত্রীকে ডাক দিল—'শুনছ?' পার্বতী কোনো সাড়া না দেওয়াতে বা স্বামীর কাছে না আসাতে ঐতাল বলল—'তোমাদের নিয়ে সকলকে জোর করে ধরে বেঁধে—কিভাবে সংসার করব?' এই বলে সে বিছানা থেকে উঠে পার্বতী যেখানে শুয়েছিল, সেখানে গিয়ে হাজির হল। বলল—'আধাআধি কথা বলে আমাকে মিছিমিছি উদ্বিগ্ন কোরো না। তুমি 'সু' বললেই সেটা যে 'সুক্কিসুংড়ে' (নারকেলের তৈরি নাড়ু) একথা বোঝার মতো সামর্থ্য আমার নেই। সরস্বতী কেন চলে গেল? কী হয়েছিল তার? বাড়িতে কোনো ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে না কি? আমি এক দণ্ডের জন্য বাইরে গেলে এই বাড়ির হাল কেমন হয় এখন তা বুঝতে পারছি।'

'আমরা কোনো ঝগড়া করি নি। সংসারে যা কিছু ঘটুক, আপনি আমাদের দোষী ঠাওরান।'

'তোমরা দোষী? তোমরা হলে গৌরবস্থ, পুণ্যাত্মা! পাপী তো আমি, দোষ যত আমার। হল ত? হয়েছেটা কি এবার সেই কথা বল মহারানী।'

'কিছুই হয় নি। ছাপরার কথা বলেছিলেন, উঠোনটাকে লেপে-পুঁছে রাখতে হবে বলেছিলেন। কিন্তু কেন, কিসের জন্য সেকথা বলেন নি। ঠাকুরঝি বলছিল—'বাড়িতে কেবল খাটুনির জন্যই আমার দরকার, গাধার কাজের জন্য দরকার। কী, কেন সে কথা জানাবার জন্য দরকার নেই।' এই বলে সে রাগ করে চলে গেল। যেভাবে গেল তাতে স্বেচ্ছায় শীগগির ফিরবে বলে মনে হয় না তিনটে রাত দুচোখের পাতা এক করে নি।...'এ বাড়িতে আমি একটা জঞ্জাল'...এই বলে কেঁদে কেটে চলে গেল।'

সমস্ত বলে কয়ে পার্বতীও যেন দুঃখের রেখা টেনে নিয়ে, কান্না জুড়ে দিল। কিন্তু সেদিকে মনোযোগ দেওয়ার মতো ধৈর্য ঐতালের নেই। এই মুহূর্তে সে কী করবে তাও সে বুঝতে পারল না। বোন ছাড়া তার সংসার অচল একথা সে জানে। সরস্বতী যে রাগ করে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে এ সংবাদ যদি একবার গ্রামের লোক টের পায়, গ্রামের মধ্যেও ভারি গোলমাল উঠবে। এই কিছুক্ষণ আগেই সে শীনময়্যর কাছে এই বলে দর্প প্রকাশ করছিল যে এ বাড়িতে পুরুষমানুষই সর্বময় কর্তা। কথাটা তার মনে পড়ে গেল।

মনের মধ্যে যখন এই সমস্ত চিন্তা ভাবনার আলোড়ন, তখন পার্বতীর কান্না শুনে ঐতাল আর থাকতে পারল না, বলল—'মহারানী, তুমিও যদি ফোঁস ফোঁস করতে থাক, আমি তাহলে কি করি? সরস্বতী যে চলে গেছে আমার পক্ষে যেন সেটাই যথেষ্ট উদ্বেগের ব্যাপার নয়, তাই তুমিও আবার ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ শুরু করলে।' এই বলে সে তার শয়নঘরে এল, কিন্তু সেখানে বসে থাকার মতো মনের অবস্থা নয়। 'থুঃ, আগুন লাগুক এই সংসারে' এই বলে ঘরের পিছনে গিয়ে অন্ধকারেই কতগুলি নারকেল পাতার বাইল খুঁজে পেতে উঠোনে বসে সেগুলিকে মশালের মতো জড়িয়ে-পেঁচিয়ে পার্বতীর শয়নস্থলে এসে দেরখো-প্রদীপ থেকে একটা মশাল ধরিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বলল—'আমি মংদর্তি ঘুরে আসি। অন্তত সেই সময়টা পর্যন্ত তোমার গান বন্ধ রাখ।

সকলে মিলে আমার মান সম্মান খোয়াবে—অমন কাজটি কোরো না, দোহাই তোমাদের।' এই বলে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

লম্বা লম্বা পা ফেলে ঐতাল হন হন করে হেঁটে চলল। মশালধরা হাত দুটো 'রপ রপ' করে দুলতে লাগল।

এই দুপুর রাতে স্বামীর বেরিয়ে যাওয়ার পরে পার্বতী তার নিজের দুঃখ সামলে নিয়ে ভাবতে বসল—'ঈশ্বর জানে, এখন উনি গিয়ে কী বলবেন, ঠাকুরঝিই বা কি জবাব দেবে। উনি যদি রাগারাগি করেন, আর ঠাকুরঝিও যদি জিদ ধরে বসে, তবে এ জন্মে আর ভাই বোনে মিল হবে না। কী করবেন উনি কে জানে?' অনেকক্ষণ ধরে এই চিন্তার পরে বিরক্ত হয়ে মনে মনে বলল—'আমি কী করব? উপরওয়ালা যা ভেবে রেখেছেন, তাই হবে।' এই বলে উদাসীন মনে প্রদীপ নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাদুরে এপাশ ওপাশ করেও ঘুম তার কিছুতেই এল না।

ওদিকে ঐতাল মাঠের পরে মাঠ পেরিয়ে এগিয়ে চলল। সারাটা পথ কুকুরের চিৎকার ধ্বনির মধ্য দিয়ে বারকুড়ি গ্রামের সীমান্তে এসে সামনের টিলার পথ ধরে একটা বনের প্রান্তে এসে পৌঁছল। ছয় দণ্ডে সাড়ে চার ক্রোশ পথ অতিক্রম করে যখন সে সরস্বতীর শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছল, তখন মশালের আলো দেখে এবং আগন্তুকের পদশব্দে সেই বাড়ির কুকুরগুলিও তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল। ঐতাল মনে মনে কুকুরগুলি অভিশাপ দিয়ে বলল—'এগুলোর কী গ্রহের ফের দ্যাখো দিকি!' পরে বাড়ির সদর দরজায় করাঘাত হতে কে একজন প্রদীপ জেলে 'এত রাতে কে এল ব্যাপার কী' জানবার জন্য বাইরের দরজা খুলে দিল। ঐতালের আগমন বার্তা শুনে বাড়ির মধ্যে একটা জটলা বসে গেল। ঐতাল কিন্তু সহজভাবে কথা না বলে জানিয়ে দিল যে আগামী এক বিবাহের নিমন্ত্রণের ব্যাপারে এই অপরাত্রিতেই তাকে আসতে হয়েছে। তারপরে সরস্বতীকে নানা মিষ্টি কথায় তুষ্ট করে পুনরায় নিশাচরের মতো ভাই বোনে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ি না আসা পর্যন্ত সরস্বতীর মুখ দিয়ে একটি কথাও বের হল না। সারাটা পথ ঐতাল একাই কথা বলছিল। এ পর্যন্ত একটা কথাও না জানিয়ে ঐতাল যে ভুল করেছিল, সেই ভুলেরই প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এখন যা ঘটেছে, যা ঘটেনি এমন সব সত্যমিথ্যা মিলিয়ে একখানা মহাভারত বানিয়ে ফেলল। সরস্বতী তার কতটা বুঝল

আর কতটা বুঝল না ঈশ্বর জানেন। তবে এই একটা শান্তি তার মনে এসে থাকবে যে দাদার সব ফাঁকা দেমাক অন্তত একবারের জন্য হলেও আক্কেল সেলামী দিয়েছে।

যখন তারা বাড়ির সামনে এসে পৌঁছল, তখন সুরোদের বাড়ির মুর্গীগুলো ডেকে উঠেছে। পিছনে তাকিয়ে সরস্বতী দেখল আকাশের শুকতারা অনেক উপরে উঠে এসেছে। দুজনেই পুকুরঘাটে নেমে পা ধুয়ে নিল। ঐতাল বলল—'হেঁটে হেঁটে আজ প্রাণটা গেল। অন্তত একদণ্ডের জন্যও একটু ঘুমোতে পারলে ভালো হত।'

'তুমি শুয়ে পড়ো, দাদা...'

'তুই এই অন্ধকারে বসে কী করবি ?'

'অন্ধকার কোথায় ? মুর্গীর ডাক শুনলে না ? শুকতারাও উঠে গেছে। ভোরবেলা কী কী কাজ করতে হবে তাই দেখছি।'

পার্বতীর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। সরস্বতীর কণ্ঠস্বরে পার্বতীর মনে শতগুণ উৎসাহ জন্মাল। মনে মনে সে বলল—'ভগবান তাহলে আমাদের ত্যাগ করেন নি।' তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে সরস্বতীর সঙ্গে দেখা করার জন্য বাইরে পা বাড়াল কিন্তু গতরাত্রির কথা মনে হতে—'না, পুরুষের কথায় কান দিতে নেই' এই ভেবে পুনরায় সে 'খট্' করে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

পার্বতীর শয়নস্থলে এসে সরস্বতী ডাক দিল—'পারোতি কি এখনও ঘুমুচ্ছ ?' সরস্বতীর ডাকে পার্বতী এবারে উঠে বসল।

ছয়

প্রায় পনেরো দিনের জন্য রাম ঐতালের গৃহ যেন একটি ধর্মশালা হয়ে উঠল। লোকজনের আনাগোনা, কোলাহল, দীয়তাং ভুজ্যতাং—এই সমস্ত কারণে কানে তালা লাগার যোগাড়। বিয়ে বাড়ির সমস্ত কর্তৃত্ব প্রতিবেশী শীনময়্যর হাতে। পূর্বদিন রাত্রি দ্বিপ্রহরে সে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেই মতো রোয়ার মাঠে জল দিয়ে ভোরবেলাতেই ঐতালের গৃহে এসে হাজির হল। কথায় বলে না—'গর্ভনির্ভেদকারী'? শীনময়্য মুখ খুললে তার গলার আওয়াজ অনেকটা সেই রকম শোনায়। তার গিন্নীও কর্তার সঙ্গে এসে উপস্থিত। যেমন কর্তা তেমনি গিন্নী। ফিস্ ফিস্ করে কথা বললেও তার গলা শোনা যায় তিন শ' গজ দূর থেকে। শীনময়্যদের কথা বলার ধরনধারণই এমনি যে তাদের আওয়াজের কাছে সমুদ্রগর্জনও হার মেনে যায়। ঐতালের গৃহ লোকজনে পূর্ণ হওয়ায় শোরগোল হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু শীনময়্যদের মতো কেবল আট-দশজন লোকের হাঁকডাকে পথচারীদের ধারণা হল বোধ করি হাজারখানেক লোক এসে জড়ো হয়েছে।

বিবাহের আর বাকী মাত্র চার দিন। দূরবর্তী আত্মীয়দের নিমন্ত্রণের জন্য শীনময়্য অথবা অন্য কোনো ব্যক্তিকে পাঠানো চলে। কিন্তু খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের বাড়িতে, যজমান-শিষ্যদের গৃহে নিমন্ত্রণ করতে কে যাবে? বাড়িতে দ্বিতীয় পুরুষ না থাকার ফলে শীনময়্যকে সব দায়িত্ব সঁপে দিলেও আপন লোকের নিমন্ত্রণের জন্য বাইরের লোক পাঠানো উচিত নয়। কিন্তু এটাও একটা লজ্জার কথা যে বর নিজেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে তার বিয়ের নিমন্ত্রণ জানিয়ে আসবে। অবশ্য একথা সত্য যে ঐতালের আসন্ন বিবাহের খবরটা ইতিমধ্যেই জানাজানি হয়ে গেছে। ছাপরা তৈরির জাকজমক দেখে গ্রামবাসীদের এমনিতেই সন্দেহ হয়েছিল। তার পরে সেই রাত্রিতে শীন-ঐতালের সুউচ্চ কণ্ঠে বেতার-বার্তা-বিনিময়ের দরুন 'ঐতালের নাকি দ্বিতীয় বিবাহ'—এই সংবাদটা হাওয়ায় ভেসে গিয়ে পশ্চিমঘাট থেকে পূর্বঘাট পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। কাজেই আত্মীয় কুটুমদের বাড়িতে গিয়ে ঐতালকে আর মুখ ফুটে নিজের বিয়ের কথাটা বলতে হবে না। হাতে অক্ষতের থালা (হরিদ্রা-কুঙ্কুম মিশ্রিত আতপ চালের থালা) নিয়ে গিয়ে

দাঁড়ালেই হল।'[1] নিমন্ত্রণের বাকী অংশটুকু তাঁরাই পূরণ করে দিয়ে বলবেন—'ওহে ঐতাল, সবই আমরা অবগত আছি। নিশ্চয়ই যাব। কোন্ লগ্নে বিবাহ কেবল সেইটুকু বলে দিয়ে যাও।'

নিমন্ত্রণের কাজে বেরিয়ে ঐতাল যেখানে যেখানে গেল সর্বত্রই তার আদর অভ্যর্থনা। সময় সংক্ষেপ বলে কোথাও গিয়ে বেশিক্ষণ গল্পগুজবের অবকাশ না থাকলেও ঐতাল যেন দ্বিতীয় বিয়ের জন্য নিজের ভিতরকার অস্বস্তিটা দূর করে দিচ্ছে এইভাবে কৈফিয়ৎ দেওয়ার সুরে কথা শুরু করে দিত—'আমার তেমন একটা ইচ্ছা ছিল না। তবে কি না বলে—অপুত্রস্য গতির্নাস্তি। তাছাড়া আমার ছোট বোন—ওই যে সরস্বতী—বড় পীড়াপীড়ি শুরু করে দিল। তার উপর আবার পার্বতীও জিদ ধরল...' এইভাবে ধানাই-পানাই করে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহের যৌক্তিকতা বুঝিয়ে দিত। ঐতালের ভাবী শ্বশুরবাড়ি পড়ুমুন্নুরু খানিকটা দূরবর্তী বলে ঐতাল কন্যাপক্ষের যথাসম্ভব বিশদ বিবরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করত যে কন্যাপক্ষ ও ঐতালদের মধ্যে একটা দূর সম্পর্কও রয়েছে। 'ওঁরাও আমাদেরই মতো কোট শ্রেণীর বৈদিক ব্রাহ্মণ। থাকেন মাত্র শিবল্লি ব্রাহ্মণসমাজে, এই যা। ওঁদের বাড়িতে কী আচার নিষ্ঠা জানেন? তার পরে, ভগবানের দয়ায় খুব সচ্ছল পরিবার। নারকেল গাছ, হোন্নে গাছ, আম কাঁঠালের বাগান যে কত তার লেখাজোখা নেই। ওই শুনতেই যা পড়ুমুন্নুরু, কিন্তু সুযোগ সুবিধার দিক থেকে পূব পরগণার গ্রাম বললেই হয়।'

যে সমস্ত বাড়িতে ঐতাল নিমন্ত্রণ করতে গেল, তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন। ঐতালের প্রথম বিবাহের কথা এখনও তাঁদের মনে আছে। তাঁরা বললেন—'ওহে রাম, তোমার বাবা তোমার প্রথম বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলেন জ্যৈষ্ঠ মাসে, যাতে বর্ষার দৌরাত্ম্যে কেউ বিয়েতে না যায়। আর আমাদের মতো অশক্ত অক্ষম বৃদ্ধেরা যাতে না যেতে পারি, তাই তোমার দ্বিতীয় বিয়েটা স্থির করেছ কি না—কোথায় বড়পাণ্ডেশ্বর, কোথায় পড়ুমুন্নুরু—সেই অঞ্চলে।' ঐতালও মিষ্টি কথায় কিছু পিছিয়ে রইল না—'ছি ছি, আপনাদের পক্ষে ওটা এমন কী দূর? এখানে নৌকায় উঠে বসবেন তো বাতাসের এক ফুঁয়ে

[1] সামাজিক নিয়ম এই যে নিমন্ত্রণকর্তা অক্ষতের থালা নিয়ে কিছু চাল নিমন্ত্রিতের গৃহের প্রবেশদ্বারে এবং কিছু চাল গৃহকর্তার হাতে দেবে।

নৌকা গিয়ে হাজির হবে তোন্‌সেতে। আর তোন্‌সে থেকে মাত্র চার পা বাড়ালেই পড়ুমুদ্রুরু। দূরে টুরে এই সমস্ত অজুহাতের কথা বলে কেউ রেহাই পাবেন না।'

সকালবেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে যেন একটা ভূ-প্রদক্ষিণ শেষ করে ঐতাল ফিরে এল সন্ধ্যার দিকে। ঐতাল বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই চারটে বড় বড় খালি বস্তা মাথায় চাপিয়ে শীনময়্য কুন্দাপুরে শনিবারের হাট করবার জন্য পদব্রজে রওনা হয়ে যায়। সন্ধ্যা নাগাদ কুন্দাপুরের হাট থেকে মিষ্টি আলু, তেঁতুল, শুকনো লঙ্কা এবং আরও সব কী কী জিনিস গোরুর গাড়িতে বোঝাই করে যখন সে 'হংগারকট্টে' বন্দরে এসে পৌঁছয়, রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। সেখান থেকে নৌকায় করে ঐতালের বাড়ির কাছে এসে 'এই সুরো, এই কালো...' এইভাবে যার যার বাড়িতে নিদ্রিত সকলকে চিৎকার করে জাগিয়ে হাটের জিনিসগুলি যখন ঐতালের ছাপরায় এনে হাজির করাল, ততক্ষণে পূর্ব আকাশে ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। 'ঘুম না হল তো বয়ে গেল। একদণ্ড শুয়ে আর কী হবে?' এই ভেবে শীন ঐতালের সঙ্গে গল্পগুজব জুড়ে দিল। গল্পের বিষয়—প্রথমেই হাট করার কৃতিত্ব; এক টাকার জিনিস কেমন আট আনায় কিনেছে সেই সব কথা; তারপরে সেই যাচ্ছেতাই গোরুর গাড়ির কথা যার বলদ দুটো আগাগোড়া পথে লেংড়াতে লেংড়াতে চলেছে; সর্বশেষ 'হংগারকট্টে' বন্দরে এসে একখানা নৌকাও না পেয়ে সে কীভাবে দোহাই পেড়ে গলা ভেঙে অতিকষ্টে নৌকার ব্যবস্থা করেছে সেই বৃত্তান্ত। সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে বর্ণনা করার পর বলল—'কোথায় কোথায় নিমন্ত্রণ সারা হল? আমাকে কোন্ কোন্ দিকে যেতে হবে? আমি বলি কি, মুনূরু, পডকেরে, কৌস্তি, কণ্যান—মোট কথা সাগর-ঘেঁষা গ্রামগুলির নিমন্ত্রণের ভার আমার উপর থাক। ভোরবেলায় বেরিয়ে গিয়ে সব শেষ করে ঠিক মধ্যাহ্নভোজনে এসে হাজির হব'—এই বলে শীনময়্য রাম ঐতালকে অভয় দিল।

নিজের ঘুম তো নষ্ট হয়েছেই, কেবল তাতে তৃপ্ত না হয়ে শীন এবার সরস্বতীকে ডেকে জাগিয়ে বলল—'সরস্বতী মা, পাঁপড় বড়ার কথাটা মনে আছে ত? তা কমপক্ষে এক হাজার পাঁপড় দরকার হবে। অবশ্য বরপক্ষের খরচ কখনই বেশি নয়। কিন্তু একটা 'সমাবর্তনে', একটা 'আরতি অক্ষতে'—এই সব কথা যখন করবেন বলেছেন, তখন ছয় শো পাত কি না পড়ে পারে? আসল বিয়েটা

হবে পড়ুমুনূরু। অতদূর পর্যন্ত বেশি লোক না গেলেও এখানকার উৎসবে ভোজে কেউ না এসে থাকবে না। দুটো বড় ভোজ, তাছাড়া আছে রোজকার খাওয়া। ঐতালের বাড়ি বলে আত্মীয়-কুটুমের পিঁপড়ের সার পড়ে যাবে।'

সরস্বতী বলল—'চিঁড়ে আর মাষকলাই গুঁড়ো তৈরি হয়ে গেছে। পাঁপড়-গুলিকে বেলে, বড়া দিয়ে সন্ধ্যার মধ্যে সব শেষ করে ফেলব। এ আর এমন কী মহাকাজ!' শীনময়্য বলল—'দেখুন ঐতাল, আপনার বোন একাই একশ।' এইভাবে মুখের আপ্যায়ন শুরু করলে সরস্বতী সুযোগ বুঝে বলল—'শীনময়্য, দাদাকে জিজ্ঞেস করুন নতুন বৌ-এর জন্য সোনা গয়নার কথা কিছু ভেবেছে কি না। আমরা জানতে চাইলে বলে দেবে স্ত্রীলোকের অনধিকার চর্চা। কনের বাড়ি থেকে গয়না পত্র যা-ই দিক না কেন, আমাদের এখান থেকে একজোড়া বালা, একটা 'কনিমনি' (আয়ুষ্মতী রমণীর পরিধেয় অলংকার বিশেষ), একটা পেন্‌ডেন্ ('তালিবোট্টু') একছড়া মটরমালা—এটুকু কি দিতে হবে না? বিয়ের বাকী তো মাত্র তিন দিন, ওগুলি কি গড়াতে হবে না?'

শীন—'হ্যাঁ সরস্বতী মা, আমাদের পুরুষদের মাথায় এই সমস্ত ব্যাপার ঢুকতে একটু দেরী লাগে। ঐতাল মশায়, খালি হাতে যাওয়া আমাদের মর্যাদার পক্ষে মোটেই ঠিক হবে না। সরস্বতী মা যা বলেছে, অন্তত ওইটুকু সোনা নিয়ে যাওয়া উচিত—'কনিমনি', 'তালিবোট্টু' (পেন্‌ডেন্ ', একজোড়া বালা, একছড়া মটরমালা এটুকু অন্তত চাই, নিশ্চয়ই চাই, নিশ্চয়ই...'

ঐতাল বলল—'ওহে শীন, আমাদের সরস্বতী যা ভেবেছে অতটা বেওকুফ আমি নই। কাল যখন নিমন্ত্রণে বেরিয়েছিলাম তখনই আমাদের স্যাকরাকে ধরে সোনা কিনে দিয়ে পরশু দুপুরের মধ্যে গয়না তৈরি করতে চাই এমন তাগিদ দিয়ে এসেছি।'

সরস্বতী—'দেখুন শীনময়্য, আমার দাদা ঘরের মেয়েদের কাছে একটা খবরও জানাতে চায় না।'

ঐতাল—'তুই বাজে বকিস্‌নে সরস্বতী। কথা বলতে বলতে, কাজ করতে করতে ফুরসুৎ মেলে তবেই তো। তোকে মংদর্তি থেকে নিয়ে এসে স্নান সেরে বেরিয়ে পড়লাম। এই সব গপ্পো করার সময় কোথায় বল দেখি। কোন্‌টা দরকারী, কোন্‌টা অদরকারী, কোন্‌টা স্থূল, কোন্‌টা সূক্ষ্ম সে জ্ঞান যদি তোদের না থাকে তবে আমি কী করব?'

সরস্বতী—'যাক, তা যেন হল। এর জন্য কী করলে ?'

ঐতাল—'কার জন্য ?'

সরস্বতী—'আমাদের পারোতির কথা বলছি। বিয়েতে ও যাবে কি যাবে না ?'

ঐতাল—'এটা কী রকম কথা বললি ? আমি কি পার্বতীকে স্নেহ করি না বলে আর একটা বিয়ে করতে চাই ? ভগবান একটা ছেলে সন্তান দিলে মরার পরে আমিও একটা পিণ্ড পাব, পারোতিও একটা পিণ্ড পাবে। আমি যখন এইসব আশা করে...'

সরস্বতী—'আমি সেকথা বলিনি। সে যদি বিয়ে বাড়িতে যায়, তবে খালি হাতে, খালি গলায় যাওয়া সম্ভব কি ? তুমি ওর জন্য কী গয়না গড়িয়েছ বল। নতুন বৌ-র জন্য যা গড়াতে দিয়েছ, তার অর্ধেকও অন্তত পারোতির জন্য গড়ানো উচিত না কি ? কনে পক্ষের এয়োরা কি দেখবে না পারোতির গায়ে কোনো কিছু গয়নাগাটি আছে কি নেই ?'

ঐতাল—'সরসোতি, পারোতির জন্য গয়না গড়াব না, গড়ানো উচিত নয় এসব কথা আমি কখনো ভাবিনি। কিন্তু তার জন্য একটা সময়-গময় চাই তো ? কি না ? বিয়ের আর বাকী আছে মাত্র দুদিন। এই সময়ের মধ্যে...'

শীনময়্য—'তা ঠিক, তা ঠিক। ও সব পরে করলেও হবে। এখন সবচেয়ে দরকারী বিষয় হল নববধূর অলঙ্কারপত্র তৈরি রাখা। বাকী সব ধীরে সুস্থে করা যাবে।'

সরস্বতী—'পরে কখনও কিছু করলেও যা, না করলেও তাই। আজ পর্যন্ত পারোতি কখনও সোনা-গয়না চায়নি। এখনও বলেনি। কিন্তু আমাদের তো বোঝা উচিত।'

ঐতাল—'আচ্ছা সরসোতী, আমি হোল্লাদের বাড়ি থেকে দু'দিনের জন্য কিছু স্বর্ণালঙ্কার চেয়ে আনি, তাহলে হবে ত ?'

সরস্বতী—'হ্যাঁ সেখানে যারা বিয়েতে আসবে—গয়নাগুলো নতুন না পুরোনো একথা বোঝার মতো চোখ তাদের নেই!'

সরস্বতীর সঙ্গে তর্কে এঁটে ওঠা ঐতালের পক্ষে সম্ভব হল না। নতুন শ্বশুর-বাড়িতে মান-সম্ভ্রম বৃদ্ধির জন্য যেটুকু করা প্রয়োজন সেটুকু আড়ম্বর দেখাতে ঐতাল প্রস্তুত, কিন্তু তার জন্য বেশি খরচ-বরচের মধ্যে যেতে সে আদৌ সম্মত নয়।

কতগুলো টাকা পয়সা খরচ করে এখন পার্বতীর গায়ে গয়না চড়ালেও যা, না চড়ালেও তাই। কিন্তু সরস্বতীর সামনে কথাটা মুখ ফুটে বলার মতো সাহস তার নেই। কারণ সে জানে সরস্বতী বেঁকে বসলে এ বাড়ির গৃহস্থালীর কাজকর্ম সব বানচাল হয়ে যাবে। ঐতাল তাই কী বলবে ভেবে না পেয়ে অসহায় দৃষ্টিতে শীনময়্যের মুখের দিকে চেয়ে রইল। কখন কী কথা কী ভাবে বলতে হয় শীন এ বিষয়ে সুচতুর। উভয় দিকের তুষ্টিবিধানের জন্য সে একটা প্রস্তাব করল— আচ্ছা ঐতাল, একটা কাজ করলে কেমন হয়? হোল্লাদের বাড়িতে গিয়ে আপনি আবশ্যকমতো গয়না নিয়ে আসুন। এনে সেই স্যাকরার পো-কে দিয়ে নতুনের মতো পালিশ করিয়ে নিন।'

সরস্বতী বলল—'ধার করা গয়না আবার দুদিন পরে ফেরত দিতে হবে না?' সরস্বতীর দিক থেকে এই আপত্তি উঠতেই শীন জবাব দিল—'বিয়ের পরে বর্ষাকাল আসবে। তখন স্যাকরার হাতে কোনো কাজ নেই। চার ভরি সোনা কিনে দিলে সে বসে বসে হাতুড়ি পেটাতে পারবে। দুটো দিনের উপায় আমি বলে দিলুম। এখন যা হয় করুন।'

সরস্বতী মনে মনে বিরক্ত হয়ে ভাবল এই খেঁকশিয়াল শিরোমণির সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। আর কিছু না বলে চুপচাপ সে নিজের কাজে বাড়ির ভিতরে গেল। শীন বলল—'ঐতাল ভোর তো হয়ে গেল। আসুন, এখন আম্রপত্র সেবন করা যাক (দাঁত মাজা যাক)। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে খানিকটা মুগের জল পান করে দরকারী কাজে হাত দিন।'

ঐতাল হেসে বলল—'যাই করো না কেন শীন, বিয়ের চারটে দিন আমার কাছ ছাড়া হোয়ো না বাপু। সরস্বতীকে বলে আমি তোমার জন্য মুগের জল নয় চিঁড়ে-দইর ব্যবস্থা করছি।' সরস্বতীর বাধা ও আপত্তিগুলিকে খণ্ডন করে শীনময়্য যেভাবে ঐতালকে রক্ষা করেছে তাতে তার মন খুশি না হয়ে পারল না। বুঝতে পারল যে, কাজে-কর্মে বিপদে-আপদে হাল ধরার পক্ষে শীনই উপযুক্ত ব্যক্তি।

চিঁড়ে-দই কথাটা শোনামাত্রই শীন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বলল—'কাল সারাটা দিন পুরো রোদের মধ্যে হেঁটে হেঁটে জল খেয়েই পেট ভরেছি। এখন চিঁড়ে দই দিয়ে পেট ঠাণ্ডা করলে আর এক প্রহর পরে মুগডাল গুড় দিলেই হল। মুগের জল, দেখুন, গরমের দিনে যেন অমৃত।' অতঃপর তারা প্রাতঃকৃত্যাদির জন্য বেরিয়ে গেল।

তিন দিন পরে বিবাহ। চতুর্থ দিন সকালবেলায় 'সমাবর্তনে'র (বরপূজার) আয়োজন। প্রৌঢ় রাম ঐতাল পদভূষণ থেকে কর্ণকুণ্ডল পর্যন্ত সমস্ত অলঙ্কার পরিধান করে, গায়ে চাদর জড়িয়ে, হাতে তালপাতার পাখা নিয়ে যখন বরবেশে দাঁড়াল, তখন রান্নাঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে নিস্পলক দৃষ্টিতে পার্বতী তার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল। সেই দৃষ্টির মর্ম বলে বোঝানো শক্ত।

পার্বতীর মনে পড়ে তার নিজের বিবাহ ও 'নান্দি' দিনগুলির কথা। প্রায় বিশ বছর আগে একজন অল্পবয়সী যুবক ভীষণ ঝড় বৃষ্টির মধ্যে পাল্‌কি চড়ে তাদের বাড়ির বারান্দায় এসে উঠেছিল—সে-ও এই সাজে। সেই দুর্দিনে যখন বিবাহের আসরে কোথাও একটু দাঁড়াবার ঠাঁই ছিল, পার্বতী তখন সকলের অলক্ষিতে স্বামীর মুখখানা একবার দেখে নিয়েছিল মনে পড়ে। তারপরে পার্বতীর পতিগৃহে আসার স্মৃতি, তারও পরে বছরের পর বছর ধরে তার অন্তরে সুপ্ত মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা, অবশেষে নিদারুণ বেদনাময় অনুভূতি যে সে বন্ধ্যা নারী —সন্তানের মা হওয়ার কোনো আশাই তার নেই—এইভাবে একের পর এক স্মৃতি ঢেউএর মতো তার মনে ওঠানামা করে। বাড়িতে সপত্নী আসবে তাতে পার্বতীর সুখ কিসের? দুই সপত্নীর মধ্যে ঝগড়া কলহ হবে না কি? সে নিজে যতই ধৈর্যের সঙ্গে অবহেলা অনাদর সহ্য করুক না কেন, নববধূ এসে যে তাকে বড় বোন বলে সম্মানের চোখে দেখবে তার ভরসা কী? স্বামীর সমস্ত প্রীতি ভালোবাসা পার্বতীর উপর থেকে সরে গিয়ে সপত্নীকেই আশ্রয় করবে না কি?

এই সমস্ত দুশ্চিন্তার সমাধান কি? মৃত্যুর পরে তার জন্য তিলতর্পণ দেওয়ার মতো গৃহে এক শিশুপুত্র জন্মাবে—এই কি? স্বামীর পক্ষে কথাটা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। নববধূর গর্ভজাত শিশুপুত্র তার স্বামীর রক্তসম্বন্ধী সন্দেহ নেই। কিন্তু সপত্নীর সন্তানের সঙ্গে পার্বতীর রক্ত সম্পর্ক কোথায়? এই সব ভাবতে ভাবতে পার্বতীর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। বর বেশে উপবিষ্ট তার স্বামীর মুখের দিকে দ্বিতীয়বার তাকাতে আর সাহস হয় না তার।

এই সময়ে সরস্বতী কোথায়? দাদার দ্বিতীয় বরবেশ দেখতে ইচ্ছুক হলেও এখন সে তার কাজের জায়গা থেকে নড়তে পারে না। পাঁপড়গুলি যাতে পুড়ে না যায় সেদিকে তার দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে। রান্নাবান্নার কাজে যারা নিযুক্ত হয়ে

এসেছে, তারা শীনময়্যর গালগল্পে খুশি হয়ে যে 'আরতি-অক্ষতে'র দিন পর্যন্ত থাকবে সন্দেহ নেই। কাজেই যে পাঁপড়গুলি তৈরি হচ্ছে তা যাতে একদিনেই নিঃশেষ না হয়ে যায় সেদিকেও সরস্বতীর লক্ষ্য দিতে হচ্ছে। তার ফুরসুৎ কোথায় ?

ইতিমধ্যে বেদনাতুর পার্বতীর মনের ভার যেন অনেকটা কেটে গেছে। বাড়িতে যে সব আত্মীয় কুটুম এসেছে তাদের আদর অভ্যর্থনা যদি পার্বতী না করে তবে কে করবে ? বাড়ির লোক হয়ে বিয়ের দিনে সে যদি আড়ালে আড়ালেই থাকে, তবে সারা গ্রামে এই কথাই রাষ্ট্র হবে যে এই বিবাহে পার্বতীর মত নেই। পার্বতী তা হতে দিতে চায় না। ভিতর থেকে উচ্ছ্বসিত-হয়ে-আসা দুঃখের আবেগ অতিকষ্টে নিরুদ্ধ করে সে রান্নার জায়গায় গিয়ে সরস্বতীর সঙ্গে কাজে যোগ দিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই ধোঁয়ার জ্বালায় চোখের জল ফেলে সেখান থেকে তাকে উঠে আসতে হয়। অতঃপর সে হাসবার মতো মুখের ভাব করে ছাপরার এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে সমবেত মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। একজন এয়ো নারী পার্বতীকে ডেকে বলল—'হ্যাঁ রে পারোতি' তোর স্বামীকে সোনা দিয়ে সাজালে এখনও যে কুড়ি বছরের ছোকরার মতো লাগে।' স্বামীর এই প্রশংসা শুনে পার্বতী নিজেও না হেসে পারল না।

'সমাবর্তন' শেষ হলে ভোজনের পাতা পড়ল। দুশো পাতে ছাপরা ভরে গেলেও তখনও নিমন্ত্রিতদের আসার বিরাম ছিল না। শীনময়্যকে ডেকে ঐতাল জিজ্ঞাসা করল—'যা তৈরি হয়েছে তাতে সকলের সমানভাবে কুলোবে তো ?' শীনের কখনও মুখের চাতুরীর অভাব নেই। এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে সে তক্ষুণি পরিবেশনের ব্যবস্থা করে দেয়। প্রথম বৈঠকের ভোজন আধাআধি হওয়ার সময়ে দেখা গেল দ্বিতীয় বৈঠকের জন্য অপেক্ষমাণ নিমন্ত্রিতের সংখ্যা একশ। যখন প্রথম বৈঠক শেষ হতে চলল, তখন দ্বিতীয় বৈঠকের সংখ্যা দাঁড়াল দুশ। রান্নার জায়গায় দ্রুত ছুটে গিয়ে শীন পরিবেশনকারীদের ধমক দিয়ে বলতে লাগল—'আচ্ছা, তোমাদের কি কিছুমাত্র হিসেবজ্ঞান নেই ? চটপট গরম গরম পরিবেশন করলে ওই রান্নাতেই বাকী দুশো লোকের হয়ে যেত !' রন্ধনশালায় উঁকি মেরে ঐতাল খুব ম্রিয়মাণ হয়ে পড়ে। সরস্বতী নিজে টকের পাত্রে জল, তেঁতুল, লবণ, লঙ্কা মিশিয়ে পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়।

ভাতের উনুন আবার ধরাতে গিয়ে সারা গ্রামখানি ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ভরে যায়। যাই হোক, প্রথম বৈঠকের নিমন্ত্রিতদের খাওয়া দাওয়া শেষ হওয়ার দণ্ড দুই পরে দ্বিতীয় বৈঠকের জন্য অপেক্ষমাণ অতিথিবৃন্দ আহার্যের মুখ দেখতে পায়। এমন সময়ে শীনের হুকুম শোনা গেল—'এই শেষ বৈঠক, যে যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, বসে পড়ো।' শীন কেবল ডাক দিল না, নিজেও বসে পড়ল, বাকী সকলেও তার সঙ্গে বসে গেল। এবারে পরিবেশনের ব্যবস্থা হল শীনের পূর্ব নির্দেশ মতো। গরম গরম ভাত—সাম্বার টক ইত্যাদি পাতে পড়তে লাগল। 'সারু' (টক্ রসম্) চাই—একথা মুখ দিয়ে বেরুতেই 'হুলি' (সাম্বার) এসে হাজির হল। 'হুলি' চাই বলতেই 'পলগু' (একপ্রকার রান্নাকরা সব্জী) এসে উপস্থিত। যখন 'পলগু' খাওয়া চলছে তখনই নিয়ে আসা হল গুড় দিয়ে কড়া পাকের মিষ্টি—চানার ডালের পায়েস।

বস্তুত দ্বিতীয় বারের রান্না দিয়ে সকলকেই পরিতোষ মতো খাওয়ান হল। শীন নিজেই সকলের আগে উঠে এসে বলল—'কেমন, বলেছিলাম কি না? প্রথম বৈঠকেই যদি এই ধরনের পরিবেশন করা হত, তবে আর দ্বিতীয়বার রান্নারও প্রয়োজন হত না এবং এতগুলি লোককে এতক্ষণ বসিয়ে রাখতে হত না। 'আরতি অক্ষতে'র দিন সমস্ত মনে থাকে যেন।' নিমন্ত্রিতদের কেউ কোনো কথা বলল না বটে, কিন্তু সরস্বতী মৃদুকণ্ঠে না বলে পারল না—'হাঁ, শীন মশাই, যে লোকগুলো নেমন্তন্ন খেতে এসেছে তারা জিব পুড়িয়ে বাড়ি যাক। বলি, এদের নেমন্তন্ন না করলে কী ক্ষতি হত', হাসতে হাসতে শীন বলল—'সরস্বতী মা, তুমি যদি তেমন ভোজের ব্যবস্থা করতে চাও, তাহলে যেতে হবে উড়ুপিতে সর্বনবমীর ভোজে।'

আহারের ব্যাপার নিয়ে শীনের আর মাথা ঘামবার সময় নেই। সে এখন ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বরযাত্রী দলকে রওনা করে দেবার জন্য। কিন্তু সেক্ষেত্রেও মহাসমস্যা। বরযাত্রায় যোগদানের জন্য যারা ছাপরার নীচে অপেক্ষা করছে তাদের সকলেই আশা করে আছে যে 'তোন্‌সে' পর্যন্ত তাদের সকলকে নৌকায় করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হবে। এদিকে শীন নৌকায় ব্যবস্থা করেছে মাত্র চারখানি। শীনের ইচ্ছা তোন্‌সে পর্যন্ত নদীপথে যাবে বরের বাড়ির লোকজন, বরকর্তারূপে সে নিজে, বাদ্যকর, ফানুসওয়ালা আর সঙ্গের যত জিনিসপত্র। চালের বস্তা ভরার মতো ভরে দিলেও তিনখানি নৌকায় বড় জোর

ধরতে পারে ষাটজন লোক। কিন্তু সমাবর্তনের ছাপরায় যে শ'দুই লোক নৌকার ভরসায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের নিয়ে কী করা যায়?

হঠাৎ তার মাথায় একটি বুদ্ধি খেলে গেল। ছাপরা থেকে বাইরে এসে সে নির্নিমেষ নয়নে পশ্চিম আকাশে একবার সূর্যের দিকে তাকালো এবং পরক্ষণেই ছাপরার মধ্যে প্রবেশ করে ঐতালকে লক্ষ্য করে, অথচ সকলেই যাতে শুনতে পায় এমনি উচ্চকণ্ঠে, বলতে লাগল—'ঐতাল, যারা পায়ে হেঁটে পড়ুমুয়ুরু যাবে, তাদের এখনই রওনা হওয়া দরকার। আর বিলম্ব করলে পরে অন্ধকার হয়ে যাবে, কারণ নদীর মোহানা পার হতে অনেকটা সময় লেগে যেতে পারে। কী আর বলব, আপ্রাণ চেষ্টা করেও চারখানির বেশি নৌকা জোটানো গেল না। হংগারকট্টের মহাজনগুলো কোক্করণে থেকে চাল আমদানীর জন্য সমস্ত নৌকা ভাড়া করে নিয়ে গেছে। আমি বলি কি—বাড়ির লোকজন আর গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সব নৌকায় চলুন। বাকী সব বালিয়াড়ির পথ ধরে এগিয়ে চলুক।' শীনময়্যর বাজখাঁই গলা কেবল ছাপরায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যেই নয়, সারা গ্রামখানিতে যেন ঢেরা পিটিয়ে দিল। অপেক্ষা করে লাভ নেই ভেবে কেউ কেউ বালিয়াড়ির পথে পদব্রজে অগ্রসর হল। কিছুলোক 'তিন ক্রোশ পথ কে হাঁটবে বাবা?' এই কথা বলতে বলতে ক্ষুণ্ণ চিত্তে যে যার বাড়ির পথ ধরল। কিছু লোকের কানে কানে শীন ফিস্‌ফিস্ করে বলে দিল—'কোনো চিন্তা নেই। আপনি নৌকাতেই যাবেন।' বেশ কিছু সংখ্যক স্থির করল যে নৌকায় জায়গা হলে তারা যাবে, নয়ত ওখান থেকে সোজা বাড়িমুখো হবে।

সূর্য অস্ত যেতে যখন আর মাত্র দু এক দণ্ড বাকী, তখন বাদ্য, বাজি প্রভৃতি সমেত বরযাত্রীর দল রওনা হয়ে নদীতীরে এসে পৌছল। পৌছনো মাত্রই নৌকায় ওঠার জন্য হুড়োহুড়ি। সকলেই জানে যে দৌড়ে গিয়ে অপেক্ষমাণ নৌকার মধ্যে একবার বসতে পারলে আর ভাবনা নেই। ফল হল এই যে, স্বয়ং বরের জন্য নৌকায় আর জায়গা রইল না। ব্যাপার-স্যাপার দেখে শীনময়্য ভয় পেয়ে গেল। কারণ যারা একবার নৌকায় গিয়ে জায়গা দখল করে বসেছে তাদের কাউকে তুলে দেওয়ার মতো সাহস তার নেই। এইভাবে শীনম্যায় যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন, তখন ঐতাল আর উপায় নেই দেখে বলল—'শীন, নৌকাগুলি এগিয়ে যাক। আমরা ধীরে ধীরে মাঠের উপর দিয়ে মোহানার মুখে বালিয়াড়িতে পৌছে যাব।' ঐতালের কথায় নৌকায় উপবিষ্ট

ব্যক্তিদের সকলেই বিরস বদনে একে একে নৌকা থেকে নেমে দাঁড়াল। এতক্ষণে শীনের কণ্ঠস্বর আবার জোরদার হয়ে উঠল—'প্রথম নৌকায় বিবাহের ছত্র, রাস্ত, সোনাগয়নার বাক্স। দ্বিতীয় নৌকায় বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দ। তৃতীয় নৌকা মেয়েদের জন্য। চতুর্থ নৌকায় যেমন জায়গা হবে, ক্রটি মার্জনা করে সকলে বসে পড়ুন গিয়ে।'

নৌকায় বসে কয়েক জনের মনে এইরূপ ভীতি জন্মাল যে এই নৌকাযাত্রা শেষ পর্যন্ত হয়ত জলবিবাহে পরিণত হতে পারে। কথাটা শীনের কানে পৌঁছলে সে হাসিমুখে ধমক দিয়ে বলল—'আমাদের গাঁয়ের লোকগুলো এমনি হয়েছে যে ওদের মুখে অমঙ্গল ছাড়া মঙ্গলের কথা আসে না।' শীনের এই মন্তব্য সত্ত্বেও কিছু লোক শঙ্কিত হয়ে নিজেরাই নৌকা থেকে নেমে গিয়ে বলল যে তারা পদব্রজেই যাবে।

ওদিকে সূর্য অস্ত গেল, এদিকে বরযাত্রী দল রওনা হল। নৌকা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাজনা ও আতসবাজির হুল্লোড় পড়ে গেল। নদীর কিনারে এসে দলে দলে মেয়ে পুরুষ ও শিশুরা দাঁড়িয়েছে বরযাত্রা দেখবে বলে। এটা কিছু আশ্চর্য নয় যে, সেই গোধূলিবেলার আলো-আঁধারেতে বরবেশী ঐতালকে খুব তরুণ বলে বোধ হচ্ছিল।

একদণ্ড সময়ের মধ্যেই নৌকাগুলি 'হংগারকট্টে' বন্দরে এসে পৌঁছল। বন্দরের কাছাকাছি হতেই শীনময়্যর কণ্ঠস্বরও উচ্চতর হয়ে উঠল—'ঐতাল একটু বেশি তেল খরচ হয় হোক, মশালগুলো জ্বালিয়ে দিই। বন্দরের ব্যবসায়ীরা আমাদের বরযাত্রীদলকে একবার দেখে নিক।' শীনময়্যর হুকুম অনুযায়ী হঠাৎ বাজি ছোঁড়ার কোলাহল অসম্ভব বেড়ে গেল, সেই সঙ্গে কয়েকটি হাউই বাজিকে দেখা গেল আকাশের দিকে ছুটতে। এমন সময়ে বাঁশিওয়ালাদের থামতে দেখে শীনময়্য ধমক দিয়ে বলে উঠল—'বন্দরের সামনে এসেই তোমাদের গলা শুকিয়ে গেল নাকি?' আবার শুরু হল বাদ্যের কোলাহল। দূর বন্দর থেকে বাঁশির শব্দ শোনা গেল কিনা ভগবান জানেন, কিন্তু শীনের মন এই ভেবে গর্বে ও খুশিতে ভরে উঠল যে আজ তার মাতব্বরি দিকবিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

'ভোনসে'র নিকটবর্তী হতেই শীনের হুকুম হল—'প্রতিটি নৌকায় চারটে করে মশাল জ্বালিয়ে দাও।' প্রজ্বলিত মশালের আলোয় নৌকাগুলির গমন পথের পশ্চাতে মসৃণ ফেনিল জলরেখা ঝিকমিক ঝিকমিক করছে। নৌকারোহী

পুরুষের দল বসে বসে পান সুপুরী চিবোচ্ছে, মেয়েরা গাইছে মঙ্গলগীত। সকলেই যখন কোনো-না-কোনো কাজে ব্যস্ত, তখন কোনো কাজ ছিল না কেবল ছত্রধারী শূদ্রদের। মশালের আলোয় তাদের সমস্ত দৃষ্টি নিবদ্ধ জলের উপর সঞ্চরমান 'বৈগে' মাছগুলির উপর। মৎস্য শিকারের চিন্তায় নিমগ্ন একে অন্যকে বলছে—'ওই দ্যাখো কী অঢেল মাছ। আজ যদি সঙ্গে এই বাম্‌ভনের দল না থাকত, তবে মাছ ধরবার কী যে সুযোগ হত!'

বাজনায়, বাজিতে কোলাহলে বরযাত্রীদের উৎসাহ উদ্দীপনা যখন তুঙ্গী, তখনই নৌকাগুলি এসে তোন্‌সের কিনারে ভিড়ল। শীনময়্য খেদের সুরে বলল—'ঐতাল, এইভাবে আরও ছ'ক্রোশ নৌকা চললেও কোনো চিন্তা ছিল না!' যে সমস্ত বরযাত্রী পদব্রজে রওনা হয়েছিল, তারা আগে ভাগে পৌঁছলেও নৌকারোহী বরযাত্রীদের ছেড়ে বিয়ের আসরে যাওয়া সমীচীন নয় ভেবে "তোন্‌সের নৌকা ঘাটের কাছে একটা চষা মাঠের আলের উপর সারিবদ্ধ-ভাবে বসে অপেক্ষা করছিল। সকলেই সেখানে একসঙ্গে মিলিত হল। তোরণ, পতাকা, মশাল নিয়ে যখন বরযাত্রীদল পডুমুন্নুরুর দিকে অগ্রসর হল, মনে হচ্ছিল যেন জয়যাত্রার পথে এক সৈন্যবাহিনী এগিয়ে চলেছে। বর বসেছে পাল্‌কিতে। পাল্‌কির অগ্রবর্তী শীনময়্য। কোমরে তার এক আঙুল চওড়া রূপোর কটিশূল আর গলদেশে চক্‌চক করছিল ধার করে-আনা সোনার হার। চারিদিকে এই বৈভবের আয়োজন দেখে ঐতাল খুব খুশি হল, তার মনে পড়ে গেল বিশবছর আগেকার প্রথম বিবাহের বরযাত্রা ঝড় বৃষ্টির জলে কিভাবে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

বরযাত্রীদল যখন পডুমুন্নুরু পৌঁছে বিবাহমণ্ডপের সম্মুখস্থ মাঠে এসে দাঁড়াল রাত্রি তখন একপ্রহর অতিক্রান্ত। বরের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই ঢাক-ঢোল, কাড়ানাকড়া বেজে উঠল, সেই সঙ্গে বাজি-বুজি, গোলা-বারুদের তুমুল নিনাদ আর তারস্বরে স্ত্রীলোকদের মঙ্গলগীত। তখন মনে হচ্ছিল যেন দু'পক্ষে এক লড়াই বেধে গেছে।

কনেপক্ষের লোকজন এসে বরকে বরণ করে ভিতরে নিয়ে গেল। ঐতালের তখন বোধ হল সে মোটেই প্রৌঢ় নয়, তরুণ যুবক মাত্র। বরকর্তারূপে শীনময়্য উপঢৌকন পেয়েছে যে রুপো-বাঁধানো হাতলওয়ালা ছড়ি, সেই ছড়ি হাতে মহামহিমান্বিতরূপে সে বিবাহমণ্ডপে প্রবেশ করল।

বিবাহ-মণ্ডপ দেখলে মনেই হয় না যে এটা দোজবরের বিয়ে। চীনাকাগজে সাজানো, ঝালর-লাগানো সামিয়ানা দিয়ে সজ্জিত মণ্ডপখানি ঝক্‌ঝক করছে। তার মধ্যে বিরাজমান ব্রাহ্মণসভা, গৃহস্থসভা ও স্ত্রী-মণ্ডলী। আর, মণ্ডপের চারিদিকে নারিকেলপাতা দিয়ে যে ঘর তৈরি করা হয়েছে, সেই ঘরের ফাঁক দিয়ে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখছে গ্রামের শূদ্র মণ্ডলী।

বরের আনন্দের সীমা নেই। বরকর্তা শীনময়্যও খুব খুশি। এমন কি বুড়ো জামাই বলে যার বিন্দুমাত্র খুশি থাকার কথা নয়, সেই শাশুড়ীঠাকরুনের চোখেমুখেও একটা তৃপ্তির ভাব। ঐতাল যে প্রচুর বিষয়-সম্পত্তির অধিকারী সে কথা তো সম্বন্ধের আগেই জানা ছিল। উদ্বেগ ছিল জামাইর বয়স নিয়ে। আর তার প্রথমপক্ষের স্ত্রীকে নিয়ে। বাপ-মা কি সহজে এমন ঘরেবরে মেয়ে দিতে চায়? কিন্তু ঐতাল যখন বরসজ্জায় সজ্জিত হয়ে এসে বিবাহের আসরে দাঁড়াল, তখন তাকে তরুণের চেয়েও তরুণ বলে বোধ হচ্ছিল। সর্বোপরি পার্বতীর ব্যবহার। যেভাবে সে স্বামীর বিবাহসভায় বরযাত্রীদের আদর-আপ্যায়নে নিযুক্ত ছিল তাতে ঐতালের শাশুড়ী এই ভেবে আশ্বস্ত হল যে তার মেয়ের পক্ষে শ্বশুরবাড়ি মোটেই অপ্রীতিকর হবে না। পার্বতী নিজেই বর-পক্ষের দেওয়া সোনা-গয়না ভিতরে নিয়ে ভাবী সপত্নীকে যেভাবে হাসিমুখে সাজিয়ে দিল, তাতে আর কনেপক্ষের কারও মনে সন্দেহের লেশমাত্র রইল না।

সরস্বতীর মন কিন্তু খুঁত খুঁত করছিল। পার্বতীর জন্য কোনো নতুন গয়না তো হয়ই নি, এমন কি হোল্লাদের বাড়ি থেকে পুরোনো গয়না দু'দিনের জন্য ধার করে আনার কথা ছিল তাও আনা হয় নি। সরস্বতীর মনের অবস্থা জেনে পার্বতী বলল—'ঠাকুরঝি, আমি কি এখনও ছেলেমানুষ যে আমাকে এখন সোনা গয়না পরতে হবে?'

ঐতাল স্বভাবত শক্ত মুঠির লোক হলেও এই বিবাহে আশাতীতভাবে মুষ্টি শিথিল করে দিয়েছে। দক্ষিণার ব্যাপারে বরপক্ষ থেকে কিছুমাত্র কার্পণ্যের পরিচয় পাওয়া গেল না। ঐতালের শিষ্যযজমানবৃন্দ গুরু-পুরোহিতের বিবাহে উপস্থিত থেকে অপর্যাপ্তরূপে ধুতি শাড়ী প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী উপহার দিল। মোটকথা, সকল দিক থেকেই ঐতালের মান-মর্যাদা বেড়ে গেল।

বিয়ের চারটি দিন কনেপক্ষের দিক থেকেও আদর-অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হয় নি। বিশেষ করে বরযাত্রীদলের অধিনায়করূপে শীনময়্যর প্রতি যে

বিশেষ সম্মান দেখানো হয়েছিল তার তুলনা নেই। শীনমহাশয়ের মুখ দিয়ে 'তৃষ্ণা' কথাটা উচ্চারিত হতে না হতেই দু-দুটো কচি ডাবের ব্যবস্থা হয়ে যেত। এই নিখুঁত আয়োজনের মধ্যে চতুর্থদিনে শীনপ্পাকে নিয়ে একটা কাণ্ড ঘটে গেল। 'মন্দ্রাক্ষতে' অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে সান্ধ্যআসরে শীনপ্পা হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়ে। সুপুরির খোসায় কিংবা পানের মধ্যে কোন কিছু ছিল বলে কি না কে জানে, তাম্বুল চর্বনরত শীনপ্পামহাশয়ের হঠাৎ মাথা ঘুরতে শুরু করে। ক্রমে চোখে তার সব অন্ধকার হয়ে এল। বর থেকে শুরু করে সকলেই ছুটে এসে শীনপ্পামহাশয়ের সেবা-শুশ্রূষায় ব্যতিব্যস্ত। ব্যাপারটা সামান্যই। কাঁচা সুপুরী চিবুনোর নেশা। শীনের মনে হল—এই সুযোগে সকলের সেবা-যত্ন আদায় করে কেষ্ট-বিষ্টু হওয়া যাক।

ইতিমধ্যে সংবাদ শুনে সরস্বতী ছুটে এল। ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—'কী হল শীনদাদা?' অবস্থা বুঝে সরস্বতী চিকিৎসার ব্যবস্থা করে দিল—'সুপুরী ভেজানো জল খেলে পেটের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সব বমি হয়ে উঠে যাবে। তখন আর ভয় নেই।' রাম ঐতাল ভয়াকুল হয়ে বলল—'তাই করো, বাপু। আমার কাজে এসে শেষে কি ওর এই দুর্গতি হল? হে ঠাকুর, মান-মর্যাদা রক্ষা কর।' পার্বতী এই খবর পেয়েই বালিয়াড়ির 'অরম' দেবতার কাছে কলা-নারকেল মানত করল।

সুপুরী-ভেজানো জল পান করাটা শীনের মনঃপূত হল না। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাকে ধীরে ধীরে চোখ মেলতে হল। দেখতে পেল দুদিকে দু'জন লোক খসখসের পাখায় গোলাপজল ছিটিয়ে তাকে হাওয়া করছে। এই সেবা-শুশ্রূষায় তৃপ্ত হয়ে শীন ক্রমশ উঠে বসতে উপস্থিত সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল—'ভগবান এই একটা ফাঁড়া কাটিয়ে দিলেন।'

বরযাত্রীদের ফিরতি যাত্রাটাও কম জমকালো হল না। নববধূর নিত্য-সঙ্গিনী থেকে পার্বতীর গল্পগুজবের বিরাম ছিল না। ঐতাল ও শীন মিলে বিবাহের চারদিনকার ঘটনাবলী পর্যালোচনায় রত। ঐতালের আনন্দ অপরিমেয়, যেন দেবলোকের সঙ্গেই তার সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। ঐতালের শ্বশুরবাড়ির দেবলোকত্ব সম্পর্কে শীনপ্পাও একমত। তার আপত্তি কেবল একটি—'দেখুন ঐতাল, এই শিবল্লি বামুনেরা যেন রান্নার সময় হাত গুড়ের মধ্যে ডুবিয়েই রাখে।' ঐতাল হেসে বলল—'তা বটে। মিষ্টি বেশিই দিয়েছিল।' পার্শ্বে

উপবিষ্ট জনেক প্রতিবেশী বলে উঠল—'ওহে শীন কাল ঐতালের বাড়িতে 'আরত্তি-অক্ষতে'-র ভোজনে তুমি একমুঠো লঙ্কা বেশিই মেখে নিও।'

এই কথায় ঐতাল হাসল বটে, কিন্তু শীন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। ব্যাপারটা সেই মুহূর্তে কারও বোধগম্য না হলেও ক্রমে ক্রমে জানা গেল। গ্রামের লোক একদিন তাকে 'শীনময়্য'রূপেই জানত। তার বন্ধুবান্ধবেরা তাকে ওই নামেই ডাকত। কিন্তু ঐতালের বিবাহে বরকর্তারূপে শীন পড়ুম্মুরু গ্রামে 'শীনপ্পা', 'শীনপ্পাময়্যরু' (শীনমহাশয়, শীনবাবু, শীনময়্যবাবু)-রূপে অভিহিত হত। পুনরায় এখন ভদ্রতার রীতি-নীতি-অনভিজ্ঞ এই লোকগুলির মুখে 'তুমি-তুমি' বলে ডাকাডাকি শীনের আদৌ পছন্দ নয়। অতঃপর কেউ 'শীন' বা 'শীনময়্য' বলে ডাকলে সে না-শোনার ভান করত।

সত্যভামা এসে পতিগৃহে প্রবেশ করল। এখন তার গোত্র বদল হয়েছে। সেইসঙ্গে বদল হয়েছে কপালে কুঙ্কুম লাগাবার রীতি। বাপের বাড়ির প্রথামতো খাড়া কুঙ্কুম রেখা না দিয়ে এখন সে পার্বতীর মতো টানা কুঙ্কুম রেখা দিতে শুরু করল। যারা দেখল, সকলেই মেনে নিল যে এই নববধূর মধ্যে শিবল্লি বামুনদের ছায়াপাত পর্যন্ত ঘটেনি। কিন্তু আড়ালে নিন্দা করা যাদের স্বভাব, তারা মুখ বুজে চুপ করে রইল না। বলে বেড়াতে লাগল—'গ্রামের পুরোহিত, বিশিষ্ট বৈদিক ব্রাহ্মণ হয়ে কিনা ঐতাল ঠাকুর শেষ পর্যন্ত শিবল্লি পরিবারের মেয়ে ঘরে আনলেন! এই কি তাঁর উচিত কাজ?'

সাত

নতুন বউ শ্বশুরবাড়িতে এলে সরস্বতী ও পার্বতীর মনে একটা কুণ্ঠা দেখা দিল—'কনে কি শিবল্লি ঘরের মেয়ে অথবা আধা-শিবল্লির।' সরস্বতীর আবার বাছ-বিচার একটু বেশিই। তাই দাদার এই হাল আমলের বিয়েটা তার কাছে খুব মনঃপূত হল না।

বিয়ের পরে ছ'মাসের মধ্যে প্রায় তিন মাস সত্যভামা স্বামীর বাড়িতেই কাটাল। তার চাল-চলন কথাবার্তা দেখে-শুনে ধীরে ধীরে সরস্বতী খুশি না হয়ে পারল না। স্পষ্টই বোঝা গেল, শিবল্লি পরিবারের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত-পালিত হলেও সত্যভামা কোট ব্রাহ্মণ শ্রেণীর আর পাঁচজন মেয়ের মতোই সাধারণ মানুষ।

প্রথম প্রথম ঘরের কাজকর্ম পার্বতী একা হাতেই করত, সত্যভামাকে ডাকত না। না ডাকলেও সে নিজে থেকে এসে পার্বতীর কাজে সাহায্য করতে থাকে। 'দরকার নেই' বললেও সে জিদ ধরে বলে—'না দিদি, আমিই করব।' দু'এক মাসের মধ্যেই থালবাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, লেপা-পোঁছা প্রভৃতি খুচরো কাজ একে একে সত্যভামার হাতে চলে যায়। মাঝে মাঝে ভোর বেলায় কিছুক্ষণের জন্য সে বাড়ির গোরু বাছুরগুলিকে বালিয়াড়িতে নিয়ে যেতেও শুরু করে। শ্বশুর বাড়িতে এসে এখনও যে কাজটিতে সে হাত লাগায় নি তা হল রান্না। সে যে রান্নার কাজ জানে না, তা নয়। তার বিয়ের চতুর্থ দিনে যখন বরযাত্রীদল ফিরে আসে, সেদিন শিবল্লি ব্রাহ্মণদের রান্না সম্পর্কে বরযাত্রীদের আলোচনা সত্যভামার কানে যায়। তার স্বামীরও ধারণা যে, শিবল্লীদের রান্না মানেই মিষ্টির গোলা। সত্যভামা তাই রান্না করতে ভয় পায়। বাটনা বাটা কুটনো কাটার মতো ছোটখাটো কাজ করে দিলেও রান্নার কাজে সে হাত দেয় না, পার্বতীও তাকে বলে না।

একদিন শীনময়্য এসে অযাচিত ভাবেই বলল—'আচ্ছা ঐতাল, আপনার সত্যদেবীর রান্না কতদূর এগোলো? এখনও কি পড়ু মুম্মুরু গ্রামেই আছে, না কোডি পর্যন্ত এসে পৌছেছে?'' সত্যভামা এ বাড়িতে এসেছে আজ ছমাস। তবু আজ পর্যন্ত ঐতাল তার নতুন বৌ-এর হাতের রান্না খেয়ে দেখেনি। শীনময়্যের

কথায় সে সত্যভামাকে ডেকে বলল—'সত্য, আজ একবার বেশ ভালো রান্না রেঁধে খাওয়াও দেখি। আমার বিয়ের কর্ত্তাব্যক্তি এসেছেন। রোজই পার্বতীর হাতের তরকারি সাম্বার্ খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে।' স্বামীর হুকুম শুনে সত্যভামার বুকটা ধক্ করে উঠল। অস্ফুট কণ্ঠে বলল—'রান্না? আমি সে পারব না।' কথা শেষ না করেই সেখান থেকে সে সলজ্জ চরণে চলে গেল।

মধ্যাহ্ন ভোজনে পাশাপাশি বসেছে ঐতাল এবং তার বন্ধু শীনময়্য। কারও উপর শীনের ভরসা নেই বলে খেতে বসার আগে খিড়কীর বাগানে গিয়ে গোটা কয়েক কাঁচা লঙ্কা ছিঁড়ে কোমরে গুঁজে এনেছে সে। শীনের পরিহিত জালী ধুতির ট্যাঁকের ফাঁক দিয়ে বস্তুগুলো সত্যভামার নজরে এল। মনে মনে সে বলল—'বাব্বা! কেমন লোক এই শীনময়্য!' ভয়ে ভয়ে সেদিন সে গুড়ের জালার কাছে গেলই না। পরিবেশন করার আগে সরস্বতীকে ডেকে বলল—'ঠাকুর ঝি, দেখলেন শীনময়্যর কাণ্ড? কোমরে কাঁচা লঙ্কা গুঁজে নিয়ে বসেছেন।' 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি'—এই বলে সরস্বতী গোটা কয়েক কাঁচা লঙ্কা রান্না করা পদের মধ্যে বেশ করে দিয়ে পরিবেশন করল। অত্যধিক ঝাল লাগা সত্ত্বেও শীনময়্য তা বাইরে প্রকাশ করল না। ঐতাল দু'এক গ্রাস মুখে দিতে ঝালে শোষাচ্ছিল। হেসে বলল—'আজ কেমন শীনপ্পা? সত্যকে কোডিগ্রামের মেয়ে বলেই মনে হয় কি না?' শীনময়্যর দম্ভ এখনও গেল না। কথাটা মেনে নিতে বাধল। বলল—'কী বললেন ঝাল হয়েছে? আমার তো বোধ হচ্ছে গুড় খানিকটা বেশিই পড়ে গেছে। আপনার কাছে ঝালটা বেশি হতে পারে, আমার কাছে একটু কমই।' এই বলে কোমর থেকে চারটে কাঁচা লঙ্কা বের করে ভাতের সঙ্গে মেখে নিয়ে খাওয়া শেষ করল। ঐতালের কাছে শীনেরই জিৎ হল। কিন্তু বাড়ির মেয়েদের বুঝতে বাকী রইল না লোকটা মহা ধড়িবাজ।

'সেদিনের রান্নাটা যা হয়েছিল চমৎকার। ঝালটা একটু কম হলে আরও চমৎকার হত'—ঐতাল এই বলে নতুন বৌএর তারিফ করলে তার ফল হল এই যে অতঃপর রান্নার পালাটা ক্রমান্বয়ে সত্যভামার ভাগে আসতে থাকল।

বিয়ে হওয়ার এক বছর পর্যন্ত দিনগুলি এইভাবেই কাটল। পিত্রালয় থেকে সত্যভামা যেদিন নববধূরূপে মাথা নীচু করে এ বাড়িতে প্রবেশ করে, সেদিন তার মাথা ছিল পার্বতীর কাঁধের নীচে। তারপরে ছ'মাস না যেতেই যৌবনবতী

সত্যভামা মাথায় এতটা বড় হয়ে উঠল যে ঘরের দরজা পার হতে উপরের চৌকাঠে তার কপাল প্রায় ঠেকে যায়। বিয়ে হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই 'পুনর্বিয়া' এবং বছর না ঘুরতে সীমন্ত সংস্কার অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে সত্যভামা এখন মা হবার জন্ম চলে গেছে পড়ুমুন্নুরে—তার পিত্রালয়ে।

পার্বতীর আজকাল প্রতি মুহূর্তের চিন্তা—'সন্তান ছেলে হবে, না মেয়ে; প্রসব কি সহজে হবে, না কষ্ট দেবে?'—দিনরাত এই একটি মাত্র তার কথা মুখে। সরস্বতী ও পার্বতী উভয়েরই খুব উৎসাহ যে এতদিন পরে তাদের ঘরে একটি আলো জন্মাবে। সরস্বতী বার বার বলে—'সন্তান ছেলে হলেই ভাল হয়। এতকাল অপেক্ষার পরে ভগবান যদি অনুগ্রহ করে একটি ছেলের মুখ দেখান, বংশটা উদ্ধার পাবে।' সঙ্গে সঙ্গে পার্বতী বলে ওঠে—'ছেলে হলে 'অরম' দেবতার দোরে নারকেল-কলার নৈবিদ্দ দেব।' অরম ঠাকুর বালিয়াড়ির গ্রাম্য দেবতা। সরস্বতীর নিজের পায়ের শক্তির উপর বিশ্বাস আছে বলে সে মানত করে বসে আগে পর্বতের গণপতি দেবতার উদ্দেশে—কেবল নারকেল কলাই নয়, একেবারে 'পঞ্চনৈবেদ্য'।

গর্ভবতী সত্যভামার কুশল সংবাদের জন্ম রাম ঐতাল একদিন পর একদিন লোক পাঠায় শ্বশুরবাড়িতে। তার আশঙ্কাটা এইরকম—'কতগুলো নক্ষত্র সন্তান প্রসবের পক্ষে আদৌ প্রশস্ত নয়। তাছাড়া, গ্রীষ্মঋতু শেষ হয়ে বর্ষা প্রায় সমাগত। নবজাত সন্তানের পক্ষে দুটোই সমান ক্ষতিকর—হয় প্রখর উত্তাপ, নয়ত প্রথম বর্ষার ঠাণ্ডা হাওয়া। উদ্বিগ্ন ঐতাল শ্বশুরবাড়িতে গিয়েই থানা গাড়ত। কিন্তু একদিকে তার যজমান বাড়ি থেকে পুজা-পার্বনের ডাক, অন্যদিকে চাষবাসের হাঙ্গামে বিশ্রাম তার এতটুকু নেই।

তবে সে ক্ষেতের আলেই থাক, বা যজমান শিষ্যের বাড়িতে 'গণ'-হোমেই ব্যস্ত থাকুক—তার সমস্ত ধ্যান ও চিন্তা একটি লক্ষ্যেই কেন্দ্রীভূত—'কুমারসম্ভব' অর্থাৎ পুত্রোৎপত্তি। 'এটা কী নক্ষত্র? প্রসূতির পক্ষে অশুভ। এটা কী? পিতার পক্ষে প্রতিকূল। এটা? এই নক্ষত্রে জাতক জন্মালে কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা নেই, বরং ধনলাভের যোগ রয়েছে। তবু তেমন মনঃপূত নয়।' এইভাবে প্রতি নক্ষত্রেই জন্ম-মুহূর্তের তুলনা করে দেখছে বৈদিক ব্রাহ্মণ।

এত যে আঁক-জোখ, নিরীক্ষণ, পর্যালোচন—সত্যভামার পক্ষে কোনোটাই সার্থক হল না। অবশেষে নিরাশ হয়ে বিরক্তি সহকারে ঐতাল বলল—

'পারোতি, তোমার যত ভুল হিসাবে বিশ্বাস করে ঠকলাম! আমাকে জিজ্ঞেস করো তো সত্যর এই আট মাস।' সরস্বতী বলল—'দাদা, তোমার ওইটুকু হিসাবও আসে না? 'পুনর্বিয়া' হল কোন্ মাসে? সেদিন থেকে ঠিক ন'মাস পূর্ণ হল। বেশি হলে, আর দিন দশেকের মধ্যে সত্যভামার প্রসব হবে। দিন কয়েক কম বেশি হয়েই থাকে। তাতে ক্ষেতি কী?'

এই জাতীয় বিচার বিবেচনার মধ্যে এক মধ্যাহ্নে বাড়ির তিনজনই গিয়ে নদীর তীরে উপস্থিত হল। জমিতে এখনও পলিমাটি দেওয়া হয়নি। নদীর মাটিকে উপরে তোলা, তারপরে তা রোদে শুকোবার সঙ্গে সঙ্গে সেই শুক্‌নো মাটিকে ক্ষেতে এনে ঢালা—এইসব ছোটখাট কাজের জন্য খোরাকী দিয়ে মুনিষ-মজুর না ডেকে তারা নিজেরাই লেগে গেল। নদীর মাঝখানে জলের মধ্যে পোঁতা একটা লগির সঙ্গে একখানা নৌকা বেঁধে তারা তিনজনেই পলিমাটি সংগ্রহের কাজ শুরু করে দেয়। প্রত্যেকের হাতে এক-একখানা থালা। জলের মধ্যে ডুব দিয়ে থালায় মাটি তুলে নিয়ে উপরে আসা, এবং তোলা মাটি নৌকায় ভরে আবার জলে ডুব দেওয়া—কাজটা তেমন সহজ নয়, তৃপ্তিকরও নয়। শরীর মুখ কাদায় মাখামাখি। কয়েক স্থানে বেশ উপরেই যখন কাদা পাওয়া যায় তখন অনেকক্ষণ শ্বাস বন্ধ রাখার দরকার হয় না। আর কাদা যদি থাকে অথৈ জলে, তবে যেমন শক্ত ডুব দেওয়া, তেমনি কঠিন থালায় করে কাদা ভরে উপরে আনা তাছাড়া শিখতে হয় অনেকক্ষণ ধরে শ্বাস বন্ধ রাখার কৌশল। ওদিকে আবার নোনা জলে চোখ খোলারও উপায় নেই।

তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। তিনজনের পরিশ্রমে নৌকা প্রায় আধাআধি ভরে এসেছে। এমন সময়ে বাধা পড়ল কাজে, দূরের ক্ষেতের আল থেকে কে যেন চিৎকার করে ডাকছে—'ঐতাল! ঐতাল!' নৌকা তখন গভীর জলে বাঁধা। মাটির উপর দাঁড়িয়ে আগন্তুককে দেখারও উপায় নেই। গলুইটা ধরে জলের উপরে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে গলাটাকে এদিক-ওদিক টান করেও যে ডাকছে তাকে দেখা গেল না। মাঝখানে চুংগি কাঁটার ঝোপে আড়াল হয়ে আছে। কাউকে দেখতে না পেয়ে ঐতাল প্রতি-চিৎকার করে উঠল—'কে ডাকছ? এদিকে এসো। এখানে আমরা পলিমাটি তুলছি।'

ঐতালের কণ্ঠ অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছল। আগন্তুক তা শুনতে পেয়ে নৌকার দিকে এগিয়ে এল। ঐতাল তখন কর্দমাক্ত দেহে একটিমাত্র কৌপীন-

ভূষিত হয়ে নৌকার গলুইর উপরে অধিষ্ঠিত! সরস্বতী ও পার্বতী তাদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত। এমন সময়ে বছর কুড়ি বয়সের একটি যুবক নদীর তীরে উপস্থিত হয়ে ঐতালের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পুনরায় হাঁক দিল—'ঐতাল! ও রাঁমৈতাল!!' ঐতাল বলে উঠল—'এই যে এখানে।' তবু সেই যুবক বুঝতে না পেরে কেবল এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিল। আগন্তুককে চিনতে ঐতালের কোনো অসুবিধা হল না। 'ওহহো, আমার শ্যালক মহাশয় এসেছেন! আমার বেশ দেখে আমায় চিনতে পারেননি মনে হচ্ছে। এই আসছি. এই আসছি, বলে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ঐতাল। শরীরটাকে মেজে ঘষে সাফ করে পুনরায় নৌকাটা ধরে সেখান থেকেই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল—'সত্য···সত্যের···কী হল?'

কিন্তু তীরে দণ্ডায়মান যুবকের কানে সে প্রশ্ন গেল না। তার দৃষ্টি ও মন নিবদ্ধ ছিল ভগিনীপতির চেহারা ও কাজকর্মের দিকে। সে নিজেও চাষবাসের আবহাওয়ায় বড় হয়েছে। কিন্তু তাদের চাষবাস আরেক রকমের। নিজেদের হাতে কিছু করবার নেই। জমি-জমা বর্গা দিয়ে একরকম সুখেই আছে তারা। কাজেই ভগিনীপতির ব্যাপারটা তার কাছে কিছু বিস্ময়কর বোধ হল। সে শুনে এসেছে—ঐতাল মশাই একজন অবস্থাপন্ন ব্যক্তি। তাঁর পক্ষে এই ধরনের কাজে ব্যাপৃত থাকা যুবকটির দৃষ্টিতে ঠিক উপযুক্ত বলে বোধ হল না। তিনি নিজেই নন, তাঁর বাড়ির মেয়েরা পর্যন্ত পানকৌড়ির মতো ডুব দিচ্ছে দেখে ভারি আশ্চর্য হল সে। তবে কি তার বোন সত্যভামাকেও একদিন এই কাজে নামতে হবে?

তার মাথায় যখন এই সব চিন্তাভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছিল, তখন ঐতাল ও তার বাড়ির মেয়েরা তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠে তীরে এসে পৌঁছল। ঐতাল পুনরায় আগন্তুককে লক্ষ্য করে বলল—'শ্যালকপ্রবর, চলো বাড়ি চলো। এখানে কেন দাঁড়িয়ে থাকবে? সত্যভামা কেমন আছে?' 'তার প্রসব হয়েছে। মা ও শিশু ভালই আছে।' সরস্বতী জিজ্ঞাসা করল—'শিশু কি...?' 'ছেলে।' ঐতাল ওখানে দাঁড়িয়েই হিসাব করতে লাগল কোন্ নক্ষত্রে শিশুর জন্ম হয়েছে। সরস্বতী বলল—'নক্ষত্র-টক্ষত্র পরে দেখা যাবে। বাড়িতে যে কুটুম এল তাকে একটু জলপান দিতে হবে না? নৌকা এখানেই থাক। পলিমাটি রাতে তোলা যাবে। আজকাল জ্যোৎস্নাপক্ষ চলছে।'

সকলের সামনে শ্যালকমহাশয়কে রেখে ঐতাল বাড়ির দিকে অগ্রসর হল। তার পশ্চাতে সরস্বতী ও পার্বতী। পথে চলতে চলতে ঐতাল তার বেশবাসের

দিকে তাকিয়ে কুটুম্বের সামনে লজ্জা বোধ না করে পারল না। 'শ্যালক, তুমি বারান্দায় উঠে চালে গোঁজা রঙিন মাদুরটা টেনে নিয়ে বসে পড়ো। আমি চট্ করে পুকুর থেকে একটা ডুব দিয়ে আসি। এই বেশে বাড়ির মধ্যে আসা ঠিক হবে না।' দাওয়ায় উঠে রঙ্ বা রঙিন মাদুর কোনো কিছুই শ্যালকের চোখে পড়ল না বলে সে খালি মেজের উপরেই একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে উপবেশন করল।

সরস্বতী সকলের আগে পুকুরে ডুব দিয়ে গা ধুয়ে এল। 'ওহো, মাদুরটা পেলে না?' এই বলে ঘরের ভিতরে রাখা রঙিন বস্তুটিকে নিয়ে এসে দাওয়ায় বিছিয়ে তাকে বসতে বলে সরস্বতী রান্নাঘরে গিয়ে উনুন ধরাল। ইতিমধ্যে ঐতাল স্নান সেরে ধুতি পরে নস্যের কৌটো বের করে টিপ তুলে নিয়ে কৌটোটা শ্যালকের সামনে রেখে বলল—'তুমি তো আবার নস্যি-ফস্যি টানো না।' কথাটা যখন জানাই ছিল, তখন আর তার সামনে কৌটা রাখার উদ্দেশ্য কী? ব্যাপারখানা এই—এটা তার দৈনিক ব্যবহারের কৌটো নয়। রোজকার নস্য রাখা হয় একটা শুকনো বিল্বফলের খোলায়, ছিপিটা তার তামাকপাতার ডাঁট দিয়ে তৈরি। শ্যালক জনার্দনের সামনে রাখা হয়েছে একটি সুদৃশ্য কাঁচের ডিবা, যেটি বিশেষ কোথাও যাতায়াত উপলক্ষ্যে ঐতালের সঙ্গী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করে। ডিবাটির গলাটুকু রুপো দিয়ে বাঁধানো। উপরের জোড়ের জায়গাটুকুতে সুন্দর একটি কিরীট। সৌন্দর্য ও আয়তনে এই অভিনব কৌটোটি মাদুরের উপরে একটি অলঙ্কারের মতো শোভা পাচ্ছিল। নদীর তীরে পলিমাটির কাজে ব্যস্ত ঐতাল পরিবারের ক্ষুণ্ণ মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এই রৌপ্যখচিত নস্যাধারের প্রদর্শনী।

সরস্বতী অতিথির পা ধোয়ার জন্য জল এনে দিয়ে একটা পাত্রে করে ঘোলের শরবৎ এবং একখানা থালায় ভরে পাঁপড় ও বড়া ভাজা নিয়ে এল। জিজ্ঞাসা করল—'প্রসবে কোনো কষ্ট-টষ্ট হয়নি তো?' তার পিছনে পার্বতী এসে প্রশ্ন করল—'ছেলে বাপের মতো হয়েছে, না মায়ের মতো?' ঐতাল বলল—'এখনই কী বোঝা যায়? এখন তো বিড়ালছানাটানার মতো হবে।' সরস্বতী বলল—'কখনই নয়। পোয়াতি অবস্থায় সত্যকে দেখে মনে হচ্ছিল সন্তান বেশ বড়-সড়ই হবে। তার উপর প্রথম সন্তান। কখনই বিড়ালছানার মতো হবে না।'

জনার্দন উত্তর দিল—'খোকা বেশ ফর্সাই হয়েছে। মাথা ভর্তি চুল। দেখতে কার মতো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বাপের মতোই হবে।' এইভাবে একইসঙ্গে হাস্য-পরিহাস ও পাঁপড়-বড়ার সেবা চলতে থাকল।

এক মুহূর্তের জন্য পার্বতীর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। রান্নাঘরে গিয়ে একা একা অন্ধকারে বসে এই বলে সে কাঁদল—'আইয়ো! আমার কপালে ভগবান সন্তানের যোগ লেখে নি।' তারপরে কী মনে হতে নিজেকে শান্ত করে মনে মনে বলল—'ছেলে হয়েছে বলে 'অরম' ঠাকুরকে যে নারকেল-কলার ভোগ মানত করেছিলাম সে কথা ভোলা উচিত নয়।' পার্বতীর খেয়াল হল সত্যভামার প্রসব সম্পর্কে সে কিন্তু কুটুমের কাছে একটি কথাও জানতে চায় নি। তাড়াতাড়ি দাওয়ায় এসে জিজ্ঞাসা করল—'প্রসবে কি কষ্ট হয়েছিল?' মেয়েলি প্রশ্নের উত্তরে নারীজগৎ সম্পর্কে 'মহাজ্ঞানী' সেই তরুণ যুবক কী কথা বলবে? অনুমানের উপর নির্ভর করেই উত্তর দিল—'হয়েছিল বোধ করি।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে দেখে সে বলল—'বাবা আজ রাতেই বাড়ি ফিরতে বলেছেন। বাড়িতে কাছে কেউ নেই। আমি তাহলে আসি গিয়ে।' ঐতাল কি এত সহজে ছাড়বে? 'বিলক্ষণ! শ্যালকের ব্যাপারই আলাদা! শুভ খবরটা নিয়ে এলে, শুধু মুখে ফিরে যাওয়ার কোনো মানে হয়? একটু পায়েস খেয়ে যেতে হবে। এত তাড়া কিসের? কাল সকালে আমিও যাব। এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।' জনার্দন বলল—'আজ না গেলে হবে না।' ঐতাল উত্তর দিল—'আরে, প্রসবের ব্যাপারে পুরুষদের আবার কী কাজ?'

এর পরে আর শ্যালক মহাশয়ের মুখে কথা জোগাল না। নিরুপায় হয়ে সে রাত্রিতে সেখানেই থাকতে হল। পার্বতী তাড়াতাড়ি শীনময়্যর বাড়ি গিয়ে এক পোয়া অড়হর ডাল ধার করে নিয়ে এল। নৈশভোজের জন্য পাতলা অড়হর ডালের সঙ্গে এমন একটি পদ করা হল সচরাচর যা হয় না—কেসুরে পাতার পাতড়া। পাঁপড়-বড়া তো আছেই। তাড়াতাড়ির সময়ে চিঁড়ের পায়েস করা সহজ বলে তাই করা হল। আহারের সময়ে ঐতাল তার পাতের পায়েস চেটে-পুটে নিঃশেষ করে বলে উঠল—'এলাচ-টেলাচ দেওয়াতে পায়েসটা বেশ উপাদেয় হয়েছে।' ভগিনীপতির এই সুপারিশের পরে সঙ্কোচ-মূর্তি-রূপী শ্যালক মহাশয় আর কী বলবে? সে-ও বলে উঠল—'বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে।' পার্বতী বলল—'চিঁড়ের পায়েস শরীরের পক্ষে বেশ উপকারী'

এই বলে পাত্র উজাড় করে কুটুমকে আরও 'সম্মান' দেখাল। চিঁড়ের পায়েস এবং 'কেসুরে' পাতার পাতড়াগুলো পেটের মধ্যে মিশে যাওয়ার ফলে আহার থেকে ওঠার সময়ে শ্যালক মহাশয় বিকেলবেলার সেই কাদামাটিপূর্ণ নৌকার মতো জড়পদার্থে পরিণত হল। ভোজশেষে মাদুরে এসে উপবেশন করতেই কুটুমের সামনে হাজির করা হল থালায় করে উৎকৃষ্ট মুচিগুড় এবং ভাজা কাজুবাদামের বীজ। কুটুম্বের যখন বোধ হচ্ছিল যে গুরুভোজনের পরে একটা বালিশ পেলেই একটু কাত হওয়া যায়. ঠিক তখনই শীনময়্য এসে সেখানে পদার্পণ করল। পার্বতী তাদের বাড়ি গিয়েছিল অড়হর ডালের জন্য—স্ত্রীর কাছে এই সংবাদ শুনে শীনময়্য আর কৌতূহল রোধ করতে পারল না। এসেই জনার্দনকে দেখে বলল—'ওহ্ হো, পড়ুমুন্নুরু-র কুটুম এসেছে। খবর নিশ্চয়ই শুভ।'

ঐতাল সোৎসাহে বলে উঠল—'শীন, আমাদের সত্যভামা নাকি একটি শিশুপুত্র প্রসব করেছে। আমার তো সন্দেহ ছিল—ছেলে হবে কি মেয়ে। নরসিংহ ঠাকুরের কৃপায় ছেলেই হল।'

শীন বলল—'আপনিই তো বলেছিলেন ওর ঠিকুজীতে তিনটি পুত্রসন্তানের যোগ লেখা রয়েছে। ঠিকুজীতে লেখার পরে পুত্র কি কখনও কন্যা হতে পারে?' ইতিমধ্যে শীনময়্যর সামনে পান-সুপারীর বাটা এসে হাজির। তার মনটা এবার দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে অবশেষে স্থির করে ফেলল—'প্রথমে কাজুবাদামগুলো ধ্বংস করে অতঃপর তাম্বুলচর্বণ।' 'পড়ুমন্নুরুর কুটুম বুঝি কাজুবাদাম স্পর্শ করেন না' —এই বলে তাকে তুষ্ট করে শীন অর্ধ দণ্ডের মধ্যে শ'খানেক কাজুবাদামের থালাখানিকে একাই খালি করে দিল। বাদাম-সেবার পরে শীন বলল—'ঐতাল, লোকে বলে কাজুবাদাম নাকি 'গরম' বস্তু। কিন্তু কী করি বলুন। পোড়া বাদামগুলো খেতে এতই সুস্বাদু যে মুখ কখনও 'না' করে না।' অতঃপর তাম্বুল-সেবা। শীন বলল—'কুটুম্ব মানুষ বুঝি পান-সুপারীও স্পর্শ করেন না!' এই বলে নিজেই শুরু করে দিয়ে জনার্দনকেও খেতে অনুরোধ জানাল। তামাক পাতা চিবোতে চিবোতে শীনময়্যর নেশা এসে গেল—'যাই হোক না কেন, আমাদের ঐতাল মশাইকে একটা পুরুষ মানুষই বলতে হবে।' অর্ধ-নিদ্রায় গুড় চিবোতে চিবোতে জনার্দন হেসে ফেলল। ঐতালের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না। শীন বলল—'তা নয়। মানে আমি বলছি বাড়িতে ছেলেপিলেদের হৈচৈ না হলে

ভালো লাগে না। তাছাড়া শাস্ত্রে আছে—পিণ্ডদানের জন্য বাড়িতে একটি পুত্রসন্তান থাকা চাইই চাই।'

ঐতাল বলল—'শ্যালকের নিদ্রা এসেছে মনে হচ্ছে। এই বারান্দাখানিতে বেশ ফুর্‌ফুরে হাওয়া আসে। কচি তালপাতার বোনা বালিশ আছে ঘরে। মাথা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম।' এই বলে ঐতাল ঘরে-বোনা মাদুর-বালিশ এনে দিয়ে তার উপর একটা শতরঞ্চি বিছিয়ে দিল। শোয়া মাত্রই শ্যালক মহাশয়ের নিদ্রা এসে গেল।

ঐতাল ও শীনময়্য মুখোমুখি বসে গপ্পো-সপ্পো করতে লাগল। মাঝখানে রেড়ির তেলের দেরখো-প্রদীপ টিম্‌টিম্‌ করে জ্বলছিল। ঐতাল বলে উঠল—'প্রদীপটায় তেলও নেই দেখছি।' শীন বলল—'প্রদীপটা নিভিয়ে দিন। কী কাজে লাগবে ওটা? বাইরে দেখুন চাঁদের আলো যেন দুধ ঢেলে দিচ্ছে। প্রদীপটাকে নিভিয়ে দিয়ে ঐতাল তার শ্বশুরবাড়ির গল্প শুরু করে দিল।

কতক্ষণ পর্যন্ত এই দুজনের 'মহাসভা' চলছিল কে জানে? একসময়ে শীন বলে উঠল—'অনেক রাত মনে হচ্ছে। চোখ দুটো জ্বালা করছে। যাই এখন।' এমন সময়ে সরস্বতী ও পার্বতী নদীর তীর থেকে ফিরে এসে বাড়ির পুকুরে সেদিনের চতুর্থ কি পঞ্চম স্নান সেরে আঙিনায় এসে পা দিল।

শীন জিজ্ঞাসা করল—'কে ওখানে? সরস্বতী মা? এই অন্ধকার রোয়ার মাঠে জল দিতে গিয়েছিলে নাকি?'

সরস্বতী বলল—'না শীনপ্পা, কুটুম এসে পড়াতে তাড়াতাড়ি করে নৌকা-বোঝাই পলিমাটি পাড়ে রেখে আসতে পারিনি। গোবিন্দ জেলে বলছিল—কাল ওকে নৌকা নিয়ে যেতে হবে কল্যাণপুর। ওর কাজের ক্ষেতি হবে। তাই মাটিটা ক্ষেতে ঢেলে দিয়ে নৌকোটা ধুয়ে পরিষ্কার করে ওর বাড়ির কাছে বেঁধে রেখে এলাম। কাদামাটি তো, ছুঁলে পরে চান না করে কি উপায় আছে?'

শীনময়্য তার বাড়ির সুখদুঃখ নিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল। যাওয়ার সময়ে, একটু নস্য সেবা করলে ভালই হত বিবেচনা করে, বলল—'ঐতাল, ঘুমের আজ দফা-রফা মনে হচ্ছে। একটিপ্‌ নস্য দিন দেখি।' কটিদেশ থেকে রূপোর ডিবাটি বের করে ঐতাল উঠোন পর্যন্ত এগিয়ে এল। খানিকটা নস্য নাকে চড়িয়ে, আরও এক টিপ্‌ দু'আঙুলের মধ্যে ধরে শীন বলল—'ঝাঁঝখানা বেশ বাপু।

আমাদের ঐতাল যেমন নস্যি তৈরি করেন, বাজারের ব্যাপারীদের তেমনটি আসেই না।'

ঐতাল বলল—'ব্যবসায়ীরা আর কী নস্যি করবে ? নরম-কোমল আর সুগন্ধি করতে গিয়ে যতটা চুণ দিতে হয় ততটা মাখন মিশিয়ে ঝাঁঝটা নষ্ট করে ফেলে। ওদের ওই নস্যি সাতদিন নাকে দিলে চোখ জ্বালা করবেই।' এইভাবে বাহাদুরী দেখিয়ে ঐতাল গিয়ে বারান্দায় উঠল।

শীনময়্য গৃহমুখী হয়ে অঙ্গুলি-ধৃত আর একটিপ নস্য নাকে ঢুকিয়ে, ঐতাল যে রুপোর ডিবা থেকে নস্য দিয়েছে সেই ডিবাটার কথা মনে করে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল—'আচ্ছা, আচ্ছা, এই বৈদিক বামুন বেলফলের শুকনো খোলা ছেড়ে এই রুপোর কৌটা আবার কবে থেকে ধরল ?' বাড়িতে গিয়ে শুয়ে পড়লেও সারা রাত ওই একই চিন্তা। কেবল তাই নয়, ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখল—তার একটা রুপোর বাঁধানো ডিবা চুরি হয়ে গেছে।

ভোর বেলায় শ্যালক মহাশয়ের জন্য একটা জলযোগের ব্যবস্থা না করলে নয়। সে সব দিনে কফির প্রচলন হয় নি। পার্বতী কিছু চিঁড়ে নিয়ে সরষে-গোলমরিচের ফোড়ন দিয়ে কুটুম্বের সামনে রেখে দিল। শরীরের পক্ষে ঠাণ্ডা বলে মুগডাল সিদ্ধ করে ডালের জলে গুড় মিশিয়ে 'কঞ্জি' করে দিল। ঐতাল সেদিন তাড়াতাড়ি স্নান সেরে বাড়ির ঠাকুরপূজা শীনময়্যর ছেলের উপর বরাত দিয়ে শ্যালকের সঙ্গে জলযোগে বসে গেল। জলযোগ শেষ হতে ঐতাল বলল—'শ্যালক, উদর পরিপূর্ণ। এখন আবশ্যক হলে বেরিয়ে পড়া যায়। আমিও যাব তোমার সঙ্গে। মাসখানেক হল সত্যভামাকে দেখি নি।'

ঐতালের পক্ষে এখানেই থামা সম্ভব হল না। কাল বিকেলে শ্যালক এসে নদীর মাঝে যে অবস্থায় তাদের দেখছে, তার জন্য একটা কৈফিয়ৎ না দিলেই নয়। 'বুঝলে কিনা, আমাদের বাড়িতে, এই ধরো, কৃষিকাজ খিড়কীর বাগানের কাজ এ সমস্ত বরাবর আমরাই করে আসছি। কিসান-টিসান যা দরকার সবই রয়েছে। ওদের দিয়েও কাজ করাতে পারি। কিন্তু কাজে এলেই ফাঁকি। সর্বদা প্রহরা আবশ্যক। চোখ সরিয়েছ কি একখানা কাজ দু'খানা হয়ে যায়। কথা বলে বলে সময় কাটিয়ে দেবে ছাড়া কাজের কণামাত্র এগোবে না। তার চেয়ে কথায় বলে, 'যার যার মাথায় তার-তার হাত' সে-ই ভালো—কষ্ট হলেও

ভালো। এই হচ্ছে আমাদের বুঝ।' একটু দম নিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'শ্যালকদের খাসের জমি কতটা ?'

'আমাদের কী জানেন, বাবার ঘুরে ঘুরে দেখাশোনা করার সুবিধা হয় না। বাতের মানুষ। কাজেই যা আসে আসুক—এই ভেবে সমস্ত জমি বর্গায় দিয়ে দিয়েছেন।'

'তাহলে বাড়িতে বিনা কর্মে বসে বসে সময় কাটানো হয় কী প্রকারে মহারাজ ? তোমার বাবার যাই হোক, তোমার এই অল্প বয়স। যা হোক একটা খিড়কীর বাগান করে জমিটার সুজুত করতে পার।'

'আমার ইচ্ছা কারকুনের কাজ করি।'

'তোমাদের পরিবারে কি কারকুনগিরির স্বত্ব আছে নাকি ?'

'আমাদের পরিবারে নেই, আমাদের এক আত্মীয়ের আছে। নগদ পঁচিশ টাকা দিলে ওটা আমাদেরই হবে, এই আর কি !'

'কারকুন হতে পারলে তো বেশ ভালই। সম্মানে সম্মান, পয়সায় পয়সা। কারকুন থাকাকালীন যেমন করে হোক তোমাদের বাড়ির পশ্চিম দিককার সরকারী বনটা দখল করে ফেলো দেখি। আজ না হোক, পঞ্চাশ বছরে অন্তত ওর দাম হবে।'

এইভাবে তরুণ শ্যালককে বুদ্ধি-পরামর্শ দিতে দিতে ঐতাল পড়ুমুন্নুরু গিয়ে পৌছল। শ্বশুরালয়ে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে কানে এলো নবজাত শিশুকণ্ঠের চিৎকার। ঐতাল নিজে নিজেই বলল—'ছেলেটা এত কাঁদছে, কারও খেয়াল নেই বুঝি ?' সঙ্গী শ্যালক এর কী উত্তর দেবে ?

শ্বশুর মহাশয় ঐতালকে স্বাগত জানালেন। অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে দৌহিত্রের জন্মবার্তা জামাতা বাবাজীকে নিবেদন করা হল। ঠিক সেই মুহূর্তে রজক-রমণী উষ্ণ করা জলে শিশুকে স্নান করিয়ে বাড়ির ভিতর নিয়ে যাচ্ছিল। নির্নিমেষ নয়নে শিশুপুত্রের দিকে তাকিয়ে কান্নার হেতুটা বুঝতে পেরে ঐতাল এই বলে নিশ্চিন্ত হল—'ও, স্নান করানো হচ্ছিল ?' শ্বশুর মশাই জিজ্ঞাসা করলেন—'ঐতাল, ছেলে কার মতো হয়েছে—আমাদের সত্যভামার মতো, না তোমার মতো ?'

ঐতাল বলল—'দেখলে তো সত্যভামার মতোই মনে হয়।'

এমন সময়ে সেখানে শাশুড়ী ঠাকরুন এসে বললেন—'তা মনে হতে পারে কিন্তু ছেলের চোখ দুটি ঠিক তোমারই মতো।'

*   *   *   *

বলাই বাহুল্য, পুত্রের মুখদর্শন করে ঐতালের খুশির আর সীমা নেই। বাড়ি ফিরে জাতকের জন্ম-নক্ষত্র ইত্যাদি বিচার করে ঐতাল পুত্রের নামকরণ করে—লক্ষ্মীনারায়ণ। নামকরণের মুহূর্ত থেকেই 'লক্ষ্মীনারায়ণ' সংক্ষিপ্ত হয়ে 'লচ্চ'-তে পরিণত হল, যদিও জন্মপত্রিকার পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ হয়ে রইল পিতৃদত্ত পূর্ণ নাম।

ঐতালের একান্ত ইচ্ছা এক মাস পরেই শিশুপুত্র সহ সত্যভামাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসে। শ্বশুরালয়ে সেইমর্মে খবর পাঠানো হল। এতদিন পরে আষাঢ় মাসের সমুদ্রের মতো ঐতালের হৃদয়ে পুত্র-বাৎসল্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। কিন্তু গোল বাধাল সরস্বতী। বলল—'কথায় বলে, 'সারা গাঁয়ের এক পথ, অন্ধ চলে ভিন্ন পথ', তোমার হয়েছে সেই দশা। প্রসূতি মায়ের বাড়িতে থাকবে তিনমাস এই হল নিয়ম। তাও আবার প্রথম প্রসূতি। একমাস যেতেই তাকে নিয়ে আসবে? নিয়ে আসার কী শুভ সময়! জষ্ঠি মাসের বিষ্টি, ধরলে কি আর ছাড়ে?'

ঐতাল বলল—'জ্যৈষ্ঠ মাস পার হয়ে গেলে অশুভ আষাঢ় মাসে আনা সমীচীন হবে কি?'

সরস্বতী বলল—'আষাঢ়-শ্রাবণ দুটো মাসই কেটে যাক। বর্ষার দৌরাত্ম্যি শেষ হোক। ফসল কাটার পরে আনলেই ঠিক হবে। আমি বলি কি, নবরাত্রির প্রতিপদেই নিয়ে আসা ভাল।' ঐতালকে অগত্যা সরস্বতীর মতেই সায় দিতে হল।

সত্যভামার চিন্তায় বর্ষাকালের সেই তিনটি মাসে ঐতালের যে কী ভাবে কাটল তা কেবল পরমাত্মাই জানেন। নবরাত্রির প্রতিপদের পনেরো দিন আগে থেকেই ঐতালের ভাবনা শুরু হয়ে গেল—'শিশুর দোলনাটা কোথায় বাঁধা যায়? কাঁঠালের তক্তা দিয়ে বেশ ভাল দেখে একটা দোলনা বানানো দরকার।' রান্নাঘরের চৌকনায় খানিকটা জায়গা নারকেল পাতার চাটাই দিয়ে শিশুগৃহ তৈরি হল। গ্রামের দীর্ঘসূত্রী হমু ছুতোরকে ডাকা হল দোলনা তৈরির কাজে। আটদিন ব্যাপী নানা কারুকার্যের পরে কাঁঠাল কাঠের দিব্য দোলনাটি শেষ হলে সরস্বতী বেশ তারিফ করে বলল—'এই দোলনা ঝোলাতে হলে কোটীশ্বরের রথের দড়িই দরকার হবে দেখছি।' ঐতাল ন্যাড়া কাঠামোটার দিকে তাকিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে বলল—'ওহে ছুতোর, তোমার বুদ্ধির বলিহারি। দোলনার

ফলকের উপর একটা সূর্য কি চন্দ্র-টন্দ্র না বানিয়ে খালি ফলকটাই জুড়ে দিয়েছ, অ্যাঁ?' পুনরায় জোড়-লাগানো খিলগুলো খুলে ফেলে ফলকের উপর সূর্য-চন্দ্রের নক্‌শা ফুটিয়ে তুলতে হনুছুতোরের পাকা দুটো দিন লেগে গেল।

হনুছুতোর বয়সে বুড়ো এবং কাজে-কর্মে ঢিলা হলেও জিভখানি তার বাটালির মতোই ধারালো। দোলনার বাহানায় দশ দিন কাটাবার পরে একদিন সে ঐতালকে ধীরে ধীরে বলল—'ঠাকুর মশাই, আপনার বারান্দায় চাল রাখার জন্য একটা সিন্দুক থাকা দরকার। সিন্দুক না হলে বারান্দার শোভা হয় না। ধরুন গিয়ে, আপনার ঘরের পেছনে কাঁঠাল গাছ তো রয়েইছে। ওটা এঁকেবেঁকে বড় হয়েছে বলে ওতে আর তক্তা হবে না। ওর গুঁড়িটা দিয়ে বেশ মজবুত একটা সিন্দুক হতে পারে।' ছুতোরের কথায় ঐতাল রাজী হয়ে গেল।

রাত্রিতে আহারের সময়ে সরস্বতী তার দাদাকে ভর্ৎসনা করে বলল—হনু ছুতোরের কথা শুনে কাঁঠাল গাছে তোমায় কুড়ুল মারতে হবে না। কিছু না হলেও গোটা পঞ্চাশেক কাঁঠাল বছরে পাওয়া যায়। সরু কাঁঠাল বটে, কিন্তু খেতে সোয়াদ আছে। ওর আর কী? একটা সিন্দুকের অছিলায় দুমাস ধরে খোরাকীর ফিকিরে আছে।'

'কিন্তু ওকে যে বলে দিয়েছি কাল আসতে। একটা হিসাব করতে হবে।'

'কিছুরই দরকার নেই। হিসাব-টিসাবে কাজ নেই। ও যা বলবে তাতেই কি সায় দিতে হবে? তুমি কাল ভোরে উঠে পডুমুন্নুরু গিয়ে বলে এসো—অমুক দিনে সত্যভামাকে পাঠিয়ে দেবেন। ছুতোর এলে আমি তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেব।'

সরস্বতীর পরামর্শে কাজ হল। হনু ছুতোরের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে পরদিন সকালেই ঐতাল শ্বশুর বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে কাশতে কাশতে হনু ছুতোর এসে উপস্থিত হলে সরস্বতী শান্ত কণ্ঠে বলল—'ছুতোর, বেশ ভাল পরামর্শ তোমার। বছরে কয়েকটি এঁচড়ের ডালনা হত আর গোটা পঞ্চাশেক পাকা কাঁঠাল পাওয়া যেত সে সব শূন্য করবে বলে এসেছ, কেমন? আমাদের সিন্দুকেও কাজ নেই, ফিন্দুকেও কাজ নেই। বাড়িতে ফটক লাগাবার পরে সিন্দুক। যাদের ফটক নেই, তাদের আবার সিন্দুক কেন?' এই বলে ছুতোরকে বিদায় করল।

* * * *

ঠিক নবরাত্রির প্রথম দিনে সত্যভামা ও লক্ষ্মীনারায়ণ বাড়িতে এল। পাড়া প্রতিবেশী এবং বাড়ির সকলেই লক্ষ্মীনারায়ণকে 'লচ্চ' বলে ডাকে। বাড়িতে আসার একবছর পর্যন্ত এই তর্কের মীমাংসা হল না যে ছেলে তার মায়ের মতো হয়েছে, না বাপের মতো। এক একজন এক একরকম মত দিচ্ছে। কেউ কেউ বলছে—'হুবহু কোদণ্ড ঐতালের মতো মুখ।' এইভাবে ঠাকুরদার সঙ্গেও ছেলের সাদৃশ্য আবিষ্কারের চেষ্টা হল।

সত্যভামা শুভক্ষণেই বাড়িতে এসেছে। তা না হলে সরস্বতী বার বার বলা সত্ত্বেও যে বাড়িতে কোনদিন দুধের ব্যবস্থা হয় নি, সত্যভামার আসার কিছুদিনের মধ্যেই সেখানে দুগ্ধবতী গাভী কী করে আসে? ঠাকুরের কৃপায় প্রসূতি সত্যভামার দুধ পানের কোনো অসুবিধা থাকল না ভেবে ঐতাল খুব খুশি হল।

যতই দিন যাচ্ছে, লচ্চর আদর সোহাগ ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। পার্বতী কি সরস্বতী, ছেলের বাবা কি মা—তাদের কারও পছন্দ নয় শিশু-পুত্রকে কোল ছেড়ে মাটিতে রাখা। এতদিন পর্যন্ত চেপে-রাখা প্রীতি বাৎসল্যে ঐতালের বুক ভরে এল। সকলকেই সে কবিরাজের মতো উপদেশ বিতরণ করছে—'লচ্চর শরীরে যেন হাওয়া না লাগে, রোদ না লাগে, ঠাণ্ডা গরম কোনোটাই না লাগে।'

আজকাল ঐতালের দৈনন্দিন কার্যক্রমেও একটা নতুন ধরনের খেয়াল দেখা যাচ্ছে। যে-সব দিনে পূজা পার্বন থাকে না, ঐতাল তখন দ্বিতীয়া ভার্যার সঙ্গে বেশ বৈঠকী আলাপ জুড়ে দেয়। একটা খুঁটিতে ঠেস দিয়ে বসে কর্তা স্বয়ং, অল্প দূরে দেয়ালে হেলান দিয়ে উপবিষ্টা সত্যভামা, আর দুয়ের মাঝখানে মাদুরের উপর ঘুমন্ত শিশু। পুত্রের জন্য সত্যভামা রানীর পাটে অভিষিক্ত হয়েছে বললেও ভুল হবে না।

লচ্চরের জন্য একটি সোনার কটিসূত্র তৈরি হয়েছে। সেদিকে দৃষ্টি রেখে ঐতাল সগর্বে বলে—'আমাদের লচ্চরের বোটরটা দেখলে সকলেরই পছন্দ হবে, কী বল?' শীনম্যয় এবাড়িতে যখন-তখন আসে। কাজেই বোটরটা তার নজরে না এসে পারল না। স্বামী-স্ত্রীর সামনে দুজনকেই খুব প্রশংসা করে, নানাবিধ রঙ্গ রস করে শীনম্যয় পাঁপড়-বড়া আদায় করে নেয়। কিন্তু আড়ালে গিয়ে তার মনে শান্তি নেই। বন্ধুবান্ধবের কাছে বলে বেড়ায়—'দেখলে, গাঁয়ের বাবুদের ঘরে

ছেলেপিলের কোমরে নেই রুপোর বোটর। আর এই বাঁকা বৈদিকের একটা ছেলে হয়েছে বলে তার চাই সোনার বোটর ?'

ঐতাল যখন বলে—'শীন আমাদের ছেলের কটিসূত্রটি কেমন দেখছ ?' শীন বলে—'আজ্ঞে, বস্তুটি তো সোনার। যদি বলেন কেমন হয়েছে, আমি বলি কি যেমন ছেলে তেমন বোটর।' পরক্ষণেই শীন সাবধান বাক্য উচ্চারণ করে—'কী জানেন, সোনার বোটর রাখা ঠিক নয়। একটা চোখ তাহলে ওর উপরেই রাখা চাই। ছেলেপিলের গায়ে সোনাটোনা থাকা কখনই নিরাপদ নয়।'

প্রত্যুত্তরে ঐতাল পরিহাস করে বলে –'কেন হে, কাবুলিওলাগুলো এদিকে আসে-টাসে নাকি ?'

আট

আজকাল ঐতালের বাড়িতে শীনময়্যর যাতায়াত বেশ বেড়ে গেছে। এসেই প্রথমে লচ্চরের কুশল প্রশ্ন, অতঃপর সত্যভামার স্তুতি। অবশেষে তার পারিবারিক জীবনের নানা দুঃখ কষ্টের কাহিনী। এই হল শীনের দৈনন্দিন কার্যক্রম। তার অভাব-অভিযোগ নাকি একা একা আসে না, আসে একবারে উপযুপরি। সকাল বেলা একসের চাল দরকার হয়ে পড়ল, সন্ধ্যাবেলা দু'পোয়া কলাই ডাল না হলে উপায় নেই, পরদিন গোটা পঞ্চাশেক নারকেল পাতার চাটাই, তার পরদিন গোরুর ভূষি—এইভাবে শত শত বাহানা করে মাগনের আর শেষ নেই। ঐতালের বিবাহ উপলক্ষ্যে এই দুজনের যে ঘনিষ্ঠতা শুরু হয়, ক্রমশঃ তা বেড়ে গিয়ে গিয়ে এখন শীনময়্যর ভিক্ষাবৃত্তি ও ভিক্ষাপূর্তি একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। অপরাহ্নে কোথাও থেকে ঐতাল দুটো বেগুন নিয়ে আসছে দেখলে সন্ধ্যার মধ্যেই শীন এসে সত্যভামার কাছে খেঙাতে থাকে—'এই কলাইর টক্, কাঁঠালের বীচি আর শশার সাম্বার্ খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে গেছে। একটা বেগুন দি'ও তো সত্য-মা।' প্রার্থিত বস্তু না পাওয়া পর্যন্ত শীনের পাঁচালী আর শেষ হতেই চায় না।

কিন্তু একটা বিষয়ে শীনের প্রশংসাই করতে হয়। সরস্বতী ও পার্বতী থাকতে সে বড় আসে না। এলেও অন্যকথা পাড়ে। ওরা কখন মাঠে কিংবা সমুদ্রের দিকে যায়, সেই সময়টা খুঁজে খুঁজেই শীন এসে হাজির হয়। এবং এসেই সত্যভামার গাল-ভরা খোসামুদি করে চাহিদার ফিরিস্তি শোনায়। ঘরে না থাকলেও সত্যভামাকে তার ব্যবস্থা করে দিতে হয়।

এত যাতায়াত সত্ত্বেও ঐতালের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে শীনের সম্যক ধারণা এখনও হয় নি। ঐতালের কাছে পয়সা-দু'পয়সা, বড় জোর আনি-দুয়ানি ছাড়া সিকি আধুলিও যে থাকতে পারে এরকম বিশ্বাস শীনম্যয়ের ছিল না। সে জানত বৈদিক বামুন এখানে-সেখানে দুএক পয়সা কুড়িয়ে বাড়িয়ে কোনোরকমে জীবিকা নির্বাহ করছে। কিন্তু বিয়ের সময়ে অতটা ধূমধাম করা এবং সেজন্য একটি পয়সাও ধার-না-করা শীনের পক্ষে খুব বিস্ময়কর বোধ হল। ভাবল—এই ব্রাহ্মণ কোথাও-না-কোথাও শ'খানেক টাকা ঘড়ার মধ্যে পুঁতে রেখেছিল। কিন্তু

বিয়ের খরচ মেটাবার পরে সেই টাকার একটি পয়সাও যে উদ্বৃত্ত থাকতে পারে না—একথাও শীনের মনে হল। বছর খানেক পরে যেদিন ঐতাল শ্যালকের সামনে তার রুপোয় বাঁধানো নস্যের ডিবাটা রেখেছিল, সেদিন শীনের মনে হল—হুঁ, ঐতালের কোনো চিন্তা-ভাবনা নেই দেখছি। লচ্ছ বাড়ি আসার পরে একদিন তার কোমরে সোনার বোটর দেখে শীনের সন্দেহ খুব প্রবল হল। একদিন সে জিজ্ঞাসাই করে ফেলল—'এই সোনার বোটর কি ছেলের দাদুর দেওয়া?' 'না, ছেলের বাবা দিয়েছে'—এই নিশ্চিত উত্তর শুনে ঐতালের ব্যাপারে শীনের ধারণা খুব উঁচু হয়ে গেল। ভাবল—'এই লোকটি তাহলে ফাঁপা নয়, বেশ শাঁসাল।' শীন কিন্তু এখানেই ক্ষান্ত হল না। সে হিসাব করতে লাগল—কোদণ্ড ঐতাল মারা যাওয়ার পর রাম ঐতাল পুরুতগিরি শুরু করেছে আজ কত বছর হল, কত তার যজমান-শিষ্যের সংখ্যা প্রতি বছরে শ্রাদ্ধ-উপনয়ন বিবাহের সংখ্যাই বা কত, তার থেকে প্রাপ্ত নগদ দক্ষিণা কত হতে পারে। একে একে এই সমস্তই চিন্তা করল শীন। 'এই হিসাব মতে ওই ব্রাহ্মণ এক হাজারেরও বেশি টাকা সঞ্চয় করে থাকবে। তাই যদি হয় তবে শ'দুয়েক টাকা আমাকে ধার দিলে এমন কী ক্ষতি?' এই সিদ্ধান্তের পরদিন থেকে শীন ঐতালের বাড়ি গিয়ে লবণ, তেঁতুল, লঙ্কা, বেগুন প্রভৃতি ধার নেওয়া একদম বন্ধ করে দিল।

অতঃপর প্রতিদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে ঐতালের বাড়িতে হাজিরা দেওয়া শীনময়্যের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। সে জানে—স্বামী-স্ত্রীর গল্পগুজব করার এই-ই সময়। এলে পরে তার মুখ কি আর বন্ধ থাকতে পারে? 'ঐতাল, আপনার স্ত্রীর রান্নার হাত নল রাজার মতোই বটে। সেদিন যে সেদ্দ করলার চাটনি বানিয়েছিল, ওরকম একটা চাটনিই আজ পর্যন্ত খাই নি। এমন কি উড়ুপির বিশেষ 'চৌকি আহারে'ও এমনটা করতে পারে কিনা সন্দেহ। কেবল চাটনি নয়, সত্য-মা খালি জলে সর্ষে-লঙ্কার ফোড়ন দিলেও তা ফরমায়েশি টক্‌কে হার মানায়।' এই বলে শীন খোসামুদি শুরু করে দেয়।

মাঝে মাঝে ঐতাল খুশি মনে শীনের কথায় সায় দেয়—'দেখো শীন, রান্না-বান্নার কাজে পার্বতী-সরস্বতীও কম নয়। রান্না ওরা করে বটে, কিন্তু ওই কোনোরকম। সোয়াদ বলে কিছু নেই। সত্য আদৌ সে-রকম নয়। সে যা রান্না করে, তার সামান্য টুকরোটুকু ফেলতেও মন চায় না। ও রান্নায় হাত

দেবার পর থেকেই আমি ঘরে খেয়ে তৃপ্তি পাচ্ছি। আমার দেখ পোড়া বৈদিকের মুখ। নানা বাড়িতে ভালো ভালো খেয়ে এমন-তেমন রান্না আর মুখে রোচে না। তবু সত্যর রান্না একটা দিনের তরেও অরুচিকর হয় নি।' এইভাবে স্ত্রীর প্রশংসায় ঐতাল পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে।

ঐতালের কথায় শীন আবার যোগান দেয়—'তা যা বলেছেন। আমি কিন্তু সেই দিনই বুঝতে পেরেছি—সত্যমা, সেটা কী বার?—সেদিন যা একটা ছোলার ডালের পায়েস হয়েছিল, আমি মরে গেলেও তার স্বাদ ভুলতে পারব না।'

শীনময়্য ভালো করেই জানে—এই ভাবে যদি সত্যভামার গুণগান করা যায়, তবে ঐতালের উপর তার প্রভাবটা কীরকম হবে। লচ্চকে দেখলে শীনের স্নেহ উথলে ওঠে। মনে হয় যেন নিজের ছেলেপিলের চেয়েও সে বেশি আদরের। মাঝে মাঝে সত্যভামা কিছুটা আড়ালে থাকলে শীন তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে অথচ বেশ ফিস্‌ফিস্ করে বলতে থাকে—'শুনুন ঐতাল, ওঁরা হলেন পডুমুন্নুরুর লোক। ওঁরা, মানে আপনার শ্যালক ও শ্বশুর মশাই, কোনোদিন খন্তা-কোদালও ধরেন নি, ফসলের জমিতে পলিমাটিও টানেন নি। আপনার সত্যভামার কথা বলছি—এই কন্যান-কোডি গ্রামের মেয়েদের মতো কোনোদিন ক্ষেতে-খামারে কাজ করেছেন কি? করেন নি। কাজেই আপনিও ওঁকে দিয়ে মাটি, সার এসব টানাবেন না।' প্রত্যুত্তরে ঐতাল গম্ভীর হয়ে বলে—'শীন আমাকে একটা ভূত-প্রেত বলে ঠাউরেছ নাকি? বড় ঘর থেকে মেয়ে আনতে জানি, আর তাকে কীভাবে রাখতে হবে তা জানি না বলতে চাও?'

সত্যভামা যেদিন এ বাড়িতে পা দিয়েছে, সেদিন থেকেই ঐতালের মনে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমস্যাটা হল—সরস্বতী ও পার্বতী যেমন চাষের কাজে জল সেঁচার ডুনি চালায়, পলিমাটি বহন করে, ধানের চারা রোপণ করে, সত্যভামাকেও সেই সব কাজের কথা বলা উচিত কিনা। তার বড় বৌ যখন মাঠের মধ্যে রোদে পুড়তে থাকে, তখন ছোট বৌকে বারান্দার শীতল ছায়ায় বসিয়ে রাখা সমীচীন কি না—এই হল সঙ্কোচ। সতীন যখন বাইরে খেটে মরছে, তখন সেই কেবল ঘরের মধ্যে বসে থাকবে—এটা ঠিক নয় বুঝতে পেরে সত্যভামাও বাইরে যেতে চায়। 'দরকার নেই' বলতে ঐতালের মুখে বাধে। তাই একটু কৌশল করে তাকে বলতে হয়—'তোমাদের একজন লচ্চকে দেখো,

বাকী তুজন সেচের কাজে যাও। স্বামীর কথা শুনে পার্বতী বলে, 'সত্য, তুমি ছেলেকে দেখো।' এই বলে তাকে ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

ঐতাল বসে বসে সত্যভামার সঙ্গে কথাবর্তা বলে। বিয়ের পরে প্রৌঢ় গৃহকর্তার মনে এই একটা ধারণা দিনে দিনেই বদ্ধমূল হতে থাকে—সত্যভামা যেমন যুবতী, সে নিজেও তেমনি যুবক। যে-কোনো বাহানায় সে নিজেও জল সেঁচার কাজে না গিয়ে তরুণী স্ত্রীর সঙ্গে কষ্ট-নষ্ট আলাপের জন্য ঘরের মধ্যেই থেকে যায়। তার এই পক্ষপাত সরস্বতীর অগোচর থাকে না। বাড়ির জামাকাপড় কেনার সময়ে বড় বৌ-এর জন্য ছ-সিকার শাড়ী আসলে, ছোট বৌ-এর জন্য নিয়ে আসে কমপক্ষে তুটাকার শাড়ী। বিদ্রূপের ভঙ্গীতে সরস্বতী দাদাকে প্রশ্ন করে—'ওটার দাম কত? এটার?' এছাড়া আছে সত্যভামার বাপের বাড়ির কাছে ঐতালের ফুটানি দেখাবার চেষ্টা। এই সব নানা কারণে ঐতালের পুরানো ও নতুন দাম্পত্য জীবনের মধ্যে একটা পার্থক্য দিনে দিনেই বেড়ে যেতে থাকে।

তার এই নতুন দাম্পত্যজীবনে সমর্থন যোগাবার মতো একজন লোকই আছে। তার নাম শীনময়্য। ইতিমধ্যে সে ঐতাল সত্যভামার কাছে তু'শ টাকা ধার চেয়ে বসেছে; ঐতাল অবশ্য শীনকে উপদেশ দিতে কসুর করেনি—'দেখো শীন, কর্জ মানে শূল। কা প্রয়োজন? দরকার নেই।' শীন পাঁচ শ প্রয়োজনের ফর্দ দিয়ে বলল—'ঐতাল, আমাকে যদি বিশ্বাস না হয়, তুজন বিশ্বস্ত লোককে সাক্ষী রেখে হ্যাণ্ডনোট্ লিখিয়ে নিলেই হবে।' ঐতাল নিরুপায় হয়ে শতকরা তিন টাকা সুদে তু'শ টাকাই ঋণ দিল।

ছ'মাস না যেতেই ঋণ নেওয়ার আসল উদ্দেশ্যটা স্পষ্ট হল। তখনকার দিনে কোডিগ্রামে ঘরের চালে টালি দেবার মতো কেউ ছিল না। সকলের ঘরেই খড়ের চাল। গাঁয়ের লোকের বিশ্বাস ছিল যে সমুদ্রের হাওয়ায় টালি টেঁকে না। ছেলের কোমরে সোনার বোটর চড়িয়েছে যে রাম ঐতাল, তার পক্ষেও কিন্তু ঘরের চালে টালি চড়াবার চিন্তা আসেনি। ইতিমধ্যে শীনের তুরাকাঙ্ক্ষা হল—গাঁয়ের মধ্যে টালির ছাদ বানিয়ে জাঁক দেখাবে। বস্তুত, ঐতালের দ্বিতীয় বিবাহের বরযাত্রার সমারোহ দেখে শীনের আকাঙ্ক্ষা জেগেছিল আর একবার বিয়ের পিঁড়িতে বসার। কিন্তু তার স্ত্রী বাগ্‌দেবী ঐতালের পত্নী পার্বতীর মতো বোকা-সরল নয়। দরকার হলে স্বামীর কান মলেও তাকে

শোধরাতে পারে। কাজেই শীনের নাম কেনার উৎকট আকাঙ্ক্ষা অন্য পথ ধরল। বড় ঘরের সামনে উত্তরমুখী করে একটা ফটকওয়ালা বারান্দা বানানো দরকার। বারান্দার ভিত ও দেয়াল মাটির হলেও খুঁটি ও দরজা হবে কাঁঠাল কাঠের। হনু ছুতোরকে দিয়ে কাঠের কাজ করিয়ে উপরে টালি ছেয়ে দিলেই হল। তা বলে ওই দেশি টালি, মানে, কুমোরের খাপড়া নয়। তিন নম্বর তো তিন নম্বরই সই, কিন্তু কিনতে হবে মংগলুরের টালি—যা নৌকায় করে নিয়ে আসে হংগারকট্টে বন্দরে। বাড়ির চারিদিকে এলোমেলো হয়ে যে তালগাছগুলো বড় হয়ে উঠেছে, সেগুলোকে কাজে লাগালে বারান্দার চালের আড়া দেওয়ার সমস্যা মিটে যাবে।

ঐতাল ধার দিতে রাজী এইরূপ ভরসা পাওয়ার দিনই শীনময়্য গৃহনির্মাণের কাজে হাত দিল। সে নিজে তার স্ত্রী এবং ছেলেরা—সকলে মিলে প্রত্যহ অবিরাম মাটি টেনে টেনে তাদের পুরোনো ঘরের সামনে একটা ভিত বানিয়ে ফেলল। মাটি মিলিয়ে পিটিয়ে নিজেদের হাতেই তারা মেঝেটা মজবুত করে বানাল। কেবল দেওয়ালগুলো তৈরির সময়ে মাত্র একজন ঘরামির সাহায্য নিতে হল। কিন্তু ফটক তো এমনি-এমনি হয় না। কাঁঠালের চৌকাঠ, খুঁটি, পাল্লা ইত্যাদি দরকার। ফটকের স্বপ্ন আরম্ভ হওয়ার পর থেকেই শীনময়্য খোঁজে থাকল কোথায় কার বাড়িতে কাঁঠাল গাছ কিংবা গাছের গুঁড়ি পাওয়া যায়। একদিন বারকূর গ্রামে গিয়ে সেখানে কোনো এক ব্যক্তির কাছে খোঁজ পেল যে ওখান থেকে তিন মাইল দূরে কোনো এক লোকের বাড়িতে কাঁঠালকাঠ তৈরি করাই আছে। সেদিন সন্ধ্যাকালেই সেই গ্রামে সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলল। নগদ টাকায় দাম দেওয়া তার মনঃপূত নয়। নিজের বাড়ি থেকে দশটা তাল গাছ কাঁঠাল কাঠের মালিকের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার কড়ার করল। চুক্তির এক সপ্তাহের মধ্যেই তালগাছগুলো কেটে কোডিগ্রামের কয়েকজন মাঝিকে ধরে-পড়ে সেই কাটা তালগাছ তাদের নৌকায় বেঁধে নদীতে ভাঁটার জলের অপেক্ষা করে একরাত্রির মধ্যে সেগুলো যথাস্থানে পৌঁছে দিল। পরদিন তার প্রয়োজনীয় কাঁঠালগাছও পাওয়া গেল এবং একইভাবে নৌকায় বেঁধে কাঁঠাল কাঠ বাড়িতে হাজির করা হল।

এখন চিন্তা হল—কাঠের কাজের জন্য কাকে ধরা যায়। এ গ্রামে তো নামকরা যায় এমন ছুতোর দুজন মাত্র—হনু ছুতোর ও লগপ্পা ছুতোর। দীর্ঘসূত্রী

অলক্ষুৰ হতু ছুতোরকে দিয়ে কোনো কাজ হবে না বুঝে শীনময়্য তাড়াতাড়ি অল্পবয়স্ক লগপ্পা ছুতোরের বাড়ির দিকে পা বাড়াল—কর্জ আদায়কারী ব্যক্তি যেমন ব্যাকুল হয়ে ছোটে তেমনি। অর্ধেক মজুরী এবছর, বাকী অর্ধেক ভগবানের ইচ্ছা হলে আগামী ফাল্গুনের ফসলের সময়ে দেওয়া হবে—এই চুক্তিতে ছুতোর মিস্ত্রিকে রাজী করিয়ে সদর দরজায় খুঁটি-চৌকাঠ-পাল্লা ইত্যাদি চড়ানো হল।

ওদিকে ঐতালের দুশো টাকা হাতে আসার পরদিনই শীনময়্য হংগারকট্টে বন্দরে গিয়ে হাজির। প্রতিটি মহাজনকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল—'হাজার দুই টালির দর কী পড়বে?' বন্দরে যে সমস্ত ঘাসী নৌকা যাতায়াত করে সেগুলোর প্রত্যেকটি মাঝির সঙ্গে কথাবার্তা বলে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল যে, এই চোরা মহাজন বেটারা সব একরকম পরস্পরের সঙ্গে সলাপরামর্শ করেই ওর দর ফেলে। কোনো রকমে অর্ধেক দাম নগদে, অর্ধেক ছ'মাসের ওয়াদা করে টালি কেনা হল। এখন সেগুলো নিয়ে আসার জন্য বালিয়াড়ির জেলেনৌকার মাঝিদের ধরাধরি করতে লাগল। মোট কথা, শীনময়্যর ফটক-বারান্দার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত গ্রামের কামিলাদের চোখে আর নিদ্রা ছিল না। দরজা ইত্যাদি বানাতে গিয়ে লগপ্পা ছুতোরের প্রাণ ওষ্ঠাগত। মিস্ত্রী বলল—'শীনপ্পা, একটি 'যখিনী' ধরলেও এড়ানো যায়, কিন্তু আপনার তাগাদা এড়ায় কার সাধ্য? আমি বলি কী সাদা কপাটই যথেষ্ট।' শীন সে কথা শোনার পাত্র নয়। বলল—'শোনো মিস্ত্রী, দরজায় মকরের মুখ, পদ্মফুল, একজোড়া টিয়ে পাখি—এ সমস্ত না বানালেই চলবে না।' 'আজ্ঞে, কাজের মজুরী কিন্তু বেড়ে যাবে।' শীন রঙ্গ করে লল—'ওহে মিস্ত্রীর পো ওসব ভয় আমায় দেখিও না। আমি কাঠ এনেছি নিগাঁঠ। একটা গাঁঠ বের করো তো। মাখন কাটার মতো কাঠ বেরিয়ে আসবে।

এক রাত্রির মধ্যে বাপ-বেটারা মিলে চালের উপর টালি ছাইয়ে, পুনরায় খুলে, পুনরায় বিছিয়ে খুলে, আবার বিছিয়ে কাজ শেষ করল। দূর থেকে ফটক-বারান্দাটা কেমন দেখাচ্ছে ভেবে শীনময়্য মাঠে নেমে নদীর পাড় পর্যন্ত হেঁটে গেল। 'থুঃ, রাতের টালির ছাদই বা কি, খড়ের চালই বা কী—সব এক। ভোর হলেই একবার দেখতে হবে।' রাতে শুয়ে পড়ল বটে, কিন্তু ঘুমটুম কি আর আসে? ভোরবেলা দন্তধাবনের পূর্বেই নদীর পাড়ে গিয়ে আর একবার দাঁড়িয়ে

সূর্যোদয়ের মুহূর্তে নতুন ঘরখানির দিকে তাকাল। 'বাঃ, যেন রাজপ্রাসাদ'—এই রকম একটা তৃপ্তির সঙ্গে বাড়ি ফিরতে ফিরতে শীনের মনে হল—একবার পলেস্তারার কাজটা হয়ে যাক না, আমাদের পারম্পল্লীর বাসুদেব বাবুর বাংলোকেও হার মানাবে।

ছাদের পলেস্তারা শেষ হয়ে গেলে একদিন বড় ছেলে নরসিংহ কোটরের হাট থেকে একটা নতুন খবর নিয়ে এল—'বাবা, আমাদের টালির ছাদ কতদূর থেকে দেখা যায় জানো? উত্তরে তিক্কটে, দক্ষিণে হংগারকট্টে, আর পূবে একেবারে সাস্তাবু থেকে।' এই খবর শুনে শীনময়্যের যে আনন্দ হল তা একটা অশ্বমেধ যজ্ঞ করার আনন্দের তুল্য।

একদিন ঐতাল নদীর পূবদিকের একটা গ্রামে বৈদিক কার্যাদির জন্য গিয়েছিল। সত্যভামার কথা মনে হওয়াতে সন্ধ্যার আগেই সে গৃহাভিমুখে রওনা হল। নদী পার হওয়ার জন্য জলের মধ্যে পা দিয়েছে—এমন সময়ে চোখ তুলতেই দেখা গেল তাদের সমুদ্রতীরে একটা নতুন টালির চাল। 'এটা কার বাবা? আমাদের বালিয়াড়িতে আবার টালির ছাদ করল কে?' এই ভেবে বিস্মিত হল ঐতাল। নদী পার হয়ে বাড়ির দিকে রওনা হলেও তার পা দুখানা আপনা থেকেই সেই নতুন ছাদের দিকে চলতে থাকে। 'কার হতে পারে এই বাংলো?'—এই কথাটা জানার জন্য সে খুব অধীর হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে তার রোয়ার ক্ষেতের কাছে গোটা কয়েক গোরু চরে বেড়াচ্ছে দেখে সেগুলোকে তাড়াতে গিয়ে ঐতাল টালির ছাদ ভুলে গিয়ে বাড়ি এসে পৌঁছল।

একদিন কেন জানি না, ঐতালের মনে পড়ে গেল, শীনময়্যের কথা। "সত্য, আমাদের শীন সেই যে টাকা নিয়ে চলে গেল, তার পরে তো আর এদিকে মুখ দেখায়নি। টাকাটা ফেরত দেবে তো, না কি?" ঠিক সেই মুহূর্তে সদর দরজা পেরিয়ে শীন উঠানে এসে হাজির হল। কথাটা তার কানে যেতে বলল—'ঐতাল, শীন আছে না গেছে—এই তো আপনার সন্দেহ?' সত্যভামা বুদ্ধি করে বলল—'না শীনপ্পা, আপনি আসছেন দেখেই উনি আপনাকে ক্ষেপাবার জন্য এই বলেছেন।' ঐতালও হেসে মিষ্টি কথায় শীনকে আপ্যায়িত করল। সত্যভামার উপস্থিত বুদ্ধির কথা ভেবে ঐতাল খুব গৌরব করল—'এমন স্ত্রী হলে তার হাতে ক্যাশবাক্সের চাবিও ছেড়ে দেওয়া যায়।'

শীনের কথার প্রত্যুত্তরে ঐতাল বলল—'দেখ শীন,, এককালে তুমি চারবার করে আমার বাড়ি আসতে। আর সেই তুমি কিনা এতদিনেও একবার দর্শন দাও নি।'

শীন এবার তার পাঁচালী জুড়ে দেয়—'দেখুন না কেনে, আমার বাড়ির হাঙ্গামা কি দুটো একটা? যারাই আমার বাড়িটা দেখে, তারা সকলেই ঠাট্টা করে বলে—'ওহে শীন, তোমার এই ভূতের মন্দিরে আর কত কাল থাকবে?' ছেলেপিলের ঘর, বর্ষার দিনে ঘরে শোবার মতো একটু শুকনো জায়গা থাকে না। তাই ভাবলাম পুরোনো চালটা ফেলে দিয়ে একটা ফটকওয়ালা নতুন বারান্দা করলে কেমন হয়।' এইভাবে শীনের ভূমিকা শুরু হয়।

ঐতাল বাধা দিয়ে বলে—"হ্যাঁ হে শীন, তুমি চাল, বারান্দা বলতে আমার মনে পড়ে গেল। সেদিন কোটর হাট থেকে ফেরার সময়ে আমাদের বালিয়াড়িতে একটা টালির ছাদ চোখে পড়ল। বেশ জাঁকালো। কার বাপু এত বেশি টাকা হল? বর্ষাকাল যখন মোহানার দিক থেকে ফুর ফুরে দক্ষিণা বাতাস ছুটবে, একখানা টালিও বাকি থাকবে না।'

শীনের জবাব না দিয়ে উপায় নেই। তাছাড়া, টাকা কর্জ নেওয়ার কথাটা দেনাদার হিসেবে তারই উত্থাপন করা উচিত্ত। অথচ চট করে কথাটা মুখে আসছে না। তাই কথার মোড় ঘুরিয়ে শীন বলে—'চুলোয় যাক টালির বাড়ি। আপনার লচ্ছ কোথায় বলুন। ওকে না দেখলে মনে আমার শান্তি নেই।' এখানেই না থেমে আরও বলে—'বলুন তো ঐতাল, আপনার কী মনে হয়? আমার বড় ছেলে নরসিংকে বেংগলুরে পাঠাব বলে ভেবেছি। সেখানে আমার বন্ধু হের্লে একটা হোটেল খুলেছে না? ও বলছে—'প্রতি মাসে একটি করে মোহর তোমার হাতে দেব।' এদিকে খানিকটা ধার কর্জও করে ফেলেছি। ঘরে কতগুলো ছেলেপিলে। গাঁয়ে থেকে কীই বা করবে ওরা?'

'তুমি কি পাগল হলে, শীন? কী-না-কী জাতের লোকে খেয়ে যাবে। আর সেই এঁটো পাতা তোলার জন্য ভগবান আমাদের ব্রাহ্মণজন্ম দিয়েছেন? হের্লেদের আর কি? ভাত বেচে টাকা রোজগার করতেও দ্বিধা নেই। মোটের উপর, দোতলা বাড়ি হলেই হয়।'

'কিন্তু ঐতাল, বেংগলুরে হের্লেদের হোটেল খুব নামজাদা হোটেল। যারা তিরুপতি গিয়েছিল তীর্থ করতে, তাদের কয়েকজন ফেরার পথে বেংগলুরে

হোটেলে থেকে এসেছে। তারাই বলল যে, বেংগলুর সিটিতে তার নাকি খুব প্রতিপত্তি, মান মর্যাদা। তাছাড়া, সেই হোটেলে নাকি কেবল ব্রাহ্মণেরাই খায়। আপনিই বলুন—ঘরে বসে থাকলে পেট ভরবে? আমার তো মোটে আট-মণী ধান জমি। তাতে ফসল হলে কি বা হয়? কাল আমি চোখ বুজলে ওরা ভাগাভাগি করে কী বা পাবে? মাথা পিছু তুমণ ধান। ওতে কি আর দিন চলবে?······বুঝলেন ঐতাল, সব অপধর্ম! অভাবে পড়ে মহামুনি বিশ্বামিত্র নাকি কুকুরের মাংস খেয়েছিলেন! সবই কালের গতি। আপনি ভাত বেচার কথা বললেন না? ভাতবেচা এমন কি অপরাধ? চালবেচাই বা এমন কী পুণ্য? ধান সেদ্ধ করে সিদ্ধ চাল—ওতো এঁটোই হল।'

'শীন, তোমার জিভ হল নাপিতের ক্ষুর। কথায় কে পারবে তোমার সঙ্গে? আমি ঠাট্টা করেই কথাটা বলেছিলাম। তুমি ছেলেকে বেংগলুরে নয়তো মৈসুরে পাঠিয়ে দাও। মোট কথা ভালভাবে বেঁচে থাকা নিয়ে কথা। আমি ভাবছিলাম াক জানো? দূরের জায়গা, কোনো বিপদ-আপদ হলে ছোট ছেলেপিলেকে দেখাশোনার কে আছে, তাই। ভগবান না করুন, তেমন অসুখ-বিসুখ হলে তোমাকে শীমোগেগ গিয়ে রেলগাড়ি ধরতে হবে। তার মানে চার দিনের রাস্তা। এই সমস্ত ভেবেই আমি 'না' করেছিলাম।'

'দেখুন ঐতাল, সবই কর্মফল। ওখানকার জল যদি ওর কপালে লেখা থাকে, তবে সেখানে গিয়ে খেতে হবে। যদি বাড়ির কুঁয়োর জলের যোগ লেখা থাকে তাই খেতে হবে। তবে আপাতত ভয়ের কিছুই নেই। আমাদের বাগ্‌দেবীর দাদার ছেলেও সেখানে আছে। অসুখ-বিসুখ হলে সে অবশ্যই দেখবে। তবে দেখুন, বাইরে পাঠাবার আগে গলায় একটা সুতো ঝুলিয়ে দিতে চাই।'

'তোমার নরসিংহের উপনয়ন? হোক, বাবা, হোক। গত বছরই হওয়া উচিত ছিল। গুরুবল নেই বলে নিষেধ করেছিলাম।'

'শুধু কি গুরুবল? পয়সার বলও ছিল না। চালের মণ ছ'সিকা হলে কী হতে পারে বলুন? তার উপর আবার সরকারী খাজনা। কেটেকুটে কি আর থাকে? এ বছর আপনি সাহায্য করেছেন। আপনার সুবাদে মাথা গোঁজার মতো একটা বারান্দা হল। এইবার যদি ওর উপনয়নটা হয়ে যায়, আপনাদের আশীর্বাদে ও খেটেখুটে ঋণটা শোধ করতে পারবে।···যাক, বেলা

হয়ে গেল। আমি এসেছিলাম উপনয়নের নিমন্ত্রণ জানাতে। আগামী সোমবারেই দিন ধার্য হয়েছে। পনেরো দণ্ডের মধ্যেই ভোজনের ব্যবস্থা হবে। দূর না, কিছু না। বাড়ির সকলকেই যেতে হবে। আমি মুখের ভদ্রতা জানি না। কিন্তু আমার মনে কী আছে আমার মনই জানে।'

'আইয়ো শীন, তুমি যদি নেমন্তন্ন নাও করতে, বাজনা শুনেই আমি যেতাম।'

'আমার উপর আপনার অতটা অনুগ্রহ আছে বলেই অক্ষতের থালা ভুলে ফেলে এলেও খালি হাতে বলে গেলাম। আপনারা সকলে এসে অনুগ্রহ করে ছেলেটাকে ব্রাহ্মণত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।'

এইভাবে ভূমিকা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সীমারেখা টেনে তাড়াতাড়ি বেরুবার জন্য উঠে দাঁড়াতেই শীনময়্যের খেয়াল হল যে সত্যভামা সেখানে উপস্থিত নেই। 'ওহো, পড়ুমুন্নুরুর গিন্নীঠাকরুন কই গো?'—এই বলে শীন রান্নাঘর পর্যন্ত গিয়ে পুনরায় একবার বাক্-চাতুরী খরচ করে এল।

সেখান থেকে বাড়ির পথে অগ্রসর হতে মাঠের মুখে সরস্বতী ও পার্বতীর সঙ্গে দেখা। সেখানেও একবার সংক্ষিপ্ত নিমন্ত্রণ করা হল। 'আগামী সোমবার সকলে আসবেন, বাড়িতে একটু উপনয়নের ব্যাপার আছে।' এই বলে শীন পা চালিয়ে অগ্রসর হল?

সরস্বতী জিজ্ঞাসা করল—'উপনয়ন, না গৃহপ্রবেশ।'

'গৃহপ্রবেশ? ও হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই আর কি ওরই মধ্যে হল। আমাদের ভূতের মন্দিরে খানকয়েক টালি লাগিয়েছি এই যা'—এইভাবে কথাটাকে দ্রুত শেষ করে কাজের অছিলায় শীনময়্য বাড়ির দিকে অগ্রসর হল।

সরস্বতী ও পার্বতী হাসিমুখে বাড়ির পথ ধরল। দুশো টাকা ধার দেওয়ার বৃত্তান্ত এখনও তাদের অজানা।

সোমবার সকালে ঐতালের হুকুম হল—'সকলেই তাড়াতাড়ি করে শীনের বাড়িতে যাও। কেবল কুটুম্বের মতো আহারের জন্য দুপুর বেলায় গিয়ে হাজির হোয়ো না।' সরস্বতী বলল—'এত সকালে সকলে গিয়ে সেখানে কি করবে? সত্য, খোকা আর তুমি দশ দণ্ডের সময়ে গেলেই হবে। পারোতি ও আমি একটু তাড়াতাড়িই যাই। কাজেকর্মে সাহায্য হবে। শত হলেও, তোমার বিয়ের কটা দিন তারা স্বামীস্ত্রীতে এসে সাহায্য করেছিল।' ঐতাল বলল, 'তবে তাই হবে।' ভাবল—পুত্র ও নতুন বৌকে নিয়ে বেশ রাজকীয় চালে

গিয়ে হাজির হওয়া যাবে। সরস্বতী উঠে স্নানটা সেরেই বের হল। তার পিছনে পার্বতীও প্রস্তুত। বেরোবার আগে পার্বতী তার স্বামীকে বলল—'ব্রহ্মচারীর হাতে দেওয়ার মতো কিছু একটা নিয়ে আসবেন।' ঐতাল বলে উঠল—'আমি একটা গোমূর্খ নাকি ?'

'প্রায় দশ দণ্ড অতিক্রান্ত হলে ঐতাল স্ত্রীপুত্রসমেত বাহির হল। শীনময়্যের বাড়ি তুশো গজও নয়। তবু সে কুটুম্বের বাড়ি যাওয়ার মতো সাজগোজ করে বেরুল। খানিকটা এগিয়ে হোন্নে গাছের আড়াল পার হতেই নজর এল টালির ছাদওয়ালা ফটক বারান্দা। তুয়ারে জমকালো আম্রতোরণ। ঐতাল মাঠের আলের উপরেই হতবুদ্ধি হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তাইতো এত কাছে থেকেও ব্যাপারটা এতদিন তার চোখে না পড়ার কারণ কি ? মনের কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়তে সত্যভামা বলল, 'হু, শীনময়্য বেশ বড় ফটক করেছে। চোখে পড়েনি কেন বল তো ?—কারণ মাঝখানে এই বালিয়াড়ি আর হোন্নে গাছের বাগানটা।' স্ত্রীর কথায় ঐতাল উত্তর দিল—'হ্যাঁ, কেউ যদি টাকা ধার দেয়, তবে কত বড় ফটক বানানো যায়।' লচ্চ তখন পৈতে-বাড়ির বাজনা শুনে বলে উঠল—'ওই যে পে-পে হচ্ছে, ওখানে যাব চল।' সকলেই পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলে। তোরণে সজ্জিত ফটক পেরিয়ে ঐতাল সপরিবারে অন্দরে প্রবেশ করে। প্রবেশকালে অলক্ষ্যভাবে দেখতে-না-পাওয়ার ভান করলেও বস্তুত ফটকের কারুকার্যগুলো ঐতালের চোখে না পড়ে পারল না। মনে মনে বলল—'হু, অনেক টাকা ব্যয় করেছে।'

সরস্বতী ও পার্বতী আগেই এসে পৈতে বাড়ির কাজকর্মে লেগে গেছে। এদিকে লচ্চকে কোলে নিয়ে প্রবেশ করতে সত্যভামা উপস্থিত রমণীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সকলেই একমত যে ঐতালের দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেটি ভারী সুন্দর হয়েছে দেখতে। বর্ষীয়সী সুমঙ্গলীরা সত্যভামাকে অনুরোধ জানালেন—'সত্য, তুমি আমাদের একখানা গান গেয়ে শোনাও তো।' ইতিমধ্যে কয়েকজন তার সোনার গয়নাগুলি দেখতে দেখতে প্রশ্ন করল—'এর মধ্যে তোমার শ্বশুরবাড়ির দেওয়া কোন্‌টা ?'

ঐতাল ভদ্রতার খাতিরে বাড়ির ভেতরে গিয়ে বলল—'শীন, আমাকে কি কাজ করতে হবে, বলো। আমি প্রস্তুত।' শীন ভদ্রতা করে বলল—'কিচ্ছু নয়, আপনি সুস্থ হয়ে সদরে গিয়ে বসুন। জন পঞ্চাশেক নিমন্ত্রিতের পক্ষে

যারা রয়েছে, তারাই যথেষ্ট।' ঐতাল ফটকের ভিতরকার বারান্দায় গিয়ে এ অঞ্চলে প্রচলিত একটি বিশিষ্ট ভঙ্গীতে উপবেশন করল—হাঁটুর ওপিঠে একখানি উত্তরীয় বেঁধে সেই ভাঁজ-করা হাঁটুর উপর দিয়ে দুহাতের একটি বেষ্টনী তৈরি করল। শীনময়ের ছোট ছেলে কয়েকখানা তালপাতার পাখা নিয়ে এল। আর এল রৌদ্রতপ্ত বিশিষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠদের জন্য এলাচ গোলমরিচে সুবাসিত উৎকৃষ্ট গুড়ের পানা। গুড়ের পানীয়ে তৃপ্ত হয়ে একজন বললেন—'এই গরমের দিনে গুড়ের পানার তুল্য আর কিছু নেই। আমাদের পারুপল্লীর বাসদেববাবুর বাড়িতে শর্করা ও নেবুর রস দিয়ে শরবৎ তৈরি করে বটে, কিন্তু শর্করা এমন কি ঠাণ্ডা? গুড়ের স্নিগ্ধতা কি শর্করায় আছে?'

সমাগত সকলেই শীনময়ের প্রশংসায় উৎসাহী হলেন। আমাদের শীনময় বেশ বুদ্ধিমান ব্যক্তি। কুমোরের কাজটা জানা থাকলে চালের টালিগুলো নিজের হাতেই তৈরি করতেন। এতসব কাণ্ডকারখানার পরে গৃহপ্রবেশের জন্য আলাদা খরচ না করে ওটা উপনয়নের হিসাবেই ঢুকিয়ে দিলেন। বেশ বিচক্ষণ সন্দেহ নেই।'

আর একজন কে মন্তব্য করলেন—'শীনের বিচক্ষণতা তুমি আজকে দেখলে? ঐতালের দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ের কথাটা মনে নেই? শীনের ঠাট-কাট দেখেই তো পড়ুমুহুরুর লোকেরা শ'তিনেক ডাব দিয়ে ব্রাহ্মণদের তৃপ্ত করেছিল। অন্য কেউ কর্তা হলে ডাবের বদলে কেবল গুড়ের জল দিয়েই আপ্যায়ন হত। তখনই আমি বলেছিলাম যাঁরা হাজার টাকা জমির ট্যাক্সো দেন, তাঁদেরও শীনময়্যর তুল্য দাপট নেই।'

আর একজন বললেন—'তার সাক্ষী এই ফটক। একটি পয়সাও ধার না করে এই বালিয়াড়িতে তিন মাসের মধ্যে ফটক বারান্দা তৈরি করা চাট্টিখানি কথা নয় বাপু।'

অতিথিরা এইভাবে বলতে থাকলেও ঐতাল কিন্তু সে আলোচনায় যোগ না দিয়ে মৌন হয়েছিল। শীনের কথা উঠলেই মাঝেমাঝে সে অন্য কথা তুলে প্রসঙ্গ পরিবর্তনের চেষ্টা করছিল। তবু তার দৃষ্টি বারবার সঞ্চরণ করে বেড়াচ্ছিল শীনের বাড়ির দরজা, কপাট, চৌকাঠ, খুঁটি ও আড়ার উপর।

ভোজনে বসে দেখা গেল—উৎকৃষ্ট ছোলার ডাল দিয়ে তৈরি মিষ্টি পুরীর ব্যবস্থা। যাচাই-করা পরিবেশন। ঐতালের কিন্তু আধখানা পুরী না খেতেই

মুখ মেরে এল। তার পাতের দিকে তাকিয়ে শীনময়্য একজন পরিবেশনকারীকে ডেকে বলল—'ওহে এখানে এই রাম ঐতালের পাতায় চারখানা পুরী দিয়ে যাও। উনি আমাদের অন্নদাতা।' শীনের শেষ কথাটার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে সকলে ঐতালের দিকে চেয়ে রইল। ইতিমধ্যে তার পাতার উপর কয়েকখানা পুরী দিয়ে তার উপর ঘি ঢেলে দেওয়া হল। কিন্তু ঐতালের গলা দিয়ে সেদিন একটুকরো পুরীও ঠিকমতো নামছিল না।

আহারান্তে কোটশ্রেণীর বামুনদের সেই মহাসম্মেলন শীনময়্যর আয়োজিত ভোজন ব্যবস্থার খুব গুণগান করল। 'মন্দ্রাক্ষতে'র শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হলে ব্রহ্মচারী পুত্রকে সামনে রেখে শীন সকলের কাছে প্রার্থনা জানাল—'জপ, অগ্নিহোত্রের দুটো মন্ত্র শেখা হয়ে গেলে ছেলেটাকে বেংগলুরে পাঠাবো বলে স্থির করেছি, আপনারা আশীর্বাদ করুন ভগবান যেন ওর মঙ্গল করেন।' বালক ব্রহ্মচারী সমবেত দ্বিজোত্তমদের সম্মুখে নুয়ে পড়ে অভিবাদন করল। এই সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে ঐতাল যে বিরসমুখে বসে রয়েছে—সে ব্যাপারটা শীনময়্যের গোচরে না এসে পারল না।

অনেকদিন পর্যন্ত যে বিষয়টা ঐতালের মনকে উৎপীড়িত করছিল, তাহল শীনময়্যের টালির ছাদওয়ালা ফটক-বারান্দা। তার মনে এই আকাঙ্ক্ষা উদগ্র হয়ে উঠল—যেমন করে হোক সে একটা দোতলা বাড়ি তৈরি করে শীনের গর্ব খর্ব করে দেবে।

আগের মতো ঘন-ঘন না হলেও ঐতালের বাড়িতে শীনের যাতায়াত চলতে থাকে। মাত্র কয়েক মাস আগে টাকা ধার দিয়ে ঐতাল এখন সেই টাকাটা ফিরে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল।

শীনময়্য যেমন নানা ছল-ছুতো তৈরি করে ঐতালের কাছ থেকে ধার নিয়েছিল, এখন ঐতালও ঠিক সেই ধরনের মিথ্যা ঠেকা-বাধা-টানাটানির কথা বলে টাকাটা ফেরত চাইতে লাগল। একদিন ঐতাল শীনের আড়ালে বলল—'আগে যদি জানতাম ও টাকা দিয়ে বাংলো বানাবে, ফটক তৈরি করবে, তবে কী আর এমন লোককে ধার দিতাম?' গ্রামের কোন একটি তালগাছ সেই কথাটা শীনের কানে লাগালে শীন রুষ্ট হয়ে বলল—'টালির ছাদ কোডিগ্রামে কেউ বানায়নি, আমি বানিয়েছি বলে হিংসায় এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের বুকটা জ্বলে যাচ্ছে। সাধে কি আর বলে বৈদিক?' এখানে বলা আবশ্যক

শীনময়্য স্বয়ং বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। তবে তার অভিধানে বৈদিক মানে পৌরোহিত্য বৃত্তিধারী। আর একটি তালগাছ এই খবরটা যথারীতি ঐতালের কানে পৌঁছে দিল। ক্ষিপ্ত ঐতাল অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো তার বাড়ির উঠোনে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছিল। “দেখলে সত্য? সাপকে দুধ খাওয়ালে কী তার পরিণাম? একটা কুকুরকে আমি কর্জ দিয়েছিলাম। ও নাকি বলে বেড়ায়—ওর টালির বাড়ি দেখে হিংসায় আমার বুক নাকি জ্বলে যাচ্ছে। কী! এমন আস্পর্ধা? ইচ্ছে হলে এখনই আমি ওর বাপের সমান টালির ছাদ বানাবার ক্ষ্যামতা রাখি।' এই বলে সক্রোধে দাপাদাপি করতে লাগল।

এই ক্রোধ ও চিৎকারের ফলে শীনকে টাকা ধার দেওয়ার কথাটা সরস্বতী ও পার্বতীর কানেও পৌঁছল। সেদিন সন্ধ্যাবেলা সরস্বতী সত্যভামার সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে 'টাকাটা কবে ধার দিয়েছে, কত টাকা ধার দিয়েছে' ইত্যাদি বিবরণ সুকৌশলে জেনে নিল। জেনে সে চুপ করে থাকল না, থাকবার লোকও সে নয়। দাদা যাতে শুনতে পায় এমনিভাবে সরস্বতী পার্বতীকে বলল—'বুঝলি পারোতি, একমায়ের পেটের বোন হয়ে গেল তুচ্ছ, বেশি হল গিয়ে ওই সেদিনকার ছোট বউ। যাক, আমাদের কী? বৌ-এর কথা শুনে ধার দিয়েছে বোধ হয়। রোজ রোজ বাড়িতে এসে কী মিষ্টি মিষ্টি কথা—'আপনার রান্নার হাত এমন, আপনার সাম্বার হয় তেমন'। গুণগান করে একেবারে মাথায় তুলেছিল। এখন তেমনি টেনে নামাচ্ছে।'

সরস্বতীর সঙ্গে ঝগড়ায় প্রবৃত্ত না হয়ে ঐতাল যেখানে বসেছিল, সেখানে থেকেই হুঙ্কার দিয়ে উঠল—'কী! আমার টাকা মেরে দেবে? ব্রহ্মলোকে গেলেও ওকে আমি ছাড়ব না।'

শীনময়্য এবং ঐতালের আড়াআড়ি বেড়ে গিয়ে ক্রমে ক্রমে তাদের মধ্যে বাক্যালাপও বন্ধ হয়ে গেল। ঐতাল বলে বেড়ায়—'পরের টাকায় ফটক বানায়।' শীনময়্য তার জবাব দেয়—'পেটে না খেয়ে পয়সা বাঁধে।' এদিকে ঐতাল উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল যে কোনো লেখাপড়া না করে কেবল মুখের কথায় সে ঋণ দিয়েছে। শীনময়্যকে সাফকথা বলার জন্য সে মনস্থির করে ফেলল—'আগামী অগ্রাণী পূর্ণিমার মধ্যে ঋণ পরিশোধ করে দিতে হবে। বেংগলুরে যখন ছেলে মুঠো মুঠো টাকা রোজগার করছে, তখন আর আমাকে কেন ঘোরানো?'

সে বছর অগ্রাণী উৎসবটা ঐতালের জীবনে বড় তাৎপর্যময় হয়ে উঠল। কোডিগ্রামের দশ মাইল দূরে কোটেশ্বর নামে একটি জায়গা আছে। একদা সেখানে স্বয়ং পঞ্চপাণ্ডব এসে কোটিলিঙ্গেশ্বরের যে দেবালয় তৈরি করেছিল, এখনও তা বর্তমান। বেশ বড় দেবালয়, বড় পুকুর, বড় মেলা—এইটেই হল এ অঞ্চলের অগ্রাণী উৎসব। দুটি কারণে উৎসবের চিন্তা ঐতালের কাছে প্রবল হয়ে উঠল। একটি কারণ অগ্রাণী পূর্ণিমায় ঋণ পরিশোধ করা হবে বলে শীনের প্রতিশ্রুতি। দ্বিতীয় কারণ পারিবারিক গোলযোগ।

পার্বতীর নিজের পেটের ছেলেপিলে নেই বলে সপত্নী পুত্র লচ্চরের উপর তার অপরিসীম স্নেহ বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু সেই সঙ্গে আরও যে একটি চিন্তা অনিবার্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল, তা হল 'এ বাড়িতে আমিই সুনীতি, সত্যভামাই সুরুচি।' ঐতাল পাবর্তীকে বড় একটা কটু কথা বলে না—একথা সত্য হলেও এ বাড়িতে সত্যভামার আসার পর থেকে এই দ্বিতীয় পত্নীর উপর বর্ষিত স্বামীর আদর-সোহাগ দেখে পার্বতীর এই ভেবে কষ্ট হল যে ওটা প্রকৃতপক্ষে তার নিজের প্রতি অনাদর। কিন্তু জীবনে সে এত দুঃখকষ্ট পেয়েছে যে এইসব ছোটখাট কারণে সে আর ব্যথিত হবে না।

লচ্চ বড় হতে থাকে। দুবছর পূর্ণ হয়ে এখন সে তিনে পা দিয়েছে। স্বপত্নী পুত্রের হাসি দেখে পার্বতীর মনে এই গৌরব জেগে ওঠে যে মৃত্যুর পরে আত্মার সদ্গতি বিধানের জন্যই এই শিশুর উদয়। শিশুও হাঁটতে শেখার পরে আর ছোটমায়ের কাছে থাকতে নারাজ। রান্নাঘর আর উঠোনের মধ্যে সে আর আবদ্ধ থাকতে চায় না। বড়মা প্রায় সারাটা দিনই বাড়ির বাইরে কাটিয়ে দেয়—মাঠে, বালিয়াড়িতে, সমুদ্রের পারে। শিশুর ইচ্ছা বড়মাকে সে অনুসরণ করে। রান্না-বান্নায় ছেলের উপদ্রব না থাকলে খানিকটা সুবিধাই হয় সত্যভামার। এদিকে বড়মায়ের কোলে চড়ে বাইরে গেলে লচ্চ সারা পথ সুগা, কাক ও 'আম্বা'দের সঙ্গে কথা বলতে থাকে। বড়মা যে-যে কাজ করে, শিশুও তার প্রত্যেকটি অনুসরণ করে। অবশেষে এই দুজনের স্নেহ-ভালোবাসা এত গাঢ় হয়ে উঠল যে স্নান-আহার-নিদ্রা কোন সময়েই বড়মা কাছে না থাকলে লচ্চরের মনে শান্তি নেই। প্রথম প্রথম সত্যভামার কাছে এই ব্যবস্থা সুবিধাজনক মনে হলেও যখন সে বুঝতে পারল যে ছেলে তার আসল মায়ের চেয়ে সৎমাকেই বেশি ভালোবাসে, তখন কিন্তু সে অসূয়ায় দগ্ধ হতে থাকল।

পার্বতীকে জল খাওয়ার জন্য যে গুড় দেওয়া হয় তারই এক টুকরো ভেঙে লচ্চকে দিতে দেখলে সত্যভামা অসন্তোষ প্রকাশ করে বলে—'গুড় খেয়ে যদি পেটে কৃমি হয়, দাঁতে পোকা হয়?' নিজের ভাগের ভালো খাবার-দাবার যদি কিছু পার্বতী লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করে, সত্যভামা অমনি বলে ওঠে 'যখন-তখন যা-তা খাবার দিয়ে আমার ছেলের পেটটা খারাপ করে দিচ্ছে।' ছেলেকে মাঠে নিয়ে যেতে দেখলে বিড়্‌বিড়্‌ করে—'এই হাওয়ার মধ্যে ছেলেটাকে ঘুরিয়ে জ্বর-টর ধরিয়ে আনবে।' একদিন যখন পার্বতী লচ্চকে নিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছে, স্বয়ং ঐতাল রুক্ষস্বরে বলে উঠল—'পারোতি, ছেলেটাকে রোদের মধ্যে কেন নিয়ে যাচ্ছ? যদি হাওয়া লাগে?' সেদিন থেকে আর পার্বতী লচ্চকে মাঠে নিয়ে যায় না।

কিন্তু ঘরের বারান্দা, রান্না ঘরের বেড়া লচ্চরের খেলার পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। মা যখন ঘরের ভিতরে কাজে ব্যস্ত থাকে, সে তখন মায়ের চোখ এড়িয়ে টলতে টলতে গিয়ে মাঠে নামে আর কেঁদে কেঁদে ডাকতে থাকে—'বড়মা, বড়মা।'

একদিন শীতের সকালে সরস্বতী ও পার্বতী উঠে মাঠে গিয়েছিল কলাই শাক তুলতে। তারা যখন শিশিরে-ভেজা শাকগুলি তুলতে ব্যস্ত, তখন লচ্চ বিছানায় উঠে বড়মাকে কাছাকাছি কোথাও দেখতে না পেয়ে 'বড়মা' বলে কান্না জুড়ে দিল। সত্যভামার রাগ চড়ে গেল—'ওই এক বায়না শিখেছে—বড়মা, বড়মা!' এর ফলে লচ্চর কান্নার মাত্রা আরও বেড়ে যায়। 'চুপ করবি? না তোর গলা চেপে ধরব?' মায়ের এই শাসানিতে লচ্চ ভয় পেয়ে চুপ করে থাকে। কিছুক্ষণ পরে বাইরে এসে দেখে উঠোনে কচি রোদের ঝিলিমিলি। লচ্চও উঠোনে নামে। ঠিক তখনই সরস্বতী ও পার্বতী এক এক আঁটি কলাই শাক উঠোনের কোণে রেখে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে লচ্চ নিঃশব্দে বড়মায়ের পিছন পিছন চলল। পার্বতী দ্বিতীয় আঁটি তুলতে যাবে এমন সময়ে লচ্চর গলা শোনা যায়—'বড়মা, আমায় নিয়ে আসোনি কেন?' 'বাছা, তুমি এই ঠাণ্ডায় বেরিয়েছ? চল, বাড়ি যাই।' এই বলে আঁটি মাথায় পার্বতী লচ্চকে কোলে নিয়ে রওনা হল, ছেলের কী গলা ফাটানো কান্না! নিরুপায় পার্বতী শাকের আঁটি ফেলে দিয়ে লচ্চকে কোলে করে সেখানেই ঘুরতে থাকে। লচ্চ প্রশ্ন করে 'বড়মা তুমি কী করছ?' 'কলাই শাক তুলছিলাম, বাছা।' 'আমিও তবে কলাই শাক তুলব' বলে সে জিদ ধরে বসে।

সকাল বেলার কাজ শেষ হল। বাকী কলাই-শাক সরস্বতী একাই বাড়িতে নিয়ে এল। দৈবক্রমে অপরাহ্নের দিকে লচ্চর শরীরটা গরম হয়। সন্ধ্যার দিকে যে জ্বর শুরু হয়, তিন দিনেও তার বিরাম নেই। হাওয়া লাগার জন্য যা যা প্রতিকার করা দরকার, করা হল। ঠাণ্ডার ওষুধ করে দেওয়া হল। পার্বতীর অন্তরে গ্লানি—সে কেন ওই ভোরে মাঠের মধ্যে বাছাকে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘোরালো। সত্যভামা মনে মনে সপত্নীকে গালি দিল। চেঁচিয়ে বলার মতো সাহস না হলেও পার্বতী যাতে শুনতে পায় এমনিভাবে কতক্ষণ গজর গজর করল। এদিকে জ্বরের ঘোরে ছেলে কেবল বড়মায়ের জন্যই ব্যাকুল হয়ে ওঠে, মায়ের কথা তার মুখেও আসে না।

এই তিনদিন যাবত গৃহকর্তা গৃহে নেই, পৌরোহিত্যের কাজে পূব পরগণার এক দূরবর্তী গ্রামে গিয়েছে। সেদিন ঐতাল বাড়ির দোর গোড়ায় পা দিয়েই 'লচ্চ' বলে ডাক দিলেও 'বাবা' বলে প্রত্যুত্তর শোনা গেল না। 'হুঁ, বারংবার নিষেধ করলেও ছেলেটাকে মাঠে নিয়ে যাবে।' ঐতাল বাড়ির ভিতরে এসে দেখে বারান্দায় বসে সত্যভামা চোখের জল ফেলছে। ঐতালের ডাক শুনতে যা বিলম্ব, সত্যভামার চোখে অশ্রুর বাঁধ ভেঙে পড়ল। 'কী কী ব্যাপার?' 'কী আর ছেলেটা বিছানায় পড়ে আছে। আজ তিন দিন হল—জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। কার ছেলে গেলে কার কী?'

ঐতাল দ্রুতপদে ভিতরের ঘরে এসে দেখে লচ্চ ঘুমিয়ে আছে। তার দুই দিকে সরস্বতী ও পার্বতী বসে আছে। দাদাকে দেখে সরস্বতী বলল—'এইমাত্র ঘাম দিয়ে জ্বরটা ছেড়েছে বলে মনে হয়।' এই বলে সে লচ্চর গায়ে হাত বুলিয়ে দিল। ছেলে জেগে উঠে সামনে ঐতালকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলে উঠল—'বাবা।' ঐতাল খানিকটা আশ্বস্ত হয়ে ছেলের গায়ে ধীরে ধীরে হাত বুলিয়ে বলল—'সরসোতি, ঘামটা মুছে ফেলে গায়ে আর একটা চাদর দিয়ে দে। ছেলেটা কদিনের মধ্যে কী রোগা হয়ে গেছে!' সরস্বতী তার দাদার কাছে তিন দিনের জ্বরের বিবরণ দিল। ঐতাল তা শুনেও শুনল না। বলল—'যাই হোক আমি ১০৮ বার গায়ত্রী জপ করব'—এই বলে ঐতাল তার বেশভূষা পরিবর্তন করে সন্ধ্যাবন্দনা শেষ করে ঠাকুরঘরের সামনে বসল। 'সত্য, লচ্চকে কোলে করে নিয়ে এসো এখানে।' সত্যভামা ছেলেকে এনে দিলে ঐতাল তার পদ্মাসনবদ্ধ কোলের উপর শিশুকে শুইয়ে গায়ত্রী মন্ত্র পাঠের সঙ্গে স্বীয়

দক্ষিণ হস্ত এমন ভঙ্গীতে রোগীর মাথা থেকে পা পর্যন্ত বুলাতে লাগল যেন ফাল্গুনী একের পর এক বাণ নিক্ষেপ করে চলেছে। গায়ত্রী পাঠ শেষ হলে খানিকটা ভস্ম আনিয়ে মন্ত্রপূত করে নিয়ে ছেলের ললাটে 'হ্রাং হ্রীং হ্রূ' সহযোগে ভস্ম লেপন করে মুখে এক চিমটি ভস্ম ফেলে দিয়ে বলল—'সত্য, ছেলেকে নিয়ে দোলনায় শুইয়ে দাও।' সত্যভামা তখন রান্নাঘরে ভাতের ফেন গালার কাজে ব্যস্ত ছিল, অর্ধপথে সে কাজ ছেড়ে আসতে না পেরে স্বামীকে তা জানিয়ে দিল। লচ্চর কাছেই দাঁড়িয়েছিল পার্বতী। 'আমি শুইয়ে দিচ্ছি' বলে এগিয়ে আসতে ঐতাল বলে উঠল—'সত্যকে ডেকেছি। তুমি সত্যভামা নাকি?' পার্বতী যেন বজ্রাহত হল।

আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়াতে না পেরে বাইরে এসে সে গোয়াল ঘরের দিকে গেল। গোরুর সামনে ফেন-বিচালি রেখে দুধ দোহাতে বসল বটে, কিন্তু হাত কেঁপে কেঁপে যাচ্ছে বলে দোহানো দুধ দুধের কেঁড়েতে আর ঠিক মতো পড়ছে না। পার্বতী কাঁপতে কাঁপতে গোয়াল ঘর থেকে ঘরে, ঘর থেকে ঠাকুর ঘরে ছুটাছুটি করছে দেখে সরস্বতী নিজের হাতে সব কাজ করে দিয়ে পার্বতীকে ডেকে বলল—'খেতে এসো বৌদি।' 'আমার আবার কিসের খাওয়া, ঠাকুরঝি?'

সরস্বতীর পীড়াপীড়িতে পার্বতীকে দুটো মুখে দিত হল। এঁটো বাসনপত্র ধুতে পুকুরে যাওয়ার পথে পার্বতীর হাত কেঁপে গিয়ে থালাগুলো ঝন্ ঝন্ করে উঠোনে পড়ে গেল। তার পিছনেই ছিল সরস্বতী। সে বাসনগুলো তুলে নিয়ে ধুয়ে মেজে বলল—'তুমি এমন করছ কেন, বৌদি?' পার্বতী আর কান্না সামলাতে পারল না। বলল—'ঠাকুরঝি, আমি কি পূতনা? ছেলের অসুখের জন্য তো আমাকেই দায়ী হতে হল।'

'কে বলেছে একথা? সত্য বুঝি? বলে বলুক। ওদের বলার অধিকার আছে, বলবে। আমাদের কপাল শোনবার, শুনব।'

পার্বতী বলল—'সত্য যা বলেছে, উনিও আমায় বললেন কিনা—'তুমি সত্যভামা না কি?' আমার অপরাধ, আমি গিয়েছিলাম ছেলেকে শুইয়ে দিতে।'

এই কথাবার্তার সময়ে সত্যভামা তার খাওয়া সেরে নিয়ে পুকুরে যাচ্ছিল। তার বিষয়ে কথা হচ্ছে বুঝতে পেরে যেটুকু শোনার শুনে নিয়ে গলার সাড়া দিয়ে ঘাটে গেল। সরস্বতী ও পার্বতী চুপ করতে সত্যভামা তার থালা ধুয়ে ঘরে ফিরে

এল। রাতের বাকী কাজগুলো তাড়াতাড়ি সেরে নিয়ে সত্যভামা স্বামীর কাছে গিয়ে চোখের জল ফেলে বলল—'আমি আর এমন কী বলেছি? সেটাকে ওরা রামায়ণ করে তুলেছে। খোকাকে ওরা ভোরবেলায় হিমের মধ্যে, ঠাণ্ডা হাওয়ার মধ্যে কলাই ক্ষেতে নিয়ে গেছে। এখন আমি যদি রাগ করে বলেই থাকি—'কার ছেলে মরলে কার কী?' তাতে ওরা জ্বলে উঠবে? বলে কিনা—'যাদের বলার তারা বলবে, যাদের শোনার তারা শুনবে।' —এই বলে সত্যভামা আর একটি কলহের ভূমিকা করে রাখল।

ইতিমধ্যে লচ্চ ডাক দিল—'বড় মা।' 'ও আমায় কেন ডাকে?' পার্বতী মনে মনে একথা বললেও তার পা কিন্তু দেরী করল না। পার্বতী ছুটে যাওয়ার আগেই সত্যভামা সেখানে এলে পার্বতী পিছনে সরে এল। সত্যভামা জিজ্ঞাসা করল—'কী খোকা?'

'আমি বড় মায়ের কোলে ঘুমোব।'

'আচ্ছা, আমি তোমায় দোলনায় ঘুম পাড়াব, কেমন?'

লচ্চ কান্না জুড়ে দিল। সত্যভামা কোনো উপায় নেই দেখে পার্বতীকে বলল—'দিদি, খোকাকে একটু ঘুম পাড়াবে?' স্বামীর ভর্ৎসনার বেদনা তখন পর্যন্তও পার্বতীর মন থেকে মুছে যায়নি, ওদিকে আবার লচ্চও বড়মায়ের কাছে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল। নিরুপায় পার্বতী শিশুকে তুলে নিয়ে কোলের উপর শুইয়ে নিজে দেওয়াল ঠেস দিয়ে বসল। দুচোখে তার অবিরল অশ্রুধারা।

সত্যভামার পক্ষে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা আর সম্ভব হল না। স্বামীর কাছে গিয়ে কেঁদে বলল—'পেটে ধরব আমি, আর মানুষ করবেন উনি?' ঐতাল বলল—'সত্য, ছেলেপিলেরা কি অত সব বোঝে? তুমি যদি এই নিয়ে কান্নাকাটি করো, আমি কী করতে পারি, বলো। তোমাদের দুজনের মাঝখানে পড়ে আমায় কি বাড়ি ছেড়ে যেতে হবে?' বস্তুত ঐতালের অবস্থা সেইরকমই হয়ে উঠেছে। সরস্বতী না থাকলে সত্যভামার যাবতীয় নালিশ অনুকূল রায় পেয়ে যেত সন্দেহ নেই। কিন্তু ছোটবোনের ভয় ঐতালের পক্ষে একেবারে অগ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না।

ভগবানের দয়ায় সেই রাতেই ছেলের জ্বর সম্পূর্ণ ছেড়ে গেল। তিন-চার দিনের মধ্যে ছেলে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াতে থাকে। তার মুখে সর্বদা বড়মায়ের নাম।

এই সমস্ত ঘটনার পর দুই সতীনের মধ্যে পারস্পরিক বৈরভাব না হলেও একরকম বিমুখতা বদ্ধমূল হল। সারা দিনে এক-আধবার কথা বিনিময় হত্ত কিনা সন্দেহ। খুব দরকার না পড়লে কেউ কারও সঙ্গে বাক্যালাপ করে না। শীত গিয়ে গরম, গরম গিয়ে বর্ষা পার হল। পার্বতীর প্রতি লচ্চর ভালোবাসা যতটা বৃদ্ধি পেল, সেই পরিমাণেই বৃদ্ধি পেল সপত্নীদের পারস্পরিক বিদ্বেষ। লচ্চর বয়স এখন তিন বছর চার মাস।

কোটেশ্বর উৎসবের আর বেশি দেরী নেই। সেই উৎসবের আগেই নতুন জামা-কাপড় কেনার নিয়ম। সম্বৎসরের আবশ্যক বস্ত্রাদি এই একটি সময়েই যথাসম্ভব কিনে রাখার ব্যবস্থা হয়।

সত্যভামা ওই অঞ্চলের প্রসিদ্ধ উৎসব কোটেশ্বরের মেলা কখনও দেখেনি এবছর ভারি ইচ্ছা হল সে সেই মেলায় যাবে। কিন্তু ছেলেকে কোলে নিয়ে আট-দশ মাইল পথ হেঁটে যাওয়ার মতো সাহসও তার নেই। ওদিকে উৎসবের দিনে ঘরে বসে থাকতেও তার মন সরে না। মেলার দিন পনেরো আগে সত্যভামা কথা পাড়ল—'এবছর অগ্রাণী উৎসবে গেলে মন্দ হত না।' ঐতাল কি তাকে নিরাশ করতে পারে। স্থির করে ফেলল—মেলায় যেতে হলে নতুন জামাকাপড় পরে যাওয়া চাই।

মেলার তিন দিন আগে বাজারে গিয়ে জামাকাপড় খরিদ করে আনল। নিজের জন্য দুখানা করে ধুতি ও গামছা, সরস্বতীর জন্য এক জোড়া মেটে পাড়ের লাল শাড়ি, পার্বতীর জন্য দুখানা সাদা পাড়ের পালাঘাট শাড়ী এবং লচ্চর জন্য কেনা হল দুখানা রেশমী পাড়ের ছোট ধুতি। সত্যভামাকে কি দেওয়া যায়?' এই ভেবে সারা দোকানটাকে আট-দশবার ওলট-পালট করে দেখল। 'পালঘাট শাড়ী সত্যভামার পছন্দ নয়, আবার সিল্কের শাড়ীরর দামও খুব বেশি'—এই সমস্ত ভেবে ভেবে অবশেষে স্থির করল যে আটপৌরে ব্যবহারের জন্য পালঘাট শাড়ীই যথেষ্ট, তবে কোথাও যেতে আসতে হলে একখানি কোনার্ত শাড়ী দরকার। কিন্তু তার দাম আরও বেশি পড়ে যায়। অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত কুমারপাল্যের রুদ্রাক্ষ পাড়ের একখানি শাড়ী কিনে ফেলল।

উৎসবের দিন একজনকে ফেলে আর একজন যাবে না। সরস্বতী খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে কেন-জল গরম করে সুরোর স্ত্রীর কাছে গিয়ে বাড়ির গোরু বাছুরগুলিকে দেখা শোনার কথা বলে এল। এতসব করার পরে হঠাৎ তার

মনে হল—'ছিঃ, বাড়ি-ঘর ফেলে সকলের যাওয়া ঠিক নয়।' এই ভেবে সরস্বতী বাড়ি-ঘর-দোর পাহারার জন্য থেকে গেল। বাকী সকলে প্রত্যুষেই যাত্রা করল। সমুদ্রের কিনারা ধরে ধরে যাবে। লচ্চ পালা করে সত্যভামার কোল থেকে পিতার কাঁধে, পিতার কাঁধ থেকে বড় মায়ের কোলে চড়ে অগ্রসর হল। কোটেশ্বরে যখন পৌঁছল তখন বেলা একপ্রহর মাত্র। মন্দিরের লাগোয়া বৃহৎ পুকুর দেখে লচ্চর আনন্দ আর ধরে না। পুকুরের মধ্যে কুমিরগুলিকে দেখে বলে—'আমরা এখানে বসে সব দেখি, কেমন ?'

পুকুরে সকলের স্নান হয়ে গেলে মন্দিরে গিয়ে কলা ও নারিকেল উৎসর্গ করা হল। তারপরে ঠাকুরের রথারোহণ দর্শন। সেই গিজগিজ করা জনারণ্যের মধ্যে ঢুকে উৎসবে সমাগত নানা লোকের মেলা দেখিয়ে ঐতাল মণিহারী দোকান থেকে লচ্চকে একটা পুতুল কিনে দিল। সূর্য মাথার উপর চড়তেই অনেকে মন্দিরের মোচ্ছবের কথা চিন্তা করতে লাগল। পুকুরের ধারে ঐতালের এক পরিচিত ব্যক্তির বাড়িতে তারা খেতে গেল। সকলেই জানে উৎসবের দিনে যার যার আত্মীয়-কুটুম্বেরা আসবে। তখন কুটুম বাড়ির ভোজনও একটা ছোটখাট মোচ্ছবে পরিণত হয়।

সকলে খেতে বসে গেলে পার্বতীর পরিচিত জনৈক মহিলা তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে পার্শ্ববর্তিনী সত্যভামার পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে পার্বতী বলল—'ইনিও আমার স্বামীর স্ত্রী।' প্রশ্নকারিণীর চোখ পড়ল সত্যভামার শাড়ীর উপর। মৃদুকণ্ঠে পার্বতীর কানে কানে বলল—'এটা কী রকম? আপনার পরনে পালঘাট শাড়ী, ওর জন্য রুদ্রাক্ষ পাড়ের শাড়ী ?' পার্বতী নিস্পৃহ ভাব দেখিয়ে বলল—'পরার মধ্যে কী আছে ? একটা হলেই হল।' কথাটা মুখে বলল বটে পার্বতী, কিন্তু শাড়ীর যে 'বেশকম' নিজের কাছে স্পষ্ট ছিল না, আর একজন তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার পরে তার মনটা ভারাক্রান্ত হল। এই ভেবে তার সত্যই খুব দুঃখ হল যে ছোটবৌ এর তুলনায় সংসারে সে অনাদরের।

মধ্যাহ্ন ভোজের পরে আবার সকলে মেলায় ঘুরতে আরম্ভ করল। সত্যভামার হুকুম মতো ছেলের জন্য ঐতাল বাতাসা, ডালমুট ও মুড়িমুড়কি কিনল। নতুন একটা মাটির হাঁড়ি কিনে তার মধ্যে সব কিছু ভরা হল। পার্বতীকে তার পতি-দেবতা মেলার খরচ বাবত যে দুটি পয়সা হাতে দিয়েছিল, তা দিয়ে কী কেনা

চলে এই বিষয়ে নানা চিন্তা ভাবনা করে অবশেষে লচ্চর জন্য খেজুর কিনে পার্বতী তার নিজের পুঁটুলিটার মধ্যেই রেখে দিল।

সন্ধ্যা হতে আর যখন মাত্র কয়েক দণ্ড বাকী, ঐতাল সদলবলে কোটেশ্বরের মাঠ পেরিয়ে সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছল। সমুদ্রতীরের বালি ভেঙে ভেঙে সকলেই দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে থাকল। সারাদিনের ক্লান্তিতে শিশুর ঘুম এসে গেল। যখন সে জেগে ছিল, তার চেয়ে এখন দ্বিগুণ ভারী হওয়াতে সত্যভামা ছেলেকে আর বইতে না পেরে স্বামীকে বলল—'এই রোদের মধ্যে বালির পথে না এসে বড় রাস্তা দিয়ে এলেই হত।' ঐতাল বলল—'রাম! যে নোংরা বড় রাস্তা। সারা পথ খালি শূদ্র আর শূদ্র। মেলা এলে 'পরে ওরা যেন আর চোখেই দেখে না। এখানে সমুদ্রের কিনারে কারও কোনো উপদ্রব নেই।' ঐতাল কিন্তু বুঝতে পারল না যে ছেলেকে আর বইতে পারছে না বলেই সত্যভামা এই কথাটা উত্থাপন করেছে।

পার্বতী সত্যভামার সঙ্কট দেখে বলল—'ছেলেকে আমার কাছে দাও। একা আর কত বইবে?' এতক্ষণে লচ্চ হাতবদল হলে সত্যভামা হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। চার-পাঁচ মাইল পরে লচ্চর ঘুম ভেঙে গেল। তখন তাকে সমুদ্র দেখাতে দেখাতে, মাঝে মাঝে হাঁটিয়ে, কখনও বা 'অজ্জিকুপ্প' করতে করতে সকলে অগ্রসর হল। যখন বাড়ি এসে পৌঁছল, পূর্ণিমার চাঁদ তখন বাড়ির অনতিদূরবর্তী নারকেল গাছের মাথা পর্যন্ত উঠেছে।

রাতের রান্না সরস্বতী করেই রেখেছিল। মেলার অশুচি কাপড়-চোপড় ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে সকলে খেতে বসল। সরস্বতী উৎসাহের সঙ্গে কলাই ডাল বেটে যে পুলিপিঠে তৈরি করেছিল, সকলের মুখেই তা তৃপ্তিকর হল। আহারান্তে পার্বতী সরস্বতীর কাছে মেলার কথা বলতে গিয়ে একসময় রুদ্রাক্ষ পাড়ের শাড়ীর ঘটনাটা বলে দুফোঁটা চোখের জল না ফেলে পারল না।

ঐতাল কোটেশ্বরের উৎসব ও মেলা দেখা ফিরে এসেছে সত্য, কিন্তু তার মন-প্রাণ পড়েছিল শীনময়্যের ব্যাপারে। কারণ এই অঘ্রাণী পূর্ণিমার দিনেই শীন টাকা শোধ করে দেবে বলে ওয়াদা করেছিল। কিন্তু সে নিজেই বাড়ি না থাকতে শীনের খুব সুবিধাই হল। নাঃ, আজ রাতেই গিয়ে টাকাটার কথা বলা দরকার। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। চট্ করে উঠে পড়ে সদর দরজার কাছে যেতে সরস্বতী এসে মেলার কথা নিয়ে পড়ল। নানা প্রশ্নের ফাঁকে রুদ্রাক্ষ

পাড়ের শাড়ীর প্রসঙ্গটা জিজ্ঞাসা করতে ভুল করল না। শুনেই ঐতালের মেজাজটা বিগড়ে গেল। মনে মনে মহাবিরক্তি হয়ে বলল—'একটা দরকারী কাজেও বেরুবার উপায় নেই। কাজের সময়ে যত আজে-বাজে প্যাঁচাল জুড়ে দেয়।'—এইভেবে পুনরায় ঘরের বারান্দায় উঠে বসে। সারারাত বিছানায় গড়াগড়ি করে শেষ রাতের দিকে স্বপ্ন দেখল যে শীনময়্য তার সমস্ত টাকাপয়সা নিয়ে পালিয়েছে।

ভোর হতেই তাড়াতাড়ি করে জলে দুটো ডুব দিয়ে বালির টিলার উপর দিয়ে ঐতাল শীনময়্যের বাড়ির দিকে ছোটে। একই সময়ে শীনময়্য মাঠের পথ ধরে ঐতালের বাড়ির দিকে রওনা হল। ঐতাল তাকে বাড়িতে না পেয়ে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল—'শীন কোথায়?' ঐতালের কথায় উত্তর দিতে গিয়ে শীনময়্যের স্ত্রী একখানি রামায়ণ বলতে শুরু করল। তার মর্মার্থ এইরূপ: ঐতালের ঋণের ওয়াদার ভয়ে শীনময়্য টাকার জন্য সারা গ্রামে বৃথাই ঘোরাঘুরি করেছে, অবশেষে বেংগলুর থেকে বড় ছেলে নরসিংহ ধার করে যে গোটা পঞ্চাশেক টাকা পাঠিয়েছে, সেই সঙ্গে নিজে চেষ্টা চরিত্র করে বাকী টাকা যোগাড় করে সুদে আসলে মিশিয়ে অঘ্রাণী পূর্ণিমার ওয়াদা মতো ঐতালের বাড়িতে যায়, কিন্তু তারা নাকি সকলে কোটেশ্বরের মেলায় গিয়েছিল—ইত্যাদি সমস্ত কথা সবিস্তারে শোনাল। কিন্তু এতসব অনাবশ্যক কথা শোনার মতো অবকাশ ঐতালের কোথায়? সে অত্যন্ত দ্রুতপদে পুনরায় বাড়ির পথ ধরল।

মধ্য মাঠে দুজনের দেখা হয়ে গেল। ঐতালের হাতে টাকাটা দিয়ে শীনময়্য বলল—'কেমন, শীনর উপর আপনার বিশ্বাস ছিল না। ভেবেছিলেন টাকাটা মেরে দেবে। এই নিন সুদসমেত আসল। আপনার ঋণও চাইনে, অপবাদও চাইনে।' এই বলে পাওনা মিটিয়ে দিয়ে হাঁটা দিল। ঐতালের মন ছিল টাকার দিকে। প্রতিটি টাকা ও নোট দেখে, পরীক্ষা করে, গুণে কোমরে গুঁজে তারপরে তাকিয়ে দেখে শীনময়্য সেখানে নেই। যাই হোক, টাকাটা হাতে আসাতে শীনের সততায় ঐতাল খুশিই বলতে হবে। কেবল খুশি নয়, এই সামান্য বিষয়ে শীনের উপর সন্দেহ করেছিল বলে মনে মনে লজ্জিতও হল। ঐতাল বলতে চেয়েছিল—'ভাই শীন, রাগ কোরো না তুমি। নানারকম অসুবিধায় পড়েছিলাম বলে টাকার জন্য হয়ত কিছু অপ্রিয় কথা বলেছি তোমাকে। সেইটাকেই বড় করে দেখো না, ভাই।' কিন্তু কথাটা বলার

আগেই শীন চলে গেছে। ঐতাল সোজা বাড়িতে এসে ঘরের দেওয়ালের একটা ফোকরের মধ্যে রূপোর টাকাগুলি রাখল, তারপরে নোটগুলি একটা ছোট টিনের বাক্সে রেখে সেই বাক্সটিও যথাস্থানে রেখে দিল। অভ্যাসমতো এদিক-ওদিক তাকিয়ে ধারে কাছে কেউ কোথাও যে নেই এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে সে বাইরে গেল। তার তহ্বিলের খবর ও পরিমাণ পার্বতীতো জানেই না, এমন কি তার সুয়োরাণী সত্যভামারও আজানা। যখন মনটা খুশি থাকে এমনি সময়ে ঐতাল কতবার একথা ভেবেছিল যে তার কোষাগারের রহস্যটা সত্যভামাকে বলবে। কিন্তু 'স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ংকরী এই শাস্ত্র বাক্যের বিধানমতো কথাটা আর বলা হয় নি।

ঐতাল যখন খুশিমনে হাসিমুখে ঘর থেকে বাইরে এল, সরস্বতীর সঙ্গে দেখা। 'কি দাদা, শীনময়্যর বাড়িতে গিয়েছিলে ? টাকাটা পেয়েছত ?' ঐতাল সগর্বে উত্তর দিল—'না দিয়ে যাবে কোথায় ? টাকাটা মেরে দিলে ওকে আমি এমনি ছেড়ে দিতাম ?' সরস্বতী বলল—'দেখ দাদা, যার তার কাছে অনর্থক বলে বেড়িয়েছ – শীন তোমার টাকাটা খেয়ে ফেলল।'

সরস্বতীর এই শেষ কথাটায় ঐতাল বাহ্যত ভ্রূক্ষেপ না করে চলে গেলেও ভিতরে ভিতরে তার মনটা খুঁত খুঁত করছিল। তাই সে পুনরায় একবার বালিয়াড়ি ভেঙে শীনময়্যের বাড়িতে গেল। শীন তখন উঠোনে বসে বসে নারকেল পাতা গেঁথে গেঁথে চাটাই তৈরি করছে। ঐতালকে দেখেই কিছুটা উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—'কী ব্যাপার ? হিসাবে কিছু গোলমাল হয়েছে না কি ? না, ওর মধ্যে কোনো অচল টাকা ছিল ?' ঐতাল বলল—'রাগ করছ কেন, মহারাজ ? বলা উচিত হয় নি এমন কিছু কথা হয়ত আমি বলেছি। তেমন কথা তুমিও বলেছ, আমিও বলছি। কিন্তু আর না, এসো সব ভুলে যাই—এই কথাটা তোমাকে বলব-বলব, ইতিমধ্যে তুমি চলে এলে। কথাটা তোমাকে না বলতে পেরে মনটা ভিতরে ভিতরে খচ্‌খচ্‌ করছিল।' ঐতাল এইভাবে তার মনটা খোসলা করে দিলে শীনের মুখখানাও প্রসন্ন হয়ে উঠল। 'যাক্‌ ঐতাল, যা হবার হয়েছে'— এই বলে পুরোনো বিষয়টাকে সেখানেই শেষ করে দেশের ও গাঁয়ের নানা কথা নিয়ে পড়ল। কোটেশ্বরের উৎসব, সেই উৎসব উপলক্ষ্যে মেলা, 'পূর্ব ঘাট' থেকে সেই মেলায় আগত বাতাসা প্রভৃতি মিষ্টি দ্রব্যের নির্মাণকৌশল, মেলায় অসম্ভব ভীড়, অঘ্রাণ মাসের মেলার রথে কোন্‌ না-কোন্‌ রাজার মুলুক থেকে কচি আমের

গুটি এনে হারের মতো ঝুলিয়ে রাখা ইত্যাদি সব বিচিত্র ব্যাপার আলোচিত হল।

* * *

সেদিনকার মতো উভয়ের মধ্যে একটা মিটমাট হয়ে গেল। অনেকদিন পর্যন্ত দুজনের মাখামাখি মেলামেশা না হলেও অসদ্‌ভাব শত্রুতাও দেখা যায়নি। কিন্তু ঐতালের মন থেকে ফটকের ব্যাপারটা দূর হল না এবং দূর হওয়ার কোনো লক্ষণও দেখা গেল না। ফটক-দুয়ার বসবার পর থেকে শীন আজকাল শীনপ্পা হয়ে দেশ-গাঁয়ে খুব সেলাম পাচ্ছে। এখন তার নিজেরও বোধ হতে লাগল সমাজে সে আর কেউকেটা নয়। ফলে ঐতালের গোপন ঈর্ষা আরও জ্বলে উঠল। 'বৌ ছেলেকে দুবার দুমুঠো অন্ন দিলে বছরের মধ্যে ছমাস যাকে উপোস করে থাকতে হয় সেই শীন এখন আমাদের এই কোড্ডি-কন্যান্ এলাকায় একটা কেষ্ট বিষ্টু হয়ে উঠেছে। আর আমি, কোদণ্ড ঐতালের সন্তান, অর্থের অপব্যয় করি না বলে কেবল বৈদিক ব্রাহ্মণরূপেই পরিচিত। কেন, আমি যদি ইচ্ছা করি এমন একটা দোতলা বাড়ি কি বানাতে পারি না যার কাছে ওর ওই ফটক-বারান্দা তুচ্ছ হয়ে যায়?' এত সব কথা মনে হলেও কথাকে কাজে পরিণত করবার মতো সাহস তার নেই। দেওয়ালের ফোকরে হাত ঢুকিয়ে দিলে প্রয়োজন মতো অর্থ বেরিয়ে আসবে সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রধান বাধা হল বাড়ির লোকের কাছে কথাটা সে কেমন করে পাড়বে। সত্যভামাকে বললে সে শোনামাত্র নেচে উঠবে। বড় ঘরের মেয়ে তো। কিন্তু পার্বতী কেবল নির্বোধের মতো বলবে, 'বাড়িঘরের আমি কী বুঝি যে আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন?' সত্যিই, এ সব ব্যাপার বোঝার মতো মানসিক শক্তিও তার নেই। কিন্তু সরস্বতী? তার সামনে কথাটা তোলাই যাবে না। আবার না তুলেও কাজে হাত দেওয়ার উপায় নেই। সরস্বতীকে বললে সে উত্তর দেবে, 'তোমার যদি পয়সা বেশি হয়েছে মনে কর, নদীর মোহানায় গিয়ে ঢেলে দাও। এখন যে ঘর আছে, সেটা কি এই সামান্য কজনের পক্ষে ঢের নয়।' আর যদি সরস্বতীকে না-বলে এই কাজে হাত দেয়, তবে এই দয়ামায়াহীন বোনটা রাগ করে বাড়ি ছেড়েই চলে যাবে। সরস্বতী চলে গেলে ওর শ্বশুরবাড়ি থেকে খোরাকী বাবদ যে চাল আসে, তা তো হাতছাড়া হয়ে যাবেই, তার চেয়েও বড় কথা, সরস্বতী না হলে বাড়ির কৃষিকর্ম প্রভৃতি একেবারে অচল।

যাই হোক, কয়েক মাস যাবৎ এই চিন্তাটাই তাকে বিদ্ধ করতে থাকে। কিন্তু সাহস করে কোনো একটা পাকা সিদ্ধান্তে আসা তার পক্ষে সম্ভব হল না। ইতিমধ্যে বাড়িতে আরও একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। সত্যভামা আর একবার মা হতে চলেছে। ভরা মাস, বেশি দেরি নেই। এবারের প্রসবটা কোথায় হবে এই হল সমস্যা। সরস্বতী বলল, 'এবারেও তোমার শ্বশুরবাড়িতে পাঠাবে কেন দাদা? এখানে আমরা দুজন নেই কি?' পার্বতী সরস্বতীকে ডেকে নিয়ে বলল, 'তুমি কথা বলতে গেলে কেন ঠাকুরঝি? কোথায় প্রসব হবে সেটা সত্যভামাই বলুক না। পরে এটা ঠিক হয় নি, ওটা ঠিক হয়নি বলে দোষারোপ করবে।' এই বলে পার্বতী সরস্বতীর উৎসাহপূর্ণ প্রস্তাবে জল ছিটিয়ে দিল।

ইতিমধ্যে শ্বশুর মাধপ্পয়্য তার ছেলে জনার্দনকে দিয়ে তিন তিন বার জামাই বাড়িতে এই বলে খবর পাঠালেন, 'আমাদের সত্য প্রসবের জন্য এখানেই আসুক। শত হলেও মায়ের বাড়ির মতো ঠাঁই আর কোথাও হয় না।' ঐতাল একবার শ্বশুরালয়ে যেতেও এই প্রস্তাব উঠল। তখন সে সসঙ্কোচে এই বলে নিবেদন করল যে শ্বশুরবাড়ির লোকজনকে বারবার উত্যক্ত করা ঠিক নয়। মাধপ্পয়্য হেসে বললেন, 'পাগল হয়েছ তুমি? আমার বোন ছিল আট জন। এখন তারা কজন আছে সে প্রশ্ন নিরর্থক। কিন্তু যখন তারা বেঁচে ছিল, তাদের ছেলে পিলে হয়েছে আমাদের বাড়িতেই। আমার মা কখনও এসময় মেয়েদের জামাইবাড়িতে রাখতেন না।' 'আচ্ছা দেখি' বলে ঐতাল বাড়ি এসে সত্যভামাকে বলতে সে তৎক্ষণাৎ সম্মত হয়ে গেল।

পাঁজিপুথি বের করে দিন, নক্ষত্র বিচার করে ঐতাল শুভ মুহূর্তে একদিন পত্নীকে নিয়ে পড়ুমুন্নূরু যাত্রার উদ্যোগ করল। তখন লচ্চর বয়স চার বছর পার হয়ে গেছে। এখন সে আধো আধো মিষ্টি কথা বলে। তাকে নিয়ে কী করা যায়? শেষ মুহূর্তে এই বিষয়ে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার হয়ে পড়ল। পিতৃদেবের ধারণা, 'প্রসবের পর দু'দুটো বাচ্চা নিয়ে সত্যভামার খুবই কষ্ট হবে। সরস্বতীর মত যে লচ্চ বাড়িতে থাকলেই ভালো হয়। পার্বতীর কথা হল— 'আমাদের এই দায়িত্ব কেন?' এই সমস্ত অস্পষ্ট কথাবার্তার মধ্যে সত্যভামা একটু বাঁকা ভাবে বলল, 'আমার ছেলে আমার কাছে বোঝা নয়।' যাই হোক পড়ুমুন্নূর রওনা হওয়ার কালে লচ্চ সকলকে বলে গেল, 'আমি দাদুর বাড়িতে যাচ্ছি।'

ঐতাল সপরিবারে পড়ুমুন্নুরু পৌঁছলে সেখানে তাদের আদর-অভ্যর্থনার কোনো ত্রুটি হল না। মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে বাড়ি রওনা হওয়ার আগে ঐতাল ছেলেকে ডেকে বলল—'লচ্চ, তুমি মায়ের সঙ্গে থাক। এখানে দাদু রয়েছেন, দিদিমা রয়েছেন, রোজ তোমায় কত কী খেতে দেবেন—গুড়, কাজুবাদাম—কেমন?' এই বলে ঐতাল রওনা হলে ছেলেও তার পশ্চাতে রওনা হল। বলল—'আমার গুড়ও চাই না, কাজু বাদামও চাই না।'

'তবে কী চাই?'

'বড় মা।'

মিষ্টি কথায় কোনো লাভ হল না। লচ্চর জিদই বজায় রইল। খানিকটা পথ হাঁটিয়ে, খানিকটা কোলে নিয়ে ঐতাল যখন বাড়ি এসে পৌঁছল লচ্চ তখন বাপের কাঁধে গভীর নিদ্রায় অভিভূত। সেই দিন থেকে সত্যভামার ফিরে না আসা পর্যন্ত দিনরাত তত্ত্ব-তালাসির জন্য পার্বতীর একটি নয়নমণি জুটল। নয়নমণিই বটে। কিন্তু লচ্চর প্রতি পার্বতীর যে পরিমাণ স্নেহ, সপত্নীভীতিও ততটা প্রবল ছিল। বাড়ি ফেরার পরে পুত্র ও সপত্নীর ক্রমবর্ধমান অনুরাগ দেখে সত্যভামা যে কী পরিমাণ ক্রুদ্ধ হবে এবং তার ফলে যে সংসারে ঝগড়া-ঝাঁটি ও মনোমালিন্যের সৃষ্টি হবে—সেইটেই ভয়ের কারণ।

মকর সংক্রান্তির পরে পনেরো দিনের মধ্যে পড়ুমুন্নুরু থেকে ঐতালের কাছে একটি শুভ বার্তা এসে পৌঁছল—শুভ পূর্ণিমা তিথিতে সত্যভামা আর একটি সন্তানের মা হয়েছে। এবারে অবশ্য মেয়ে সন্তান। এই সুখবরটি বাড়ির সকলকে জানাবার উদ্দেশ্যে ঐতাল ছেলেকে ডেকে বলল—'লচ্চ, তোমার একটি বোন হয়েছে—ছোটখাট একটি বোন।'

লচ্চ বলে উঠল—'আমি বোন চাইনে, কিছু চাইনে। আমার বড়মা আছে।' লচ্চকে জোর করে বোনের কথায় খুশি করবার জন্য বড়মা বলল—'ওকথা বোলো না বাছা। সুন্দর একটি বোন বাড়িতে এলে তুমি তার সঙ্গে কেমন সুন্দর খেলবে। উঠোনে বসে বসে তোমরা দুজনে 'কাঁইবিচি' খেলবে, অ্যাঁ?' কাঁইবিচির কথা মনে পড়তে লচ্চ বলল—'বড়মা, এসো আমরা কাঁইবিচি খেলি।' শিশুর পীড়াপীড়িতে পার্বতী পাটা ও তেঁতুলবীজ এনে লচ্চের সঙ্গে খেলা করতে বসল।

কিছুক্ষণ পরে রান্নার সময় হলে পার্বতী বলল 'আমি এখন তোমার জন্য রান্না করে রাখি। খেয়ে দেয়ে আবার খেলব, কেমন?

'আচ্ছা। আমি এখন একাই খেলি।'

'তাই তো বললাম, আমি না থাকলে বোনের সঙ্গে তুমি খেলতে পারবে।'

'বোন কী বড়মা?

বড়মা হাসল।

নয়

টালির বাড়ি তৈরি করার আকাঙ্ক্ষা ঐতালের মন থেকে কিছুতেই গেল না। কিন্তু সেই কাজে নামবার মতো যথোচিত সাহস না থাকায় অগত্যা সে চুপ করে রইল। ভাবল—সে যদি ওরকম একটা টালির ঘর তৈরি করে, তবে শীনময়্য একথা না বলে ছাড়বে না—'আমার উপর হিংসা করেই ঐতালের পো টালির ঘর বানিয়েছে।' কাজেই শীনের চোখ টাটানোর মতো অন্য কোনো কাজে তাকে হাত দিতে হবে। ঐতালের নারকেলবাগানের সংলগ্ন ঐতু পূজারির একটি চমৎকার বাগান আছে। ঐতালের বাগানের তুলনায় পূজারীর বাগানখানা নন্দনবনের তুল্য। মাটির উপর দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালেই নারকেলের নাগাল পাওয়া যায় এমন সব চারাগাছে পূর্ণ। আগে একবার ঐতালের নজর পড়েছিল ওই বাগানখানার উপর। পূজারী সেবার টাকার ঠেকায় তার কাছে এসে বলেছিল—'ঠাকুরমশাই, আমার এই বাগানখানা কিনতে চান কিনুন, বন্ধক রাখতে চান তাই করুন। মোট কথা, আমাকে শ'পাচেক টাকা দিন।' ঐতালের তখন টাকা দিতে সাহস হয়নি। তার একটু কারণ আছে। ঐতালের প্রথম বিয়ের বছরে তাদের বাগানের একটা অংশ মোহানার জলে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেকথা সে ভোলে নি। সেই ঘটনার পর কয়েক বছর পর্যন্ত মোহানার স্রোত বইত বাগানের কোল ঘেঁসে। এখন অবস্থাটা পালটে গেছে। গত পনেরো বছর ধরে বালির স্তূপ জমে জমে মোহনার উত্তর কিনারে পঞ্চাশ থেকে একশ গজ পর্যন্ত বিস্তৃত টিলা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে নদীর সমস্ত প্রকোপ গিয়ে পড়েছে দক্ষিণ কিনারে। ঐতালের বিশ্বাস আর বছর পঞ্চাশের মধ্যে উত্তর পারে মোহানার উপদ্রব হবে না। তাছাডা, নদীর দিকে পাথরের চাঁই দিয়ে বাঁধ বানিয়েছে পূজারী। কাজেই বাগানখানা খরিদ করার উদ্দেশ্যে পূজারীর সঙ্গে এখন আবার কথাবার্তা চালাতে ইচ্ছুক হল সে।

এদিকে দেনায় ডুবু ডুবু পূজারী একদিন ঐতালের সঙ্গে দেখা করতে এল সকালবেলা। পূজারীর দীর্ঘ চেহারার দ্বিগুণ ছায়া লম্বা হয়ে পড়েছে বালিয়াড়ির উপর। অস্পৃশ্যের ছায়া এড়িয়ে ঐতাল ওর কাছ থেকে যথাসম্ভব দূরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'পূজারী, তোমার বাগানখানা শেষপর্যন্ত কাকে দিলে?'

'ঠাকুরমশাই, উপযুক্ত খদ্দের না পেলে কাকে দেব? শীনময়্য একবার বলেছিলেন—আচ্ছা দেখব।'

'শীনময়্য? তার কাছে এত টাকা কোত্থেকে আসবে? খালি খালি মুখের চোট ঝেড়েছে।'

'না, ঠাকুরমশাই। এখন তার দুই ছেলে নাকি বেংগলুরে থাকে। সেখানে তারা তাদের মামাকে নিয়ে একটা হোটেলও নাকি খুলেছে। রোজগারপাতি নাকি বেশ ভালোই।'

খবরটা শুনে ঐতাল বেশ বিচলিত বোধ করল। নীরবে নীচের দিকে তাকিয়ে খানিকক্ষণ সে বুঝি বালিয়াড়ির কাঁকর গণনায় ব্যস্ত ছিল। শীনময়্যের ছেলেরা যে নিজেদের হোটেল খুলেছে এখবর সে জানত না। তার জানা ছিল ওরা কেবল অন্য লোকের হোটেলে চাকর-বাকরের কাজ করে। পূজারীর কথায় ঐতালের চমক ভাঙে—'কিন্তু ঠাকুরমশাই, তিনি চারশ টাকার বেশি দাম দেবেন না। এতে গাছ পিছু চারটে টাকাও হয় না। দু বছরের নারকেল বেচে ওই টাকা পাওয়া যায়।'

'ওই চারশ টাকাই দেব। বিক্রি করতে রাজী আছ?'

'কেমন করে দিই, ঠাকুরমশাই? বাগানখানায়, ধরুন গিয়ে দুশোরও বেশি গাছ। বছরে কম করে হলেও প্রত্যেকটি গাছে দেড়শ-দুশ ফল ধরে। শুধু তাড়ি বের করতে দিলেও বেশি পয়সা হবে। দশটা গাছে নম্বর দিয়েছি। কিছু না হলেও বছরে অন্তত চল্লিশ টাকার মতো আয় হয়।'

'তাহলে পূজারী, তোমার নারকেল গাছের দর দেখছি নারকেল গাছের মতোই উঁচু।'

'ঠাকুরমশাই, অন্যায্য কথা কিছু বলিনি। একমাত্র মোহানার কাছাকাছি এই যা ভয়। তা না হলে হাজার টাকায় যে কেউ নিয়ে নিত। এ অবস্থায় অন্তত ছ'শ টাকা না পেলে দিই কী করে?'

ঐতাল কিছুক্ষণ অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করল। এমন চমৎকার বাগানখানি সে যদি না নেয় তবে তা নিশ্চয়ই শীনময়্যের হাতে গিয়ে পড়বে। আগেরবার পূজারী পাঁচশ টাকা দাম চেয়েছিল, ঐতাল এবারে তাতেই রাজী হল। বলল, 'টাকা যোগাড় হলেই 'রিজিস্ট্রি' করব। কিন্তু 'রিজিস্ট্রি' না হওয়া পর্যন্ত এই খবর যেন কাক প্রাণীও জানতে না পারে।'—এই বলে তাকে বারংবার সতর্ক করে দিল। পূজারী যেন হাতে আকাশ পেল।

এই কথাবার্তার মাস দুয়েকের মধ্যেই পূজারীর নারকেল বাগানের মালিক হল রাম ঐতাল। তবু সে খবরটা বাইরে প্রচার করল না—পূজারীও কাউকে কিছু বলেনি। ইতিমধ্যে শীনময়্য একদিন শ'দুয়েক টাকা জোগাড় করে স্থির করে ফেলল আপাতত পূজারীর হাতে দুশো টাকা নগদ দিয়ে বাকী দুশো টাকার ওয়াদা করে নেবে। শীনময়্যের দৃঢ় বিশ্বাস—এই বালিয়াড়ি অঞ্চলে অতটাকা দেওয়ার মতো আর কেউ নেই। তাই সে পূজারীকে বাড়িতে ডাকিয়ে এনে কথা আরম্ভ করে যখন জানতে পেল যে ওটা ঐতাল কিনে নিয়েছে, শীনের বুকটা ধক্ করে উঠল। জিজ্ঞাসা করল—'নিয়েছে? কত টাকায়?'

'ঐতাল মশাই নিয়েছেন পাঁচশ টাকায়। তা-ও আমার লোকসান হয়েছে। কিন্তু কী করব হুজুর? আমার টাকার বড় গরজ ছিল। ওদিকে নতুন চারাগুলিতে ফল ধরতে শুরু করেছে। আমার ইচ্ছা ছিল না বেচে দেওয়ার।'

'তুই এখন বাগানখানা ছেড়ে কোথায় যাবি?'

'আপাতত ওঁরই প্রজা হয়ে থাকব। ভগবান যদি করেন তাড়ির দোকান দিয়ে আর একটা বাগান করা যাবে। তাড়ির কাজে যা মুনাফা, বাগানে তা কোথায় হুজুর?'

শীনময়্য বলল—'তুই একটা আস্ত বোকা। আমি ছয় শ টাকার জন্য তৈরি ছিলাম। তবে নগদ টাকা হাতে না নিয়ে কথা বাড়ানো উচিত নয় বলে চুপ করে ছিলাম। আজই তুই দিতে চাইলে চোখ বুজে ছয়'শ টাকা ফেলে দিতাম।' এই বলে শীন পূজারীর লোভটা বাড়িয়ে দিয়ে তাকে বিদায় দিল।

এবার ঈর্ষ্যায় জ্বলে মরার পালা শীনময়্যের। ঐতালের বাগান কেনাটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারছিল না সে। তার দেমাকে জ্বলে উঠল। 'দক্ষিণার পয়সা কুড়িয়ে ও যদি পাঁচশ টাকার সম্পত্তি করতে পারে, তবে আমার ছেলেদের রোজগার দিয়ে আমি একদিন সারা গ্রামখানাই কিনে ফেলব।' তার দুই ছেলে এবং শ্যালক মিলে যে হোটেল খুলেছে—'শ্রীলক্ষ্মী নরসিংহপ্রসন্ন বলেপেট হোটেল'—খুব জমজমাট তার কারবার। বড় ছেলে নরসিংহের চিঠিতে জানা গেল, বেংগলুরের আশে-পাশে নানা অঞ্চল থেকে লোক আসে তাদের হোটেলের স্পেশাল দোসে খেতে। এর থেকেই বোঝা যায়, ব্যবসা বেশ জমে উঠেছে এবং প্রতি মাসেই নরসিংহের কাছ থেকে শীনময়্যর নামে পঞ্চাশ টাকা করে মনি অর্ডার

আসছে। এদিকে শীনময়্য মহানন্দে তৃতীয় পুত্রের গলায় পৈতা ঝুলিয়ে তাকেও বেংগলুর পাঠিয়ে দিল। সে আরও স্থির করে রেখেছে যে সালিগ্রামের উৎসবটা পার হয়ে গেলে চতুর্থ পুত্রকেও পাঠিয়ে দেওয়া হবে। বাড়ির সব কটি ছেলে একই হোটেলে থাকলে মোটামুটি নিশ্চিন্ত থাকা যায় এবং সেই সঙ্গে মুঠো মুঠো টাকা উপার্জনের পথও প্রশস্ত হয়।

শীনময়্যের হাতে এখন প্রচুর টাকা। স্বভাবতই তার চিন্তা হল টাকার বিনিময়ে কী ভাবে ভালো ভালো সম্পত্তি হস্তগত করা যায়। কাজেই সে লোক লাগিয়ে খোঁজ নিতে থাকল গ্রামের কে কে জায়গা-জমি বিক্রি করতে অথবা বন্ধক রাখতে প্রস্তুত আছে। অন্য খদ্দের আছে জানতে পারলেই শীন সেই সম্পত্তির জন্য পাঁচ-সাত মোহর বেশি দাম হাঁকিয়ে সেটি কুক্ষিগত করে। আর যদি জানতে পারে যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে রাম ঐতাল, তবে জমির প্রকৃত মূল্যের উপর দু'একশ টাকা বেশি দিতেও তার কার্পণ্য নেই। তার এই প্রতিস্পর্ধার ফল হল এই যে নিজেদের গ্রামে ও তার আশেপাশে পাঁচ সেরী দশ সেরী ধানের যে সমস্ত ছোট ছোট ক্ষেত ছিল, সেগুলি শীনময়্যের নামে কেনা হয়ে গেল। এমন কি রাম ঐতালের রোয়ার মাঠের দুদিকে দুটি দশসেরী ক্ষেতও শীনের হস্তগত হল।

এই খবর শুনে ঐতাল ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল— 'বিষয় আশয় করার কি একটা রীতি-নীতি থাকতে নেই? পূজারীর বাগানখানি আমার বাগানের লাগোয়া ছিল বলেই কিনেছি দূরে থাকলে কি কিনতে যেতাম? আর শীনের চাল-চলনই আলাদা। এই সব টুকরো টুকরো ক্ষেত থেকে কি লাভ হবে কিছু? সেদিন মনূরু গ্রামে কয়েকখানি পাঁচসেরী ক্ষেত কিনেছে। ওতে কি ও চাষ বাস করতে পারবে? যেখানে লাঙল ঘোরাবারও জায়গা নেই, সেখানে জমি কেনা মানে মিছিমিছি ভূমিকর দেওয়া। যে টাকা খরচ করেছে, ওসব জমি থেকে সেই টাকাটাও উসুল হবে না।'

কিন্তু শীনময়্য কি বোকা না উন্মাদ? মোটেই নয়। সে মনে মনে একটা পথ ঠিক করে রেখেছে। সে ভালো করেই জানে যারা জমি বিক্রী করতে চায় তারা প্রায় সকলেই ছোট ছোট জমির মালিক। বড়ো জমির মালিকেরা সহসা জমি হস্তান্তর করে না। শীনময়্যের সান্ত্বনা এই যে সে যদি পর পর জমি কিনতে থাকে তবে দশজনের মধ্যে তার প্রভাব প্রতিপত্তি ঢের বেড়ে যাবে।

কেবল তাই নয়, তার কাজের মধ্যে আরও হিসেব আছে। ঐতালের রোয়ার ক্ষেতের তিন দিকের ছোট ছোট জমি এখন শীনময়্যের দখলে। কেবল পশ্চিম দিকের একখানি জমি এখনও অন্য লোকের হাতে। সেটাকে যেমন করে হোক দখল করে নিয়ে শীন যদি নিজের জায়গায় বেড়া লাগিয়ে দেয়, তবে ঐতালের রোয়ার মাঠ একটা দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তখন ঐতালকে বাধ্য হয়েই সেটা শীনের কাছে বিক্রী করে দিতে হবে এবং সমস্ত টুকরো জমিগুলি এক লপ্তে একখানি তিন মণী জমিতে পরিণত হবে। আর যদি ঐতাল বিক্রী করতে রাজী না হয়, তবে তাকে যথেচ্ছ হয়রান করা তো যাবেই। 'শীনময়্যকে ভয় করবে না কিংবা তার তোয়াক্কা রেখে চলবে না গ্রামে যেন এমন একটি লোকও না থাকে'—এই উদ্দেশ্য নিয়ে সে অগ্রসর হচ্ছে। তার নিশ্চিত বিশ্বাস—সম্পত্তি করা আর শতরঞ্জ খেলার রীতি নীতি একই।

শীনের বড় ছেলে বেংগলুর যাওয়ার সাত-আট বছরের মধ্যে পর পর চার ছেলেই সেখানে গিয়ে কাজে লেগেছে। তাদের বলেপেটের হোটেল বেড়ে যেতে এখন তরগুপেটে এবং চিক্কপেটে আরও দুটো ব্রাঞ্চ খোলা হয়েছে। এদিকে দেশের বাড়িতে মা ষষ্ঠীর কৃপায় 'প্রতি দুবছরে একটি শিশু-র পরম্পরা অক্ষুণ্ন থাকতে শীনময়্য এখন আটটি পুত্রসন্তানের জনক। 'ভগবান যদি করেন আগামী নববর্ষের পরেই নরসিংহের জন্য একটি মেয়ে ঘরে আনব। ওই রাম ঐতালের দ্বিতীয় বিবাহের চেয়েও বেশি ধুমধাম করে ছেলের বিয়ে দেব। বিয়ের দিন হাউই-তুবড়ি ছুঁচোবাজি দিয়ে মনূরু থেকে কোডি আর সমুদ্র থেকে বারকুরু পর্যন্ত মেদিনী কাঁপিয়ে দেব।'

শীনের আস্ফালনে সকলেই যে গ্রাহ্য করে তা নয়। কিন্তু তার ঘরে কিছু পয়সা জমেছে একথা যারা জানে, দুদশ টাকা কর্জ নিতে তাদের যাতায়াত শুরু হয়ে গেল। চতুর শীন একই জায়গায় বেশি টাকা ঢালে না। কিন্তু একবার হয়েছে কী, পারম্পল্লীর বাসুদেববাবুও সরকারী খাজনার টাকা যথাসময়ে যোগাড় করতে না পেরে পাঁচ শ টাকার জন্য শীনময়্যের দ্বারস্থ হলেন। শীনের গর্ব দেখে কে? 'পাঁচ শত টাকা ধার দিয়েছি পারম্পল্লীর বাসদেব বাবুকে। তাও বিনে লেখাপড়িতে।' কিন্তু ঋণের টাকা ফেরত পেতে অনেক বিলম্ব হবে বুঝতে পেরে ব্যাকুল শীন বাসুদেববাবুর বাড়িতে ঘন ঘন হাঁটাহাঁটি করে পাঁচ শ টাকার ঋণকে বন্ধকী ঋণে পরিণত করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

দেশের জমিদার বাবুকে টাকা ধার দিয়ে শীনময়্য যে কোডি গ্রামের একজন মাতব্বর ব্যক্তিরূপে গণ্য হবে তাতে আর আশ্চর্য কী? বিয়ে-পৈতার সময়ে যে ব্যক্তি বৈদিকের আসরেই ঘোরাফেরা করত, সেই শীন মহোদয়কে আজকাল বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যেও অগ্রাসন দেওয়া হয়ে থাকে। ওদিকে হিসাবপত্র জানে না এমন সব নিরক্ষর জেলে-কৈবর্তকে চক্রবৃদ্ধি হারে টাকা ধার দিয়ে শীনময়্য হুকুম নামা জারী করে দিয়েছে যে পথে দেখা হলেই সকলেই যেন তাকে ঝুঁকে পড়ে সেলাম করে।

একবার শীনময়্য জমিদার বাড়িতে গিয়েছিল বিয়ে উপলক্ষ্যে। জমিদার বাবুর মেয়ের বিয়ে পার্শ্ববর্তী গ্রামের জমিদার পুত্রের সঙ্গে। তখন শীনময়্য সেখানে অসামান্য আদর-সম্মান লাভ করে। ওদিকে তার বিপরীত প্রান্তে বৈদিকের সভায় এসেছিল রাম ঐতাল। জমিদার বাড়ির রীতি অনুযায়ী সকলের জন্যই চিনির শরবতের ব্যবস্থা। শীনময়্যকে দু-দু'বার চিনির শরবৎ দেওয়া হল রূপোর পাত্র করে। বৈদিক ব্রাহ্মণ ঐতালের সামনে নিয়ে আসা হল মাত্র একবার, তাও আবার কাঁসার ছোট ঘটিতে।

জমিদারবাড়ির বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে বস্রূরুর নাগম্মা নর্তকী আসেনি এমন বোধ করি একবারও ঘটে নি। নাগম্মার বয়স বেশি হওয়াতে আজকাল আর সে নাচে না। তার বদলে বেহালা বাজায়। নাগম্মার দুটি যুবতী মেয়ে—চেন্দু ও রাজীবি—সেদিন ভারতনাট্য নৃত্য দিয়ে আসর জমিয়ে রেখেছিল। নাচ শেষ হলে গ্রাম্য বাবুদের মধ্যে মর্যাদার লড়াই শুরু হয়ে যায়। ক-বাবু রাজীবিকে ডাকিয়ে খ-বাবুকে সেলাম দেওয়ালে, খ-বাবু চেন্দুকে ডেকে এনে ক-বাবুকে পাল্টা সেলাম দেওয়ায়। সেই একটি দিনেই একবার নয়, দু'বার নয়, আ-ঠা-রো বার শীনময়্যকে এই বলে সেলাম দেওয়া হল—'শীনম্যয় মহারাজকো দৌলৎ জাদা।' সেলাম যারা দিয়েছিল, খানিকটা দৌলৎ তাদের হাতে ফিরিয়ে দিতে গিয়ে শীনম্যয় আঠারো গুণ-দুই মানে ছত্রিশটি টাকা বিনা বিচারে ব্যয় করে ফেলল। কিন্তু যে-বেচারা একটি মাত্র সেলামেরও অধিকারী হতে পারল না, সেই রাম ঐতালের মুখখানা সেদিন ভারি বিমর্ষ দেখাল। কেউ কখনো শুনেছে যে, বৈদিক বামুন পয়সা দিয়ে এই ভুয়ো ইজ্জৎ লাভের জন্য লালায়িত হয়ে ওঠে? অথচ এই লোকটা কুলাচার ভেঙে শীনময়্য থেকে মহামান্য 'শীনময়্যরু' (শীনময়্য বাবু) হতে চলেছে।

বাড়িতে এসে ঐতাল সত্যভামাকে বলল—'ওই শীন এখন আমাদের মতো লোককে চোখ তুলেও দেখে না। ও আজকাল বারবণিতার সেলাম পাচ্ছে কিনা। আজ ছত্রিশটি টাকা দণ্ড দিয়ে আঠারোটা সেলাম আদায় করেছে। ওদিকে ছেলেগুলি কফিতে জল মিশিয়ে গাহক ঠকিয়ে টাকা রোজগার করছে, আর এদিকে পিতৃদেব সেই রোজগারের টাকা ঘুঙুরওয়ালীদের পায়ে দণ্ড দিচ্ছেন! কী মহাকাজ!' সত্যভামা স্বামীর মানসিক কষ্ট বুঝতে পেরে সহানুভূতির সান্ত্বনা দিয়ে বলল—'কার পয়সা গেলে কার কী? এই অপব্যয়ের পথে আমাদের প্রয়োজন নেই।'

ঐতাল কিন্তু চুপ করে থাকল না। কোনো এক বন্ধুকে ধরে তাকে দিয়ে এক বেনামী চিঠি লেখাল নরসিংহের বেংগলুরের ঠিকানায়—'তুমি ওখানে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকা রোজগার করছ, আর সেই টাকা তোমার পিতৃদেব এখানে এই বুড়ো বয়সে বারবণিতার পায়ে জলাঞ্জলি দিচ্ছে।' নরসিংহ চিঠিখানা পেয়েই খুব বিচলিত হয়ে পড়ে। পরে মামার কথায় এই ভেবে শান্ত হয় যে কে না কে শত্রুতা করে একটা উপদ্রব পাকাবার মতলবে আছে।

নব বর্ষ এসে গেছে। তিন বছর পরে নরসিংহ মাত্র এক সপ্তাহের জন্য দেশের বাড়িতে এল। ছেলের কাছে বেংগলুরে তাদের তিন-তিনটে হোটেলের বৈভবের কথা শুনে শীনময়্য খুব খুশি। নিশ্চয়ই ঠাকুর নরসিংহ দেবতা কৃপা করে তাদের অদৃষ্ট ফিরিয়ে দিয়েছেন। পুত্র নরসিংহের বয়স এখন ১৮। হোটেলের সমস্ত কাজ শিখে নিয়ে এখন সে নিজেই মালিক হয়ে বসেছে। এবারে সে বাড়ি এসেছে মামার নির্দেশে। সে বলে দিয়েছে বেংগলুরে যে প্রচুর রোজগার হচ্ছে দেশের বাড়িতে সেই টাকা দিয়ে স্থায়ী কিছু ব্যবস্থা করার জন্য নরসিংহ যেন তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করে। মামার অভিপ্রায়ের কথা বাবাকে জানাতে শীনময়্য হাসবার মতো মুখ করে বলল—'কী ভেবেছে, বুদ্ধি কি কেবল তার একারই আছে? তুমি যে টাকা পাঠিয়েছ, আমি তা দিয়ে কী কী করেছি জানো?' এই বলে সে একটা লম্বা ফিরিস্তি দিল। এসব কথা নরসিংহ আগেই জানত। বলল—'মামা কী বলেছে জানেন? ভাবনা চিন্তা না করে একরোখা হয়ে সম্পত্তি করা ছেড়ে দিতে। এখানে এক টুকরো, ওখানে এক টুকরো—এইভাবে সম্পত্তি কেনা যাতে কোনো খাজনাপত্র পাওয়া যাবে না—এভাবে টাকা

নষ্ট করে লাভ কী?' আরও জানাল যে মামার জন্যও যেন আলাদা করে হাজার চারেক টাকার সম্পত্তি দেখে রাখা হয়।

শীনময়্য খুব ভাবনায় পড়ে গেল। সে যে সম্পত্তি করেছে তা দিয়ে অন্যের উপর উপদ্রব করা সহজ, কিন্তু সেগুলিতে চাষবাস করা সহজ নয়। ক্রমশই বুঝতে পারল—জমিগুলিকে অন্যলোকের হাতে খাজনায় দিয়ে পরে সেই খাজনা আদায় করাও বেশ একটা ঝামেলার ব্যাপার। ওদিকে সুদের কারবারে আট-দশ টাকার মতো ছোট ছোট ঋণের সুদ পাওয়া গেলেও পারম্পল্লীর জমিদার বাবুকে দেওয়া পাঁচ শ টাকার সুদ বাকীই পড়ে থাকল। এই সমস্ত কারণে শীনের মনে হল শ্যালকের পরামর্শটা মান্য করা উচিত। সে সাহায্য করেছে বলেই এত অল্প সময়ের মধ্যে নরসিংহ আজ তিন তিনটে হোটেলের অংশীদার হতে পেরেছে। শীন বলল—'নরসিং, তুই যে পয়েন্টটা বললি, ঠিকই। তাই করা যাবে।' শীনময়্য তখন ভাবছিল যে এবারে ছেলের একটা বিয়ের ব্যবস্থা করা দরকার। নরসিংহ বলে উঠল—'বেংগলুর ফিরে যাওয়ার সময় হয়েছে। বিয়েটিয়ে এখন নয়। আগামী বছর দেখা যাবে।'

এবারে যাওয়ার সময়ে চতুর্থ ভাইকে সে সঙ্গে করে নিয়ে গেল। বাবাকে বলে গেল—'চাষবাসের কাজ শেষ হলেই আপনি একবার বেংগলুর এসে মাস দুই আমাদের সঙ্গে থাকবেন, মামা এই কথা বলে দিয়েছে।' এই চিন্তা শীনময়্যকে আর এক বিপদে ফেলল। বেংগলুরে যাওয়ার কথা নিয়ে সে এমন ভাবে শোরগোল তুলল যেন সে সুদূর কাশীতে তীর্থযাত্রার উদ্যোগ করছে।

গ্রীষ্মকাল গিয়ে বর্ষা এসেছে। শীনময়্য তাড়াতাড়ি করে চাষবাসের কাজ শেষ করে ফেলল। বৃষ্টি খানিকটা ধরে এলে শীমোগে স্টেশনে গিয়ে সে বেংগলুরের ট্রেন ধরবে বলে মনস্থ করল। কিন্তু এখন সমস্যা এই যে শীমোগে যাওয়ার উপায় কী? তার ছেলেপিলেরা চার-পাঁচ দফায় থেমে থেমে পায়ে হেঁটেই যাতায়াত করে বটে, কিন্তু তার নিজস্ব মর্যাদা অনুযায়ী কোডি থেকে শীমোগে পর্যন্ত গোরুর গাড়িতেই যাওয়া দরকার। গাড়িটা না নয় জমিদারবাবুর দাক্ষিণ্যে পাওয়া যাবে, কিন্তু পথের মাঝখানে নদীগুলি পার হওয়ার উপায় কী? বর্ষাকালের সপ্‌সপে হাওয়ার মধ্যে আংগুবে চড়াই-পার হওয়া যায় কী ভাবে? চড়াই পার হতে গিয়ে সে যদি গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করে, তবে ওখানকার জোঁকগুলি কি তার রক্ত না চুষে ছাড়বে?—এই রকম নানা চিন্তা একটার পর

একটা তার মনে আবর্তিত হতে থাকে। পায়ে হাঁটার মতো শারীরিক সামর্থ্য তার আছে। কিন্তু শীনময্য এই সামান্য কথাটা বুঝতে পারল না যে গোটা পথটা সে হেঁটে যেতেও পারে। পারম্পল্লীর জমিদার বাবুকে যে টাকা কর্জ দিয়েছে সে কিনা শীমোগে পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যাবে? তার একটা 'মান-সন্মান' আছে না? 'যার ছেলেরা মাসে শতশত টাকা রোজগার করে, তার কী এমন দায় পড়ল পায়ে হেঁটে যাবার?' এই বলে কি দেশের লোক না হেসে থাকবে?

তখনকার দিনে গ্রামের মানুষের পক্ষে পায়ে হেঁটে যাতায়াত করা কোনো বিশেষ ব্যাপার ছিল না। নবরাত্রি উপলক্ষ্যে বড়দের সঙ্গে সাত-আট বছরের শিশুরাও শৃঙ্গেরীতে পদযাত্রা করত। নবরাত্রির সময়ে কি বৃষ্টি হত না? কয়েক বছর আগে সেখানে ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গরূপে মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে শাড়ীবিতরণ হত বলে গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে শীনময্যের স্ত্রীও যায় নি কী? এই সমস্তই সত্য বটে, তবু শীনের মন দ্বিধাগ্রস্ত। বেংগলুর যাত্রা সম্পর্কে সে কোনো কিছুই স্থির করতে পারল না।

একদিন বন্দরের মহাজন পট্টিতে গিয়ে দীর্ঘ চিন্তাভাবনার পরে ছেলেকে লিখে পাঠাল যে শরীরটা তার ভাল নেই এবং ফসল কাটার আগে কোনোক্রমেই তার পক্ষে বেংগলুর আসা সম্ভব নয়। এদিকে কিন্তু নিজের বৈভবও পরাক্রম প্রদর্শনের চোটপাটে সারা গ্রাম তোলপাড় করে দিতে তার কিছুমাত্র বিরাম নেই। ওদিকে 'বাবা আসবেন' বলে ছেলেরা অপেক্ষায় থেকে থেকে খুবই নিরাশ হয়ে পড়ল। রিপ্লাই কার্ডে লিখে জানায় 'দীপাবলী শেষ হতেই বেংগলুরে রওনা হতে দ্বিধা করবেন না।'

বেংগলুরের প্রসঙ্গ কোনোমতেই এড়ানো যাচ্ছেনা দেখে শীনময্য হতাশ ও বিরক্ত হলেও, ওখান থেকে যখন মাসে মাসে কখনো পঞ্চাশ কখনো একশটি করে টাকা আসে, মনটা তার খুশিই হয়। মাঝখানে শ্যালকের জন্য তিন হাজার টাকার সম্পত্তি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ওৎ পেতেছিল। যাদের জমি আছে অথবা নেই যারা জমি বিক্রী করবে অথবা করবে না—সকলের কাছেই সে সাড়ম্বরে বলে বেড়াতে লাগল—'বল দেখি, সরেস সম্পত্তি কোথায় কিনতে পাওয়া যায়।' সেই সঙ্গে এই চাল দিতেও কসুর করল না যে মুখের কথা খসালেই এক থোকে সে দশ হাজার টাকা ফেলে দেওয়ার সামর্থ্য রাখে।

রোয়ার কাজের শেষ এবং ফসলকাটার শুরু—এই দুয়ের মাঝখানে শীনময্যের

জীবনে আর একটা বিশেষ ব্যাপার ঘটল। পারম্পল্লীর জমিদার বাবুদের গৃহে আর একটি বিবাহের আয়োজন হচ্ছে। বাসুদেববাবু তাদের অবিভক্ত পরিবারের অখণ্ড সম্পত্তির মালিক। আগের বারের বিয়ে—যে বিয়ে উপলক্ষ্যে শীনময়্য 'দৌলৎজাদা' উপাধি লাভ করে—সেটা ছিল বাসুদেববাবুরই মেয়ের বিয়ে। এবারে তাঁর দাদার ছেলের বিয়ে। নিজের মেয়ের বিয়ের মতো ধুমধাম করে পরলোকগত দাদার ছেলের বিবাহ দিতে বাবুমশায়ের মন চাইছিল না। মন চাইলেও, আগের মতো শক্তি সামর্থ্যও ছিল না। তাই বিবাহের দিন ধার্য করা হল বর্ষার দিনে। তাঁদের গ্রাম থেকে দশ-বারো মাইল দূরবর্তী পূব-পরগনার কোক্করণের কাছাকাছি একটি গ্রামের এক অবস্থাপন্ন পরিবারে সম্বন্ধ স্থির হয়েছে। তাদের তিনটিই মেয়ে-সন্তান। কাজেই ভবিষ্যতে ওদের সম্পত্তির এক-তৃতীয়াংশ বাসুদেববাবুর ঘরেই আসবে—এই সমস্ত বিচার-বিবেচনা করেই বিবাহ স্থির হয়। বর্ষাকালের বিবাহে কেবল মুষ্টিমেয় বরযাত্রী গেলেই যথেষ্ট এই ভেবে ব্যবস্থাদি করা হয়। বলা বাহুল্য, সেই মুষ্টিমেয় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে শীনময়্যও অন্যতম। সময়টা শুক্লপক্ষ। কয়েক দিন যাবত বৃষ্টি বাদলের উপদ্রব নেই এবং আকাশটাও পরিষ্কার দেখে স্থির হল, সমাবর্তনের দিন দুপুর বেলার দিকেই বরযাত্রীরা রওনা হয়ে নৌকাযোগে বারো মাইল পথ অতিক্রম করে মধ্যরাত্রির আগেই পৌঁছনো যাবে। গোরুর গাড়ির উপযুক্ত রাস্তা ছিল না বলে সকলেরই নৌকাযাত্রা পছন্দ হল। একটু মাত্র অসুবিধা এই যে, বৃষ্টি যদি মন করে এবং হাওয়া যদি 'রুমুরুমু' করে বইতে থাকে তবে প্রাণ নিয়ে কোক্করণে যাওয়া আর কাশীযাত্রা শেষ করা একই কথা। তবু 'আগেগুড়ে'র সিদ্ধিদাতা গণেশকে এক হাজার কলা-নারকেল মানত করে বুকের পাটায় ভর করে বরযাত্রীর দল রওনা হল।

বাবুদের বাড়ির প্রধান কর্তারা, পুরুত ঠাকুর, বর এবং শীনময়্যসহ চার-পাঁচ জন মান্যগণ্য ব্যক্তি নিয়ে বরযাত্রীদল। বাজনাদারেরা পরদিন হেঁটে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলেই হবে এইরূপ ব্যবস্থা হল। কিন্তু বাবুদের বাড়ির শুভ কর্মে মুজরের দল ছিল অপরিহার্য। এদের সঙ্গে করে নিয়ে না গেলে অনুষ্ঠান পূর্ণ হত না। বাড়ির মেয়েরা ও পুরুত ঠাকুর বসল এক নৌকায়। আর এক নৌকায় উঠলেন স্বয়ং বাবুরা, শীনময়্য সহ আরও কয়েকজন এবং সর্বোপরি বেহালাধারিণী নাগম্মা, নাগম্মার দুই মেয়ে চন্দু ও রাজীবি এবং দোহার সুব্ব।

পাল খাটানো নৌকা তর্ তর্ করে চলতে থাকে। সূর্য ডোবার আগেই নারকেল বাগানের পাশ দিয়ে, সুন্দর ঢালু জমির মধ্য দিয়ে নৌকা এগিয়ে চলে বারকুরা গ্রাম পিছনে ফেলে। আর মাত্র ছ-সাত মাইল পথ। হাওয়া যদি এই ভাবেই অনুকূল থাকে, আর যদি আকাশে মেঘাড়ম্বর না হয়, তবে একপ্রহর রাতের মধ্যেই কোক্করণ গ্রামে পৌঁছে সেখানে বরযাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট নিবাসে যে যথাসময়ে উপনীত হয়ে বিশ্রাম করা যাবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ রইল না। বাসুদেববাবু বললেন—'আণেগুড্ডের গণপতিঠাকুর যা করাবেন তাই হবে।' বেহালাধারিণী নাগম্মা বলল, 'ঠাকুর কি আমাদের বিপদে ফেলবেন ?'

নৌকা চলতে চলতে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসতে আকাশে দেখা দিল চাঁদের আলো। নদীযাত্রাকে বোধ হচ্ছিল স্বপ্ন সন্তরণের মতোই মনোরম। বাবু ধীরে ধীরে ইয়ারদের ডেকে বললেন—'বাজনা-বাদ্যও নেই। বৃষ্টিও মনে হয় পালিয়েছে। মিছিমিছি গাল গল্প করার চেয়ে নাগম্মা একটু বেহালা বাজালে এবং রাজীবি একটু মুখখানা খুললে বেশ শোনা যেত।' রসিকপ্রবর বাবুমহাশয় এই কথা বলাতে শীনময়্য সমজদারের মতো বলল—'বাবুজী, আপনার মেয়ের বিয়েতে গান গেয়েছিল রাজীবি। নেচেও ছিল খুব চমৎকার। এখন রাজীবির ছোট বোনও বা কম কিসে ?' নদীর মধ্যে সঙ্গীতের প্রস্তাবে সকলেই বেশ উৎসাহিত দেখা গেল। গান শুরু হওয়ার মুখে বাবুজী রসজ্ঞের মতো ফরমায়েশ করলেন—'সেই গান, সেই যে—'নচ চুম্ চুম্' গানখানি।' শীনময়্য ফোড়ন দিল—'ওরা যা গায়, তাই যেন মধুর!' সংগীতের এবং বিশেষভাবে সংগীত-কারের টানে বাবুজী ও শীনময়্য এখন যে সামনে এগিয়ে এসেছেন সে খেয়াল নেই। তাদের খেয়াল হল, যখন পশ্চাতে 'চিলিচিটিলু' শব্দ করে ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। এদের নৌকা ছিল পিছনে। সামনের নৌকাখনি এতদূর এগিয়ে গেছে যে সে নৌকার আরোহীরা এদের চিৎকার-ধ্বনিরও বাইরে।

শীনময়্য বলল—'ভয় নেই। সামান্য ঝির্ঝিরে বৃষ্টি, এক্ষুনি থেমে যাবে। মিছিমিছি বেহালা-টেহালা ভিজিয়ে দরকার নেই।' মুজরোর কর্তানী নাগম্মা বলল—'কি ব্যাপার, পান-সুপারির ডিবাটা কি ভুলে এসেছেন আপনি ?' ডিবাটা বের করার সঙ্গে সঙ্গেই বাতাসের সঙ্গে সঙ্গে খুব জোর বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। নৌকার মাঝিদের চোখে চার গজ দূরের পথও ঝাপসা বোধ হচ্ছিল। 'কিনারে কোথাও নৌকা ভিড়াই, মধ্যজলে রাখা ঠিক হবে না। বৃষ্টিটা থেমে যাক'—এই

বলে মাঝি পাড়ের দিকে নৌকা ভিড়াবার চেষ্টা করতে লাগল। ইতিমধ্যে সেই বৃষ্টি-বাদলের ঝাপটায় একে একে সকলের স্নান হয়ে গেল। সামনের নৌকার কথা ভেবে বাসুদেববাবু খুব বিচলিত হয়ে পড়েন। যতই চিৎকার করো না কেন সেই বৃষ্টির ধুন্ধুমারে কাছের লোকের আওয়াজই শোনা যায় না, দূরের ডাক শোনা যাবে ?

নৌকা কোনো ক্রমে পাড়ে এসে ভিড়ল। কিন্তু এখানটায় উপরে ওঠার উপায় নেই। নদীর পাড়ে পাড়ে মাথা সমান উঁচু হোগলা বনের ঝাড়। নৌকা আর সামনে পিছনে না গিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। ছাতা ধরেও কোনো ফল হল না। সকলেই ভিজে-পুড়ে একাকার। জলের ঝাপটে ঝাপটে নৌকার ছইয়ের নিচের পাটাতনও পুকুর হয়ে গেল। ঠাণ্ডায় প্রত্যেকে হি-হি করে কাঁপছে। কী আর করা ? বৃষ্টি না থামলে পাড়ে ওঠার সাধ্য নেই। কোথায় যে তারা এসে পৌঁছল—কাউকে ডেকে-ডুকে একথাটা জানারও কোনো উপায় নেই। শীনময়্যর কেবল এই কথাটাই মনে হতে লগল—'বেংগলুর যাত্রাটা এড়িয়ে আমি এখন এই বরযাত্রের মেলে ফেঁসে গেলাম !'

দুই দণ্ডের 'লালাটি' সকলকেই ভোগ করতে হল। তারপরে, সেই ঝড়-বৃষ্টি যেমন হুড়মুড় করে এসে পড়েছিল, তেমনি ফুরৎ করেই চলে গেল। আকাশ পরিষ্কার। জ্যোৎস্না নদীর বুকে দুধের মতো ছড়ানো। মাঝি জিজ্ঞাসা করল—'বাবুমশাই, নৌকা নিয়ে এগোবে ?' বাবু বললেন—'এখানে থামিয়ে রেখে কি করবি ? কাছাকাছি কোনো বাড়ি-ঘর পাওয়া যায় কিনা...।' 'বাড়িঘর পেতে হলে অন্তত এক ক্রোশ যেতে হবে। সামনে আধক্রোশ দূরে কোক্করণে গ্রামই এসে যাবে।' 'আণেগুড্ডের গণপতি ঠাকুরই যদি রুষ্ট হন, তার উপর মানুষ আর কি করবে ? যা হোক, আগের নৌকাটাকে খুব জোরে হাঁক দাও দেখি।' মাঝি তারস্বরে হাঁক দিলেও কোনো প্রত্যুত্তর এল না। 'ওরা বুঝি ঢের আগে বেড়ে গেছে হুজুর।'

নৌকা আবার মাঝ-নদীতে এসে অগ্রসর হয়ে চলে। বৃষ্টি স্নাত সকলেই স্থির করল যে যার সিক্ত বস্ত্র নিংড়ে নিয়ে পরিধান করবে। না করে উপায় নেই। কারণ নাগম্মার মুজরোর দল ছাড়া, বাকী সকলের কাপড়-চোপড় অন্য নৌকায়। এই ভাবে ঠাণ্ডায় কষ্ট পেতে হবে ভেবে শীনময়্য খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল।

জ্যোৎস্নালোকে জমিদারবাবু শীনের কানে কানে 'গুস্ গুস্' করে কি জানি কি বলছেন। আর হাসিমুখে শীনময়্য টেড়ে-টেড়ে চন্দু-রাজীবির মুখের দিকে চুরি করে তাকাচ্ছে। মাঝ রাতে নৌকা যখন কোক্করণ গ্রামের ঘাটে এসে পৌঁছয়, তখন বৃষ্টি জনিত সমস্ত অনর্থের কথা ভুলে গিয়ে শীনের মনে এক অতি অপূর্ব মধুর স্বপ্ন দেখা দেয়।

নৌকা ঘাটে পৌঁছতে দেখা গেল কনের বাড়ির লোকেরা রোশনচৌকি নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। শীনময়্য পাড়ে নেমেই বলল—'আমাদের কপালে এমন গ্রহের ফেরও ছিল?' নাগম্মা বলল 'না বাবুজী, আমাদের মধ্যে কোনো একজনের 'গ্রহফল' ভালো না হলে আমাদের সকলকেই দুঃখ পোহাতে হত।' নাগম্মার কথায় 'সে কে বাবা?' এই বলে সকলেই এদিক-ওদিক তাকিয়ে মুচকে মুচকে হাসল।

জমিদারবাবু সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে বরযাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানে গিয়ে উঠলেন। সেখানে আর এক প্রস্থ আদর-আপ্যায়নের ধুম। শীনময়্য বলল 'কিছু একটা গরম গরম খেয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা হয়ে শুয়ে পড়া যাক।' নাগম্মা পরিহাস করে বলল—'এমন কি দায় বাবুজী যে ঠাণ্ডা কাপড় চোপড়েই শুতে হবে?' শীনময়্য বলল, 'দোহাই মহারানী তোমার মুখে বাঁধোয়া নেই।' রাজীবি বলল, 'মনে তো হচ্ছে ওর মুখে বাবুজী আপনিই বাসা বেঁধেছেন।' রাজীবি মুচকি হেসে চোখ ঠেরে সোজাসুজি শীনময়্যের সঙ্গে কথা বলল এই প্রথম। শীনময়্য একটু নিম্নকণ্ঠে বলল, 'মায়ের চেয়ে মেয়ে দড়!' তাতে মা এই বলে টিপ্পনী কাটল, 'দেখুন না আজকালকার মেয়েগুলিকে।'

বরযাত্রীনিবাসে যথোচিত আদর-আপ্যায়নের মধ্যে নৈশ ভোজন সম্পন্ন হলে রাত্রি অধিক হয়েছে বলে যে যার নির্দিষ্ট স্থানে শুয়ে পড়ল। 'কী জানি কেন ঘুম আর আসবে না' এই বলে বাসুদেববাবু শীনময়্যকে সঙ্গে নিয়ে একটা ঘরে এসে বসলেন। সামনে এল পান-সুপারীর বাটা। মুজরা দলের তবলাবাদক সুব্ব গিয়েছিল তামাক-পাতার খোঁজে। জমিদারবাবু নিম্নকণ্ঠে বললেন—'সুব্ব, পান যারা সাজল, তারা না থাকলে পানের আর স্বাদ রইল কি?'

আমন্ত্রণ পেতেই যা বিলম্ব। চন্দু ও রাজীবিকে নিয়ে নাগম্মা সেখানে এসে জাঁকিয়ে বসল। সময় কেটে যাচ্ছে একদিকে নাগম্মার বিচক্ষণ কথাবার্তার ফুলঝুরিতে, অন্যদিকে চন্দু-রাজীবির তাম্বুল-পরিচর্যায়। চন্দু তাম্বুলপানে তৃপ্ত

করছে বাসুদেববাবুকে, রাজীবি শীনময়্যকে ! সময় হল বলে নাগম্মা এক সময়ে বাইরে চলে গেল।

রাত্রি যথাসময়ে ভোর হলেও বাবুরা যখন ঘুম থেকে উঠলেন, বেলা তখন একপ্রহর। তাঁদের জন্য প্রাতরাশ প্রস্তুত। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে সকালবেলাকার জলযোগ শেষ করে বাসুদেববাবু শীনময়্যকে সঙ্গে নিয়ে কুটুম্ব বাড়িতে গিয়ে দর্শন দিলেন। সেখানে ছাপরা ও আহারাদির ব্যবস্থা প্রভৃতি দেখতে দেখতে কুটুম্বের কাছ থেকে অনুরোধ এল যাতে বিবাহের চারটে দিনই তাঁরা অনুগ্রহ করে থেকে যান। শীনময়্য বলল—'সমস্ত বরযাত্রীকে একই জায়গায় থাকতে দিলে বেশ একটা ভীড়-ভাড় হবে। বরযাত্রী নিবাসে ব্যবস্থা ভালোই। যারা চলাফেরায় শক্ত সমর্থ, তারা সেখানেই থাকবে। এখান থেকে ওখানে এমন কি দূর? আমাদের কোডিগ্রাম থেকে পারস্পল্লী যাওয়ার মতোও নয়। যারা চলতে ফিরতে অক্ষম ও অনিচ্ছুক, তারা এখানেই থাক।' বাসুদেববাবু শীনময়্যের কথায় 'তাই ঠিক' বলে তাঁর সম্মতি দান করলেন!

সেদিন অপরাহ্ণে পুনরায় মানত করা হল যাতে গোধূলি লগ্নে বৃষ্টিপতি বরুণদেব এবং আগেগুড্ডের গণপতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে! সত্য বটে, কাল বিনায়ক প্রভু মানত-মিনতি সত্ত্বেও নদীবক্ষে বৃষ্টিধারায় তাদের ভিজিয়ে দিয়েছিলেন, তবু যে অন্য কোনো দেবতার শরণাপন্ন হবে তারও উপায় নেই। যাই হোক, সেদিন সন্ধ্যায় ঠাকুর তাদের প্রার্থনায় কর্ণপাত করে থাকবেন। বিবাহের শেষ অনুষ্ঠান 'জলধারা বিধি' না হওয়া পর্যন্ত একফোঁটা বৃষ্টিও পড়েনি। তারপরেই একদণ্ড কাল ধরে মুষলধারে বর্ষণ। মুজরোওয়ালাদের সেলাম দানের কার্যক্রম স্থগিত হয়ে গেল।

মুজরোওয়ালীরা বলেছিল—'বাবুজী এই বিয়ে বাড়ির গোলমালে আপনাদের কি ঘুম হবে?' আহারান্তে তাই জমিদারবাবু ও শীনময়্য যাত্রীনিবাসে চলে গেলেন। প্রথমে স্থির হয়েছিল যাত্রীনিবাসে যাবে কেবল উৎসাহী পুরুষের দল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাগম্মা চন্দু রাজীবিরাও সেই দলে ভিড়ে গেল।

বিবাহের চারদিন যাবত বরযাত্রী নিবাসের কোলাহল কহতব্য নয়। একে একে পর্যায়ক্রমে নৃত্য, গীত ও তাম্বুলের সমারোহ দেখে বলা কঠিন আসল বিয়ে-বাড়ি কোন্‌টি। যাইহোক, চতুর্দিনব্যাপী বিবাহ উৎসব বিশেষ ধুমধাম সহকারে সম্পন্ন হল। কুটুম্ব গৃহে যাদের অভ্যর্থনা পাওয়া দরকার, তারা তা পেল। চন্দু

রাজীবির সরস রসনায় যাদের তৃপ্তি পাওয়া দরকার, তারাও সে রস থেকে বঞ্চিত হল না। চারদিন পর জমিদারবাড়ির মেয়েদের পীড়াপীড়িতে নদীবক্ষে নৈশ অভিযানের সংকল্প পরিত্যক্ত হয়ে দিবালোকে স্বগ্রামে অভিমুখে নৌকাযাত্রার ব্যবস্থা করা হল। ফেরার সময়ে আর বৃষ্টিবাদলের নামগন্ধও নেই। এবারে চড়া রোদের কড়া তাপে সকলেই সিদ্ধ হতে হতে মধ্যাহ্ন পার করে গ্রামের ঘাটে এসে পৌঁছাল।

দেশে ফিরে শীনময়্যের কাজ মোটেই সুখকর হল না। রাজীবিকে বিদায় দিতে তার বুকের মধ্যে কোথায় যেন চিন্‌চিনে বেদনার অনুভূতি। এতকাল পর্যন্ত জীবনের রস রঙ্গের সঙ্গে যার লেশমাত্র পরিচয় ছিল না, সেই প্রৌঢ় শীনময়্য আজ রাজীবির উপর কেমন যেন একটা মাত্রাধিক প্রীতির আকর্ষণ বোধ করল। বিদায় নেয়ার আগে রাজীবি শীনময়্যকে মিষ্টি কথায় খুশি করে বলল, 'বাবুজী, আপনি যখনই কুন্দাপুর যাবেন, গরীবদের একবার দেখে আসবেন।' তারপর থেকে শীনময়্য এক নতুন চিন্তায় মগ্ন হয়ে পড়ল—কুন্দাপুরে কবে তার কাজ পড়বে।

জমিদারবাড়ির বিবাহের খবর সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। আগের বিবাহে রাম ঐতাল নিমন্ত্রিত হয়েছিল। কিন্তু এবারে তার নিমন্ত্রণ না পাওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? এই নিয়ে যখন সে বিষম চিন্তান্বিত, এমন সময় খবর এল বরযাত্রীদল ফিরে এসেছে। দিন কয়েকের মধ্যে শীনময়্যের নতুন কীর্তি-কলাপের বিবরণও যথারীতি তার কানে এসে পৌঁছল। আপন মনে ঐতাল বলে উঠল—'হুঁ, এই কোডিগ্রামের নতুন বাবুমশাই আমাদের শীনময়্য সমান তালে চলবেন কিনা পারম্পল্লীর জমিদারবাবুদের সঙ্গে।' এই বলে ঐতাল ক্রূর হাসি হাসল।

দশ

রাম ঐতালের যখন মেয়ে জন্মাল, তখন প্রথম সন্তান লচ্চর বয়স সাড়ে তিন বছরের কিছু বেশি। সত্যভামা তার নবজাত শিশু কন্যাসহ পতিগৃহে এল বটে, কিন্তু তার ফলে যে লচ্চর দিক থেকে কিছু ইতর বিশেষ দেখা গেল তা নয়। এমন কি সর্বদা কচি শিশুর সেবা শুশ্রূষায় ও আদর যত্নে ব্যস্ত দেখেও লচ্চ তা নিয়ে কোনো হিংসা করে না। কারণ সে মায়ের বদলে বড় মায়ের স্নেহের দুলাল হিসেবেই বড় হয়ে উঠছে। ছোট বোন বাড়ি আসার পর লচ্চ যদি মায়ের মুখ দেখে চারবার তো বড়মায়ের চৌদ্দবার। ব্যাপারটা যে সত্যভামার পক্ষে মোটেই প্রীতিকর নয়, সে কথা না বললেও চলে। ছেলেকে সে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, 'লচ্চ, বোনের সঙ্গে খেলবি না?' উত্তর আসে, 'আমার বোন চাই না।' 'তবে আমার সঙ্গে খেলবি?' লচ্চ বলে, 'তবে আমায় কোলে নাও, বোনকে মাটিতে রাখ।' সত্যভামা দুঃখ করে বলে, 'তুই যার-তার হাতে বড় হবি বলে আমার পেটে এসে জন্মেছিলি।'

এদিকে লচ্চ পার্বতীর সঙ্গে খুব বেশি কথা বললেও পার্বতী যতক্ষণ বাড়িতে থাকে ততক্ষণ সে বাহ্যত বিশেষ কোনা স্নেহ-প্রীতি দেখায় না। কিন্তু বাড়ির সদর দরজা পার হল তো দুজনের মধ্যে অবারিত ভাব। পার্বতীর নিজের পেটে একটি ছেলে হলে যেমন মায়া মমতা জন্মাত, ঠিক তেমনি আকাঙ্ক্ষাই এই সপত্নী-পুত্রকে কেন্দ্র করে তার মনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এইসব কারণে সত্যভামা এখন নামেমাত্র নিজের ছেলের মা। যতই দিন যায় তার মনে এই বেদনাই প্রবল হতে থাকে।

রাম ঐতাল যে বাড়িতে বসে ছেলের সঙ্গে খেলা করবে এমন অবকাশ তার নেই। তবে সন্ধ্যায় ফিরে এসে লচ্চর সঙ্গে সে কথাবার্তা বলে। সেও এটা লক্ষ্য করেছে যে ছেলে তার দিনরাত বড় মায়ের পিছন পিছন থাকে। কিন্তু বকাবকি করে কোনো লাভ নেই তাও সে বোঝে। কিন্তু সত্যভামা তার দুঃখের কথা স্বামীর কাছে না বলে থাকতে পারে না—'পরে এই মেয়েটাও বড় হয়ে বড়মার পিছু ধরবে। আমি কেবল প্রসব করার কষ্ট পোহাই।' ঐতাল সত্যের মানসিক বেদনাটা বুঝতে পারে, কিন্তু তা দূর করার উপায় তার জানা নেই।

চার বছর পূর্ণ করে লচ্চ এখন পাঁচে পা দিয়েছে। এই সম্বন্ধে প্রতিকারের একটা উপায় খুঁজে পাওয়া গেল। কথাটা এল সত্যভামার কাছ থেকে এইভাবে—'লচ্চর তো এখন ইস্কুলে যাবার বয়স। ওকে লেখাপড়া শেখানো দরকার। বাবার কাছে থেকে মল্‌পির সরকারী ইস্কুলে ভর্তি হতে পারে। ওখানে দাদুর বাড়িতে লচ্চ ভালো ভাবে মানুষ হবে।' ঐতাল কিন্তু ছেলেকে নিজের কাছ থেকে দূরে রাখতে অনিচ্ছুক। বলে—'লচ্চর লেখাপড়া নিয়ে এত তাড়াতাড়ি কি?'

ছেলের পাঁচ বছর পূর্ণ হতেই একদিন সরস্বতী বলল—'দাদা, আগামী নবরাত্রির প্রতিপদের দিন আমাদের শঙ্কর পণ্ডিতের পাঠশালায় লচ্চকে দিয়ে দাও। পাঁচ বছর বয়স হল, অথচ খোকা এখনও 'শ্রী' লিখতে শিখল না! পারম্পল্লীর বাসুদেববাবু নাকি ইংরেজি শেখাবার জন্য ছেলেদের কুন্দাপুরে না-হয় উডুপিতে পাঠায়। লচ্চর ইংরেজি-ফিংরেজি লাগবে না। রামায়ণ-ভাগবত পড়ে শোনাবার মতো বিদ্যে হলেই ঢের।' ঐতাল জবাব দেয়—'তোর এত তাড়া কেন সরস্বতী? লচ্চকে শঙ্কর পণ্ডিতের পাঠশালায় দিতে পারি। কিন্তু পণ্ডিতের যা শাস্তি দেওয়ার নমুনা—এই ধরো, আড়ায় বেঁধে ঝোলোনো, কেদারা-আসনে বসানো, তাছাড়া তেঁতুল কাঠির পিট্টি—এতে খোকার সেখানে চারদিন পড়াই ধুম।'

'কী বল? শঙ্কর পণ্ডিত আমাদের ছেলের গায়ে হাত তুলবে?'

'কাদের ছেলে না কাদের ছেলে মারের সময়ে সেদিকে কি খেয়াল থাকে? সেদিন শীনময়্যের ছেলে ওরটকে আড়ায় বেঁধে ঝোলাল, সেই ছেলে উপর থেকে নিচে কাঁটার উপর পড়ে সে কী অনর্থ—সে কথা শোনোনি বুঝি? শীনময়্যও কি আইন-কানুন কম বোঝে? পাঠশালায় গিয়ে নাকি শঙ্কর পণ্ডিতকে এই বলে শাসিয়ে এল—'আমি তোমার ঠ্যাং ভেঙে দেব পণ্ডিত।' 'বেশ, তোমার ছেলেকে তুমিই পড়াও'—পণ্ডিত নাকি এই বলে শীনের ছেলে ওরটকে পাঠশালা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। এখন লেখাপড়ার জন্য হয় মসুরুর পাঠশালায় না হয় সরকারী ইস্কুলে যেতে হবে। ছোট ছেলেপিলের পক্ষে কি রোজ নদীর এপার-ওপার করা সম্ভব? তাই ছেলেটা আবার শঙ্করের পাঠশালাতেই যাচ্ছে।'

সরস্বতী বলল—'চুলোয় যাক লেখাপড়া। লেখাপড়া না হলে ভারি বয়ে গেল। বলি, লিখে পড়ে বিদ্বান হয়ে কী করবে শুনি? ও সমস্ত ওই জমিদার

বাবুদের ছেলেপিলের জন্য। লচ্চ যদি তোমার মতো শ্লোক-মন্ত্র পড়তে পারে তবেই ঢের। তোমার পরে পৈতৃক বৃত্তিটা তো চালাতে হবে।'

সেদিন আর কথা বেশি অগ্রসর হল না। 'নবরাত্রির এখনও তিনমাস বাকী। এখনই তাড়া কিসের?' এই বলে ঐতাল আলোচনা পিছিয়ে দিল। কিন্তু সে মনে মনে ভারি সমস্যায় পড়ে গেল। তার একটি মাত্র ছেলে, তাকে সরকারী ইস্কুলে পাঠিয়ে কী লাভ? ভবিষ্যতে তার বৈদিক বৃত্তির জন্য একজন দরকার হবে না? বরং, বাড়িতেই গোটাকয়েক মন্ত্র ও অষ্টোত্তর শিখিয়ে দিয়ে উপনয়নের পরে তার নিজের সঙ্গে এদিক ওদিক নিয়ে যেতে পারলে লচ্চ একদিন তারই মতো পাকা বৈদিক হয়ে উঠবে। এইভাবে একটা সমাধান পাওয়া গেল।

কিন্তু মাঝখানে ঐতালের মন অনেকদিন থেকেই আর একটা চিন্তার জালে জড়িয়ে আছে। সে শুনেছে—বাসুদেববাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র ইতিমধ্যেই কুন্দাপুরে উকিল হয়ে ফিরে এসেছে এবং এ অঞ্চলের বহু মক্কেল পিঁপড়ের লাইন লাগিয়ে তার কাছে গিয়ে টাকা ঢালছে। এই খবরটা শোনা অবধি 'আচ্ছা আমার ছেলে যদি উকীল হতে পারে তবে কেমন হয়?' এইরকম গর্হিত চিন্তাও সে করে। লচ্চ কেবল বৈদিক হয়ে পড়ে থাক এতে তার কিছুমাত্র তৃপ্তি নেই। কারণ শীনময়্যের ছেলেরা হাঁটতে শেখার আগেই বেংগলুর গিয়ে রাশি রাশি টাকা রোজগার করছে—এ তো সে চোখের উপরেই দেখছে। আর এই ছেলেদের দৌলতে শীনময়্য আজ শীনময়্যবাবু হয়ে ঘুরে বেড়ায়। শীনময়্য যদি বাবু হতে পারে, তবে ঐতাল কেন তার ছেলেকে দিয়ে কীর্তিমান হতে পারবে না? শীনের ছেলেরা কফির বাটি-গেলাস ধুয়ে বেংগলুরে বসে টাকা রোজগার করতে পারে, তবে আমার ছেলে কেন ইংরেজি শিখে উকিল হয়ে দেশে বসেই টাকা আয় করতে পারবে না?—ঐতাল এই সব স্বপ্ন দেখতে লাগল।

অনেক দিন পর্যন্ত ঐতাল এই মধুর স্বপ্নে তন্ময় হয়ে আছে। এদিকে নবরাত্রি আসল। একদিন শঙ্কর পণ্ডিত সোজা ঐতালের বাড়িতে এল। ঐতাল তখন বাড়ি নেই। শঙ্কর এসে জিজ্ঞাসা করল—'বাড়িতে কেউ আছেন নাকি?' সরস্বতী বাইরে আসতে আসতে বলল—'দাদা সন্ধ্যা নাগাদ ফিরবে। কে, পণ্ডিত মশাই নাকি? ভিতরে আসুন, বসুন। 'গঙ্গোদক' (পানীয় জল) দেব?' পণ্ডিত বলল—'আমার এখন হাতে সময় নেই। পাঠশালায় যাওয়ার পথে এখানে এলাম। সামনে বিজয়া দশমী। আপনাদের বাড়ির খোকার

তো পাঁচ বছর পূর্ণ হল। আমার পাঠশালায় পাঠিয়ে দেবেন—এই কথাটাই বলতে এসেছিলাম।'

'আমিও তো দাদাকে সেই কথাই বলেছি। কিন্তু পণ্ডিত মশাই সত্যমিথ্যা জানি না, লোকে বলে—আপনার পাঠশালায় বড় মারধোর করা হয়, তাছাড়া আড়ায় বেঁধে ঝোলানো, চেয়ার-কার্তিক করা এসব তো আছেই। ওতে ছেলেপিলেরা ভয় পায়। আমাদের লচ্চর গায়ে আমরা এ পর্যন্ত কখনও হাত দিই নি।'

'মা কতসব লোকে কতসব কথা বলবে। ওই আমাদের মমুরু গাঁয়ে একটা মাস্টার আছে—ত'র মতলব হল কি করে তার পাঠশালায় আমাদের এই কোড়ি গ্রামের এ পার থেকেও ছাত্র জোটাতে পারে। সে কি না কি একটা খবর রটিয়েছে কে জানে?'

'এটা আমাদের শোনা কথা। কে না কে বলেছে। যাহোক, ছেলেকে আপনি না মারলেই হল।'

'দেখুন, ওভাবে ছেলের গা বাঁচিয়ে লেখাপড়া শেখানো আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি যখন পাঠশালায় পড়ি, সপ্তাহে অন্তত এক দিন আমার পিঠে তেঁতুল ডাল ভাঙত। আমি তার দশভাগের একভাগও মার-ধোর করি না। কিন্তু শাস্তি নেই শুনলে ছেলেপিলেদের মনে পাঠশালার ভয়টাও আর থাকবে না। ওরাও আর পড়াশুনো করবে না। তাপ না দিলে মাখন কি গলে?'

এতসব কথাবার্তার মধ্যে পণ্ডিতের সামনে রাখা গুড়টুকু খেয়ে জলের ঘটি নিঃশেষ করে বলল—'দাদাকে বলবেন ছেলেকে পাঠিয়ে দিতে। বিজয়াদশমীর দিন ভর্তি হলে লেখাপড়ায় পিছিয়ে থাকে না।'

'সরকারী ইস্কুলে এই দিনক্ষণ বাছা নেই বুঝি? ওদের বিজয়াদশমী নেই?'

'সরকারের মাথামুণ্ডু কোনো হিসাবই নেই। কার্‌কডে একটা ইস্কুল আছে। যে কোনো বার যে কোনো তিথি হোক না কেন, ইস্কুলে ছেলেদের যেতেই হবে। একাদশী অমাবস্যার দিনেও ওদের ইস্কুল। কুন্দাপুরের হাট আর কি! ওদের আবার দিনক্ষণ বাছা? কি আপনাদের ছেলেকেও ওখানে দেওয়ার কথা ভাবছেন নাকি? ওখানে সব একাকার! তেলির ছেলে, বামুনের ছেলে সব এক লাইনে বেঞ্চির উপর ঘেঁষাঘেঁষি!'

'তাই নাকি পণ্ডিত মশাই? ওই রকম বুঝি? আমাদের খোকা ওখানে ভর্তি হলে বৈদিকের ছেলে, তেলির ছেলে এক পঙ্‌ক্তিতে?'

'সরকারী হিসাব ওই রকমই। আমার পাঠশালায় আমি ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কোনো কীটও আসতে দিই না। আমাদের মাঠের ওপারে থাকে নাগওবা শেঠ। সে আমায় বলেছিল—'পণ্ডিত মশাই, আমাদের ছেলেগুলিকে দু একটা 'প্রসঙ্গ' শিখিয়ে দিন।' আমি বলে দিলাম—'যারা শেখায় শেখাক। আমি যে কোনো জাতের লোককে লেখাপড়া শেখাতে পারি না।'

'সরকারী বিদ্যালয়ে ওরকম কোনো নিয়ম নেই বুঝি?'

'সরকার যদি তাদের এই নীতি আরও দশ বছর চালায়, তবে বলে দিচ্ছি লাঙল-জুয়াল ধরতে আর কোনো ছোটলোক আসবে না। তখন চাষ-বাসের জন্য ব্রাহ্মণকেই মাঠে নামতে হবে।'

পাঠশালার বেলা হল বলে শঙ্কর পণ্ডিত সেখান থেকে রওনা হল। রওনা হওয়ার আগে জানিয়ে গেল—'দাদাকে বলবেন কথাটা।' অতঃপর দশবাড়ি ঘুরে প্রত্যেক স্থানে দু'চার কথা বলে তবে সে পাঠশালায় যাবে। তার নিজের বাড়িতে যথেষ্ট জায়গা নেই বলে গ্রামেরই জনৈক গৃহস্থের ধানভানার প্রশস্ত আঙিনায় সে তার মহাপাঠশালার পরিচালক। এ পর্যন্ত তার ছাত্রসংখ্যা কখনও ছয়ের বেশি হয় নি, অবশ্য তিনের নীচেও নামে নি। অথচ কন্যান, কোড়ি, পড়ুকেরে—পাশাপাশি এই তিনখানা গাঁয়ে সেই নাকি একমাত্র দ্রোণাচার্য। এখনকার ছেলেদের লেখাপড়া শেখায় শঙ্কর পণ্ডিত, এখনকার বুড়োদের লেখাপড়া শেখাতেন তার বাবা নারায়ণ পণ্ডিত। নারায়ণ পণ্ডিতের জিহ্বাগ্রে নাকি নৃত্য করত ছেচল্লিশ 'প্রসঙ্গ'। তাঁর পাঠশালায় যারা আট-দশ বছর যাতায়াত করেছে, তাদের কাউকেই তিনি অন্তত দশ-বারোখানা 'প্রসঙ্গ' না শিখিয়ে ছাড়তেন না। তার উপর দলিল-দস্তাবেজ লিখন, তালপাতার লেখা, নামতা—এ সমস্তও শেষ করতে হত। পাঠশালার ছেলেরা নাকি শ্লেট বা কাগজের উপর হাতের লেখা লিখে সরস্বতীর অপমান করত না।

শঙ্কর পণ্ডিতের অত শত 'প্রসঙ্গ' জানা না থাকলেও কয়েকটি প্রচলিত উপাখ্যান—যেমন, মীনাক্ষীকল্যাণ, কর্ণার্জুন যুদ্ধ, বভ্রুবাহন যুদ্ধ, ইন্দ্রকীল প্রভৃতিতে তার দক্ষতা কম নয়। তা ছাড়া মৃদঙ্গে তার হাত খোলে ভাল। ভাগবত ও রামায়ণের কথকতায় তার পারদর্শিতা সামান্য নয়। কণ্ঠস্বর মধুর

বলে গ্রামের 'তালমন্দলে' (পাঁচালিজাতীয় একপ্রকার দেশীয় নাটক) তাকে ছাড়া জমেই না। শঙ্কর পণ্ডিতের একটা দোষের বিষয়ে গ্রামের সকলেই একমত —ছাত্রদের উপর তার মারের হাতটা মৃদঙ্গের হাতের চেয়েও কড়া। এই নিয়ে কোনো অভিভাবক আপত্তি জানালে শঙ্কর পণ্ডিত জবাব দেয়—'ছেলেবেলায় বাবার হাতে কত মার খেয়েছি আপনি জানেন কি? খালি পূজা করে কি বিদ্যা হয়? খেটে খেটে পিঠ যার বেঁকে যাবে, মা সরস্বতী তাকে কৃপা করবেন।' এই ভাবে উপদেশ দেয় শঙ্কর পণ্ডিত। কেউ যদি বলে—'পণ্ডিত মশাই, আপনি যে মারবেন না তা নয়। তবে পরিমাণটা বেশি হয়ে গেলে ছেলেপিলেরা ভয়ের চোটে হোন্নে গাছের উপর লুকিয়ে থাকবে বৈ পাঠশালায় যাবে না।' তখন শঙ্কর পণ্ডিত জবাব দেয়—'বাড়িতেও যদি আমার মতো শাসন করে, তাহলে আর ছেলেরা হোন্নে গাছে আস্তানা গড়া দূরে থাক্, চড়বেও না। ছেলেদের 'লাই' দিতে নেই। কথায় বলে ছোট বয়সে দাবড়ি, বড় হলে রাবড়ি।' এই বলে সে অভিভাবকদের মুখ বন্ধ করে। বড়দের মুখ বন্ধ করা সহজ, কিন্তু ছোটদের মন জয় করা কঠিন—একথা সে জানে না। আর জানে না বলেই ছ জন ছাত্রের কাছ থেকে পাওনা ছ'মণ চাল নিয়েই তার পণ্ডিতীকে তৃপ্ত থাকতে হয়। সেই সঙ্গে অবশ্য কিছু নারকেল তরকারিও আসে, কিন্তু চাষ বাস না থাকাতে শঙ্করপণ্ডিতের কষ্টেসৃষ্টে কেবল কাঞ্জিভাতের যোগাড় হতে পারে।

পণ্ডিতের বক্তৃতা শুনে সরকারী ইস্কুল সম্পর্কে সরস্বতীর মনে একটা ঘৃণার ভাব উদ্রিক্ত হল। ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম নিয়ে শেষকালে কিনা সরকারী বিদ্যালয়ের অনাচারের মধ্যে লেখাপড়া শিক্ষা করা?

রাতে ঐতালের ভোজনকালে সরস্বতী তার কাছে বসে বলল 'দাদা, শঙ্কর পণ্ডিত এসেছিল আজ সকালে।' স্বভাবতই ভাইবোনের কথাবার্তা লচ্চর ভবিষ্যৎ জীবনের ভালমন্দ নিয়ে অগ্রসর হতে থাকল। ঐতাল যেন গভীরভাবে চিন্তা করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে—এমন একটা ভাব দেখিয়ে বলল—'পণ্ডিতের বেতের ভয়ে আমাদের লচ্চ চারটি দিনও পাঠশালায় যাবে না। তাছাড়া, আজকাল এই যক্ষগান পাঁচালি-টাঁচালি শিখে জীবিকা-নির্বাহ হয় না। দ্যাখো, বৈদিক বলে আমি যে কতটা সম্মান পাই তা তোমার ভালই জানা আছে। আর ওদিকে হোটেলে দুটো পয়সা উপার্জনের উপায় হয়েছে বলে শীনময়্য যে কতটা সম্মানের অধিকারী তাও তোমার অজানা নয়।'

'তাহলে ওর মতো লচ্চকে কোথাও কোনো হোটেলে পাঠানোই তোমার মতলব ?'

'ছি ! ওই ভাত-বেচা টাকায় আমার দরকার নেই। তার চেয়ে বরং আমার পাঁচ 'কোজি' (২১০ মণ) ফসল থেকেই লচ্চর জীবন সুখে স্বচ্ছন্দেই কাটবে। তার উপর পৌরোহিত্য করলে জীবিকা নির্বাহের কোনো অসুবিধাই হতে পারে না।'

স্বামীর কথায় অদূরে উপবিষ্ট পার্বতীর খুব বিস্ময় হল। তাদের যে পাঁচ 'কোজি' ফসলের জমি রয়েছে এ কথাটা আজ এমনি আকস্মিক ভাবেই সে জানতে পেল। এই দরিদ্র ঘরের রমণীর এই জ্ঞান হল—তারা তাহলে এই গ্রামের একটি অবস্থাপন্ন পরিবার ! তাছাড়া তার স্বামীর কাছে অনেক নগদ টাকাও আছে বলে সে শুনেছে। কিন্তু কত টাকা—তা সে কিছুই জানে না। ওবিষয়ে যদি একবার ভয়ে ভয়ে জানতেও যায়, তবে স্বামী তার ধমক দিয়ে বলবে—'মেয়েলোকের আবার টাকা পয়সার খবরদারী কেন ?'

লচ্চর লেখাপড়ার বিষয়ে দাদার কোন স্পষ্ট উত্তর না পেয়ে সরস্বতী বলল 'দাদা, শীনময়্যের ঠাট-বাট, মান-সম্মান নিয়ে আমরা কী করব ? ছেলেকে কি বাড়িতেই কিছু লেখা পড়া করিয়ে পূজাপাঠ মন্ত্রতন্ত্র শিখিয়ে মানুষ করবে ?'

এমন সময়ে সত্যভামা সেখানে এসে উপস্থিত হল। সেও ছেলের লেখাপড়া নিয়ে কিছু-না-কিছু ভেবেছে, কিন্তু তার মনের কথা জানা যায় নি এখনও। সে পড়ুমুন্নুরুর মেয়ে। স্বামীর আর্থিক স্বচ্ছলতা সম্পর্কে পার্বতীর চেয়ে সে কিছু বেশিই জানে। আরও বেশি জানে তার বাপের বাড়ির গৌরবের কথা। বাবার মুখে সত্যভামা মাঝে মাঝে এই কথা শুনেছে—'ঐতাল যদি দক্ষিণার পয়সার জন্য বাড়ি বাড়ি না ঘুরে পায়ের উপর পা রেখে বসে থাকে, তবে সেও পাঁচটা গ্রামের মধ্যে 'বাবু' বলে গণ্য হতে পারে।' নবরাত্রি আসছে এবং বিজয়াদশমীর দিন শঙ্কর পণ্ডিতের পাঠশালায় ছেলেকে পাঠানো হবে—এই কথা জানতে পারার পর থেকেই সত্যভামাও চিন্তিত হয়ে পড়ে। এদিকে ছেলেকে বাড়িতে রেখে বড় হতে দিলে ও যে ওর বড়মার মতো গোরু বাছুর চরানো ছাড়া আর কিছুই শিখতে পারবে না—এ কথাও সে বোঝে। মোটকথা, লচ্চ বাড়িতে থাকলে মায়ের কাছ থেকে পর হয়ে যাবে—সত্যভামার এই ভয়টাও কম নয়। তাছাড়া লচ্চর লেখাপড়ার ব্যাপারে এরা-এরাই সব ঠিক করে ফেলবে গর্ভধারিণী জননীর কোনো কথা খাটবে না—এটাও সত্যার মনঃপূত হল না। এই সমস্ত কারণেই

সেখানে এসে সে আলোচনার যোগ দিল। বলল—'আমি বলি কি, লচ্চর দাদুর কাছে একটা পরামর্শ নেয়া দরকার। আমাদের যাতে ভালো হয়, তিনি নিশ্চয়ই সেই রকম পরামর্শ দেবেন।'

সরস্বতী মনে মনে ভাবল—'ছেলের দাদুর বাড়ির কথা যখন উঠেছে, তখন মনে হয় ছেলের নিজের বাড়ির লোকদের উপর অবিশ্বাস।' তাই সে বলল—'ঠিক আছে। তাঁকেই জিজ্ঞেস করো। ভবিষ্যতেও দাদুই তার পথ দেখিয়ে দেবে ত, না কি ?'—এই বলে সরস্বতী চলে গেল।

আলোচনা সভা সেখানেই শেষ হয়। কিন্তু শয়নাগারে বসে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিষয়টি নিয়ে আরও কথাবার্তা চলে। ঐতাল বলে আমাদের ছেলে উকিল হতে পারলে ভালই হয় কী বলো ? না হয় তহশীলদার কিংবা কানুনগো অথবা যে কোন সরকারী কর্মচারী হতে পারলেই যথেষ্ট। ওই রকম কাজে যে গৌরব তা আমাদের মতো বৈদিক বংশে আসবে মনে হয়।'—ঐতালের কণ্ঠে আশার বাণী। অতএব স্থির হল যে ছেলেকে শঙ্কর পণ্ডিতের পাঠশালা অথবা ঘরে বসিয়ে বৈদিক শিক্ষা—কোনোটাতেই দেওয়া হবে না, সরকারী ইস্কুলেই পাঠানো হবে। পড়ুমুন্নুরুতে দাদুর বাড়ি থেকে সরকারী ইস্কুল কাছেই। দাদুই লচ্চর দেখাশোনা করবেন। সত্যভামার আশঙ্কা এখানে থাকলে খোকা একটা অপদার্থ ছেলে হবে।

বর্ষা ধরে আসতে জেলেদের নৌকাগুলি সমুদ্রে ভাসানো হল। মহালয়া অমাবস্যা উপলক্ষ্যে ঐতাল পরিবারের সকলে সমুদ্রে স্নান করল। শঙ্কর পণ্ডিতের বার্ষিক আয় যাতে একমণ চাল বেশি হতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে পণ্ডিতমশাই দিনের পর দিন উপর্যুপরি ঐতালের গৃহে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। 'যেমন করে হোক বিজয়াদশমীর দিন ছেলেকে পাঠিয়ে দেবেন।' এই বলে পণ্ডিতের পীড়াপীড়ি চলতে থাকল। সরস্বতী আজকাল লচ্চর লেখা পড়ার বিষয়ে কথা বলা ছেড়ে দিয়েছে। 'কী ব্যাপার ? ঐতাল কি ছেলেকে কার্কড ইস্কুলেই পাঠাবেন বলে স্থির করেছেন ? আজ পর্যন্ত কেবল বাবুদের ছেলেপিলেরাই ওই ইস্কুলে যাচ্ছিল। এখন কি বৈদিক ব্রাহ্মণও তাদের লেজ ধরল ?' এইভাবে ঐতালের বাড়িতে বসেই শঙ্কর পণ্ডিত ঐতালকে খোঁটা দিতে লাগল। 'পণ্ডিতমশাই, আমরা ওসব কী জানি ? ছেলের বাপ-মা যেমন করবে, তেমনি হবে।'—এই বলে সরস্বতী সেখান থেকে চলে গেল।

নবরাত্রির মধ্যেই একদিন ঐতাল শ্বশুরালয়ে গিয়ে দর্শন দিল। মাধপ্পয়্য জামাতা বাবাজীকে অতি সমাদর করে পরিহাসের ভঙ্গীতে বলল 'ঐতাল, শ্বশুরবাড়ি কি পুরোনো হয়ে গেল ? সুব্বি হওয়ার পরে সত্যভামাও আসেনি, তুমিও আসনি।' ঐতাল বলল—'আপনার সঙ্গে একটা পরামর্শ করব বলে এসেছি। সত্য বলে যে ছেলেকে ইংরেজি ইস্কুলে দিলেই ভাল হয়।' শ্বশুর মশাই হাসতে হাসতে বললেন, 'হুঁ, বৈদিক ব্রাহ্মণদের চোখ ফুটেছে দেখছি। লচ্চকে লেখাপড়ার জন্য বাইরে পাঠাবে—সেটা তোমাদের নিজেদের খুশি। আমি তো বলেই দিয়েছি মেয়ে বিয়ে দেওয়ার পরে যার-যার অভিপ্রায় মতো চলবে।' এই বলে পুনরায় হাসলেন। পরিহাসছলেই জামাইকে পুনরায় বললেন—'আর কী ? আজকালকার দিনে চার অক্ষর ইংরেজি যার জানা আছে, তার যা সম্মান, তোমার ওই মন্ত্র-অষ্টোত্তরীদের সে গৌরব কখনও হবে না।'

কথাবার্তা এইভাবে চলতে চলতে একটা সিদ্ধান্তে আসা গেল। শাশুড়ী বললেন—'লচ্চ আমাদের এখানেই থাক। আমাদের ছেলেটা, যাহোক, বড় হয়ে উঠেছে। এখন সে গ্রামের গোমস্তাগিরি করে। বাড়িতে একটা ছেলে থাকলে ভালোই হয়।' শ্বশুর মশাই বললেন—'পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লচ্চ এখানেই পড়ুক। ইস্কুল এখান থেকে দূর নয়। কোডিতে থাকলে ইস্কুলে আসার জন্য রোজ নদী পার হতে হবে। ছোট ছেলেপিলেকে ওভাবে পাঠানো ঠিক নয়।' শ্বশুর-শাশুড়ীর কথায় ঐতালের আর খুশি ধরে না। 'তা যা বলেছেন লচ্চ যদি খানিকটা ইংরেজি শেখে, তবেই যথেষ্ট। ভগবান করলে, আমাদের মতো ওকে দিবারাত্রি কাদামাটি শুকনো মাটি মাড়াতে হবে না।'

মাধপ্পয়্য বললেন—'তাই তো বলছি আমি, আমার ছেলেটার কি বুদ্ধি হল জানি না। অর্ধপথেই লেখাপড়া ছেড়ে দিল। তা না হলে আজ ও উকিল হতে পারত। যাই হোক, ও যা ইংরেজি জানে যথেষ্ট। সেদিন তশীলদার সাহেব এলে ও গিয়ে তাঁর সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা বলেছে। সাহেবের সুপারিশে ওর গোমস্তার পদটা 'পার্মেন্ট' হলেও হতে পারে।' ঐতালের শ্যালক-প্রবর তশীলদার সাহেবের সঙ্গে ইংরেজিতে কথা বলেছে—এই ভারি খবরটা শুনে ঐতালের বিস্ময়ের সীমা রইল না। শ্বশুরমশাইকে বলল—'আপনি যা বললেন সেই রকম করাই সমীচীন। কিন্তু ছেলের মর্জিটাও দেখতে হবে। বড়মার খুব ন্যাওটা। এখনও তাকে ছেড়ে এখানে থাকতে চাইবে কিনা কে

জানে? যখন সুবিবটা হল, তখন তো আপনারা দেখেছেন নিজের মায়ের সঙ্গে ও কিছুতেই এল না।'

মাধপ্পয়্য বললেন—'ছেলেপিলেদের ব্যাপার। কয়েকদিনের মধ্যে ওরা সব কিছু ভুলে যায়। তাছাড়া, এখানে ওর দিদিমা রয়েছে।'

যা হোক সেদিন অপরাহ্ণে গৃহে ফেরার সময়ে ঐতালের আনন্দের সীমা ছিল না। সে যেন নিজেই ছেলে হয়ে তশীলদাররূপে মাটির উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। চলতে চলতে উল্লাসে তার মন নৃত্য করছে। নদীর মোহানা পার হওয়ার সময়ে অস্তগামী সূর্যের আভায় মেঘে মেঘে নানা রঙের খেলা। হাস্যময় তরঙ্গের শীর্ষদেশ সূর্যের শেষ আলোয় ধারালো ছুরির মতো চক্‌চক্ করছে। নদীর জলপ্রবাহ মহানন্দে পূর্ণ হয়ে ছুটতে ছুটতে সমুদ্রের বুকে মিলিয়ে যাচ্ছে। এ সব দৃশ্য চোখ দিয়ে দেখলেও ঐতালের মন তখন শূন্যে সৌধ নির্মাণে তন্ময়। এতই তন্ময় যে নদীপার হয়ে নৌকা কিনারে ভিড়লেও ঐতালের সেদিকে খেয়াল নেই। পাটনী বলে উঠল 'ঠাকুর মশাই কোডিগ্রাম যে এসে গেল, নামুন।' 'হুঁ, কত তাড়াতাড়ি মোহানা পার হলি রে?' এই বলে ঐতাল হাসিমুখে পারে উঠল।

বাড়ির পথে চলতে চলতে একদিকে তার মন আনন্দে নেচে উঠল এই ভেবে যে সত্যভামার জন্য একটা শুভ সংবাদ নিয়ে এসেছে। কিন্তু পরক্ষণেই এই ভয় দেখা দিল যে এই সংবাদ নিয়ে কিভাবে সে সরস্বতীর সম্মুখীন হবে। তারপর লচ্চ যদি বড়মা-বড়মা করে সমস্তটা মাটি করে দেয় তা হলে কী হবে— এ ভয় তো ছিলই। সে ভেবে রাখল যে প্রথম-প্রথম পার্বতীর কাছ থেকে দূরে থাকা লচ্চর পক্ষে কষ্টকর হলে প্রতি শনিবারে গিয়ে ওকে বাড়িতে নিয়ে আসতে হবে। এই সমস্ত চিন্তাভাবনা করতে করতে ঐতাল বাড়ির সদরে এসে পৌঁছল। মাত্র কয়েক গজ দূরে পুকুর—জলে টৈ-টুম্বুর। সেখান থেকে এক নাগাড়ে উত্থিত হচ্ছে ব্যাঙের 'টোরো-টোরো' সংগীত। ওদের সুরে সুর মিলিয়ে ঐতাল সান্ধ্য জপ শুরু করে দিল—'গুরুরেকো গুরুবিষ্টুঃ।' তার মন্ত্রের শব্দ শুনে ঘরের মধ্য থেকে লচ্চ 'আপ্পা' বলে চেঁচিয়ে উঠল। সত্যভামা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে জ্যোৎস্নালোকে পুকুর পাড়ে স্বামীর কাছে এল। পিত্রালয়ের খবর জানার জন্য খুবই উৎসুক সে। লচ্চর লেখাপড়ার বিষয়ে বাবা কী বললেন? মায়ের মতই বা কী। ঐতাল 'ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যম্'-এর ফাঁকে ফাঁকে- স্ত্রীর এক-

একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে। যে-খবর পাওয়া গেল তাতে সত্যভামারই জয় হয়েছে বলে সে খুব খুশি। লচ্চকে আদর করে কোলে নিয়ে বলল—'লচ্চবাবু, তুমি এখন থেকে ইংরেজি ইস্কুলে যাবে, বিদ্বান্ হবে, বুদ্ধিমান হবে।'

রাতের আহার সকলেরই শেষ হয়েছে। লচ্চ বড়মাকে বলল: বিছানা পেতে দিতে। পার্বতী লচ্চর শোবার ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজের গৃহকর্ম নিয়ে ব্যস্ত ছিল। অনেক রাতে সরস্বতী ও পার্বতী রোজকার মতো লচ্চর পাশপাশি বিছানা পেতে শুয়ে পড়ল। মৃদুকণ্ঠে সরস্বতী জিজ্ঞাসা করল—'বৌদি তুমি কিছু জানতে পারলে কি লচ্চর দাদুর বাড়ি থেকে কি খবর এল?' পার্বতী বলল—'আমি কি জানি? ছেলেকে শঙ্কর পণ্ডিতের পাঠশালায় পাঠাক বা ইংরেজি ইস্কুলে পাঠাক, আমার কাছে দুই-ই সমান। ইংরেজি ইস্কুলে পাঠালে আমাদের রোজ দুটো বেশি ডুব দিতে হবে এইত? এতক্ষণ পর্যন্ত লচ্চ চোখের পাতা বুজে শুয়েছিল। হঠাৎ বলে উঠল 'বড়মা, মা বললে কি জানো? —আমি নাকি ইংরেজি ইস্কুলে গিয়ে বিদ্বান হব, বুদ্ধিমান হব। তাই নাকি বড়মা? ইংরেজি ইস্কুল কোথায়?' পার্বতী বলল—'এই চোর! তোর চোখে এখনও ঘুম নেই?'

যাই হোক, তাদের জানার মতো খবরটুকু পাওয়া গেল। এ বিষয় নিয়ে ছেলের সামনে আলোচনা করা উচিত নয় বলে তারা চুপ করে রইল। ভাবল—লচ্চ ঘুমোলে পরে তারা খানিক কথাবার্তা বলে ঘুমোবে। কিন্তু ইতিমধ্যে তাদেরও ঘুম এসে গেল।

নবরাত্রির চতুর্থ দিন পার হয়ে পঞ্চম দিন এসেছে। শঙ্কর পণ্ডিত আর একবার ঐতালের সন্ধানে তার বাড়িতে এল। ঐতাল স্নান সেরে বৈদিক কার্যাদির জন্য বেরিয়ে পড়ার আগেই তাকে গিয়ে ধরে ফেলতে হবে এই ভেবে সে একটু সকাল সকালই এল। যেমন করে হোক এক মণ চাল সংগ্রহের উপায় করতে হবে ভেবে শঙ্কর পণ্ডিত এসে বলল—'ঐতাল, এই বিজয়াদশমীর দিন আপনার লক্ষ্মীনারায়ণ আমার পাঠশালায় ভর্তি হবে, কী বলেন?' ঐতাল যে এখন আর ওয়াদা করবে তার উপায় নেই। কাজেই সে বলল—'পণ্ডিত মশাই, আপনি যে দয়া করে আমাদের বাড়িতে এসেছেন, তার জন্য খুব 'সন্তোষ' হলাম। কিন্তু দেখুন, এ বিষয়ে আমি খোকার দাদুকে জিজ্ঞাসা

না করে অগ্রসর হতে পারি না। আপনাকে একটা পাকাপাকি উত্তর দেব বলেই আমি সেখানে গিয়েছিলাম। শ্বশুরমশাই বলেছেন যে ছেলেকে তার ওখানে রাখলেই ভালো হয়। আমার গৃহিণীর ইচ্ছাও তাই।'

'কেন, সেখানে কি ভাল পাঠশালা আছে নাকি?'

'সেখানে কাছেই একটি সরকারী ইস্কুল আছে। শ্বশুরমশাইয়ের ইচ্ছা, নাতিকে একটু ইংরেজি শেখাবেন।'

'হাঁ, এই ইংরেজির মোহ—বৈদিক ব্রাহ্মণ আপনি—আপনাকেও রেহাই দিল না? ঐতাল, আপনি যদি ছেলেকে বাড়িতে বসিয়ে মন্ত্রতন্ত্র পূজাপাঠ শেখান, আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু তা না করে যেখানে কি না সব জাতের মেলা, সেই সরকারী ইস্কুলে পাঠাবেন? এই আমাদের কার্কড ইস্কুল দেখছেন না? ওখানে একজন নতুন মাস্টার নাকি এসেছে—বৈশ্য না শূদ্র কে জানে? ব্রাহ্মণের ছেলেরা তার হাতে মার খাবে। তবেই বুঝুন, কোথা থেকে কোথায় এসেছে কালের গতি!'

দূরে দাঁড়িয়ে সরস্বতী এদের আলাপ শুনছিল, কিন্তু কাছে এসে কোনো কথায় যোগ দিল না, দেওয়ার ইচ্ছাও হল না।

ঐতাল বলল—'পণ্ডিত মশাই, আপনি যা বললেন সে সব না জেনেশুনে লচ্চর দাদু ওকে ওখানে যেতে বলতেন বলে মনে হয় না। ওখানকার মাস্টার ব্রাহ্মণই হবে। এখানে কার্কড গাঁয়ের সরকারী বিদ্যালয় অন্য জাতের শিক্ষক এসেছে বলে ছেলেকে সেখানে পাঠাবো না ঠিক করেছি। তাছাড়া, দেখুন, পড়ুমুন্নুরুতে ব্রাহ্মণ ছেলেরা নাকি পৃথক বেঞ্চিতে বসে। আপনার পাঠশালার মতো তারা সেখানে মাটিতে বসে না।'

'আচ্ছা ঐতাল, ওই ইংরেজি ইস্কুলওয়ালাদের মতো একটা কাষ্ঠমঞ্চ আমি কি এনে রাখতে পারি না? পাঠশালাটা কি দশাবতার-পালা যে তামাশা দেখার জন্য একটা কাষ্ঠমঞ্চে বসা দরকার? ও কথা যাক। আপনার ছেলের ভবিষ্যতের কথাটা আপনার মনে এল না এটা কিন্তু আশ্চর্য। আমার স্বার্থের জন্য বলছি তা মনে করবেন না।'

'পণ্ডিতমশাই, আমার সত্যভামার বয়স এই সবেমাত্র বাইশ বছর। নরসিংহ-ঠাকুরের কৃপায় তার আর একটি পুত্রসন্তান হওয়া অসম্ভব নয়। আমার

অবর্তমানে সেই ছেলেই বৈদিক কার্যাদি দেখাশোনা করবে। ভালোভাবে শিখলে তিনবছরেই যাজনিক বিদ্যা এসে যাবে।'

'তাহলে আপনার লক্ষ্মীনারায়ণ উকিল হবে, কী বলেন ?'

'ভগবান যা করবেন তাই হবে। বাবুদের চোখে ছেলে একটা শ্রাদ্ধের বামুন বলে গণ্য না হলেই হল।' কথা বাড়িয়ে শঙ্কর পণ্ডিতের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক করার ইচ্ছা না থাকায় অন্য কাজের অছিলায় ঐতাল চলে গেল।

শঙ্কর পণ্ডিত অত্যন্ত নিরাশ হয়ে প্রস্থানের উদ্যোগ করলে সামনেই সরস্বতীর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে বলল—'শুনলেন আপনার দাদার কথা? বৈদিক ব্রাহ্মণও যদি ইংরেজির মোহে জাতপাত জলাঞ্জলি দেয়।'

সরস্বতী বলল—'আমি কী জানি বলুন। যার-যার জ্ঞানবুদ্ধি মতো কাজ করবে।' এই বলে এ ব্যাপারে ঔদাসীন্য দেখিয়ে সরস্বতী চলে গেল। শঙ্কর পণ্ডিত চরম নৈরাশ্যে অভিভূত হয়ে গৃহমুখী হল। যাওয়ার সময়ে নৈরাশ্য-তিক্ত কণ্ঠে বলে গেল—'আমিও এরপরে কয়েকখানা কাষ্ঠমঞ্চ বসিয়ে নানা জাতের ছেলেকে একসঙ্গে বসিয়ে শিক্ষা দেব। শেঠ হয়তো শেঠ, ভট্ট হয়তো ভট্ট। সব জাতের গোয়াল বসিয়ে ছেলেগুলোকে চরাব।' এই বলে বাড়ির পথ ধরল। যেতে যেতে ভাবল—'নারায়ণ পণ্ডিতের আমলে গোয়াল-ভর্তি ছেলে আসত। আর আজ আমি দুটি ছেলেকেও সংগ্রহ করতে পারিনে! এই বেটা বামুনদের বিশ্বাস করেই আমার সর্বনাশ হল। তা না করে যদি বালিয়াড়ির জেলেদের ছেলেগুলোকে লেখাপড়া শেখাতাম, অন্তত দশ-বারো মণ চাল ঘরে আসত।'

নবরাত্রি এল। ঐতাল-পরিবারে নবরাত্রির উৎসবে কোনো ধুমধাম নেই। নবরাত্রির ষষ্ঠদিনে মূলা নক্ষত্রে সরস্বতীপূজা হয়ে গেলেই নিশ্চিন্ত। পূজার পরে সত্যভামাও পুত্রের বিদ্যারম্ভ উপলক্ষ্যে পিত্রালয়ে যাওয়ার জন্য উৎসুক। লচ্চকে মিষ্টি কথা দিয়ে এবং দাদুর বাড়ির নানা সুস্বাদু খাবারের বর্ণনা দিয়ে মায়ের সঙ্গে যেতে রাজী করানো গেল। রওনা হওয়ার আগে পার্বতীর কাছে গিয়ে লচ্চ বলল—'বড়মা, আমি দাদুর বাড়ি যাই।' এই কথায় পার্বতীর চোখে জল দেখা দিল। লচ্চ ব্যথিতকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—'তুমি কাঁদছ কেন বড় মা?' 'ও কিছু নয়, কিছু নয় বাছা।'

'বড় মা, আমি তাড়াতাড়ি চলে আসব।' আসার সময়ে তোমার জন্য

মিঠাই-মণ্ডা-নাড়ু নিয়ে আসব।' 'আচ্ছা এসো বাবা' এই বলে পার্বতী নিজের হৃদয়-বেদনাকে চাপা দেবার চেষ্টা করে অশ্রুপূর্ণ চোখে লচ্চকে কোলে নিয়ে আদর করল।

লচ্চ তার কষ্ট বুঝে বলল—'বড় মা, আমি তাহলে দাদুর বাড়িতে যাব না। তোমার সঙ্গে থাকব।'

সরস্বতী ও পার্বতী জানত যে লচ্চর এই সিদ্ধান্তের ফলে তারাই দোষের ভাগী এবং সত্যভামার কটু কথার লক্ষ্য হবে। কাজেই তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে খুশি করে পড়ুমুন্নুরু পাঠাতে হল। যাওয়ার সময়ে লচ্চ বলল—'বাবা, কাল তুমি আমাকে নিয়ে আসবে তো?' ঐতাল বলল—'হ্যাঁ খোকা।'

বিজয়াদশমীর দিন ঐতাল পুনরায় পড়ুমুন্নুরুতে উপস্থিত হল। আজ পুত্রের বিদ্যারম্ভ। লচ্চকে তাড়াতাড়ি স্নান করিয়ে ঐতাল নিজেই শাস্ত্রীয় রীতিতে ছেলের 'হাতেখড়ি' দিয়ে দিল। অতঃপর মাস্টারকে ডাকিয়ে এনে লচ্চর স্লেট-পেন্‌সিলে দীক্ষার ব্যবস্থা করা হল। অনেকক্ষণ ধরে নাতিকে স্লেটের উপর হিজিবিজি দাগ কাটাতে দাদুর মনে খুব আনন্দ হল। পরদিন দাসপ্পয়্য মাস্টার লচ্চকে সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে যেতে এল। —'চলো খোকা, বেড়াতে যাই। আমাদের ইস্কুলে তোমার মতো অনেক ছেলে আসে।' এই বলে তাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে চলল! পিতৃদেবও ছেলের সঙ্গে ইস্কুল পর্যন্ত গেল। সেখানে বেঞ্চি, চেয়ার, বোর্ড্ প্রভৃতি দেখে ঐতালের দৃঢ় বিশ্বাস হল যে তার ছেলে এখানে পড়লে ভবিষ্যতে অবশ্যই মুন্‌সেফ না হয়ে যায় না।

আধঘণ্টা খানেক বসে 'অ আ' লিখে লচ্চ বলল—'বাবা, ইস্কুল হল। চলো বড়মায়ের কাছে যাই।' ঐতাল আরও কিছু সময় ওখানে থাকবার জন্য ছেলেকে কত বোঝাল। কিন্তু তাতে ফল না হওয়াতে পুনরায় তাকে সঙ্গে নিয়ে ঐতাল লচ্চর দাদুর বাড়িতে এল। তারপরে একসময়ে ছেলের চোখ এড়িয়ে ফিরে এল কোডিগ্রামে। বাবা ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে বুঝে লচ্চর কি কান্না! তখন মা সত্যভামা সান্ত্বনা দিয়ে বলল—'খোকা, বাবা চলে গেছেন তাতে কি? আমি তো আছি।' এই কথা শুনে লচ্চ শান্ত হয়। পরদিনও দাসপ্পয়্য মাস্টারের সঙ্গে লচ্চকে ইস্কুলে যেতে হয়। এইভাবে সপ্তাহখানেক চলার পরে সত্যভামাও পিত্রালয় থেকে বিদায় নেয়। লচ্চ বুঝতে পারে বাবা-

মা দুইজনে তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। লচ্চ ইস্কুলে যায়, অ আ শেখে, মাঝে মাঝে বড়মাকে স্মরণ করে কেঁদে ওঠে।

একদিন লচ্চ কোডিগ্রামে যাবে বলে ইস্কুল থেকে বেরিয়ে বালির সেই বিশাল রাজ্যে ঘুরে ঘুরে পথ হারিয়ে ফেলে। দাদু ও দিদিমার মনে বিশেষ উদ্বেগের সঞ্চার হতে দাসপ্পয়্য মাস্টার সারা গ্রাম খুঁজে সন্ধ্যানাগাদ লচ্চকে ধরে নিয়ে এল।

দাদু ও দিদিমা লচ্চকে কিছুতেই শান্ত করতে পারেন না। অবশেষে তারা অন্য একটি উপায় খুঁজে বের করেন। দাসপ্পয়্য মশাই অন্য অঞ্চলের লোক। দূরবর্তী গ্রামে বাড়ি বলে তাকে কোনো একটা আশ্রয়ের জন্য ঠিক করে নিতে হয়েছে। রাতের আহার উডুপিতেই সম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্নভোজন পালা করে এক এক ছাত্রের বাড়িতে এক-এক দিন। এখন লচ্চর দাদু মাধপ্পয়্য বললেন—'মাস্টার মশাই, এদিক-ওদিক না ঘুরে আপনি আমার নাতিটাকে একটু দেখাশুনা করুন। আপনার দু'বেলা আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা এখানেই হবে।' সেদিন থেকে মাস্টারমশাই দাদু দিদিমার কাছে নাতির গুণকীর্তনকে তার কাজের প্রধান অঙ্গ বলে মনে করতে থাকে। ইস্কুলে থেকে ফিরেই বলে—"মাধপ্পয়্য, ক্লাসের কোনো ছেলেই আপনার দৌহিত্রের সঙ্গে পেরে ওঠে না। আজ পঞ্চাশ থেকে একশ' পর্যন্ত গণনা শিখে ফেলেছে।...আজ দশঘরের নামতা মুখস্থ...আজ গাড়ি ও কুকুরের গল্পটা সুন্দরভাবে পড়েছে'—এইভাবে প্রত্যহ। তার এই সমস্ত মধুর বাক্যের তাৎপর্য যা-ই হোক না, লচ্চ যে একজন স্নেহশীল শিক্ষক পেয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কারণ অন্যান্য ছেলেদের জন্য যখন প্রতিদিন একখানা করে বেত-ভাঙার প্রয়োজন ঘটে, তখন লচ্চ সম্পর্কে দাসপ্পয়্য মাস্টারের বিবেচনাবোধ সত্যই বিস্ময়কর।

লচ্চ ইস্কুল থেকে বাড়িতে এলে দিদিমার আদরের আর শেষ নেই। এইভাবে তিনমাসের মধ্যেই এই নতুন পরিবেশে লচ্চর পুরোনো দিনের কথা সব মিলিয়ে যাওয়ার মুখে। দাদুর বাড়িতে সুস্বাদু আহার্য তার বড়মায়ের স্নেহ-মমতা-আদরকেও ভুলিয়ে দিল। লচ্চ এখন যথার্থ দিদিমার দৌহিত্র। ইতিমধ্যে ঐতাল দুতিন বার শ্বশুরবাড়িতে এসেছিল। ফিরে যাওয়ার সময়ে প্রতিবারই জিজ্ঞাসা করে—'লচ্চ, দিন কয়েকের জন্য বাড়ি যাবি?' বন্ধুদের সঙ্গ ও দিদিমার স্নেহ-ভালোবাসার কথা ভেবে লচ্চ জবাব দেয়—'না, যাব না।'

এগারো

লচ্চ যে কোডিগ্রাম ছেড়ে মামাবাড়িতে থেকে লেখাপড়া করে—এই ব্যাপারটা কোডিগ্রামে খুব পরিহাসের বস্তু হয়ে দাঁড়াল। শঙ্করপণ্ডিত তার মনের সমস্ত বিষ গ্রামের লোকের কাছে উদ্‌গীরণ করতে থাকল। কেবল তাই নয়, শীনময়্যের উস্কানিতে একথাও বলে বেড়াতে লাগল—'ঐতালের এখন বৈদিক কাজকর্ম ছেড়ে দেওয়াটাই বাকী আছে। ইতিপূর্বে 'শিবল্লি' পরিবারের মেয়ে ঘরে এনেছে বউ করে, এবারে ছেলেকে পাঠিয়েছে জাত-নাশা ইংরেজি স্কুলে!' সরস্বতীরও অবশ্য এই ধরনের ইস্কুল ভালো লাগেনি। কিন্তু 'যার-যার ছেলেপিলের বিষয়ে তার-তার চিন্তা'—এই কথা ভেবে ওনিয়ে আর মাথা ঘামাল না।

ইতিমধ্যে লচ্চর প্রাথমিক শিক্ষা এগিয়ে চলল। প্রথম দু' তিন মাস সে অবশ্য জল ছাড়া মাছের মতো অস্বস্তি বোধ করছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে দাদু ও দিদিমার বাৎসল্য এবং অন্য ছাত্রদের তুলনায় লচ্চর প্রতি দাসপ্পয়্য মাস্টারের স্নেহ-পক্ষপাতের ফলে পডুমুনূরুই তার বাড়ি হয়ে উঠল। ছুটি-ছাটা হলে কোডি-গ্রামে আসে। তখন অনেক দিন পরে-পাওয়া ছেলেকে নিয়ে বাড়িতে আদর সোহাগের ধুম পড়ে যায়। বড় মায়ের স্নেহ-ভালোবাসায় মাঝে মাঝে লচ্চর মনে হয়—'এখানেই থাকি!' কিন্তু ছুটির দিন শেষ হয়ে এলে বন্ধুদের কথা ভেবে সে নিজেই বাবাকে বলে—'আমাকে দাদুর বাড়িতে নিয়ে চল।'

চার পাঁচ বছরের মধ্যে পডুমুনূরুর পড়া শেষ হয়ে গেল। ছুটির সময় লচ্চ এখন বাড়িতে। ঐতালের মনে ভারি চিন্তা—'এতসব করে এখন ছেলেকে নিয়ে কী করা যায়?' এই বিষয়টা তার মাথায় আসে না। ওদিকে দাদুর বাড়ি থেকে মাঝে মাঝেই খবর আসে—'লচ্চকে দিয়ে পলিমাটি টানিও না। তোমাদের সুবিধা না হলে আমিই ওকে হাইস্কুলে পড়াব।' কুন্দাপুর, উডুপি, মংগলুর—নানা জায়গায় ইংরেজি ইস্কুল শুরু হয়েছে। বড়লোকের ছেলেপিলেরা সেখানে গিয়ে পড়াশোনা করে। প্রত্যেক অভিভাবকের আশা ইংরেজি ইস্কুলে গেলে তার ছেলেপিলেরা ভবিষ্যতে কেউ উকিল বা কেউ তহশীলদার হবে।

ঐতালের এখন উভয় সংকট। লচ্চর বয়স দশ হয়েছে। অবিলম্বে তার পৈতার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া, মেয়ে সুব্বি সাত বছর পূর্ণ করে আটে পা দিয়েছে। ওদিকে ঠিকুজীর হিসাব মতো সত্যভামার তৃতীয় সন্তানের জননী হওয়া কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এই সমস্ত ভেবে সরস্বতী একদিন ঐতালকে বলল, 'দাদা লচ্চ যা পড়াশোনা করেছে, আমাদের পক্ষে তাই ঢের। ওখানে পড়ুমুনূরুতে তোমার শ্বশুরবাড়ি থেকে বেশি বেশি স্নেহ দেখিয়ে ইংরেজি-ফিংরেজির কথা বললে তুমিও যেন তাই করে বোসো না। ভবিষ্যতে কি তোমার পৈতৃক বৃত্তি ছেড়ে দেবে? তুমি যাদের কুলপুরোহিত তাদের অবস্থাটা কী হবে? তাদের বাড়িতে একটা শ্রাদ্ধ বা বিয়ে-পৈতা হলে এর পরে কে যাবে? ঐতাল এই প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারল না। সত্যই, রাম ঐতালের পৈতৃক বৃত্তি তার সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধ হওয়া সমীচীন নয়। কিন্তু ভবিষ্যৎ? ঠিক এই সময়ে 'বাবু' শীনময়্য নিমন্ত্রণ পেল জমিদারবাড়ির পুত্রের বিবাহে, কিন্তু রাম ঐতালকে তারা একবার ডেকেও জিজ্ঞেস করল না। এই অপমানসূচক ঘটনায় ঐতালের হৃদয়টা কুরে কুরে খাচ্ছিল—'এই বৈদিক বৃত্তিতে কোনো মর্যাদা নেই। সামনে সকলেই 'ঐতাল ঐতাল' বলে নমস্কার করলেও পিছনে 'দক্ষিণা-কুড়ানো বামুন' বলে ঘৃণা করে!' সবচেয়ে দুঃসহ হয়ে উঠেছে শীনময়্যের উপহাস আর শঙ্করপণ্ডিতের টিপ্পনী। যেমন করে হোক ওদের সামনে নিজের মর্যাদা দেখাতে হবে এবং তার উপায় হচ্ছে ছেলেকে ইংরেজি পড়ানো।

সরস্বতীর বেয়াড়া প্রশ্নের কোনো জবাব দিল না ঐতাল। না দিয়ে বলল—এখন ওই সব নিয়ে মাথা ঘামানো কিসের? ছেলের পৈতা না দিয়ে কিছুই করছি না! এবছর 'গুরুবল' ভালই আছে। ও যখন ছুটিতে আসবে, ভগবান করলে তখনই একটা পৈতা দিয়ে ফেলব। বাড়ির সকলেই তাতে সায় দিল। ঐতাল স্থির করল—একটা মাত্র ছেলে। তার পৈতাটা একটু ধুমধামের সঙ্গেই হওয়া দরকার। বৈশাখমাস আসতেই লচ্চর উপনয়নের প্রস্তুতি-পর্ব শুরু হয়ে গেল! ঐতালের বিয়ের সময়ে যে ছাপরা তৈরি হয়েছিল, সেটা এখনও আঙিনা ভরে বিরাজমান। এবার তার সাহায্যের জন্য শীনময়্যকে আর ডাকা হল না। তার বদলে শীনের যারা প্রতিপক্ষ, তাদেরই একজন সুব্রায় উপাধ্যায়কে বাড়িতে ডাকল রান্নাবান্না প্রভৃতি সমস্ত ব্যবস্থার তদারকির জন্য। নিমন্ত্রণের ব্যাপারে ঐতাল নিজেই বাড়ি বাড়ি গিয়ে জানিয়ে এল। শীনময়্যের বাড়িতে

গিয়ে বিশেষ কুটুম্বের মতো সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে বলল—'সেদিন কিন্তু আমাদের বাড়িতে না এলেই চলবে না।'

এদিকে পড়ুমুনূরু থেকে ঐতালের শ্বশুরবাড়ির সকলেই পৈতার দিন এসে কয়েকদিন সেখানেই থাকবে বলে মনস্থ করল। নিজের ছেলে বড় হয়ে যাওয়ার পরে অন্য কারও উপর স্নেহবর্ষণের সুযোগ নেই দেখে মাধপ্পয়্য দৌহিত্র লচ্চকে তাঁর চোখের মণি করে রেখেছেন। তাই তিনি সাধারণত বাড়ি থেকে বাইরে কোথাও না বেরুলেও নাতির পৈতা উপলক্ষ্যে দিনকয়েক মেয়ের বাড়িতে এসে থাকার সিদ্ধান্ত করেন। উপনয়নের ব্রহ্মচারীর আনন্দ বলে শেষ করা যায় না। বড়মা, বাবা, দাদু, মা—সকলেরই আদর লচ্চর উপর। উপনয়ন-পর্ব বিশেষ সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন হল। মাধপ্পয়্যর অনুরোধ উডুপির কানুনগো সাহেব এসেছিলেন। এই সময়ে আদালত ছুটি থাকাতে ঐতালের কুটুম্ব নাগাপ্পাও এসেছিলেন। পৈতার ভোজন উপলক্ষ্যে বড়া ও মিষ্টি পরোটা—এই দু'রকম আহার্যের ব্যবস্থা করা হয় এবং সরস্বতীর আগ্রহে দুটি পদই প্রত্যেককে দু' দুবার যাচাই করা হয়। সরস্বতী ভোলেনি যে তার দাদার দ্বিতীয় বিয়ের সময়ে শীনময়্যের তদারকিতে অত্যন্ত তাড়াহুড়ো করে ভোজন পর্ব শেষ করা হয়েছিল।

সমাগত অতিথিদের আদর অভ্যর্থনা কিছু কম হয় নি। এবং মৌখিক ভদ্রতায় শীনময়্যের তুলনায় সুব্রায় উপাধ্যায় কিছু কম যান না। উকিলবাবুকে ও কানুনগো সাহেবকে তিনি বারংবার স্বাগত জানালেন। শীনময়্য তিনটি সোনার আংটি এবং মোটা সোনার হার পরে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপবিষ্ট থাকলেও সুব্রায় তাকে সম্বোধন করে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করল না। অবশ্য ঐতাল নিজেই দুবার করে এসে বলে গেল—'ময়্যমশাই, সকলে সমান হয় না। এটা তোমাদেরই বাড়ি মনে করো ভাই।' মাধপ্পয়্যও পুরোনো দিনের স্মৃতি নিয়ে শীনময়্যের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন। শীন কিন্তু তার সমধর্মী বাসুদেব বাবুকে পৈতার আসরে না দেখতে পেয়ে বড় অস্বস্তি বোধ করল। পরে এক দিন সে জিজ্ঞাসা না করে পারল না যে বাসুদেববাবু সেখানে যান নি কেন। উত্তরে তিনি বললেন—'আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের বিয়েতে ঐতালকে বলা হয়নি বলে তার প্রতিশোধ নিয়ে থাকবে। ও আমাকে নিমন্ত্রণ করলেও আমি কি অমন হাড়কেপ্পনের বাড়িতে খেতে যেতাম?'

উপনয়ন শেষ হয়ে গেলে উডুপির কানুনগো সাহেব চলে গেলেন, চলে গেলেন কুন্দাপুরের উকিলবাবুও। আর দু'তিন দিনের মধ্যে মাধপ্পয়্যের বাড়ির লোকেরা চলে যাবে। সত্যভামা বাবার কাছে এসে বলল—'যাবার আগে ঠিক করে যাও লচ্চ এর পরে কী পড়বে।' মাধপ্পয়্য বললেন—'সে বিষয়ে আমি আর কী বলব? আমার যা বলার আগেই বলে দিয়েছি। লচ্চর লেখাপড়া সম্পর্কে দাসপ্পয়্য মাস্টার যা বলেন তাই করা উচিত। তিনি বলেন—এ পর্যন্ত অমন বুদ্ধিমান ছেলে তাদের ইস্কুলে আসে নি। অত বুদ্ধি কী যাগযজ্ঞ করেই শেষ করে দেবে নাকি? আজকালকার দিনে উকিল বা তশীলদার হতে পারলে যে গৌরব আর কিসে তা আছে? আর কিছু না হোক, দশটা বছর ইংরেজি শিখলে কম-সে-কম 'কোর্জি' ধানপান করা যাবে। বৈদিক ব্যবসা ধরে থাকলে কি মর্যাদা আসবে?

সরস্বতী আর চুপ করে থাকতে পারল না। বলল—'আপনি যে গৌরব-টৌরব মান্যি-গণ্যির কথা বলছেন তা ঠিক। কিন্তু ভবিষ্যতে দাদার পরে পৌরোহিত্যের কাজ কে করবে?' মাধপ্পয়্য বললেন—'করতে হবে এমন কী কথা আছে? না করলে ক্ষতি কী? গ্রামে কি আর কেউ পারবে না?' এমন সময়ে ঐতাল বলে উঠল—'এ সংসারে কি আর ছেলেপিলে হবে না বলতে চাও? আমার কোষ্ঠীতে তিনটি পুত্রসন্তানের যোগ আছে।'

'হ্যাঁ, এখনও তিন নয়, তেরটি ছেলে হবে তোমার! তোমার বয়স হল পঞ্চান্ন সে কথা বোধ করি ভুল গেছ। আমার কী? ইংরেজি-ফিংরেজি মানেই তো রাশি রাশি টাকা।'

ঐতাল বলল—'এখন এক রাশি টাকা ঢাললে পরে চারগুণ টাকা ঘরে আসবে। ও সমস্ত হচ্ছে মাছধরার ফাঁদ পাতার মতো। ফাঁদ পাততে ভয় পেলে মাছই আসবে না।'

মাধপ্পয়্য বললেন—'সরস্বতী মা, টাকা পয়সার দোহাই পেড়ে তোমরা পিছিয়ে যেও না। আমার নাতির জন্য, যত টাকা লাগুক, আমি খরচ করব। আমার বড়ই দুঃখ যে আমার ছেলেটা অর্ধেক পড়াশুনা করে ইংরেজি ইস্কুল ছেড়ে দিয়েছে। লচ্চ যদি শেষ পর্যন্ত ইংরেজিটা পড়তে পারে, আমাদের দুই বাড়ির পক্ষেই সেটা একটা মর্যাদা। এই তো লচ্চর পৈতায় কানুনগো সাহেব এসেছিলেন। তিনি যেখানে যান না কেন, কত মর্যাদা তার।'

'কেন? আমাদের কুন্দাপুরের উকিলবাবু? এই ছুটিতে কোডিগ্রামে এসেছেন। এখনও ফিরতে পারেন নি। নানা জায়গা থেকে নেমন্তন্ন। তাঁকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে আদর আপ্যায়ন করেনি, ভোজন করায়নি—এমন লোক নেই।'

পুরুষেরা সকলে মিলে যখন এইভাবে লচ্চর ভাবী ঐশ্বর্যের কথা নিয়ে আলোচনা করছে, তখন সরস্বতী বলল, 'আমি মেয়েমানুষ, আমার কী? সরকারী ইস্কুলে লচ্চ কোন্ পথে-না-কোন পথে যায় আমি কেবল তাই ভাবছি। ও ইংরেজি পড়ুক এই যদি আপনাদের অভিপ্রায় হয়, বেশত।' উপনয়নের দিনকয়েক পরে মাধপ্পয়্য সপরিবারে পড়ুমুনূরু চলে গেলেন।

সরস্বতী একদিন ঐতালকে ডেকে বলল, 'দাদা, লচ্চ ইংরেজি লেখাপড়া শিখবে, শিখুক। কিন্তু ওকে ওর দাদুর বাড়িতে রেখো না। উনি টাকা দেবেন সত্য, কিন্তু তোমার ছেলের লেখাপড়ার জন্য তুমি তাঁর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে এটা ঠিক নয়। আমরা এখানে না হয় একবেলা খাব, তবু তোমার খরচেই ওকে লেখাপড়া শেখাও। নয়ত পরে শীনময়্যের মতো লোকেরা এই বলে টিটকারি দেবে—নিজের ছেলেকে ভিক্ষে করে ইংরেজি শেখায়।' সরস্বতীর এই কথাটা ঐতালের খুব ভাল লাগল। বলল, 'সরসোতি, কী ভেবেছিস? উনি বলেছেন বলেই কি আমি ছেলেকে ওঁর আশ্রয়ে রাখব? লচ্চকে আমি কুন্দাপুরের ইস্কুলে দেব বলে স্থির করেছি।'

'টাকা-পয়সার কী করবে?'

ঐতাল বেশ একটু দেমাক দেখিয়ে বলল, 'আমাকে তুই কী ভাবিস? আমার কাছে কি পাঁচ-ছ হাজার টাকা নেই?' সরস্বতী চুপ করে রইল। দাদার কাছে যে অতটাকা আছে একথা তারই মুখ থেকে আজ প্রথম শুনে খুশিও হল সে। দাদা যখন পাঁচ-ছ হাজার বলেছে, তখন তার আধাআধি টাকা না থেকেই পারে না। কোথায় এত টাকা রেখেছে—সেকথা গ্রামবাসীদের কাছে অজানা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ঐতাল মুখ খুলে যা বলে ফেলেছে তার দ্বিগুণ টাকা তার কাছে আছে।

লচ্চর গরমের ছুটিটা বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। এখন থেকে তাকে ইংরেজি শিক্ষার জন্য তৈরি হতে হবে, তার আনন্দ দেখে কে? কোডিগ্রামের বালিয়াড়িতে হেঁটে হেঁটে প্রতিবেশীদের বাড়ি বাড়ি দেখা করে খবরটা সে নিজেই

রটাল। কয়েকবার শীনময়্যের বাড়িতেও গেল। তার পঞ্চম ছেলে লচ্চর সমবয়সী। তারও সেই বছরেই পৈতা হয়। যখনই সুযোগ পায় লচ্চকে সঙ্গে নিয়ে বালিয়াড়ির হোয়ে গাছের বাগানে খেলা করে। মাঝে মাঝে তাদের মধ্যে দস্তুরমতো প্রতিযোগিতা চলে জপ-তপ-সন্ধ্যাবন্দনা-অগ্নিকার্যের মন্ত্র নিয়ে। শীনময়্যের ছেলে যায় শঙ্কর পণ্ডিতের পাঠশালায়। নাম 'ওরট' (অশান্ত), স্বভাবেও তাই। তার সঙ্গে প্রতিযোগিতা কিনা দিদিমার অতি আদরের নাতিরূপে প্রতিপালিত লচ্চর ? ওরট মন্ত্র-আবৃত্তিতে পরাজিত হলেও নামতা-পাঠে জয়লাভ করে। শঙ্কর পণ্ডিতের পাঠশালায় নামতাবস্তুটি থাকে আঙুলের ডগায়। কাজেই এব্যাপারে লচ্চ কোনোবারই জয়ী হতে পারে না।

রোজকার মতো একদিন দুজনের মধ্যে খেলা, দৌড়, গল্পগুজব এবং যাবতীয় প্রতিযোগিতা শেষ হল। লচ্চ তখন বাহাদুরি দেখাবার জন্য বেশ ডাঁটের সঙ্গে বলল, 'জানিস, আমি উড়ুপি না-হয় কুন্দাপুর যাব ইংরেজি পড়তে।' ওরট তার বাহাদুরিটা ঘোষণা করে বলল, 'আসছে মাসে দাদা বাড়ি এলে পরে আমি তার সঙ্গে বেংগলুরে যাব জানিস ?' দুজনেই এসব বড়াইয়ের কথা শিখেছে বাড়ির লোকজনের কাছে এবং একজন আর একজনকে ছাড়িয়ে যাবে বলে বড়দের কথাবার্তাই খরচ করতে লাগল। ওরট বলল, 'বৈদিক বামুনের জিভে ইংরেজি নাকি আসবেই না।' লচ্চ বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'কে বলে এমন কথা ?'

'আমার বাবাই বলে ? মন্ত্র যেমন পট পট করে বলা যায়, ইংরেজি নাকি অত সহজ নয়। কে একজন নাকি উকিল হবার আশায় ইংরেজি পড়তে গিয়ে দশ-দশবার ফেল করে এখন বাড়িতে এসে হাল চাষ করে!'

'সেই লোকটা তাহলে তোর মতো শঙ্কর পণ্ডিতের পাঠশালায় লেখাপড়া করেছে। সেই জন্যই তো সকলে বলে—লেখাপড়া করতে হলে সরকারী ইস্কুলে যেতে হয়।'

'ওখানে যারা যায় তাদের নাকি জাত থাকে না। আমাদের শঙ্কর মাস্টার বলে—সরকারী ইস্কুলে সব জাতের লোক একসঙ্গে ওঠাবসা করে।'

'ওঃ, তোদের ভারি জাত আছে। বেংগলুরে কোন্ না-কোন্ জাতের এঁটো বাসন মাজে যারা তাদের আবার জাত ?'

কথা এইভাবে চলতে চলতে বেড়ে গিয়ে ওদের মধ্যে হাতাহাতিও হল। দুজনেই দিব্বি কাটল—কেউ কারো সঙ্গে কথা বলবে না। সেদিন অপরাহ্নে

অনেকক্ষণ পর্যন্ত ওরা আলাদা হয়ে হোয়ে ফল কুড়োতে কুড়োতে একা একা খেলা করছিল। এমন সময়ে নজরে এল দূরে সমুদ্রগ্রামী একটা বাষ্পীয় জাহাজ। তার ধোঁয়া দেখে লচ্চ বলে উঠল, 'ওই ত্যাখ ওরট, কলের জাহাজ। বিলেত থেকে আসছে ওটা।'

ওরটের দৃষ্টি সেদিকে পড়াতে সেও লচ্চর সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে সমুদ্রতীরে গিয়ে হাজির হল। 'ওটা বোধ হয় বোম্বাই থেকে আসছে', এই বলে মাসে অন্তত একবার করে যে সব জাহাজ দেখতে পাওয়া যায় সেগুলির গল্প বলতে লাগল ওরট। একথাও বলল, 'রাতের অন্ধকারে জাহাজগুলো দেখা যায় না— দেখা যায় কেবল সারি সারি আলো' সন্ধ্যাবেলায় বিদায় নেয়ার সময়ে আবার তাদের বন্ধুত্ব হল। লচ্চ বলল, 'আমি বোধহয় কাল পডুমুনূরু চলে যাব।' ওরট প্রত্যুত্তরে বলল, 'দাদা খুব শীগগিরই আমাকে বেংগলুরে নিয়ে যাবে।' এখন তারা পরস্পরের কাছে বিদায় নেয়ার জন্য দণ্ডায়মান দুটি বন্ধু!

তিন চার দিন পরে লচ্চ পডুমুনূরু চলে গেল। সেখানে তার দাদু তার ভবিষ্যৎ লেখাপড়ার বিষয়ে ওখানে জ্ঞানী ব্যক্তিরূপে পরিচিত দাসপ্পা মাস্টারের কাছে জিজ্ঞাসা করে সব স্থির করবেন। একদিন ঐতালও তার শ্বশুরবাড়িতে উপস্থিত হল, সেদিন বড়রা একত্রিত হয়ে একটা মহাসভার আয়োজন করল। দাসপ্পা মাস্টার বলল, 'লেখাপড়ার জন্য উডুপিই উপযুক্ত স্থান। নিত্যই দাদুর বাড়ি থেকে যাতায়াত করবে। দুপুরবেলার খাওয়া উডুপি হোটেলেই চলবে। সেখানে খরচও কম। যার তার হোটেলে পড়ে থাকার দরকার নেই।' দাসপ্পা মাস্টারের এই মন্তব্যের পরে মাধপ্পয্য এই বলে সম্মতি দিলেন, 'মাস্টারের কথাই আমার কথা।' রাম ঐতালও 'তাই হবে' বলে বাড়ি ফিরে গেল।

কিন্তু তার মনের মধ্যে এই একটা ভারি অস্বস্তি যে ছেলে একেবারে দাদুর বাড়িতেই বড় হতে থাকবে এই নিয়ে সরস্বতী না জানি কী বলে! ঐতাল খুশি এই কারণে যে লচ্চ শ্বশুর মশায়ের বাড়িতে থাকলে তার নিজের খরচ অনেক কম হবে। সে দিন সন্ধ্যায় বাড়িতে এসে বলল, 'পডুমুনূরুতে যাকেই জিজ্ঞাসা করি সকলেই বলে যে লেখাপড়ার জন্য উডুপিই সব চেয়ে উত্তম। কুন্দাপুরে নাকি খুব খরচ। পার্বতী বলল, 'যেখানেই হোক আমাদের কী?' সরস্বতী ভ্রূ-কুঞ্চিত করে সেখান থেকে চলে গেল। পরদিন সে ঐতালকে ডেকে বলল, 'দাদা, অপরের আশ্রয়ে ছেলেপিলে মানুষ করা ভালো নয়। তোমার একটি মাত্র ছেলে।

ভবিষ্যতে লচ্চ দাদুর বাড়িকেই চিনবে বৈ আমাদের কথা মনেই রাখবে না।' ঐতাল একটু দ্বিধায় পড়ে গেল। সরস্বতীর কথাটা মিথ্যা বলে মনে হল না। মাঝে মাঝে তারও মনে এরকম সন্দেহ জাগে যে ছেলে বুঝি তার কাছে দূর হয়ে যাবে। কিন্তু শ্বশুরের কথায় না বলার মতো সাহস বা ইচ্ছা কোনোটাই তার নেই। এদিকে সত্যভামার মন যে বাপের বাড়ির দিকেই টানবে এটাই স্বাভাবিক। সে বলল, 'কুন্দাপুরে যে থাকা যায় না একথা আমি বলি না। কিন্তু সেখানে ছেলের অসুখ-বিসুখ হলে কে দেখাশোনা করবে? উডুপিতে পড়াশোনা করলে আর কিছু না হোক, রোজ সন্ধ্যাবেলা দাদুর বাড়িতে আসতে পারবে। একমাত্র দুপুর বেলাটাই চোখের সামনে থাকবে না, এই যা।' সত্যভামার যুক্তিটা মন্দ নয়। ঐতাল সেই যুক্তি দিয়ে সরস্বতীকে খুশি করবার জন্য আর একবার চেষ্টা করল। শান্ত কণ্ঠে বলল, 'কুন্দাপুরে কার-না-কার হোটেলে খেতে হবে। ওখানে ছেলের অসুখ বিসুখ হলে কে দেখাশোনা করবে? আমাকে গিয়ে ওখান থেকে অসুস্থ ছেলেকে বাড়ি নিয়ে আসতে হবে না? রোজ ছেলের মাথায় তেল মাখিয়ে চুল আঁচড়ে দেবার লোক চাই না? স্নান করিয়ে দেবার দরকার হবে না? সপ্তাহে অন্তত একবার 'তৈলস্নান' চাইনা? এই সমস্ত কি হোটেলে থাকলে হতে পারে? এখন ওর বয়স মাত্র দশ বছর। স্নান, তৈলস্নান করবার মতো শক্তি ওর আছে কি? ধরো, ছেলেকে কুন্দাপুর হোটেলে দিলুম, তারপরে কি দিবারাত্রি এই চিন্তা হবে না—ওখানে একা একা না জানি কেমন আছে ছেলেটা, এই বুঝি অসুখ-বিসুখ হল। তাই বলছিলাম, যে পর্যন্ত নিজেরটা নিজে বুঝে-সুঝে না করতে পারে. সে পর্যন্ত উডুপিই ভালো।' এই সমস্ত কথাই এমন স্নেহ-পরিপূর্ণ যে সরস্বতীর সম্মত না হয়ে উপায় নেই: কাজেই সে 'না' করতে পারল না। বলল, 'তবে তাই হোক। ছেলের কাছে যেকোনো একজনের থাকা নিয়ে কথা।' সম্মতি দিলেও মনে মনে সরস্বতী একথা না ভেবে পারল না যে এই সরকারী ইস্কুলে পাঠানোটাই হল যত নষ্টের মূল।

লচ্চ সম্পর্কে আর তর্ক বিতর্কের অবকাশ রইল না। স্থির হল সে পডুমুনূরু থেকেই প্রতিদিন যাতায়াত করবে। যথাসময়ে উডুপির হাইস্কুলে ওকে ভর্তি করার ব্যবস্থা হয়। সেদিন লচ্চর সঙ্গে গিয়েছিল দাসপ্পা মাস্টার। উডুপি লচ্চর কাছে একেবারে নতুন জায়গা নয়—ইতিপূর্বে দেখেছে সে কয়েকবার। যখন

পডুমুনূরুর ছোট ইস্কুলে পড়ত, তখন বড়দের সঙ্গে 'লক্ষদীপ', 'পর্যায়' প্রভৃতি উৎসব উপলক্ষ্যে উডুপিতে যাতায়াত করেছে। উডুপির বাজার, মন্দির, উৎসব ইত্যাদি দেখে ভারি ভালো লেগেছিল তার। এখন রোজই সেই আকাঙ্ক্ষিত স্থানে যাওয়া যাবে ভেবে লচ্চ খুব উৎফুল্ল। ভোরবেলায় স্নানটি সেরে নিয়ে বই ধরে কি না ধরে। অতঃপর আহার পর্ব সমাধা করে কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে বিদ্যালয় যাত্রা। বাড়ি ও উডুপির ইস্কুলের মধ্যবর্তী এই তিন চার মাইল পথ হাঁটা। প্রথম প্রথম একটু কষ্টকর ছিল বৈকি! কিন্তু সারা পথে একজন না একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতই। ইস্কুলে পৌঁছে খানিকক্ষণ পড়াশোনা। দুপুরবেলা টিফিনের সময়ে একটা হোটেলে গিয়ে চা খেয়ে আসা। বড়রাই সেই হোটেলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। হোটেলে চা পানের পরে পুনরায় ইস্কুল। বিকেল পাঁচটায় ইস্কুল ছুটি হলে সারা পথে খেলা করতে করতে গৃহে ফেরা। নাতি ক্লান্ত হয়ে আসবে ভেবে সদর দরজায় তার আগমনের প্রতীক্ষায় দিদিমা দাঁড়িয়ে থাকতে লচ্চর ভাবনা কী? কোন না কোন সুস্বাদু খাবার তৈরিই থাকে।

দিন যায়, মাস যায়। এই নতুন জীবন লচ্চর ভালই লাগে। তার মধ্যে ধীরে ধীরে দেখা দেয় শহুরে লোকের চট্‌পটে ভাব ও কথাবার্তা। ইংরেজি ইস্কুলে পড়ে বলে অহঙ্কারও কিছু কম নয়। পথে যখনই গ্রাম্য লোক দেখতে পায়, তাদের শুনিয়ে শুনিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ইংরেজিতেই কথা বলে। মাসে কিংবা তিন মাসে একবার কোডিগ্রামে গেলে সেখানে বাবা-মা এবং আর সকলের সামনে ইংরেজি বিদ্যা জাহির করে। আঃ, রাম ঐতালের আনন্দের আর সীমা নেই! আর কয়েক বছর পরেই ছেলে নির্ঘাৎ ওকালতি করবে। লচ্চর ভারি শখ তার বন্ধু ওরটের কাছে সে তার ইংরেজি বিদ্যার বড়াই করে। কিন্তু লচ্চর গ্রামে আসার আগেই ওরট তার দাদার সঙ্গে বেংগলুর চলে গেছে।

বছর যায়। ছুটি-ছাটাতে আর বাড়ি আসার জন্য লচ্চর তেমন ব্যাকুলতা নেই। ছুটি থাকলেও সে উডুপিতে গিয়ে ঘোরাঘুরি করে আসে। যদি কেউ জানতে চায়—'ছুটিতে ওখানে গিয়ে কী করো?'—লচ্চ মোটা মোটা বই দেখিয়ে উত্তর দেয়—'আগের মতো নয়। এখন অনেক পড়া যে!'

ছুটির দিনেও লচ্চ যে কোডিগ্রামে না গিয়ে উডুপি ও পডুমুনূরুতে দিন কাটায় এ ব্যাপারটা সরস্বতীর আদৌ মনঃপূত নয়। মাঝে মাঝে দাদাকে বলে, "দেখেছ? আমাদের বাড়ি ঘর আর ভাল লাগছে না। তা না হলে বাড়ি

বলে একটা মায়া থাকে না?' ঐতাল ছেলের পক্ষ টেনে বলে, 'কী সব নাকি পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকে?' কিন্তু সরস্বতী ও সব কথা মানতে মোটেই রাজী নয়। 'তুমি যাই বল না কেন দাদা, ও আমাদের রান্না পছন্দ করে না। আমরা শত ভাল করে তৈরি করে দিলেও ও বলে কী জানো?—এ সমস্ত একেবারেই বিস্বাদ। ওখানে দাদুর বাড়িতে অনেক আদর আপ্যায়ন করে বোধহয়। করে করুক, আমার কী?' ঐতাল বলল, 'যা সত্য নয় তা বলিসনে।' সেদিন দাদাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে হল। আহারের সময়ে সরস্বতী বলল, 'আজ 'হরিবে' (পালংশাক জাতীয়) পাতার সাম্বারটা (টকডালটা) কেমন হয়েছে দাদা, ভালো নয়? আজ ওর জন্য বিশেষ করে 'গারিগে' (মিষ্টি খাদ্য) লাড্ডু তৈরি করলাম। তুমি দু'বার করে সব পদ চেয়ে খেলে, আর ও একটুকরোও স্পর্শ করল না। কেন? ওখানে দাদুর বাড়ির মতো আমরা রান্না করতে পারি না বলে?' সেদিন সত্যভামাই সকাল থেকে নারকেল ও চাল বেটে বেটে ক্লান্ত হয়েও ছেলেকে খাইয়ে খুশি করবে বলে 'গারিগে' (মিষ্টি খাদ্য), 'চক্কুলি' (নিমকি), 'উংডলক্কু' (লাড্ডু) করেছিল। লচ্চ সেই সমস্তই একটু শুঁকে দেখল মাত্র। সত্যভামার মনটা বেজার হয়ে গেল। সেদিন সেও ছেলেকে ভর্ৎসনা না করে পারল না। আহারের সময়ে বাপের সামনে এতসব কথা শুনতে লচ্চর চোখ মুখ লাল হয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই চোখে জল এসে গেল এবং তৎক্ষণাৎ খাওয়া ফেলে উঠে পড়ল। রাম ঐতালও বিষম ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল, 'এক বিঘৎ মানুষ নয়, তার আবার চোট দেখ না? মা-মাসী দুকথা বললে মর্যাদা ক্ষয়ে যায় বুঝি?' কিন্তু লচ্চ সেই যে বাইরে চলে গেল আর এল না, খেল না, এমন কি ছুঁয়েও দেখল না।

কোনো রকমে আর দু'তিন দিন বাড়িতে কাটিয়ে অবশেষে 'আমার অনেক পড়াশোনা পড়ে আছে। আমি দাদুর বাড়ি চললাম' এই বলে হাঁটা দিল। সেদিনের পর থেকে ছুটির সময়ে বাড়ি আসার ব্যাপারে লচ্চর একটা ঔদাসীন্য দেখা গেল।

এই ভাবেই কাটল—এক নয়, দুই নয়, পাঁচটি বছর। লচ্চ এখন থার্ড্ ফর্ম-এর ছাত্র। কী একটা কাজে ঐতাল উডুপি এসে অমনি একবার ছেলের স্কুলের খোঁজ খবর নিতে সেখানেও গেল। কেবল ছেলেকে প্রাণ ভরে দেখার টানেই গিয়েছিল। প্রস্থানের সময়ে বলল, 'খোকা, তোর মাকে দেখতে ইচ্ছা

হয় না রে ? দিন কয়েক আগে নাকি এক সপ্তাহের ছুটি ছিল।' লচ্চ জবাব দিল, 'ছুটি থাকলে কী হবে ? ছুটির পরে যে পরীক্ষা ছিল।' ঐতাল বলল, 'থাক সেকথা। গরমের ছুটির আর কত দিন বাকী ?' 'আর দু সপ্তাহ।' 'বেশত। ছুটিতে কিন্তু বাড়িতে অবশ্যই আসবি।' অন্যমনস্কভাবে ছেলে উত্তর দিল—'হুঁ।' 'ভগবান যদি করেন শীগগিরই সুব্বির বিয়েটা দিতে চাই'—এই কথা জানিয়ে ঐতাল প্রস্থান করল।

গরমের ছুটি আরম্ভ হয়েছে। লচ্চর পড়ুমুন্নূরু থেকে বাড়িতে না এসে উপায় নেই। কারণ, রাম ঐতাল শ্বশুরমশাইকে বলতে এসেছিল—'ছুটি আরম্ভ হলেই ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। ওযে নিজের বাড়ি চেনে তা তো মনে হয় না।' কথাটা একটু কর্কশ শুনিয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু ঐতালের মন আজকাল ছেলেকে দেখার জন্য ভারি অস্থির হয়ে ওঠে। বয়স তো হল ষাটের কাছাকাছি। চুল সব শাদা হয়ে গেছে। আগের মতো দেহে আর শক্তি নেই। এদিকে সুব্বি বারো বছরের হয়ে উঠল। বিয়েতে অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে, আর বিলম্ব করা যায় না। বাড়িতে বাবা মা বড়মা পিসী সকলের সে স্নেহের পুতলী। লচ্চ দূরে থাকলেও সুব্বি কাছে থাকাতে অতটা কষ্ট বোধ হয়নি। এখন তাদের মনে এই চিন্তা উঁকি দিতে লাগল যে সুব্বির বিয়ের পরে সে শ্বশুরবাড়ি চলে গেলে বাড়িটা আবার খালি খালি বোধ হবে। ঠিকুজীর ফল অনুযায়ী ঐতালের পক্ষে তৃতীয় একটি সন্তানের জন্য অপেক্ষা করা সার্থক হল না। ফলে তার পৈতৃক বৃত্তির ধারা চালিয়ে নেয়ার মতো কেউ রইল না। এই সমস্ত চিন্তা ভাবনার ফাঁকে ফাঁকে দিনে দিনে লচ্চর দূরে চলে যাওয়াটা তার মনকে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন করে তুলল।

আর লচ্চ ? ছুটি আরম্ভ হয়েছে সপ্তাহখানেক হয়ে গেলেও বাড়ির মুখো হওয়ার লক্ষণ দেখা গেল না। দাদুর বারংবার মৃদু ভর্ৎসনা সত্ত্বেও সে রোজই কেবল উড়ুপি যাতায়াত করে, সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে, আড্ডা মারে। এ সমস্ত ছেড়ে কোডির বনবাসের জন্য সে কিছুমাত্র ব্যস্ত হল না।

ঐতাল রোজই লচ্চর প্রত্যাশায় থাকে। ওদিকে মেয়ের সম্বন্ধ খোঁজাখুঁজি করতে গিয়ে তার ব্যস্ততার সীমা নেই। অমিত্র গ্রামবাসীরা ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করেছে, 'সুব্বিটা দেখতে দেখতে মোষের মতো হাতীর মতো বড় হয়ে উঠছে। মেয়ে ঋতুমতী হলে পরে ঐতাল ইংরেজি মতে ওর বিয়ে দেবে।'

এই ভাবে যারা ঐতালকে টিটকারি দেয় তাদের অগ্রগণ্য হল শীনময়্য। সে ইতিপূর্বেই তার দুই ছেলের বিবাহ দিয়ে কীর্তি স্থাপন করেছে। তার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে বিবাহ উপলক্ষ্যে নাগম্মার দলের মুজরো হয়। বাসুদেববাবুরও ইচ্ছা ছিল তাই। কিন্তু বড় ছেলে নরসিংহ যদি অসন্তুষ্ট হয়—এই ভীতিটাও প্রবল ছিল। যে ছেলে মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে দেয় বলে বাপ এখন গ্রামের একজন নামদার ব্যক্তি, সেই ছেলেকে শীনময়্য ভয় না করে পারে?

শীনময়্য ইতিমধ্যে একবার বেংগলুর ঘুরে এসেছে। তার ছেলের বৈভব এবং সেখানকার হোটেলের ধরণ-ধারণ দেখেশুনে তার বিশ্বাস হয়েছে যে তারা এখন আর মাটির উপর নেই। এহেন শীনময়্য এখন টিটকারি দিলে ঐতালের কীরকম মনে হবে? কে একজন প্রস্তাব করল—'তোমার সুব্বিকে শীনময়্যের সেজো ছেলের কাছে দাও না কেন?' সরস্বতীও সে প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছিল। তখন ঐতাল বলে উঠল, 'ওদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ? আমাদের দরকার নেই।' কার-না-কার মারফত কথাটা শীনময়্যর কানে পৌঁছাল। সে প্রত্যুত্তরে টিপ্পনী কাটল, 'আমি কি পাগল হয়েছি নাকি যে ইংলিশ ঐতাল-ঘরের মেয়ে আনব?' ঐতাল তার ছেলেকে ইংরেজি ইস্কুলে পাঠিয়েছে বলে শীনময়্যের অমন বিদ্রূপের পাত্র হল। সুব্বি যতই বড় হচ্ছে, বাড়ির লোকের কাছে এক একটা দিন যেন এক একটা যুগ বলে বোধ হতে লাগল। গ্রামের লোকেরা দিনের পর দিন তাদের মেয়েকে নকল করে যে সব কথা বলছে তা শুনে সত্যভামার আর সহ্য হল না। স্বামীকে সে বলল, 'তুমি বাবাকে বলে গ্যাখো না। তিনি কোথাও একটা সম্বন্ধ দেখে দিতে পারেন।' সরস্বতী কিন্তু ঐতালের মনে এই বলে ভয় জন্মিয়ে দিল, 'দাদা, তুমি নিজে সম্বন্ধ করে বিয়ে করলে, এই নিয়ে গ্রামের লোক 'শিবল্লি', 'আধাশিবল্লি', 'তিন পোয়া শিবল্লি' বলে কত বিদ্রূপ করেছে! সুব্বির জন্য পড়ুমুনূরুতে বললে তারা শিবল্লী পরিবারের ছেলে জুটিয়ে দেবে। কোট শ্রেণীর বামুন নিয়ে মাথা ঘামাবে না।' এটা অবশ্য যথার্থ কথা। ঐতালের নিজের বিবাহের ব্যাপারে যে-সমস্ত টীকাটিপ্পনী হয়েছিল তাতে সে খুবই মর্মাহত হয়। মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'কী করব সরসোতি? ১০৮ খানা ঠিকুজী এনে দেখেছি। আমাদের পোড়া গোত্রের উপযুক্ত গোত্রে সম্বন্ধ পাওয়াই দুষ্কর। তাছাড়া, শিবল্লী, অর্ধ-শিবল্লী বলে রটাবার লোকের অভাব নেই। কেবল কি তাই? সুব্বির জন্ম-নক্ষত্রে

সকলেই ভয় পায়। ওটা শাশুড়ীর পক্ষে অনিষ্টকর। কিন্তু ছাখ, ছেলের মা না থাকে, ঠিকুজীর মিল হওয়া চাই, ধান পান যথেষ্ট আছে—এমন ছেলে জোটানোই দায়।' সরস্বতী বলল, 'ছাখো দাদা, পঞ্চাশ ভরি সোনা দেবে—এই কথাটা মুখ ফুটে বললে বর আপনা থেকেই এসে যাবে। ঐতাল পয়সা খরচ করবার লোক নয়—এই ভয় করেই সকলে পিছিয়ে যায়। ছাখো, মংদর্তি গ্রামে আমার শ্বশুর বাড়িতেই তিনটি আইবুড়ো ছেলে আছে। একটির সঙ্গেও কি সুব্বির ঠিকুজীর মিল হবে না?'

সরস্বতীর কথাটা দাদার মনে ধরল। এখন সত্যভামা এখানে রাজী হলে কাজে অগ্রসর হওয়া যায়। সেই রাতেই সে বিষয়টা সত্যভামার কাছে উত্থাপন করে। ছ'ক্রোশ দূর বটে, কিন্তু মংদর্তির বেংকপ্রয়্যের ঘরে তিনটি ছেলে-সন্তান। তিনটি ছেলেই দেখতে ভাল। সব মিলিয়ে তারা ছ'শ টাকা ভূমি-কর দেয়। খেয়ে দেয়ে সুখে থাকার পক্ষে কোনো অভাব নেই। জানাশোনা ঘর। কাজেই গিয়ে কথা পাড়লে 'না' বলতে পারবে না। আর ছেলের মা না থাকায় বেংকপ্রয়্য মশায়ের ভয়েরও কোনো কারণ নেই। সত্যভামা বলল, 'গলায় যখন আটকেছে তখন যেখানে হয় সেখানেই ছাখো। আমি তো তাদের কিছুই জানি না। চেনা-পরিচয়ও নেই। তুমি 'ঠিক' বললেই ঠিক। সুব্বিটা ভেবে ভেবে আর গ্রামের লোকের কথা শুনে শুনে দিনে দিনে কেমন হয়ে যাচ্ছে।'

পরদিন আবার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আর এক দফা আলোচনা হল। পার্বতী মৃদুকণ্ঠে বলল, 'মংদর্তি গ্রাম তো কিছু খারাপ নয়। পূর্ব দিকের গ্রাম এই যা। ভগবানের অনুগ্রহে ওখানেই যদি হয়, তবে নিজে গিয়ে কথাবার্তা বলে আসাই ভাল। ঘণ্টায় ঘণ্টায় যে গ্রামে টিট্‌কারি দেয়, সেখানে কোনো সম্বন্ধের দরকার নেই।' সত্যভামা পার্বতীর কথায় সায় দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ দিদি, এই সম্বন্ধ করলেই ভালো হয়।'

'আজ দিনটা ভালো নয়' বলে ঐতাল আগামী কালের জন্য কাজটি স্থগিত রাখল। পরদিন ভোরবেলায় উঠে স্নান সেরে গৃহদেবতার শরণাপন্ন হল। সত্যভামাও শুচিস্নাতা ও শুদ্ধ বস্ত্র পরিহিতা হয়ে স্বামীর পার্শ্বে এসে হাতজোড় করে দাঁড়াল। সুব্বিও সেখানে এসে উপস্থিত হল। দেবতার মঙ্গলারতির পরে ঐতাল বলল, 'হে ঠাকুর, মর্যাদা বাঁচাও, মান-সম্মান রক্ষা করো।' এই বলে দেবতার অনুগ্রহ প্রার্থনা করল। খানিক পরেই ঐতাল আনন্দে চিৎকার

করে উঠল, 'সিদ্ধি! সিদ্ধি!' আহা, সেদিন সরস্বতীর যা আনন্দ বলে শেষ করা যায় না। ঐতালের উৎসাহেরও সীমা-পরিসীমা নেই।

'আজই ঠিকুজী নিয়ে আসব' এই বলে ঐতাল খুব তাড়াতাড়ি রান্না করবার হুকুম দিল। রান্না হল। আহারও শেষ হল। পাঁজি দেখে, অশুভ মুহূর্তগুলি এড়িয়ে, অতি পুরাতন সবুজ রঙের চাদরখানি কোমরে জড়িয়ে ঐতাল কন্যার বরান্বেষণে যাত্রা করল। পথে নানাবিধ শুভলক্ষণ দৃষ্টিগোচর হল। প্রখর রৌদ্রে, তপ্ত মাটিতে তদেকচিত্ত হয়ে সে বারকুরু গ্রামের দিকে অগ্রসর হয়ে সূর্যাস্তের কিছু পূর্বেই মংদর্তি গ্রামের কুটুম্বগৃহে গিয়ে উপস্থিত হল। বাড়ির সদরেই গৃহকর্তা বেংকপ্রয্য মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হতে তিনি সাদরে ঐতালকে গৃহে অভ্যর্থনা করে বসিয়ে সরস্বতীর কুশল জিজ্ঞাসা করেন। সরস্বতীকে তিনি এনেছিলেন তাঁর ছোট ভাই-এর জন্য। কিন্তু বিয়ের বছর দুই পরে ভাই মারা যায়। দু' তিন বছর সরস্বতী কোডি-মংদর্তি আসা-যাওয়া করে তার পর থেকে দাদার সংসারেই আছে। বেংকপ্রয্য সরস্বতীকে একদিনেও ভুলে যায়নি, ভ্রাতৃবধূর প্রতি তাঁর স্নেহ অপরিসীম।

বেংকপ্রয্যের বয়স এখন ষাটের কাছাকাছি। তাঁর তিনটি পক্ষ। দ্বিতীয় পক্ষে দুটি মেয়ে। তৃতীয় পক্ষে তিনটিই ছেলে। বড় ছেলের বয়স এখন কুড়ি বছর পূর্ণ হয়েছে। বাকী দু'জন এক-এক বছরের ছোট। বেংকপ্রয্য যখন জিজ্ঞাসা করলেন, 'সরস্বতী ভাল আছে ত?' ঐতাল বলল, 'সরস্বতী বলে দিতেই তো আমি আপনার এখানে এলাম।' বেংকপ্রয্য বললেন, 'সরস্বতীও এখানে অনেকদিন আসেনি—তা তিন-চার বছর হবে। একবার এলে ভাল হয়।' এই ভাবে গৃহকর্তা কুটুম্বের সঙ্গে ভদ্রতামূলক কথাবার্তা শুরু করে দিলেন। মিষ্টি কথায় ঐতালও পিছিয়ে পড়ে রইল না।

নৈশ ভোজনের পরে ঐতাল তার আগমনের হেতু প্রকাশ করলে গৃহকর্তা এই বলে ভূমিকা করলেন, 'ঐতাল, আমারও বয়স হয়েছে। আগের মতো আর চলা-ফেরার সামর্থ্য নেই। বড় ছেলেটার বিয়ে দেওয়ার কথা ভাবছিলাম। আমি এখন ঠিকুজী-কোষ্ঠী খুঁজতে বাইরে যেতে অপারগ। এই ভরসায় আছি যে কপালের লেখন থাকলে হবেই হবে।'

তাঁর তিন ছেলের মধ্যে বড়ো দুজনের ঠিকুজী ঐতালের সামনে এনে দিলেন। ঠিকুজী দেখে বিচার করে দীর্ঘ চিন্তার পরে ঐতাল বলল, 'প্রথমটির মধ্যম, কিন্তু

দ্বিতীয়টির উত্তম। আপনি যা বলবেন, তাই হবে।' গৃহকর্তা জানালেন যে, বড় ছেলের বিয়ে না হলে মেজোটির বিয়ে সম্পর্কে চিন্তা করা সমীচীন হবে না।

ঐতালের পক্ষে যে কোনো-একটি হলেই হল। সে বলল, 'মনে হচ্ছে কোনো একটি যোগের বলে আমাদের দুই পরিবারকে একত্র করে রাখবে।' সেই রাতেই তাঁরা দুজনে মিলে স্থির করলেন যে এই গরমেই শুভকার্য অনুষ্ঠিত হবে। পরদিন রাম ঐতাল একরকম বায়ুবেগে গৃহে পৌছাল। বাড়িতে সেদিন অভূতপূর্ব আনন্দ। সরস্বতী সুব্বিকে ডেকে বলল, 'সোনার মতো বাড়ি। এখানে থাকাও যা, ওখানে যাওয়াও তা—একই কথা। ওখানে শ্বশুরবাড়ি বলে পর ভাববার মতো কিছু নেই।' সত্যভামাও শুনে খুব খুশি হল।

ঐতাল মনে মনে বিবাহের দিন স্থির করে ভাবল যে কোনোমতেই যেন খবরটা বাইরে প্রচার না হয়, কারণ শীনময়্য ও শঙ্কর পণ্ডিত তাহলে বিয়ের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

যে রাত্রিতে ঐতাল উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, সেই রাতেই কিনা জ্বরে তার শরীর উত্তপ্ত হয়। জ্বরটাও খুব জাঁকিয়ে এসেছে। যে ঐতাল ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলতে কিংবা ক্রোশের পর ক্রোশ পথ চলতে কিছুমাত্র ক্লান্তি বা অসুবিধা বোধ করে না, সামান্য একটু গা গরম হলেই কিনা হৈ চৈ করে বলে উঠল, 'গা পুড়ে যাচ্ছে, সমস্ত গা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।' সেদিন জ্বরটার বাড়াবাড়ি হওয়াতে বাড়িময় একটা কোলাহল পড়ে গেল, সেই কোলাহলের মধ্যে ঐতালের মনে এল লচ্চর কথা। সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'ওর ছুটি শুরু হয়ে গেছে কবে। বলে এসেছি ছুটি হলেই যেন চলে আসে। ওকি আমাদের একবার দেখ.তও চায় না? হা ভগবান, আজকালকার ছেলে!' দাদার মনোভাব দেখে সরস্বতী তাড়াতাড়ি সুরোকে পড়ুমুন্নূরু পাঠিয়ে দিল লচ্চকে খবর দেবার জন্য। পরদিন রাতে লচ্চ এসে হাজির হল মুখখানা বিবর্ণ করে।

কাছে আসতে ঐতাল জিজ্ঞাসা করল, 'কদিন হল তোদের ছুটি শুরু হয়েছে?' 'এক সপ্তাহ।' 'এক সপ্তাহ হয়ে গেছে, তবু এখানে আসতে পারলিনে? এখন কেন এয়েছিস? আমি মরে গেলেই তো আসতে পারতে!' লচ্চ আজ পর্যন্ত বাবার কাছ থেকে এমন তীব্র ভর্ৎসনা শোনে নি। তার সমস্ত দর্প যেন নিভে গেল। কাঁদতে কাঁদতে এক কোণে সরে গেল কচি বাছুরটির

মতো। রাতে কিছু খেলনা। সরস্বতী ও পার্বতী দুজনে মিলে তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল।

পরদিন ঐতাল বিছানা ছেড়ে উঠল। ঐতাল ভাবছিল, 'পূব পরগণার জল খেয়েই কি জ্বরটা হল? না, রোদের মধ্যে হেঁটে হেঁটে পথে কোথাও জলটল খেয়ে জ্বর হল কে জানে?'—এইরূপ সংশয়পূর্ণ দুর্ভাবনার মধ্যে জ্বর ছেড়ে গেল। তবে দুর্বলতা কিছুটা এখনও রয়েছে। আবার ধীরে ধীরে হাঁটা-চলা শুরু করে ঐতাল, 'খোকা কোথায়?' বলে লচ্চকে ডেকে পাঠালে সে মুখ নামিয়ে বাপের সামনে এসে দাঁড়াল।

'পিতামাতার কথা সন্তানের কি ভুলে যাওয়া উচিত?' এই বলে ঐতাল তার উপদেশাবলীর দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করতেই সরস্বতী এসে বাধা দিয়ে বলল, 'ছেলেমানুষি করে যদি কয়েকটা দিন ওখানে থেকেই থাকে, তা নিয়ে এত রাগারাগি কেন? কাল রাতে তোমার গালমন্দ খেয়ে ভাত পর্যন্ত খায় নি।'

ঐতাল বলল, 'এই তোমরা সকলে 'নাই' দিয়ে দিয়েই ওকে মাথায় তুলে দিয়েছ। আমার এখন বয়স হয়েছে। কাছে এসে বসবে, আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলবে—এই বুদ্ধি যদি না আসে তবে ছেলেপিলে থেকে লাভটা কী?'

লচ্চর চোখ দিয়ে আর এক দফা অশ্রুধারা ঝরে পড়ল। পার্বতী এসে স্বামীকে নিরস্ত করে বলল, 'যাক্‌গে, কত আর বলবেন?'

পিতা-পুত্রের এ অধ্যায় শেষ হল। ঐতাল সুস্থ হয়ে তার সহকারীরূপী সুব্রায় উপাধ্যায়কে ডাকিয়ে এনে কন্যার বিবাহের আয়োজন শুরু করল। ছাপরা তৈরি করা, হাটে-বাজারে কেনা-কাটা, সোনা-গয়নার ব্যবস্থা—এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই তার। মাঝখানে সত্যভামাকে নিয়ে শ্বশুরবাড়ি ঘুরে এল। মাধপ্রয়্য যখন বললেন—'গ্রামটা তো ম্যালেরিয়া গাঁ', ঐতাল দার্শনিক ভঙ্গীতে জবাব দিল, 'কপালে যা লেখা আছে, তাই হবে।'

আসন্ন বিবাহের কাজকর্মের জন্য ঐতাল ছুটোছুটিতে ব্যস্ত থাকার সুযোগে লচ্চর সাহসটা আবার বেড়ে যায়। কিন্তু বাপের সামনে পড়ে গেলে মাথা নীচু করে এদিক-ওদিক সরে পড়ে। এক-একবার তার মনে হয়—'পডুমুন্নুরে চলে যাই।' কিন্তু ছোট বোনের বিয়েটা আসন্ন বলে যেতেও পারছে না। কি করা যায়?

একদিন ঐতাল বলল, 'লচ্চ, আয়, আমার সঙ্গে কুন্দাপুরের হাটে।

হাটটাও অমনি দেখা হয়ে যাবে। বাড়িতে ঠাকুর দেবতার মতো নাক ঢেকে বসে থাকলে কি কাজ হবে?' 'না' বলার সাহস নেই বলে লচ্চকে বাপের অনুগামী হতে হল। সারাটা পথ খালি পায়ে কড়া রোদের মধ্যে হেঁটে হেঁটে কুন্দাপুরে গিয়ে পৌঁছন গেল। তারপরে হাটের মধ্যে বোকার মতো ঘুরে ফিরে আবার বাড়ি ফিরে এল। এই হাঁটাহাঁটির ফলে পায়ের ব্যথা ভালো করতে সেঁক-প্রলেপে আরও কয়েকটা দিন কাটল। বিয়ে বাড়িতে সকলেই ব্যস্ত, একা লচ্চই চুপ করে বসে থাকে। ঐতাল যেমন বলে, 'এই ইংরেজি পড়া ছেলেগুলো যে এত বোকা ও অকর্মণ্য হয় তা আমি জানতাম না', লচ্চও তেমনি নিজে থেকে বাড়ির কাজে কর্মে সাহায্য করতে গিয়ে বুঝতে পারে—কোনো কাজই তার ঠিক হচ্ছে না, কোনো কাজই তার জানা নেই। একবার সত্যভামা বলল, 'লচ্চ, পাঁপড় বেলে দিবি? তিন চার হাজার পাঁপড় হবে, বাবা। বাড়িতে তো কেউ বসে নেই।' মায়ের কথায় লচ্চ কাজে গিয়ে বসল বটে, কিন্তু পাঁপড়ের কাই চাকী বেলুনে আটকে গিয়ে এমন হল যে অন্য লোক এসে আবার নতুন করে বেলতে শুরু করে দিল।

লচ্চর তখন মনে হচ্ছিল যে সে তক্ষুণি একবার পেড়ুমুন্নুরুতে গিয়ে পড়তে পারলে ভাল হত। বাড়িতে বসে সে আর সময় কাটাতে পারে না। যখন ছোট ছিল, সে ও শীনময়্যের ছেলে ওরট মিলে হোন্নে গাছের বাগানে কত খেলা করেছে। এখনও যে সময়টা ভালো লাগে না, তখন সে একা একা বাগানে গিয়ে বসে থাকে। সেখানে ভালো না লাগলে যায় সমুদ্রতীরে। নানা রঙের ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে সেখানে খেলা করে। সে খেলায় ক্লান্তি এলে বালির মধ্যে গর্ত খোঁড়ে। তাও যদি ভাল না লাগে, পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে সমুদ্রের ঢেউ গুণতে থাকে।

কিন্তু এক সময়ে তাকে ঘরে ফিরতেই হয়। বাড়ির সকলেই চাকর বাকরের মতো খাটছে দেখে তার ঘৃণা জন্মে। মনে মনে ভাবে—'বাবা পয়সা বাঁচাবার জন্য ইচ্ছা করেই কুলি সাজে।' সেদিন কুন্দাপুরের হাট থেকে ফেরার সময়ে রাম ঐতাল এক মাথা-বোঝা লঙ্কা নিয়ে এসেছে, আর সে তার পিছনে পিছনে নির্বোধের মতো হেঁটে মরেছে—এই কথা মনে পড়া মাত্র লচ্চর মধ্যে একটা ঘৃণার ভাব উৎপন্ন হয়। ভাবে—'বাবার কাছে কি গাড়ি ভাড়া দেওয়ার দু' আনা পয়সা না থেকে পারে?'

এই ভাবে একটার পর একটা চিন্তা তার মনের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে আর সে হাতে একটা লাঠি নিয়ে মাটির উপর হিজিবিজি দাগ টেনে চলে। সমুদ্রের এক একটা ঢেউ এসে তার সেই অপরিসীম এক ঘেয়েমির অর্থহীন রেখাগুলিকে ধুয়ে মুছে দিয়ে গেলে আবার একবার সেই কাজেই লেগে যায় সে। অবশেষে ঘিরে আসা অন্ধকারে বালির রেখাগুলি অদৃশ্য হলে লচ্চর চমক ভাঙে—'তাই তো! সূর্য ডুবে গেছে? যাই তবে জেলখানায়'—এই বলে যে গৃহাভিমুখে রওনা হয়। গৃহের সকলেই যখন কামনা করে লচ্চর কাছ থেকে একটু প্রীতি, দুটি মিষ্টি কথা, তখন কিন্তু তাদের সকলের সম্পর্কেই লচ্চর মনে যে ভাবটি বদ্ধমূল হতে থাকে তার নাম বিদ্বেষ।

বারো

সুব্বির বিবাহের আর বেশি দেরি নেই। বিবাহের সপ্তাহ খানেক আগে মাধপ্পয়্য সস্ত্রীক জামাইবাড়িতে এসে উপস্থিত হন। তাঁর নাতনীর জন্য কয়েক খানা ঠিকুজী তিনি নিজেও দেখেছিলেন বটে, কিন্তু বর্তমান সম্বন্ধের ব্যাপারে তাঁর অখুশির কোনো কারণ নেই। খোঁজ-করে করে দেখা গেল যে তাঁদের সঙ্গে সুব্বির ভাবী শ্বশুরবাড়ির কী একটা সম্পর্ক নাকি মান্ধাতার আমলে ছিল। তিনি নিজেই দাঁড়িয়ে থেকে বিশেষ উৎসাহে জামাইবাড়ির সকল ক্রিয়াকর্ম সম্পন্ন করাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। তাতে ঐতালের বোঝা হাল্কা হলেও তার সহকারী সুব্রায় উপাধ্যায় তেমন খুশি হল না। যাইহোক, চারদিন ব্যাপী বিবাহের উৎসব বেশ সমারোহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হল। ঐতাল পরিবারে বিশেষ খুশির কারণ এই যে যে-পরিবারে সরস্বতীর বিয়ে হয়েছিল সুব্বিও সেইখানে গিয়ে পড়বে।

এই বিয়ের দিনগুলিতে লচ্চর বিশেষ পাত্তা পাওয়া গেল না। তার বাবা ও দাদু দুজনেই সমাগত অতিথিদের কাছে এই বলে খুব গৌরব বোধ করছিলেন—'লচ্চ এখন ইংরেজি পড়ে। ভগবান যদি দয়া করেন, তবে বি. এ. পাশের পরে হয় ওকালতি অথবা তহশীলদারী করবে।' কিন্তু লচ্চকে ডাকাডাকি করলেও সে ধারে কাছেও ঘেঁসে না। এলেও মৌনদুর্গার অবতার হয়ে থাকে। অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে ঐতাল বলল, 'যাঁরা এসেছেন তাঁদের কাছে বসে একটু 'এস্‌-কেস্‌' না করলে তবে আর ইংরেজি শেখা কেন?' কিন্তু পিতৃদেবের এই কথার পরে পুত্র বাড়ি থেকে উধাও হয়ে ঘুরতে লাগল। বাড়ির পশ্চাৎ ভাগে হোন্নে গাছের উপরে তার আস্তানা। না হলে সমুদ্র তীরে। বিয়ে বাড়িতে দু'একটি কাজ থাকেই। ঘরে উপযুক্ত ছেলে থাকতে সেই সমস্ত কাজ অন্য বাড়ির ছেলেপিলেকে ধরে করাতে ঐতাল খুব বিব্রত বোধ করল। মনে মনে বলল 'এ কী রকম ইংরেজি শিক্ষা বাবা। বাড়িতে থেকে অতিথিকে এক ঘটি জল এনে দিতেও পারে না? এটা কার বাড়ি?' একবার লচ্চকে চোখের সামনে পেয়ে ঐতাল যখন তাকে পান ও পানীয় জল আনতে বলল, সে চুন-সুপারি শূন্য শুধু পান এবং গুড় ছাড়া কেবল

এক গেলাস জল এনে অতিথির আসনে রাখল। ঐতাল বুঝল—এই সব ইংরেজি-পড়া ছেলেপিলে গৃহকর্মের অনুপযুক্ত।

বিবাহ শেষ হল। সমাগত আত্মীয়স্বজন যে যার বাড়িতে চলে গেল এবং বাপের পীড়াপীড়িতে লচ্চকে শেষ পর্যন্ত বরযাত্রী দলের সঙ্গে সুব্বির শ্বশুরবাড়ি যেতে হল। সেখানে গিয়েও সে কারও সঙ্গে মেলামেশা করল না—না ছেলেপিলেদের সঙ্গে, না বড়দের সঙ্গে। লচ্চ ফিরে এলে বাড়ির ছাপরা খুলে অন্যান্য জিনিসপত্র সরানো হল। ঐতাল একসময়ে তার শ্বশুরমশাইকে বলল, 'আমি কিন্তু লচ্চকে নিয়ে খুব চিন্তায় পড়েছি।'

'ওর বিষয়ে তোমার কী চিন্তা ? ওর শরীর কি ভালো নেই ?'

'না সে সব বিষয়ে খুব ভাল। ভালো রান্না করে দিলে বেশ ভাল করেই ভোজন করে। কিন্তু ও যে এমন নির্বোধ হবে আমি ভাবতে পারি নি। কোনো একটা কাজ ওকে দিয়ে হবার নয়। বলে দিলে ওর মাথায় ঢোকেও না এরকম ছেলেকে ইংরেজি পড়িয়ে কী হবে ?'

'তুমি ওকে এখানে যেমন দেখছ, তাতেই এই সিদ্ধান্ত করেছ, তাই নয় ? তোমার শাশুড়ীকে জিজ্ঞেস করো—সে বলবে কথাবার্তায় লচ্চ খুব চৌচাপট। সব ব্যাপারে চালাক-চতুর। কেন জানি না এখানে এসে কুঁকড়ে যায়, গোম্‌রামুখো হয়ে থাকে।'

ইতিমধ্যে সুব্রায় উপাধ্যায় হাতে একটা পুরোনো কাগজপত্রের বাণ্ডিল নিয়ে উপস্থিত। 'কী বল ঐতাল, মেয়ের বিয়েটা বেশ ভালো ভাবেই হয়ে গেল। সেদিন শীনময়্যের বাড়ি থেকে বিয়ের বরযাত্রী হয়ে না গেলে গ্রামের লোক এখানেই দ্বিগুণ হত। নচ্ছারটা ইচ্ছে করেই একইদিনে ওর ছেলের বিয়ের তারিখ রেখেছিল।'

'ওর কথা চুলোয় যাক। তা না হলে, আমাদের সুব্বির বিয়ের দিনেই ও কিনা ওর ছেলের বিয়ে ঠিক করল—বিয়ের এত সব লগ্ন থাকতে ? বাসুদেব বাবুর ঘর থেকে মেয়ে আনছি বলে একটা নেশা ঢুকেছিল ওর মাথায়। এদের জন্যই তো আমাদের বাড়িতে এমন কিছু লোক আসতে পারেনি। প্রতিদিনই কি আমাদের শত শত পাতা অন্ন নষ্ট হয়নি ? যাক্ কৃষকদের কপাল ভাল। চারদিন অন্তত ওরা পেটভরে ভাল খেতে পেল।'

'সে কথা যাক। আপনার লচ্চকে দেখছিনা ?'

'লচ্চ? কোথায় কোন্ হোন্নে গাছে আস্তানা করে থাকবে। ওর কথাই তো আমার শ্বশুরমশাইর সঙ্গে বসে বলাবলি করছিলাম। ও যে একটা অপদার্থ হবে একথা আমি ভাবতেই পারি নি।'

'কে? লচ্চ অপদার্থ? বিলক্ষণ!'

মাধপ্পয়্য খানিকটা ভরসা পেয়ে মুখের চর্বিত পান উঠোনের ওপাশে গিয়ে ফেলে দিয়ে এসে বললেন, 'সুব্রায়মশাই, লচ্চ এখানে এসে কেমন ঠাণ্ডা মেরে যায় দেখে জামাই দুঃখ করছিল।'

'ওটা অমনিই। দু'দিন পরেই কেটে যাবে। আমি আজ লচ্চকে খুঁজতে এলাম কেন জানেন? এর জন্য—' এই পর্যন্ত বলে বগলস্থ কাগজের বাণ্ডিলটা তাদের সামনে রেখে, সেই পুরোনো মলিন কাগজে লেগে থাকা ধুলো বালি ঝেড়ে পুনরায় বলল—'ওকে দিয়ে এই রেকর্ড কখানা পড়িয়ে নেব, তাই আনলাম।'

ঐতাল বলল, 'এখন ওই কাজটা বাকী আছে? রেকর্ড পড়া? রেকর্ডের ইংরেজি কোন্ রাজার আমলের ইংরেজি তার কি ঠিক আছে। এই 'কনে-বউ' পড়বে রেকর্ড? হুঁ!'

মাধপ্পয়্য বললেন—'উপাধ্যায় মশাই, কী রেকর্ড ওটা?'

'মানে দেখুন না। আগের একটা রেকর্ডে আমাদের বাড়ির পূবদিকের দুটো নীচু জমি গৃহদেবতার নামে দেবত্র করে রাখা হয়েছিল বলে রয়েছে। মানে দেবোত্তর জমির উপযুক্ত দাখিলা নেই। এখন শীনময়্য এই জমির দখলীস্বত্ব নিতে চায়। সেদিন আপনার নাতিকে আমি কিছু রেকর্ড দেখালাম। ভালভাবে পড়ে সবটার অর্থ বলে দিল। এইটুকু নিয়ে এসেছি যদি এতে নতুন কিছু দরকারী কথা পাওয়া যায়।'

'লচ্চ পড়ে বলতে পারল? দেখুন উপাধ্যায় মশাই, ও পড়ছে এখন থার্ড ফর্ম-এ, ওর পক্ষে এটা যথেষ্ট। আমাদের দাসপ্প্য মাস্টারও তো ইংরেজিতে কিছু কম নন। কিন্তু রেকর্ড-টেকর্ড তিনি পড়ে বলতে পারেন না।'

ঐতাল সুব্রায়ের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারল না। বলল, 'বেশ যাও, তোমার উকিলবাবুকে খোঁজ করো গিয়ে। আমাদের সুব্রো বলে ও দিন-রাত বসে থাকে হোন্নে গাছের বাগানে, নয়তো সমুদ্রের ধারে। এই গরমের দিনে চন্‌চনে রোদ বেশ ঠাণ্ডাই হবে। এখনও ওখানেই কোথাও বসে আছে। বাড়িতে তো জায়গা নেই।'

উপাধ্যায় বলল, 'তাহলে দেখি গিয়ে সমুদ্রের ধারে। আমি বলি কি ঐতাল, তোমার লচ্চ ওকালতিতেই ভাল করবে। প্রথম তার সামর্থ্য দেখে আমার মনে হয়—আমার ছেলেটাকে পেটের দায়ে রান্নার কাজে না লাগিয়ে যদি ইংরেজি শেখাতে পাঠাতাম ভাল হত। কিন্তু তখন টাকা পয়সার সুবিধে ছিল না। কী করা?' এই বলে সে তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমুদ্রের দিকে চলে গেল।

এদিকে রাম ঐতাল অনেকক্ষণ যাবত ছেলের বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকল। 'শীনময়্যের ছেলেরা হোটেলে কাজ করলেও টাকা পয়সা রোজগার করে বাপের মর্যাদা বাড়িয়েছে। লচ্চ কী করবে কে জানে?' বাপ এইরূপ দুঃখ করতে থাকলে ছেলের দাদু বললেন, 'আচ্ছা, ওর বয়সটাই বা কী! বাড়িতে কিছু একটা হলেই তুমি ওকে বকাবকি করতে থাকবে তাইতেই ও ভয় পেয়ে যায়।'

ঘণ্টা খানেক পরে উপাধ্যায় ফিরে এল। উঠোনের দরজা পার হওয়ার আগেই বলল, 'ঐতাল! কী বলেছিলাম আমি? তোর ছেলে সামান্য নয় বাপু। আমাদের কুন্দাপুরের উকিলদের চেয়ে এক হাত উপরে।' এই বলতে বলতে ভিতরে প্রবেশ করল। উপাধ্যায়ের খুশি আর ধরে না। লচ্চ যে পড়ে অর্থ উদ্ধার করতে পেরেছে তার চেয়েও তার দশগুণ আনন্দ এই কারণে যে তার জমির বিষয়ে সে একটা নতুন সূত্রের হদিশ পেয়েছে। 'দেখুন মাধপ্পয়্য, এই যে রায়ের নকল না, এটা ময়লা পুরোনো হয়েছে বটে, কিন্তু রায়টা নাকি আমার স্বপক্ষে। পারম্পল্লীর বাসুদেববাবু এবং আমার বাবার মধ্যে কবে একটা মামলা হয়েছিল মংগলুর আদালতে, এটা নাকি তারই রায়। তাতে নাকি এই কথা বলেছে যে আমাদের খালের নিকটবর্তী 'ফীল্ড্' দেবতায় বর্তালো। আপনাদের লচ্চ বলছে, 'ফীল্ড্' মানে জমি! আমি কালই কুন্দাপুরে গিয়ে এটা উকিলকে দেখিয়ে শীনের নামে একটা 'রিজিস্ত্রী নোটিস' বের করব।'

মাধপ্পয়্য ওটা তুলে নিল। রাম ঐতালও কাছে এগিয়ে এল। কিন্তু আদালতী রায়ের ওই মলিন কাগজগুলি তার কাছে অবোধ্য। উপাধ্যায় কাগজগুলি দেখাতে দেখাতে বলল, 'মাধপ্পয়্য, আপনার নাতির মাথাটা খুব পরিষ্কার।' এই বলে সে কাগজপত্র বগলদাবা করে প্রস্থান করল।

রাম ঐতালের পক্ষে উপাধ্যায়ের এই সমস্ত কথা বিশ্বাস করা কষ্টকর। 'ছেলের কেরামতিটা যাচাই করা দরকার'—বলে সে মনস্থির করল।

আহারান্তে লচ্চ সবেমাত্র শুয়েছে, এমন সময়ে ঐতাল হাঁক দেয়, 'লচ্চ, এখানে আয় ত।' লচ্চও নিদ্রার ভাণ করে। অবশেষে দাদুকে উঠে গিয়ে নাতিকে তুলে আনতে হয়। যে সমস্ত রেকর্ডের বিষয় ঐতালের জানা আছে, এরকম দু'একখানা কোর্ট রেকর্ড লচ্চর সামনে রেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কী আছে এতে, ছ্যাখ তো। এটা লগয়্য শেঠের মকদ্দমায় পাওয়া ডিক্রির নকল কি না?' লচ্চ 'গুস্ গুস্' করে ইংরেজি আউড়ে কাগজগুলি উল্‌টে পাল্‌টে আন্দাজের উপর তার সারাংশ পড়ে শোনাল। ঐতাল এতেই খুশি। 'হে ঠাকুর যথেষ্ট। অন্তত এইটুকু যোগ্যতা যে হয়েছে, তাই যথেষ্ট! যাক, তোমাকে আর বাড়ির চাষবাস দেখতে হবে না, এখন ইংরেজি বিদ্যা দিয়ে খেয়ে থাকতে পারলেই হল।' এই বলে ঐতাল ছেলের পিঠে হাত বুলিয়ে দেয়। দাদু বলেন, 'ছেলেপিলে এমনি হওয়া দরকার—এমনি চালাক চতুর। ওর বয়সটা কী? মাত্র পনেরো বছর।' এই বলে লচ্চকে ছেড়ে দিলেন।

লচ্চ গিয়ে শুয়ে পড়বার পরে শ্বশুর-জামাইয়ের মধ্যে তার বিষয়েই আলাপ-আলোচনা চলছে। লচ্চ কান পেতে গুরুজনদের কথাবার্তা শুনছে। ঐতাল বলল, 'লচ্চর হাইস্কুলে পড়াটা তাহলে কুন্দাপুরেই হোক। ওখানকার জলবায়ু ভাল। তাছাড়া আমিও মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতে পারব। উডুপি থেকে কুন্দাপুরে নাকি ঝট্‌কাগাড়ি শুরু হবে শুনেছি।' মাধপ্পয়্য বললেন, 'ছোট ছেলেপিলেকে একা একা দূরে পাঠিয়ে দেওয়া ঠিক নয়।' ঐতাল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'যাই হোক, ইস্কুল আরম্ভ তো সেই জ্যৈষ্ঠ মাসে না? এখনো পনেরো দিন বাকী। দেখা যাক।'

পরদিন মাধপ্পয়্য তাঁর গ্রামে প্রস্থান করেন। রওনা হওয়ার আগে লচ্চকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেবার কথা বলতে, সত্যভামা বলল, 'বাবা ও এখন দিনকতক এখানেই থাক।'

কুন্দাপুরে যাওয়ার আগেই উপাধ্যায় মংগলুর আদালতের রায়ের কথা প্রচার করে বলে বেড়াল, 'ঐতালের ছেলে লচ্চরের কাছে ইংরেজি যেন জলের মতো সহজ।' ফল হল এই যে যাদের মাঝে মধ্যেই কোর্টে যেতে হয় মামলা-মকর্দমার কাজে, তারা একে একে ঐতালের গৃহাভিমুখে ধাবিত হতে থাকল। 'আপনার লচ্চ কোথায় ঐতাল? এই একখানা দলিল পড়ে দিলে বড় ভাল হত'—এই বলে কাগজ হাতে অনেকে এসে উপস্থিত হয়। ঐতালের গর্বের

সীমা পরিসীমা নেই। এমন কি শীনময়্য পর্যন্ত নিজের একটি কাজ অন্য লোকের মারফত লচ্চকে দিয়ে করিয়ে নিল। সে নিজে ঐতালের বাড়িতে আসতে লজ্জা বোধ করে বলে পরোক্ষ উপায়ে কাজ হাসিল করেছে। কিন্তু সব কাগজ-পত্র অন্য লোকের হাতে ছেড়ে দেওয়া চলে না। একখানা জরুরী ও গোপনীয় দলিল নিজেই লচ্চকে দেখাবে বলে শীন খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এবং শেষ পর্যন্ত একটা যুক্তিও ঠাওরায়।

একদিন হোম্নে বাগানে শীনময়্য লচ্চকে পাকড়াও করে—'কী ব্যাপার পড়ুমুন্নূরুর লোক যে আজকাল আমাদের চিনতেই পারে না, অ্যাঁ। এসো, চলো আমাদের বাড়ি। আমার ছেলেরা সকলেই বেংগলুরে। ওরা যে ওখানে চলে গেছে তা তো তুমি জানোই। সম্প্রতি ছোটটাকেও—ওই চন্দ্রকেও—পাঠিয়ে দিয়েছি। দেখো, তোমার বোনের বিয়েতে তোমাদের বাড়িতে যাওয়া সম্ভব হল না। তখন তো আমার বাড়িতেও ছেলের বিয়ে একই লগ্নে। কী করব? আটকে গেলাম।' এই বলে খুব খোশামোদ করে লচ্চকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেল। বেংগলুরে তৈরি সুস্বাদু খাবার লচ্চর সামনে এসে পৌঁছতে খুব দেরি হল না। খেতেও বেশ তৃপ্তিকর। এই অবসরে শীনময়্যর দলিলখানি পড়িয়ে নেবার অভীষ্টও সিদ্ধ হল। অতঃপর আরও দু'তিনবার শীনময়্যর বাড়িতে লচ্চর যাতায়াতের কথা শুনে ঐতাল একদিন পুত্রকে বলল—'লচ্চ, মিছিমিছি যার-তার বাড়িতে যখন-তখন যেতে নেই। ওই শীনময়্য আমাদের বাড়ির কাউকে দেখতে পারে না।' পিতার হুঁসিয়ারী সত্ত্বেও লচ্চ সেখানকার আদর-সমাদরের কথা ভুলতে পারল না।

ইস্কুল আরম্ভ হওয়ার এক সপ্তাহ আগে দাদুর বাড়ি থেকে লচ্চর তলব হল। পুনরায় বাড়ির সকলে একটা পরামর্শ সভা বসাল। ঐতাল বিশেষ চিন্তামগ্ন। দাদুর বাড়িতে থাকলে লচ্চ ক্রমশই তাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাবে। কিন্তু ইংরেজি পড়ার খরচও উত্তরোত্তর বেড়ে যাচ্ছে। যদি উডুপি ইস্কুলে দেওয়া যায় তবে কিছুটা দায়িত্ব শ্বশুরমশাই বহন করবেন বলে তার মনে হল। 'তবু আর একবার বাড়ির লোকের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি'—এই ভেবে সে স্ত্রীকে বলল, 'সত্য, কী করি বলো দেখি? তোমার বাবা তো বলে পাঠিয়েছেন, 'লচ্চ উডুপিতেই ভর্তি হোক।' সত্যভামা বলল, 'আমি কী বুঝি বলো। তবে এই বাড়ি-ঘর ওর ভালো লাগে না দেখে আমার কেমন যেন…।'

সরস্বতী বলল, 'আমার যা বলবার বলছি। তোমাদের যা করবার করো। লচ্চ আর কোন মতেই উডুপিতে পড়বে না। ও যেন সব সময়েই কী-না-কী ভাবে, দেখলে মনে হয়, দাদুর বাড়িতে রাখা ঠিক হবে না। তাছাড়া, এভাবে আর কতকাল থাকবে। সবটারই একটা সীমা আছে।' ঐতাল নিরুপায় হয়ে বলল, 'তাহলে লচ্চকেই জিজ্ঞেস করো, ও কী করবে।' কুন্দাপুরের বিষয়ে লচ্চকে জিজ্ঞাসা করে যা জানা গেল তা হল এই: কুন্দাপুর থেকে উডুপির ইস্কুলে যে-সব ছাত্র আসে, তাদের কয়েকজন লচ্চর সহপাঠী। অতএব একবছর কুন্দাপুরে থাকলেও তার পক্ষে সুবিধাজনক হবে বলে মনে হয়। আবার এক সময়ে একথাও বলল যে, উডুপি হলেও তার কোনো আপত্তি নেই।

ঐতালের ঝোঁক এখন কুন্দাপুরের দিকেই বেশি। সে ভাবল, 'অতদূর হেঁটে যাওয়া লচ্চর পক্ষে কষ্টকর হবে। তবে এখন নাকি ঐ অঞ্চলে ঝটকাগাড়ি চলাচল করবে। কাজেই বাড়ি থেকে সালিগ্রাম পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে সেখান থেকে ঘোড়ার গাড়িতে করে অনায়াসে কুন্দাপুর যেতে পারে। উডুপিতে থাকলে ছেলে আমার অধিকারে থাকবে বলে মনে হয় না। কিন্তু কুন্দাপুরে ছেলের আহারের ব্যবস্থা করা যাবে কোথায়? ওখানে কোটীশ্বর ব্রাহ্মণদের হোটেল থাকলেও কোট ব্রাহ্মণদের ত কোনো হোটেল নেই।' ঠিক তার পরদিন এসে দেখা দিল উপাধ্যায়। রাম ঐতাল পরিহাস করে বলল, 'আজ কী রেকর্ড এনেছ উপাধ্যায়? মোহানা দিয়ে যত নোনা জল বয়ে যায় সে সমস্তর উপরে তোমার অধিকার নন্দ রায়ের আমলের রায়ে লেখা আছে কিনা তাই বুঝি দেখাতে চাও?'

উপাধ্যায় বলল, 'কী বলছেন, আমি দলিলের কাগজপত্তর নিয়ে মাতামাতি করি? যাই হোক, শীনময্যর নামে যে একখানি রিজিস্ট্রী নোটিস বের করে এলাম সে তো আপনার লচ্চরই অনুগ্রহে। আর একটা পয়েন্ট জানা আবশ্যক বলে আপনার কাছে এলাম। আমার ছেলে কিট্টু এখন কুন্দাপুরের তশীলদারের বাড়িতে পাকের ঠাকুর। তশীলদার সাহেব এখন নাকি কার্কডে বদলী হবে। ও রকম স্থানে আমার ছেলেকে পাঠাবার ইচ্ছা নেই; তাছাড়া দু'একজন আমাকে বলল কি জানেন, কিট্টু যখন রান্না ভালই জানে, তখন একটা ছোট-মোট হোটেল দিয়ে বসুক না। আজকাল কুন্দাপুরে কোট ব্রাহ্মণদের থাকবার জন্য একটি হোটেলও নেই। ওরকম একটা হোটেল থাকলে কি আমরা

কোটীশ্বর বামুনদের হোটেলে যাই? মামলা-মকর্দমার জন্য আমাকেও যাতায়াত করতে হয়। ছেলেরও ধরুন এখন বয়স হয়েছে। একটা হোটেল দিলে কেমন হয়?'

'ভালই ত। রান্নাটা যখন আসে, তখন তাই করুক। আমাদের অঞ্চল থেকে যারা কুন্দাপুরে যাই, সন্ধ্যা পর্যন্ত উপোস করে থেকে তারা বাড়ি ফিরে আসি। কাজেই কুন্দাপুরে কোট ব্রাহ্মণদের জন্য একটা আহারের জায়গা হলে ভালই হয়। কিন্তু ছ'পয়সার বেশি যেন রেট্ না হয়। তাহলে আর কেউ খেতে আসবে না।'

'কেউ না এলেও ইস্কুলের ছাত্র পাওয়া যাবে। এক-একমণ চাল, তার উপর আট আনা পয়সা মাসে মাসে এলেই যথেষ্ট।' ঐতাল সায় দিয়ে বলল—'করো দেখি। ভগবানের দয়া হলে আমাদের লচ্চকেও কুন্দাপুরে রাখব ভেবেছি।'

জ্যৈষ্ঠ মাসে বর্ষা শুরু হয়ে গেল। হাই ইস্কুল খুলতে আর বেশি দেরি নেই এবং লচ্চর ভবিষ্যৎ লেখাপড়ার বিষয়ে পাকাপাকি ভাবে একটা কিছু স্থির করে ফেলা অত্যাবশ্যক হয়ে উঠল বলে ঐতাল একদিন পুত্রকে নিয়ে পড়ুমুনুরু রওনা হল। সেখানে গিয়ে যা শুনল তাতে ঐতাল এক রকম বজ্রাহতের মতো বিমূঢ় হয়ে গেল—লচ্চ এবছর ফেল। লচ্চর নিরাশাও অবশ্য পিতার কষ্টের চেয়ে কম হল না। বৃদ্ধ মাধপ্পয্য আশ্বাস দিয়ে বললেন—'ঐতাল, ফেল অনেকেই হয়। ইংরেজি তো আর পাকা কলা নয় যে ছুলে গিলে ফেললেই হল। ফেল হয়েছে বলে ওর পড়া বন্ধ করা চলবে না। যেটা ধরেছে সেটা শেষ করুক, ম্যাট্রিকের গণ্ডীটা অন্তত পার হোক।' বৃদ্ধের এই পরামর্শে রাম ঐতাল সম্মত হয়ে বলল—'কিন্তু উডুপিতে ওর সেয়ানা বুদ্ধি এদিক ওদিক বাইন-চালি করবে। তার চেয়ে কুন্দাপুরই ভাল। ছোট জায়গা, ঘুরে বেড়িয়ে আড্ডা মেরে সময় কাটাবার কিছু নেই।' লচ্চও দাদুকে জানিয়ে দিল যে সে উডুপিতে আর ওই ইস্কুলে পড়বেই না। ফেল হয়ে পুনরায় সেই ক্লাসেই ছোটদের সঙ্গে বসতে তার অভিমানে বাজল। দাদু মোট কথা বলে দিলেন—'কুন্দাপুর হয় তো কুন্দাপুরই ঠিক। ওখানেই পড়ুক। মোট কথা লেখাপড়া ছাড়া ঠিক হবে না। ভবিষ্যতে বিদ্যার ফল ভাল হবেই হবে।'

লচ্চ মহাশয় এবারে আর একটি স্থান পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুত হল। এক

সপ্তাহ হল কুন্দাপুরের ইস্কুল খুলে গেছে। পিতা পুত্র দুজনেই বৃষ্টির মধ্যে তালপাতার ছাতি মাথায় দিয়ে কুন্দাপুরে হাজির হলে সেখানকার ইস্কুলে লচ্চকে ভর্তি করে দিতে কিছু অসুবিধা হল না। কিন্তু উপাধ্যায় পরিকল্পিত কোট ব্রাহ্মণদের হোটলে এখনও শুরু হয় নি। অগত্যা ঐত্তাল অত্যন্ত অনিচ্ছুক মনে পুত্রকে কোটীশ্বর সম্প্রদায়ের নারায়ণ গোটের হোটেলে রাখার ব্যবস্থা করে দিল। লচ্চ বেশ পরিহাসের ভঙ্গীতে বলল—'কোট নাইবা হল গোট তো পাওয়া গেল।'

বৎসরের প্রারম্ভে লচ্চ স্থির করল যেমন করে হোক গত বছর ফেল হওয়ার পরাজয়কে মুছে ফেলতে হবে।

নতুন জায়গা, নতুন বন্ধু বান্ধব, নতুন পরিবেশ। নারায়ণ গোটের হোটেলে আরও পাঁচ-ছ জন ছাত্র এসে যোগ দিয়েছে। তাদের মধ্যে লচ্চই বয়সে ছোট। তার এখন ষোল বছর। বাকীদের বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে। তাদের মধ্যে দুজন আবার পিতৃত্বও অর্জন করেছেন। লচ্চর এক সহপাঠী বেশ লম্বা চওড়া ভারিক্কি চেহারার লোক। বাড়িতে তার ছ-সাত বছরের একটি ছেলে। মোটকথা, একবছরেই একটি ক্লাসের গণ্ডি উত্তীর্ণ হতে হবে এমন মাথার দিব্যি কেউ তাদের দেয় নি। রস-চর্চায় সকলেই সমান যায়। ইস্কুলের মহা-খাটুনি শেষ হলে সন্ধ্যায় হোটেলের দোতালায় বৈঠক বসে এবং তাস পাশার আড্ডা জমে যায়। লচ্চ যদি বলে, 'আমার ভাই পড়াশুনো আছে,' বন্ধুরা উচ্চ হাস্য করে বলে, 'পড়ে উদ্ধার হবি দেখছি। জুন জুলাই মাসে বই ধরার দুরদৃষ্ট তোমার ?' ক্রমশ ওদের সঙ্গে তাস খেলা শিখে সময় কাটাবার নতুন উৎসাহে মেতে যায় লচ্চ।

হোটেলের খাওয়া মানে রোজ একই রকমের রান্নার বিরক্তিকর পুনরাবৃত্তি। আর তাতে লঙ্কা-তেঁতুল ছাড়া বিশেষ কোনো উপকরণের বালাই ছিল না। কাজেই খেতে বসা থেকে শুরু করে খাওয়া শেষ হওয়ার পরে পর্যন্ত গোট-গিন্নীর 'চমৎকার' রান্না সম্পর্কে ছেলেদের আলোচনা আর ফুরোতে চাইত না। সেই খোশগল্প শেষ হলে তাদের শয়ন পর্ব। কিন্তু লচ্চ শুয়ে পড়লেও বাকী সকলে নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের 'পারায়ণ' পালন করে।

লচ্চই হোক কিংবা তার বন্ধু জনার্দন, রাময়, নরসিংহ যেই হোক না কেন, সকলেই খোশ-গল্পের রাজা। গোট মশাইর হোটেল থেকে ইস্কুলের শিক্ষক

পর্যন্ত—সমস্ত ব্যাপারেই ঠাট্টা-বটখিরি গুলজার হয়ে উঠে। অমুক মাস্টারের ইতিবৃত্ত, তমুক মাস্টারের খবরদারী কিছু বাদ পড়ে না। এই সমস্ত বিষয় বেশ মুখরোচক হলেও লচ্চর অন্তরে একটা বড় অতৃপ্তি আহার নিয়ে। তার যে জিহ্বা দাদুর বাড়িতে নানা চর্ব চোষ্য পদার্থে অভ্যস্ত, সে এসে ঠেকল কিনা গোট মহাশয়ের অম্বলে অর্থাৎ পরিষ্কার ঘাটের জলে। খেতে বসলেই দিদিমা বলতেন—'এসো বাছা, খাও বাছা আর একটু লাগবে বাছা ?' এমন আপ্যায়নে অভ্যস্ত মানুষ কি তৃপ্তি পেতে পারে হোটেলের পরিবেশে ?

দিন পনেরো পরে শনি রবিবারের সঙ্গে আরও দু এক দিনের ছুটি নিয়ে লচ্চ এসে দাদুর বাড়িতে উপস্থিত। হোটেলে খাওয়ার নানা অসুবিধার কথা শুনে স্নেহময়ী দিদিমা নাতির সঙ্গে সাজিয়ে দেয় ঘি, পাঁপড় ইত্যাদি বিশেষ ভোজ্য দ্রব্য। কিন্তু হোটেলে সেগুলি খাবার উপায় কী ? সকলের সঙ্গে ভাগ করে খেতে গেলে তো দু'দিনেই খতম। আবার একা-একা যে খাবে তারও উপায় নেই। লচ্চ সেদিন ঘিয়ের বয়েমটা পাশে রেখে খেতে বসেছে। পাঁপড়গুলি সব আগে ভাগেই বন্ধুদের মধ্যে বিলি-বাঁটোয়ারা করতে গিয়ে নিঃশেষিত। লচ্চর বন্ধুদের মধ্যে তার প্রায় সমবয়সী বলতে নরসিংহ। ছোট কাঁচা লঙ্কার মতো ভারি তুখোড় ছোকরা। বয়েম থেকে লচ্চর ভাতের পাতে ঘি পড়তে-না-পড়তেই নরসিংহ বলে উঠল, 'কে রে, বাবা, এমন দুর্গন্ধ চর্বি খায় ?' এই বলে নাসিকা কুঞ্চন করতে লচ্চ জবাব দিল, 'চর্বি না খেয়ে ঘি, দুর্গন্ধ না সুগন্ধ সেটা খেয়ে দেখো' এই বলে ওর পাতেও খানিকটা ঢেলে দেয়। নরসিংহের পথ ধরে বাকী সকলেও লচ্চকে ভয় দেখিয়ে, উত্যক্ত করে নয়ত ভুলিয়ে-ভালিয়ে ঘিটুকু নিঃশেষ করে ফেলে। এই ভাবে পনেরো দিন পর পর কোডি গ্রাম থেকে অথবা পড়ুমুনূরু থেকে লচ্চর যে খাবার-দাবার আসে, বন্ধুদের হাতে তা সাবাড় হতে দেরি হয় না। লচ্চই বা কী করে ? তার খাওয়ার আকাঙ্ক্ষা মরেও মরে না।

বাড়ি থেকে আনা অষ্টমীর 'চক্কুলি' ও নাড়ুগুলিকে সে যে বাক্সে লুকিয়ে চুরিয়ে রাখবে তাও কঠিন হয়ে উঠল। কেউ যখন হোটেলে থাকে না এমন সুযোগ খুঁজে যে একা একা খাবে তারও উপায় রইল না। অথচ লচ্চর মুখের লোভাভিও কিছুতেই যায় না। রাতে শুতে গিয়েও চাদরে মুখ ঢেকে ঠোঁট নাড়াতে না পারলে তার তৃপ্তি নেই। তিন চার মাসের মধ্যে হোটেলে বসে-

কিছু খাওয়া লচ্চর পক্ষে অসাধ্য হল। বাক্সজাত খাদ্য বস্তুগুলি দিনে দিনে উধাও হতে থাকল। এই সমস্ত উপদ্রব সইতে না পেরে লচ্চ অবশেষে ঠিক করে ফেলল—গোট মহাশয়ের হোটেল না ছাড়লে আর পরিত্রাণ নেই।

ইতিমধ্যে ভাগ্যক্রমে উপাধ্যায় মহাশয়ের পরিকল্পিত হোটেল খুলে গেল। তার ছেলে কিট্টুই হোটেলের সর্বময় কর্তা। হোটেল বলতে একটা ছোট কুঁড়ে ঘর, একটা রান্নাঘর, একটি কুঠুরী, এক টুকরো বারান্দা—কুল্যে এই হল সেখানকার পরিসর। ওইটুকু জায়গার মধ্যেই লচ্চ গিয়ে আস্তানা গাড়ল। কিট্টুর হোটেলে অন্ন-ব্যঞ্জনের সংস্থান অতি সামান্য—শশার বীচির অম্বল, কাঁঠালের আঁটির ডালনা, ভূঁইকোড়ের মূলের সাম্বার্ (টক্ ডাল)। তবু দু'এক মাস যাবত লচ্চর কোনো অভিযোগ নেই, কারণ হোটেলে সে একমাত্র ছাত্র বলে তার মা দিদিমার দেওয়া খাবারে ভাগ বসাবার কেউ রইল না। কিন্তু লচ্চর কপালে এই ভোজনসুখ বেশি দিন টিঁকল না। কারণ গোটের হোটেলের জন কয়েক ছাত্রবন্ধু কিট্টুর হোটেলে এসে আশ্রয় নিল। প্রথম দিনেই বলল—'ওহে লচ্চ আগের হোটেল ছেড়ে এই হোটেলে তোমার চলে আসার গোপন কারণটি আমাদের অজানা নেই।' আবার ভাগীদারদের দল হাজির বলে লচ্চ মনে মনে বিরক্তি বোধ করলেও এই ভেবে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করল যে এবারে তাস খেলাটা বেশ জমে উঠবে। পুরোনো হোটেলের মালিক গোটের কোনো কাজ না থাকলে সে এসে তাস খেলায় বসে যেত। কিন্তু এই কিট্টু উপাধ্যায়ের তাস খেলা সম্পর্কে কোনো নেশা বা জ্ঞানগম্যি তো নেই-ই, বরং সে একদিন রাম ঐতালের কাছে কিনা নালিশ করে বসল—'এখানে কি তাস খেলার জন্য ছেলে রেখেছেন?' ক্রুদ্ধ ঐতাল পুত্রকে গালমন্দ করে ওই প্রতিশ্রুতি আদায় করে ছাড়ল যে লচ্চ আর কোনদিন তাস স্পর্শও করবে না।

তাস খেলা বন্ধ হল বটে, কিন্তু আবার অন্য উপসর্গ জুটল। লচ্চ তখন বাজারের রাস্তা ঘাটে টোঁ টোঁ করে ঘোরে। শুধু কি ঘোরা ফেরা? বাজারের পথ দিয়ে যখনই সে আসে যায়, চোখে পড়ে বড় বড় ছেলেরা জলযোগের জন্য কোঙ্কণীদের রেস্তোঁরায় বসে আছে। তখনকার দিনে কফি হোটেলে খাওয়া একটা বড়লোকী ফ্যাশান্ বলে গণ্য হত। একদিন তার এক বন্ধু তাকে নিয়ে গিয়ে রেস্তোঁরার ভোজনে দীক্ষিত করে। তারপর থেকে লচ্চ রেস্তোঁরার নিয়মিত গ্রাহক। বাড়ি থেকে খাবার এনে যাকে-তাকে খাইয়ে নিজে

উপবাসী থাকার চেয়ে কঙ্কি হোটেলের খাওয়া ঢের ভালো। এতে কিট্টু উপাধ্যায়ের কোনো ক্ষতি নেই। কারণ তার প্রাপ্য টাকা থেকে সে বঞ্চিত হবে না। কিন্তু কিট্টু ঠিক সাধারণ হোটেলওয়ালাদের মতো নয়। সে এমনি ভাব দেখাত যে তার হোটেলের ছাত্ররা যেন তারই ঘরের ছেলেপিলে। বিশেষ করে ঐতাল পরিবারের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকায় কোঙ্কণী হোটেলে খাওয়ার জন্য লচ্চর বিষয়ে দ্বিতীয় অভিযোগ তার পিতার কানে গিয়ে পৌঁছাল। লচ্চ ছুটিতে বাড়ি এলে ঐতাল ক্রোধে একেবারে নরসিংহ মূর্তি ধারণ করল। সরস্বতী চোখের জল ফেলে বলল—'লচ্চ, শুনলাম তুই কোঙ্কণীদের হোটেলের খাবার খাস। তোর কি জাত-পাতের বালাই নেই?' লচ্চ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'না পিসীমা, কোঙ্কণী হোটেলের দিকে আমি ফিরেও তাকাই না।'

এই 'সন্দিগ্ধ' জীবনে লচ্চর বিরক্তি ধরে গেল। সে আবার কিট্টুর হোটেল ছাড়ার কথা ভাবছে। লচ্চ হোটেল ছেড়ে দিলে, তার পশ্চাতে বন্ধু নরসিংহ এবং পরে হয়ত আরও কেউ ছেড়ে দেবে। অর্থাৎ কিট্টুর জমে-ওঠা হোটেল আবার খালি হয়ে যাবে। এই ভয়ে সে ঐতালের কাছে নালিশ জানায়—'আমি থাকলে বলি তো—এ রকম কোরো না, ও রকম কোরো না। তাই হয়ত লচ্চ আমার হোটেলের বিরুদ্ধে আপনার কাছে বলে থাকবে।' ঐতাল বোঝে যে তার ছেলের উপর তত্ত্বাবধান করার মতো একজন কেউ অবশ্য থাকা দরকার। তাই সে লচ্চকে শাসিয়ে বলে, 'অন্য কোনো হোটেলে যাওয়ার মতলব কোরো না। যতদিন আছ কিট্টুর হোটেলেই থাকবে। জলখাবার যা দরকার বাড়ি থেকে নিয়ে যাবে।'

লচ্চ পড়ে যায় বিপাকে। ভাবে—এ আবার কোথাকার ঝামেলা বাবা? মুখের লালচ তার কিছুতেই ঘোচে না। পিতৃদেবের শাসনের পরে কোঙ্কণীদের হোটেলে সে আর যায় না বটে, কিন্তু তা বলে সেখানকার 'আস্বাদে' এবং আরও সুস্বাদু খাবার থেকে-সে বঞ্চিত থাকছে না। কিট্টুর দৃষ্টি এড়িয়ে অন্যের মারফত খাবার চলাচল করে। বাড়িতে কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে লচ্চ জবাব দেয়—'ঈশ্বরের দোহাই, আমি আজকাল কোঙ্কণী হোটেল একদম যাই না।' আক্ষরিক অর্থে কথাটা কিন্তু মিথ্যা নয়।

সে না-হয় হল। কিন্তু তার পক্ষে আর একটা সমস্যা যে মাথা তুলেছে

দাঁড়িয়েছে। কোঙ্কণী হোটেলের জন্য খরচার টাকা যোগাড় করা যায় কি ভাবে ? তা-ও আবার একার খরচ নয়। দু'তিন জন বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে ভাগ করে খেতে হয়। সেই খরচ কিভাবে চালানো যায় এই হল লচ্চর ভাবনা। আর ওদিকে তার পিতৃদেব কিট্টুর হোটেলে মাসিক খরচের টাকাটা কিট্টুর বাবার হাতে দেয়। লচ্চর বইপত্র খাতা, আলোর তেল প্রভৃতির জন্য পাই-পয়সা হিসাব করে তবে ঐতাল টাকা হাত-ছাড়া করে। লচ্চর দাদুর বাড়ি থেকে মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে। এতদিনে সে বুঝতে পারে যে কুন্দাপুরে এই ঘৃণ্য জীবনের চেয়ে দাদুর বাড়িতে থেকে উডুপিতে পড়াই ঢের ভাল ছিল।

রাম ঐতালও এতদিনে বুঝতে পারে যে হাইস্কুলে লেখাপড়া মানেই টাকার শ্রাদ্ধ! তার কাছে প্রতিটি পয়সা যেন এক-একটি টাকা। কেবল সত্যভামার ওকালতিতে লচ্চর দাবিগুলি কোনোরকমে মিটে যাচ্ছে। এ অবস্থায় বই-এর জন্য পাওয়া টাকায় বই-কেনা কুলোয় না ; ইস্কুলের মাইনে দেবার টাকা খরচ হয়ে যায় কোঙ্কণী হোটেলের খরচ মেটাতে—এইরকম একটা জটিল অবস্থার সম্মুখীন হতে হল লচ্চকে। বাড়িতে লাভ নেই বলে লচ্চ সোজা দাদুর বাড়িতে গিয়ে মাশুল আদায়ের চেষ্টা করতে লাগল। দাদু ও দিদিমা দুজনেই তাঁদের অতি আদরের নাতিকে দু'এক টাকা করে হাত-খরচ দিতে আরম্ভ করেন। ফলে, বাপের উপর লচ্চর বিদ্বেষ বেড়ে যায়। হ্যাঁ শীনময়্যর কথাই ঠিক। সে যে বলেছিল—'লচ্চ, তোর বাবার কাছে পয়সাই হল প্রাণ'—সে কথা দেখা যাচ্ছে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বাপের উপর আর কিছুমাত্র শ্রদ্ধাভক্তি নেই, যেটুকু ছিল ধুয়ে-মুছে গেছে। যাই হোক, লচ্চ খুব খুশি যে টাকার সংকট থেকে সে উত্তীর্ণ হতে পেরেছে। সে এখন বুঝতে পারল যে মিথ্যা অজুহাতই টাকা আদায়ের একমাত্র অস্ত্র। এই মহৎ সত্য উপলব্ধির পরে তার চেষ্টা হল কি করে কিট্টুর উপাধ্যায়ের খবরদারী থেকে রেহাই পাওয়া যায়।

কুন্দাপুরে ছ-সাত মাস কাটার পরে লচ্চ যখনই বাড়ি যায় তখনই সে এই বলে অনুযোগ করে, 'আমি যদি এ বছর ফেল করি, তোমরা আমাকে দোষ দিতে পারবে না। কিট্টুর হোটেলে যত বাজে লোকের ভীড়। বই ধরি তার সাধ্য কি ? ওই গোলমালে কি পড়াশুনো হয় ? পরীক্ষায় পাশ না করতে পারলে শেষে কিন্তু আমাকে দোষ দিও না।' রাম ঐতাল আবার ছেলের চিন্তায় পড়ে যায়। আর একবার সে কিট্টুর সঙ্গে দেখা করে। কিট্টুরও দোষ নেই।

হোটেল বলে অন্যলোকও খেতে আসে। কেবল দু'চারজন ছাত্র দিয়ে কি তার পোষায়? আবার যারা খেতে আসে তারা মুখ না খুলে বোবা হয়ে থাকবে একথা বললেও কি চলে? কাজেই রাম ঐতাল লচ্চকে ডেকে বলে—'তুই দু'য়েকটি ভাল ছেলে সঙ্গে নিয়ে কাছাকাছি একটা থাকার মতো ঘর খুঁজে নে। তারজন্য যদি মাসে আনা আষ্টেক ভাড়া দিতে হয়, চিন্তা নেই। এবছর যে টাকা খরচ হল, সেগুলো যেন মোহানার জলে ফেলা না যায়।' এই উপদেশ দিয়ে ঐতাল প্রস্থান করে।

লচ্চর ব্যাপারে কিট্টুর কিছুটা হার হল আর সন্দেহ নেই। কিন্তু ছোকরাটা যে তার হোটেল থেকে সরে যাবে তাতে সে খুশিই হল। লচ্চর পক্ষে লক্ষ্মীছাড়া হোটেলগুলি সবই একরকম। তবে সান্ত্বনা এই যে একটা আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করতে পারলে কারও ধার না ধেরে স্বাধীনভাবে থাকা যাবে। রেস্তোরাঁয় খানাপিনারাও কোনো বাধা থাকবে না। তাস পিটবারও কোনো অসুবিধা হবে না। কাজেই পিতৃদেবের আদেশ মতো ভাল তিনজন বন্ধু জুটিয়ে নিল—নরসিংহ, জন্ন ও শ্রীনিবাস এই তিনটি পুরোনো পাপী।

বার্ষিক পরীক্ষার আর বিলম্ব নেই। সারাটা বছর তাস-পাশায় কাটিয়ে এখন আহার-নিদ্রা ভুলে দিন রাত লচ্চ বই নিয়ে থাকে। পরীক্ষার দিনগুলিতে চোখে তার ঘুম নেই। পরীক্ষার শেষে একবার যদি সে ক্লাস টপকাতে পারে তবে কুন্দেশ্বর দেবতার দুয়ারে একজোড়া কলা-নারকেল ঘুষ দেবে বলে সে করার করে রাখল।

যে করেই হোক, জ্যৈষ্ঠ মাসে ছেলের উচ্চতর শ্রেণীতে প্রোমোশনের সংবাদ পেয়ে ঐতালের সমস্ত চিন্তা-ভাবনা দূর হল।

তেরো

লচ্চর ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিতে আর তিন বছর বাকী। বন্ধুদের সাহচর্যে, কফি-হোটেলের খানাপিনায় এবং আমোদ-প্রমোদ-কৌতুকে এই তিনটি বছর সে কিভাবে কাটাবে তা একরকম স্থির করে ফেলেছে। তবে এবারকার ছুটিতে পিতৃশাসনের ভয়ে সে গ্রামেই গেল, গেলবারের মতো অজ্ঞাতবাস করল না। লচ্চকে দেখে সরস্বতী বলে—'খোকার বোধহয় কুন্দাপুরে ভালো লাগছে না। শরীরটাও একটু ভালো হয় নি। কেবল লম্বার দিকে বেড়েছে। কিন্তু মোটা হল কৈ?' পার্বতী এই সমস্যার সমাধান করে দেয়—'আহা, শত হলে হোটেলের রান্না। ও খেয়ে কেউ কখনও মোটা হতে পারে?'

পার্বতীকে আজকাল বৃদ্ধার মতো লাগছে। নানা চিন্তা ভাবনায় চুল তার পেকে গেছে। লচ্চ বাড়িতে এলে পার্বতী আগের মতোই তাকে স্নেহমমতাভরে কাছে ডেকে কথাবার্তা বলে। কিন্তু লচ্চ কেমন যেন সকলের প্রতিই নির্বিকার। সত্যভামা দুই সন্তানের মা, কিন্তু কেউ তার কাছে থাকে না। বাড়ির গৃহস্থালি কাজকর্মেই নিজেকে সে মগ্ন রাখে। ঐতাল মহাশয়েরও বয়স হয়েছে। সরস্বতীর বয়স হলেও পার্বতীর মতো সে অথর্ব হয়ে পড়েনি। এখনও তার কর্ম তৎপরতা অটুট। ঘরে সকলেই যে যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে, তবে কনিষ্ঠ বলে সত্যভামার উপরেই গৃহকর্মের চাপটা একটু বেশি। ইতিমধ্যে সে বলতে শুরু করেছে—'আরে বাবা, কবে যে শেষ হবে এই সংসার?' ঝঞ্ঝাটময় সংসারকে মধুময় করে তুলতে পারে ছেলেপিলেরা। তারা কেউ এখন কাছে নেই। তারা ত এখন বড় হয়ে গেছে। কেবল যখন সুব্বি তার শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে আসে, সত্যভামা তখন প্রাণভরে মেয়ের ওপর তার প্রীতি-মমতা প্রদর্শন করে। তা না হলে আর পাঁচ জনের মতো সেও কোনোরকমে বেঁচে আছে মাত্র।

মে মাসের ছুটিতে লচ্চ বাড়ি থাকা কালে সরস্বতী একদিন ঐতালকে বলল, 'দাদা ছেলের বয়স তো ১৬।১৭ হয়ে গেল। এখন বিয়ে দাও না। তোমার চুল দেখতে দেখতে পেকে এল। সুব্বির বিয়েটা যেমন দিয়ে ফেলেছ, সেইমত লচ্চর বিয়েটাও দিয়ে দাও।' সরস্বতী কথাটা লচ্চর কাছেও পাড়ল।

বাহ্যত সে ঔদাসীন্যের ভান করলেও মনে মনে কিন্তু ভাবছিল তার বন্ধুদের মতো সেও কেন একজন স্বামী হবে না। কিন্তু ঐতাল সম্মত হল না। কিছুকাল হল তার মেয়ের বিয়ে হয়েছে, এখন আবার ছেলের বিয়ে? উপর্যুপরি দুটি বিয়ের জন্য নগদ টাকা খরচ করতে মন চাইল না। তাছাড়া লচ্চর ইংরেজি শিক্ষার খরচটাও একটা বোঝার মতো মনে হচ্ছে।

এইভাবে বিবাহের ব্যাপারে হতাশ লচ্চ দ্বিতীয় বর্ষের গোড়ায় কুন্দাপুর পদার্পণ করল। পিতৃদেবের চিন্তা—কুন্দাপুরে আরও তিন বছরের পড়া শেষ হলে তবে ম্যাট্রিকের গণ্ডীটা পার হওয়ার মতো হবে। আর পুত্রের চিন্তা হল—যেন-তেন-প্রকারে মজা উড়িয়ে দিন কাটাতে হবে। একথাও তার অজানা ছিল না যে, যে কোনো পথে মজা ওড়াতে হলে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তুটির নাম টাকা। প্রতি মাসে, প্রতি সপ্তাহে তার বই-এর তালিকা দীর্ঘ হয়েই চলে। আজ অমুক ফী, কাল তমুক ফী ইত্যাদি বাহানা করে বাড়ি এসে সরস্বতীর মারফত বাপকে বলে টাকা আদায় করে। ওদিকে আবার দাদুর বাড়ি থেকেও টাকা আসছে।

একদিন রাম ঐতাল শ্বশুরবাড়িতে গেলে মাধপ্পয়্য বললেন—'নাতি এসেছিল গত শনিবার। হোটেলের খাওয়া ওর একেবারেই পছন্দ নয়। শরীরটাও রোগা হয়ে গেছে। একসের ঘি-র ব্যবস্থা করে দিলুম।'

রাম ঐতাল যথাসাধ্য সংযত স্বরে বলল—'এ কেমন ইংরেজি পড়া বাবা! হোটেল-খরচ, বই-পত্র নিয়ে প্রতি মাসেই পনের বিশ টাকা করে খরচ হচ্ছে। এই বিদ্যা শেষ হতে আর কত লাগবে ভগবান জানেন। গত মাসে শুধু বই-এর জন্য নিয়ে গেছে দশটা টাকা

শ্বশুর মশাই বললেন—'তুমিও কি ওখান থেকে টাকা দিচ্ছ নাকি? বইপত্র বেতন ইত্যাদির জন্য আমিই তো এখান থেকে দিচ্ছি।' শুনে ঐতালের বুকটা ধক্ করে উঠল। সে বলল—'আপনি কেন দিচ্ছেন? গত বছর থেকে প্রদীপের তেল থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি জিনিসের জন্য আমিইতো দিয়ে আসছি।' ছেলে যে এইভাবে দুদিক থেকেই টাকা লুঠছে ঐতাল তার আভাস মাত্র পায় নি। ওদিকে দাদুর বাড়িতে বিস্ময় সৃষ্টি হল। সেখানে গিয়ে টাকা চাওয়ার সময়ে লচ্চ বলত, 'বাবার কাছে চাইলে পাই-পয়সাও দেয় না।' লচ্চ সম্পর্কে মাধপ্পয়্য খুবই বিচলিত বোধ করলেন। বললেন, 'কি কাজে ও এত টাকা নষ্ট করছে? ওখানে কোথাও কি কফির হোটেল আছে?' ঐতাল

সন্দেহ প্রকাশ করে বলল, 'একটা লোকের কফিতে আর কত টাকা লাগতে পারে ? মনে হয় দুষ্টু লোকের পাল্লায় পড়ে দলবল নিয়ে কফি-টফি খায়।'

দাদু দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'লচ্চর এসব কি দুর্বুদ্ধি হয়েছে! কি সব বখাটে ছেলেদের সংসর্গে পড়েছে বাবা! তুমি আর ওকে নগদ টাকা দিও না। আমি দাসপ্পা মাস্টারের কাছে খোঁজ নিয়ে বইপত্র বেতন ইত্যাদির জন্য যা লাগে সবই দেব। তুমি কেবল হোটেলের খরচটা দিলেই যথেষ্ট।'

ঐতাল বলল, 'হোটেলের খরচা আমি তো প্রতিমাসেই কিট্টু উপাধ্যায়ের বাবা সুব্রায় উপাধ্যায়ের হাতে দিই—আপনি দেখেছেন তাকে, সেই যে আমাদের সুব্বির বিয়ের সময়ে উপস্থিত ছিল।'

পুত্রের ব্যাপারে ঐতাল খুব চিন্তিত হয়ে পড়ল। গ্রামে ফিরে এসে সুব্রায়ের মারফৎ লচ্চকে খবর পাঠাল যে সে যেন আগামী শনিবার অবশ্য অবশ্য বাড়ি আসে। খবরটা পেয়ে লচ্চ একটু ঘাবড়ে গেল। 'শনিবার আমি কি করে যাই? আমাদের মাসিক পরীক্ষা আছে যে।' এই বলে সে চুপ করে রইল। সে মাসে কফি হোটেলে লচ্চর প্রচুর টাকা বাকী পড়েছে। টাকার ঠেকায় সোজা সে পড়ুমুন্নুরুতে গিয়ে হাজির। দিদিমাকে বলল, 'পরীক্ষার জন্য আমার টাকা লাগবে, দিদিমা।' জবাব দিলেন দাদু। দাদু এই প্রথমবার নাতির উপর রুক্ষ হয়ে বললেন, 'তুমি তোমার বাবার কাছ থেকেও টাকা নিচ্ছ, আবার এখানে এসেও মিথ্যা বলে টাকা নেবে, কেমন?' দাদুর সামনে লচ্চর মুখে আর কথা যোগাল না। তার অভিমানে অত্যন্ত আঘাত লাগায় সে উচ্চস্বরে কেঁদে উঠল। কান্না আর থামেই না। মাধপ্পয্য নাতিকে নানারূপ উপদেশ দিলে লচ্চ এই বলে জিদ ধরল, 'বেশ ত, আমার উপর তোমাদের বিশ্বাস না থাকলে আমি আর ইস্কুলে যাব না।' নাতির দুঃখে দিদিমা বললেন, 'আপনি যাই বলুন না কেন লচ্চ টাকা অপব্যয় করবার ছেলে নয়। হয়ত দুধ-দই একটু বেশি খেয়ে থাকবে। ওর বাবার কাছে বেশি টাকা চাইতে ভয় পায় বলে এখানে কিছু টাকা চেয়ে নেয়।' টাকা আদায়ের উপায়টা দিদিমাই দেখিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ আবার হেঁচকি দিয়ে কেঁদে কেঁদে লচ্চ বাপের উপর দোষারোপ করে নিজের নিরীহ ভালোমানুষির পরিচয় দিয়ে, কুন্দাপুরে ব্যয়-বাহুল্যের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে চোখের জলে দাদুর মন ভিজিয়ে দিল।

বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়েছে। লচ্চর বাড়িতে আসার আগে দেখা গেল

দোকানে, কফি-হোটেলে কুড়ি-পঁচিশ টাকার মতো বাকী। বাপের কাছ থেকে যে টাকা আসত, তা বন্ধ হয়ে গেছে। দাদুও টাকা দিচ্ছেন বেশ শক্ত হাতে। সুতরাং এই বাকী টাকাটা শোধ করার একমাত্র উপায় আগামী ক্লাসের বই কেনার টাকার মধ্যে এই খরচটাও ঢুকিয়ে দেওয়া।

এ বছর গরমে ঐতালের জীবনে ভারি জোয়ার-ভাঁটা হল। একদিকে অভাবিত লাভ, অন্যদিকে অপ্রত্যাশিত লোকসান দুই-ই একসঙ্গে এল। একটা সম্পত্তি ক্রয় নিয়ে ঐতাল বিশেষ চিন্তান্বিত। আর ঠিক এই সময়েই কিনা সরস্বতী বলল, 'দাদা, এই গরমের ছুটিতেই লচ্চর বিয়ে দিয়ে দাও।' সত্যভামাও সায় দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ ঠাকুরঝি, আপনার কথা শুনে আমার মনে হয় ছেলে যাতে বিপথে না যায় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার।' কিন্তু ঐতাল বিয়ের প্রস্তাব এই অজুহাতে স্থগিত রাখল যে উপযুক্ত ঠিকুজী কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। আসলে ঐতালের লক্ষ্য ছিল একটা খুব ভাল সম্পত্তির উপর। গ্রামের নদীর পূবদিকে কার একটা সম্পত্তি বিক্রী অথবা বন্ধকীর জন্য মালিক প্রস্তুত বলে খবর পাওয়া যায়। কথাটা শুনে ঐতাল মনে মনে হিসাব করে— 'দু হাজার টাকায় যদি দেড় 'কোডি' (৬০ মণ) শস্য বাড়িতে আসে তবে সেটা হাতছাড়া করা অনুচিত'—এইরূপ স্থির করে সে টাকার সন্ধানে লেগে যায়। সমস্ত দেনদারকে 'এখন আমার টাকা অবশ্য দরকার' এই বলে চাপ দিয়ে টাকা সংগ্রহ করে। একদিন জমিটা দেখবার জন্য দাদা ও বোন দুজনে মিলে রওনা হয়। সরস্বতী লচ্চকেও সঙ্গে নিয়ে যায়।

সেদিন রাতে বাড়ি ফিরে এসে সরস্বতী ভ্রাতৃবধূদের কাছে বলে, 'ওরকম জমি আর একটিও পাওয়া যাবে না। তাছাড়া সম্পত্তির উপর টাকা ঢাললে সে টাকা নষ্ট হয় না।' এই ধরনের যুক্তিও দেখাল। বাড়ির লোকেদের মধ্যে একটা তর্ক দেখা দিল—জমির মূল্য তিন হাজার টাকা, কিন্তু বন্ধক রেখে কর্জ দিলে দু' হাজার টাকা, এই দুয়ের মধ্যে কোন্‌টা ভাল ? অল্প টাকায় যা হয় ঐতাল সর্বদা সেই কাজের পক্ষপাতী। কিন্তু সরস্বতী বলল, 'বন্ধক টন্ধক মানে তারা আবার টাকা শোধ দিলেই ছাড়িয়ে নেবে। তখন যদি শীনময়্য মালিককে পুরো টাকা দিয়ে সম্পত্তিটা কিনে নেয় ?' এইরূপ একটা সন্দেহ উত্থাপিত হওয়ায় ঐতালকে সরস্বতীর কথাটা মেনে নিতে হল। বলল, 'বেশত, না হয় কেনাই যাবে

শীনময়্যাকে ঠাট দেখাতে গিয়ে নিজের কোন ক্ষতি না হয় এমন যে-কোনো কাজের জন্য ঐতাল প্রস্তুত। কাজেই সে তাড়াতাড়ি করে সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই সম্পত্তিটা 'রিজিষ্ট্রি' করে কিনে ফেলল। এবং অনতিকালের মধ্যেই এই খবরটা গ্রামের একটা জবর খবরে পরিণত হল। শীনময়্য চারিদিকে বলে বেড়াতে লাগল, 'অমন একটা জমি ওই বেওকুফটা মাত্র তিন হাজার টাকায় ঐতালকে দিয়ে দিল? আমি যে এখানে চার হাজার টাকা দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে আছি, আমাকে একবার জিজ্ঞেস করতে নেই?'

যে রাতে জমি কেনার সিদ্ধান্ত করা হয়, লচ্চ সেদিন ওই একই বারান্দায় শুয়েছিল। কথাবার্তা শুনে সে অবাক হয়ে গেল। বাপের সম্পর্কে লচ্চর একমাত্র ধারণা ছিল যে সে একজন 'হাড়কেপ্পন' মানুষ। কোনোদিন ভাবতেই পারেনি যে তার বাপ 'হাজার' টাকার ব্যাপারে কথা বলার ক্ষমতা রাখে। সে বসে বসে এই কথাটাই ভাবছিল, 'বাবা যে দু হাজার তিন হাজার টাকার কথা বলছে, অত টাকা কার কাছে আছে?' এমনি সময়ে একদিন ঐতাল বাড়ি এসে বলল, 'সরসোতি, সম্পত্তিটা আজ 'রিজিষ্ট্রি' হল। তিন হাজারের উপর আরও গোটা পঁচিশেক টাকা বেশি খরচ হয়ে গেছে।' এসব কথা লচ্চর পক্ষে যেন অবিশ্বাস্য। সে দাদুর বাড়িতে বড় হচ্ছে, ভাল খাওয়া-পরা কাকে বলে তা সে জানে। কিন্তু এও জানে যে হাজার-হাজার টাকা নগদ দেবার কথা উঠলে দাদু তা দিতে পারবে না। বাপের বিষয়ে লচ্চর মনে যুগপৎ দুই বিপরীত ভাবনার উদয় হয়—জুগুপ্সা ও অহঙ্কার। জুগুপ্সা এইজন্য যে এত টাকা থাকতেও এইভাবে পেট বেঁধে বেঁচে থাকার মানে কী? লচ্চ মাসে মাসে আট দশ টাকা চাইলে পিতৃদেবের চোখে অগ্নিকণা উদ্গীর্ণ হয়। আবার ভিতরে ভিতরে লচ্চর খুব আনন্দও হল এই ভেবে যে তারা তাহলে আদৌ গরীব নয়। এখন এই ঐশ্বর্যের কিছু অংশ কীভাবে তার পকেটে যেতে পারে লচ্চ তার উপায় নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করে দেয়। অতঃপর অনেক দিন যাবত লচ্চর সেই একমাত্র কাজ। বাবা যখনই বাড়ি থেকে বাইরে যায়, তখনই সে সতর্কতার সঙ্গে এদিক-ওদিক উঁকি-ঝুঁকি মারে। পিতৃদেব যে কোথায় টাকা রাখে সে ভেবে পায় না। ঘরে না আছে একটা সিন্দুক, না আছে বাক্স।

জমি কেনার সপ্তাহ খানেক পরে সন্তানসম্ভবা সুব্বিকে পিত্রালয়ে আনা হল। সুব্বির প্রতি তার বাবা মা বড়মা ও পিসীমা সকলেই যে আদর-যত্ন দেখাল তা

বলে শেষ করা যায় না। এমন মিষ্টি নেই যা তৈরি করা হয় নি। এইসব দেখে শুনে লচ্চর মনে প্রবল ঈর্ষ্যা জন্মাল। যা কিছু ভোজ্যদ্রব্য মেয়ের জন্য। ছেলেদের আর খাবারের দরকার নেই। প্রস্তুত খাদ্য সামগ্রী প্রথম সুব্বিকে দেওয়া হচ্ছে দেখে লচ্চ ভারি অস্বস্তি বোধ করে। এক এক বার তাকে পরিবেশন করতে এলে সে জ্বালাময় মন্তব্য করে, 'ওসব সুব্বিকে দাও গে। আমার আবার খাওয়া! আমার জন্য তো কিট্টুর হোটেলের শশার বীচির অম্বলই যথেষ্ট!' তখন সত্যভামাও চটে গিয়ে বলে, 'খোকা, কোত্থেকে তোর এই দুর্মতি হল?' তাতে লচ্চর ক্রোধ বাড়ল বৈ কমল না।

ঐতাল যেদিন নাতির মুখ দেখল সেদিন তার আনন্দের সীমা নেই। প্রসূতি সুব্বি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করতে বাড়ির সকলেই 'আণেগুড্ডে'র গণপতিকে ছয় ছয় বার করে বন্দনা করল। এই শুভ সংবাদ সুব্বির শ্বশুরালয় মংদর্তি গ্রামে পাঠাবার জন্য ঐতাল তার ছেলেকে ডেকে বলল, 'লচ্চ, তুই যখন জন্মেছিলি, তোর মামা আমাদের বাড়িতে এসে সেই খবরটা দিয়েছিল। এখন মংদর্তি গিয়ে তোর ভগিনীপতির কাছে সুব্বির ছেলে হওয়ার খবরটা দিয়ে আয় ত দেখি।'

লচ্চ বলল, 'মংদর্তি যাওয়ার পথ আমি চিনি না।'

বাবা বলল, 'সুরোকে সঙ্গে নিয়ে যা।'

ছেলে বলল, 'আমি অতদূর হাঁটতে পারব না।'

ঐতাল বলল, 'তুই কুন্দাপুর থেকে পড়ুমুন্নূরুতে দাদুর বাড়ি হেঁটে যাতায়াত করিস, আর এখান থেকে মংদর্তি যেতে পারবি না?'

লচ্চ বলল, 'কুন্দাপুর থেকে পড়ুমুন্নূরু পর্যন্ত চলাচলের ভালো পথ রয়েছে আর এতো পাহাড়ী রাস্তা।'

পিতাপুত্রের এই প্রথম সংঘর্ষ। সত্যভামা রেগে গিয়ে বলল, 'কেন ওকে মিছিমিছি বলছ? সুব্বির সাধের দিনে তাকে যে হিংসা করেছে সে যাবে ভগিনীপতিকে খবর দিতে।'

সরস্বতী বলল, 'না দাদা, ভালো খবর বড়দেরই গিয়ে বলা উচিত। তুমি বাড়িতেই থাকো। প্রসূতির যদি কিছু হয় তবে ওষুধ-বিষুদ দেওয়া ও ছুটোছুটি করবার লোকের দরকার হবে। আমি চট্ করে মংদর্তি ঘুরে আসি।' এই বলে সরস্বতী বেরিয়ে পড়ল।

ঐতালের জিদ চেপে গেল। বলল, 'লচ্চ, তোকে আর মংদর্তি যেতে হবে না। দাতুর বাড়িতে গিয়ে খবরটা দিয়ে আসতে পারবি? নাতনীর ছেলের মুখ দেখবে বলে তোর দিদিমা কত আশা করে আছে!' সত্যভামা বলল, 'কেন বাবার ওখানে স্থরোকে পাঠিয়ে দাও। ও তো অতিথি, ও এ বাড়ির কেউ না।'

ঐতাল বলল, 'ও যদি খবর দিতে না যায়, তবে দুপুর বেলা খাওয়া বন্ধ।' লচ্চও ক্রুদ্ধকণ্ঠে জবাব দিল, 'আমি না খেয়ে মরব না'—এই বলে সে গোঁ ধরে সেখান থেকে চলে গেল। ঐতাল একদিকে জিদ ধরে বসে আছে, 'দেখি, ও কী করে।' কিন্তু দুপুরে আহারের সময়ে লচ্চর দেখা নেই। পার্বতী বলল, 'খোকা বোধ হয় দাতুর বাড়িতে গিয়ে থাকবে।' ঐতাল জবাব দিল, 'ওকে আর পাই পয়সা দিয়েও বিশ্বাস নেই। এ বংশে ও ভুল করে জন্মেছে মনে রাখবে। আমি স্থরোকে পাঠাচ্ছি পড়ুমুন্নূরুতে খবর দিতে।'

সেদিন সন্ধ্যাকালেই স্থরো পড়ুমুন্নূরু থেকে ফিরে এসে জানাল, 'গিয়ে দেখি আমাদের ছোটবাবু (লচ্চ) সেখানে বারান্দাতে বৈসে আছেন গো। বুড়োকর্তাকে খবরটা দিনু। তায় তেনি শুধোলেন, সুব্বি মায়ের ছেলে হৈল কবে? দাদাঠাকুর, বটঠাকরুনের শরীলডা ভালো আছে বলে ঠেকল না। বুড়ো কত্তা বললেন—দিন কয়েক পরে তেনি আইসবেন।'

পুত্রের উপর ঐতালের ক্রোধের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। 'দেখলে, লচ্চটা ওখানে গিয়ে দাতু-দিদিমাকে জানায় নি যে সুব্বির ছেলে হয়েছে। দেখলে কাণ্ডটা?' ওদিকে তার শাশুড়ী ঠাকরুন অসুস্থ শুনে সেই রাতেই ঐতাল পড়ুমুন্নূরু যাবে বলে স্থির করল। কিন্তু মংদর্তি থেকে সরস্বতী বা জামাইর আসার অপেক্ষায় থেকে থেকে রাত প্রায় দ্বিপ্রহর হল। ঠিক দুপুরে রাতে জামাইকে সঙ্গে নিয়ে সরস্বতী এসে উপস্থিত। জামাইর যথোচিত আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি হল না। পরদিন সকালে ঐতাল সরস্বতীকে ডেকে বলল, 'সরসোতি, সত্য-র মা অসুস্থ, স্থরো এসে বলল। আমি একথা সত্যকে জানাই নি। একবার গিয়ে দেখে আসি কী হয়েছে, কেমন আছেন? তুই বাড়িঘরের প্রতি লক্ষ্য রাখিস।' এই বলে সরস্বতীকে হুঁসিয়ার করে দিয়ে ঐতাল পড়ুমুন্নূরু রওনা হল।

একদিকে সুলভ মূল্যে উৎকৃষ্ট সম্পত্তি লাভের উৎসাহ অন্যদিকে দৌহিত্র

লাভের আনন্দ। পড়ুমুন্নুরুতে যে দৃশ্য তার জন্য অপেক্ষা করে ছিল তাতে তার সমস্ত উৎসাহ আনন্দ নিভে গেল। শাশুড়ী কেবল অসুস্থ নন, মৃত্যুশয্যায় শায়িত। বয়স অনেক হয়েছে। জ্বরে ও বাতের যন্ত্রণার কষ্টে ভুগে ভুগে তিনি এখন মৃত্যুর অপেক্ষা করছেন। অশক্ত শরীরে তিনি মৃত্যুর কিনারে এসে দাঁড়ালেও মন কিন্তু এখনও বাঁচবার ইচ্ছাকে প্রবলভাবে আঁকড়ে আছে। জামাইকে দেখে তিনি বলে উঠলেন, 'রাম, তুমি এসেছ! আমার এই অসুখ আর ভাল হবে না, বাবা। রাম, সুব্বির ছেলেকে যদি একবার দেখতাম! তারপরে আমি মরে ছাই হলেও দুঃখ নেই'—এই বলে বৃদ্ধা খুব ব্যাকুলতা প্রকাশ করলেন।

রাম ঐতাল আশ্বাস দিয়ে বলল, 'মা, আপনার কিসের চিন্তা? কোনো ভয় নেই। সুব্বির ছেলেকে আপনি দেখতে পাবেন। সুব্বিরও খুবই ইচ্ছা—আপনাকে দেখাবার।'

'রাম, ওই ছেলের মুখ দেখব বলেই ভগবান আমাকে এপর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছেন। তা না হলে আমি তো গতবছরেই মরে যেতাম।'

বৃদ্ধার মুখে কেবল শিশুপুত্রের কথা। তাঁর নাতনীর ঘরে পুতি। সেদিন থেকে প্রত্যহ ঐতালের আসা-যাওয়া চলতে থাকল—কোডি থেকে পড়ুমুন্নুরু, পড়ুমুন্নুরু থেকে কোডি। বাপকে দেখে লচ্চ লুকিয়ে থাকে বলেই পড়ুমুন্নুরুতে গিয়েও ঐতালের মাথায় লচ্চর কথা জাগে নি। এদিকে মাঝে মাঝে সত্যভামাও পিত্রালয়ে যাতায়াত করে। শয্যালগ্না মুমূর্ষু বৃদ্ধার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠল—'আমাকে তোমরা এইভাবেই মরতে দেবে? আমি কি একটু পুতিকে কোলে নেব না? আর কদিন বাঁচব? বেশি হলে আর একটা দিন।' এই বলে মুমূর্ষু চোখের জল ফেললেন। দুদিকে উপবিষ্ট স্বামী ও জামাই। কিন্তু কেউ কোনো উপায় খুঁজে পেলেন না। রোগীর দিন যে ঘনিয়ে এসেছে সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। কিন্তু নদী পার হয়ে কে কার সঙ্গে দেখা করবে? কয়েক দিনের শিশু না মৃত্যু কবলিত বৃদ্ধা প্রমাতামহী? মাধপ্পয়ার অপরিসীম সাহস বলতে হবে। ছেলে জনার্দনকে ডেকে বললেন, 'খোকা, পালকির জন্য খবর পাঠা। তোর মা যে ওই একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে চলে যাবে, তা ঠিক হবে না।'

সময় অপরাহ্ণ। সূর্যের তেজ নরম হয়ে আসতে মাধপ্পয়া একটা শোভাযাত্রা বাহির করেন। মুমূর্ষু পত্নীকে পাল্‌কিতে শুইয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো একটা

অসম সাহসের পরিচয় দেন। সঙ্গে রয়েছে জামাই রাম ঐতাল। সকলের মনে এই ভয়—মাঝ পথে যদি কিছু ঘটে! কিন্তু তিনি পুতিকে দেখতে চলেছেন একথা শোনা মাত্র মুখ তাঁর হাসি-খুশি, চোখে তাঁর অভূতপূর্ব জ্যোতি। আকাশে তখনও গোধূলির আলো নিভে যায় নি। পাল্‌কি থেকে বৃদ্ধাকে এনে নামানো হল সুব্বির পাশেই। কাছেই শিশুপুত্র। লণ্ঠনের আলোয় বৃদ্ধার আবছা চোখ ছুটি বিকশিত হয়ে উঠল। তিনি ধীর কণ্ঠে বললেন—'হা—তে—দি—বি?' সত্যভামা ছোট শিশুকে তাঁর হাতের কাছে তুলে ধরতে সেদিকেই তাঁর দৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ হয়ে রইল। চারিদিকে দণ্ডায়মান সকলের চোখেই অশ্রুধারা। 'আমার আকাঙ্ক্ষা মিটল' বলে বৃদ্ধা এক মুহূর্ত চোখ বুজলেন! পুনরায় চোখের পাতা খুলে স্বামীকে ইশারা করলেন—'এখানে নয়। চলো ওখানে যাই।'

শোভাযাত্রা এবারে প্রত্যাবর্তনের পথে। পাল্‌কি পুনরায় কোডিগ্রাম থেকে পডুমুন্নৃরুতে পৌঁছল। এবং সেই পাল্‌কি থেকে তুলে এনে তাঁকে যথাপূর্ব শয্যায় শোয়ানো হল। ওদিকে তাঁর শ্বাসের টান উঠে ধীরে ধীরে জীবনের আলো নিভে গেল। মাধপ্পয়্যর বয়সটা যেন হঠাৎ বেড়ে গেল। শিশুর মতো কেঁদে উঠল রাম ঐতাল। আর লচ্চ? সেদিন তাকে কোথাও দেখা যায় নি।

দিদিমার মৃত্যুর কথা শুনে সুব্বি নিজের দুর্ভাগ্যের কথা বলে খুব কাঁদতে লাগল। সরস্বতী তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল—'তোর ছেলেই যে তাঁর শেষ জীবনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছে, সুব্বি।'

দৌহিত্রের নামকরণের পরে রাম ঐতাল ছুটল পডুমুন্নূরুতে শাশুড়ীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য। একদিকের আনন্দ অন্যদিকের বিষাদে ডুবে গেল। শ্বশুর মশাই এই বৃদ্ধ বয়সে একা-একা কীভাবে বাকী জীবনটুকু কাটাবেন সেই চিন্তায় মগ্ন হল ঐতাল। তার নিজের বয়সই বা কম কিসের? ষাট তো পেরিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে যখন সে ভাবে যে, এই মায়ার খেলা ছেড়ে যেতে শীগ্‌গিরই তার ডাক আসবে, তখনই মনে পড়ে লচ্চর কথা। পার্বতীকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, 'লচ্চ কোথায়?' পার্বতী বলে, 'ওখানে, ওই পডুমুন্নূরুতেই হবে। আহা, ওখানেই থাক দাদুর এই দুঃসময়ে ও কাছে থাকলেও সান্ত্বনা।' ঐতালের মনে পড়ে গেল যে ওর দিদিমার মৃত্যুকালেও ওকে দেখা যায় নি। 'সান্ত্বনা দেবে? হ্যাঁ, দিদিমার শেষ অবস্থায় যেমন শান্তি দিয়েছে, তেমনি শান্তি

দেবে দাদুকে অকৃতজ্ঞ কুকুর!' পার্বতী ক্ষুব্ধ স্বামীর মনে সান্ত্বনা দিতে অনেক চেষ্টা করল।

ইতিমধ্যে একদিন সরস্বতী বলল, 'দাদা, যত শীগ্‌গির সম্ভব, লচ্চর বিয়েটা দিয়ে দাও। সংসারের বাঁচামরা, কিছুই তো বলা যায় না।'

ঐতাল বলল, 'তুই কি পাগল হলি সরস্বতী? এখন তো বিবাহাদির কথা কোনো মতেই ভাবা যায় না।'

আর মাত্র একসপ্তাহ পরে ছুটি শেষ হয়ে ইস্কুল আরম্ভ হবে। কুন্দাপুরে যাওয়ার আগে অন্তত টাকা পয়সার জন্য বাবার সঙ্গে দেখা না করে উপায় নেই বলে লচ্চ অনেক দিন পরে দাদুর বাড়ি থেকে কোডিগ্রামে এল। তবু রাম ঐতাল গৃহে তার পুত্রের উপস্থিতিকে গ্রাহ্যই করল না। লচ্চও তার পিতৃদেবকে জ্বালাতন করার অভিপ্রায়ে ঘন ঘন শীনময্যের গৃহে যাতায়াত করতে থাকে। শীনময্যরও বয়স হয়েছে। মুখে তার কাল রেখা পড়েছে। তবু তার দাপট-দেমাক পুরাদস্তুর আগের মতোই। ইদানীং যে ব্যাপারটা তাকে পাগল করে দিয়েছে তাহল—নদীর ওপারকার ওই ভাল সম্পত্তিটাকে মাত্র তিনটি হাজার টাকায় আত্মসাৎ করে ফেলল কিনা রাম ঐতাল! তার পরম শত্রু! শীনময্যও কম নয়। ঐতালের রোয়ার মাঠের চারিদিককার সমস্ত ক্ষেত সে নিজেই কিনে নিয়েছে। অনেক দিন ধরেই এই চেষ্টা চলেছিল। নিজের ক্ষেতে পলিমাটি ফেলার বাহানা করে পর পর তিন বছর ধরে শীনময্য তার জমি এক হাতের মতো উঁচু করে ফেলেছে। চতুর্থ বছরে সেখানে নারকেল চারা লাগিয়ে কিষাণদের জন্য একটা চালাঘরও তৈরি করে দেয়। এতদিনে ঐতালের খেয়াল হয় মহাভারতের সেই চক্রব্যূহের কথা। ঐতালের ক্ষেতে যাওয়ার রাস্তা চারিদিক থেকেই বন্ধ। এবং বর্ষাকালে সে ক্ষেত একটি পুকুরে পরিণত হল। শীনময্য আস্ফালন শুরু করে দিল, 'দেখি বৈদিক বামুনকে আদালতে টেনে নেব। না হয় ত, ও এসে আমার পায়ে ধরুক।' নিজের ক্ষেত বাঁচাবার জন্য রাম ঐতাল বাধ্য হয়ে আদালতের শরণাপন্ন হল। তার মর্যাদাও কি কম? দরকার হলে সে হাইকোর্ট পর্যন্ত দেখে নেবে। ঐতাল লচ্চকে একথা অনেক আগেই বলে দিয়েছে যে শীনময্য তাদের পরম শত্রু। তার বাড়িতে লচ্চ যেন কোনো মতেই না যায়। এতসব কথা বলার পরেও শীনের বাড়িতে লচ্চর যাতায়াত ঐতালের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল।

গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হয়ে জুন মাসে ইস্কুল খুলতে জানা গেল যে ভগবানের অসীম কৃপায় এবারে লচ্চ উপরের ক্লাসে উঠেছে। কিন্তু ঐতাল বলে দিলে, 'ওর আর ইস্কুলের প্রয়োজন নেই। এখানে—এই বাড়িতে—এসেই অন্ন ধ্বংস করুক।' সত্যভামা বলল, 'তুমি কি ক্ষেপেছ? এখানে বাড়ির লোকও কি ওর জ্বালায় সুখে থাকবে?' সরস্বতী বলল, 'দাদা, ওর কপালে ব্রহ্মাঠাকুর যা লিখে রেখেছেন সেই মতোই হবে। তোমার যা দণ্ড দেওয়ার, দাও। ভগবান যা করাবেন, তাই হবে।' কাজেই পূর্ববৎ লচ্চর লেখাপড়া চলতে থাকল।

আজকাল ঐতালকে মাঝে মাঝেই কুন্দাপুরে যাতায়াত করতে হয়। তার রোয়ার মাঠ নষ্ট করে দিয়েছে বলে সে শীনময়্যর বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করেছে। এ অঞ্চলে ঘোড়ার গাড়ি নতুন চালু হওয়াতে শীনময়্য পয়সা খরচ করে বাবুয়ানা দেখালেও ঐতাল আগের মতোই পায়ে হেঁটে যাতায়াত করে।

লচ্চ এখন পঞ্চম ফর্মে উঠেছে। এই মাস শেষ হলে এক বছর পরেই ম্যাট্রিক। এ বছরও লচ্চর কিট্টুর হোটেল ছাড়া গতি নেই। তবে এই তিন বছরে কিট্টুর হোটেলের অনেক উন্নতি হয়েছে। এখন সে একটা বড় বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। দোতলা বাড়ি হওয়ার ফলে কিট্টু একদিন লচ্চর বাবাকে বলল, 'ঐতাল, আপনার ছেলে অন্য কোথাও ভাঁড়া দিয়ে না থেকে আমাদের দোতলার উপরেই যদি থাকে, তবে আমি ওকে দেখাশোনাও করতে পারব। আপনি ওখানে যা ভাড়া দিচ্ছেন, এখানে তার অর্ধেক দিলেই হবে।' রাম ঐতালের হুকুম হয়ে গেল। লচ্চ এখন প্রচার করতে লাগল যে আজকাল কিট্টুর হোটেলের দোতালায় তাদের আপিস। বলা বাহুল্য, লচ্চর সঙ্গে পুরোনো বাবুরা যেমন ছিল, তেমনিই আছে।

কিট্টুর হোটেলটা যে কেবল বড়ই হয়েছে, তাই নয় বিয়ে করার পরে কিট্টু এখন সপত্নী সেখানে বাস করার ফলে জিহ্বায় গ্রহণযোগ্য কিছু পদার্থ তৈরি হচ্ছে, উপকরণ যদিও পূর্বেকার শশার বীচি, কাঁঠালের বীচি ইত্যাদি। মাসিক যারা এক টাকা বেশি দেয়, তাদের জন্য দই-ঘি-এর ব্যবস্থা আছে। যারা কিট্টুর হোটেলে খেতে আসে, তাদের কাছে সে এই বলে প্রচার শুরু করে দিল, 'আপনারা নানা জাতের কফি-হোটেলে কফি ও খাবার খাচ্ছেন। আমিই একটা কফি-হোটেলের ব্যবস্থা করছি।' বেংগলুর ফেরত একজন বন্ধুর সঙ্গে মিলে

কিট্টু তার হোটেলের পাশেই একটা কফি-হোটেল খুলে বসল। তখনকার দিনে কোট ব্রাহ্মণশ্রেণীকে কোঙ্কণীদের হোটেল থেকে রক্ষা করবার মতো মহাধর্মকার্যের কৃতিত্ব যদি কাউকে দিতে হয় তবে সে কিট্টু উপাধ্যায়।

এই কফি-হোটেল চলল প্রায় এক বছর। এবং লচ্চ ছিল কফি-হোটেলের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। কিন্তু একমাত্র সেখানেই তার জলযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হলে টাকার স্ফীত অঙ্ক দেখে বাবার মনে সন্দেহ জন্মাতে পারে বলে লচ্চ কিট্টুকে ফাঁকি দিয়ে কখনো-সখনো অন্যান্য কফি-হোটেলেও যাতায়াত করত।

কিট্টুর হোটেলের উন্নতি হয়েছে বটে, কিন্তু তার জীবনের সুখ শান্তির বিনিময়ে তার এখন উভয় সঙ্কট—এ যন্ত্রণা কাউকে বলাও যায় না, আবার না বলে চুপ করে সহ্য করাও অসম্ভব।

লচ্চর নতুন কর্মক্ষেত্র হল কিট্টুর হোটেল। আর তার দরবারখানা হল হোটেলের দ্বিতল কক্ষ। লেখাপড়াটা তার পক্ষে এখন গৌণ বিষয়। আসল চর্চার বিষয় হল খোসগল্প, খেলাধুলো, ঠাট্টা-ইয়ারকি-বটখিরি। পড়াশুনোর দিকে মন দিলে লচ্চ ভালই করত, সাধারণ ছেলেদের তুলনায় তার মেধা কিছু কম নয়। কিন্তু বর্তমানে তার মন লেখাপড়ার দিকে না গিয়ে আকৃষ্ট হল শিকার-এর দিকে। বয়োধর্মের গুণে লচ্চ ও তার বন্ধুদের কথাবার্তা এখন ছেলেদের প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে ইস্কুলগামী দুটি একটি মেয়েকে ঘিরেই আবর্তিত হতে থাকে। পথে ঘোরা ফেরার সময়ে চোখ থাকে তাদেরই দিকে। এই বিষয়ে দলের পাণ্ডা হল বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু জন্নু। ওদের দৈনন্দিন কথাবার্তা ক্রমশই অভদ্র অশ্লীল হাসিঠাট্টায় ভরে ওঠে। দু'একবার জন্নু লচ্চকে এমন উস্কানিও দিয়েছে 'অমুক জায়গায় যাবি ? চল্ যাই তমুক জায়গায়।' কিন্তু লচ্চ মোটেই সাহসী নয়। লজ্জা ও সঙ্কোচে জড়সড়। সুতরাং লচ্চকে উস্কানি ব্যর্থ হল। প্রকাশ্যে লচ্চ জন্নুর বিষয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করলেও মনে মনে কিন্তু তার সাহসের তারিফ না করে পারেনি।

লচ্চর ঘনিষ্ঠ বন্ধু জন্নু নয়, নরসিংহ। এদের দুজনের মধ্যে গোপন কিছু ছিল না। কাজেই লচ্চর মনস্কামনা পূর্তির জন্য যদি কেউ সহায়ক হয়, তবে সে নরসিংহ। তাকে নিয়মিত খাওয়াতে পারলে লচ্চর যে কোনো কাজের জন্য সে প্রস্তুত। এহেন নরসিংহ নিযুক্ত হল লচ্চর ডাক পিওনের কাজে। ব্যাপারটা এই : লচ্চর দৃষ্টি পড়েছিল ইস্কুলের মেয়ে সঞ্জীবির উপর।

সঞ্জীবি দেখতে সুন্দরী। যে পথ দিয়ে সে যায়, লচ্চও সেই পথে বিনা কাজে ঘুরে বেড়ায়। বলাবাহুল্য, সঞ্জীবিও তাকে অনাদর করে না, বরং যেন প্রশ্রয় দেয়। নরসিংহ ঘুরে বেড়ায় লচ্চ সঞ্জীবির ডাক-পিওন হয়ে।

সঞ্জীবিদের পরিবার বাহ্যত ভদ্র বটে, কিন্তু ওদের ভড়ংটা বেশি। দরিদ্র সংসারে সেই ভড়ং মেটাতে হলে অন্য উপায়ে কিছু অর্থাগমের ব্যবস্থা প্রয়োজন। এইভাবেই লচ্চ একদিন সন্ধ্যায় প্রবেশাধিকার পায় সঞ্জীবিদের বাড়িতে। নরসিংহ সেদিন রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিরক্ত হয়ে হোটেলে ফিরে আসে। আহারের সময়েও লচ্চকে ফিরতে না দেখে কিট্টু উপাধ্যায় রেগে যায়। দেরি করে ফিরে লচ্চ উপস্থিত মতো একটি কৈফিয়ৎ দেয় 'অঙ্কের মাস্টার যেতে বলেছিলেন। তাই গিয়েছিলাম, কী করব ?' এই অছিলায় কিট্টুর মুখ থেকে রেহাই পায়।

অতঃপর প্রত্যহ নৈশ ভোজনের পরে লচ্চ ও নরসিংহ লুকিয়ে চুরিয়ে আনা-গোনা করতে শুরু করে। দলের পাণ্ডা জন্নু যাতে এই নৈশ অভিযান সম্পর্কে কিছুমাত্র সন্দেহ না করে, তার জন্য একটা বাহানাও বের করতে হয়। সঞ্জীবিদের বাড়ি পেরিয়ে ইস্কুলের এক মাস্টারমশাইর বাড়ি। সেখানেই তারা প্রাইভেট পড়তে যায় বলে রটিয়ে দেয়। কথাটা শুনে ঐতাল ভাবে যে তাঁর ছেলে যখন এতটা কষ্ট করে মাস্টারের বাড়িতে যাতায়াত করছে তখন দু এক টাকা বেশি খরচ হলেও চিন্তা নেই।

কিন্তু এই নতুন-পাওয়া মজার জীবনের জন্য লচ্চর পকেট দ্রুত খালি হতে থাকে। তাছাড়া, বন্ধু নরসিংহের খরচ-খরচার দায়িত্বও তার। দাদুর বাড়িতে গিয়ে লচ্চ মিথ্যা বলে যে কাজ হাসিল করবে তারও উপায় নেই। নিরুপায় লচ্চ একটা ফন্দি বের করে। একদিন সে কিট্টুর হোটেলে এই বলে শোরগোল তুলল যে স্নানের সময়ে স্নানাগারে যে সোনার হার তুলে রেখে এসেছিল কিছুক্ষণ পরে গিয়ে সেটা আর পাওয়া গেল না। সেই হারের টাকা দিয়ে দু এক মাস যাবত লচ্চর প্রণয়-চর্চা অব্যাহত চলল। ঐতাল এসে অসাবধানতার জন্য ছেলেকে খুব ভর্ৎসনা করল। কিট্টু এই বলে দুঃখ প্রকাশ করল যে তার হোটেলের উপর একটা বদনাম হওয়াতে তার ব্যবসায় খুবই ক্ষতি হবে।

আজকাল এটা একটা নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে যে জন্নু যখন ছাদে একা বসে বসে উস্‌খুস্‌ করে, তখন লচ্চ ও নরসিংহ প্রাইভেট পড়ার অজুহাতে মাস্টারের

বাড়িতে যাওয়ার নাম করে অন্যত্র যাতায়াত করে এবং প্রণয়ের পাঠ শেষ করে যথাসময়ে দোতলার ঘরে ফিরে আসে।

ব্যাপারটা জম্বুর কাছে অসহ্য ঠেকে। তারা রোজ রোজ বিলম্ব করে ফিরে আসে দেখে একদিন বেরুবার সময়ে ওদের পিছু নেয়। অবশেষে তাদের চৌর্যবৃত্তির সন্ধান পেয়ে উল্লসিত জম্বু ওদের খেপাতে শুরু করে। কিন্তু গুপ্ত তথ্য সকলেরই আছে। সুতরাং পরস্পরের সুনাম বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তারা একটা আপস করে নেয়। আপসে নাম রক্ষা হল বটে, কিন্তু পকেটের মান রক্ষার উপায় কী? দোকানে বাকী, কফি-হোটেলে বাকী, ইস্কুলের বেতন বাকী। পাওনাদারদের গালি হোটেল পর্যন্ত ধাওয়া করে অবশেষে ঐতালের কানেও পৌঁছাল। ঐতাল প্রথমে খুব তর্জন-গর্জন করে পুত্রের বাকী বকেয়া মিটিয়ে স্থির করল যে ছেলের হাতে আর টাকা-পয়সা না দিয়ে সোজা হোটেলের মালিক এবং ইস্কুলের শিক্ষকের হাতে টাকা দিয়ে নিষ্কৃতি পাবে। ওদিকে শ্বশুরমশাইকে জানিয়ে দিল, সেখান থেকে যেন কোনো রকমেই লচ্চকে টাকা-পয়সা দেওয়া না হয়।

অতঃপর দাদুর বাড়িতে লচ্চর চোখের জল বিফল হল। সঞ্জীবির কাছ থেকে যে ডাক আসে, লচ্চ জানে সে ডাকের সাড়া দিতে হয় পয়সা দিয়ে। পয়সা-বিহীন শুষ্ক প্রণয় কখনও সফল হয় না। জালে আবদ্ধ পশুর মতো লচ্চর মন অস্থির হয়ে ওঠে। একদিন সে নরসিংহকে ধরে বলে, 'আমি যত টাকা তোমাকে দিয়েছি, সব ফেরত দাও।' 'কে বলেছিল টাকা দিতে?' এই কথা কাটাকাটির পরিণামে দুজনের বন্ধুত্ব ভেঙে গেল এবং নরসিংহ বাধ্য হল কিট্টুর হোটেল ছেড়ে দিতে।

সে বছর ঐতালের বাড়িতে এমন একটি ঘটনা ঘটল যা কোনো দিন ভাবাও যায় নি। তার ঘরের দেয়ালের বিবরস্থ গুপ্ত ধনাগার থেকে একদিন পঁচিশ-তিরিশ টাকার মতো উধাও। ঐতাল ভারি চিন্তিত ও বিচলিত হয়ে সত্যভামাকে জিজ্ঞাসা করল। সত্যভামা জবাব দিল, 'তুমি কাল বাড়িতে ছিলে না। কাল লচ্চ এসেছিল। সকালে এসে ও দেখি বিকেল বেলাতেই বাবার ওখানে চলে গেল।' ঐতালের সন্দেহ হল ছেলের উপর। দেখা হলেই সে কথাটা জিজ্ঞাসা করবে। কিন্তু কবে? একমাস পরে যখন দেখা হল, লচ্চ তখন ঈশ্বরের নাম নিয়ে শপথ করে বলল যে টাকার কথা সে কিছুই জানে না।

অতবড় শপথ বাক্যের পরেও ঐতাল ছেলেকে বিশ্বাস করতে পারল না—যাই হোক, অবশেষে তার সন্দেহ হল হয়ত নিজের হিসেবের গোলমালের দরুণই এমনটা হয়ে থাকবে। কারণ তার দৃঢ় ধারণা যে তার টাকা রাখার গুপ্ত স্থানের তুলুক-সন্ধান অন্য কারও পক্ষেই জানা সম্ভব নয়।

টাকা পয়সার টানাটানিতে লচ্চর প্রাইভেট পড়া শীঘ্রই বন্ধ হয়ে গেল। অন্ধকারে ঘোরাঘুরি ছেড়ে দিয়ে সে এখন ভদ্র হল। এই ভদ্রতার মুখ্য কারণ অবশ্য—সে এখন একেবারেই রিক্ত-হস্ত। লচ্চ আর একবার বাড়ি এল, কিন্তু তার আগেই ঐতাল তার টাকা রাখার জায়গা বদল করে ফেলেছে।

লচ্চর এই নিদারুণ নৈরাশ্যের দিনে জন্নু হল তার 'মার্গদর্শক'। লচ্চ জানত যে তার চেয়ে জন্নুর আর্থিক অবস্থা আরও খারাপ। কিন্তু তার কথাবার্তা থেকে বোঝা যায় কোথাও সে একটা প্রণয়ের ব্যাপারে লিপ্ত। কিন্তু 'কার সঙ্গে তোমার ভাব?' এ কথাটা লচ্চ মুখ ফুটে জিজ্ঞাসা করল না। অথচ ব্যাপারটা জানার জন্যে ভারি উৎসুক হয়ে উঠেছিল। এই যখন অবস্থা তখন একদিন লচ্চ জন্নুর অপেক্ষায় ওৎ পেতে রইল। একদিন নয়, দুদিন নয়, প্রায় রোজই জন্নু মাথাধরা এবং আরও কত কী অসুখের বাহানা করে ইস্কুল পালিয়ে হোটেলে চলে আসে ঠিক দুপুর বেলায়। কিট্টু তখন কফির হোটেলে বসে পয়সা রোজগারে ব্যস্ত। প্রণয়চর্চার উপযুক্ত সময় বটে! লচ্চর মনে প্রবল সন্দেহ হোটেলের কর্ত্রী ঠাকরুনের সঙ্গে জন্নুর বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠেছে। একদিন লচ্চ ধীরে ধীরে তার বন্ধুকে বলল, 'জন্নু বন্ধু হলে তোমার মতোই বন্ধু হওয়া উচিত। তোমাকে এত কফি খাইয়েও তোমার গোপন কথাটা জানতে পারলুম না।' 'গোপান কথা? আমার আবার গোপন কথা কী?' লচ্চ হেসে হেসে বলল, 'জানতে পেরেছি, ভাই।' 'কী? কী জানতে পেরেছ?' লচ্চ আবার হেসে হেসে এবং বেশ টেনে টেনে উচ্চারণ করল, 'জ...ল...জা।' ধরা পড়ে যাওয়ার মতো বিবর্ণ হয়ে গেল জন্নুর মুখ। শেষ পর্যন্ত স্বীকার না করে উপায় রইল না। জলজা অর্থাৎ হোটেল মালিক কিট্টু উপাধ্যায়ের স্ত্রী।

লচ্চও মনে মনে জলজার অনুগ্রহপ্রার্থী। জলজার স্নানগৃহে প্রবেশের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে লচ্চ গিয়ে সেখানে চার-ছ আনা পয়সা রেখে আসে এবং কিছুক্ষণ পরে পয়সা খোঁজার নাম করে গিয়ে সেখানে পয়সা না দেখে বলে ওঠে, 'আপনি নিয়েছেন? ঠিক আছে।' ধীরে ধীরে এই ধরনের পয়সা হারানোর ঘটনার

পুনরাবৃত্তি হতে থাকে। খেতে বসে লচ্চ কর্ত্রী ঠাকরুনের রান্নার প্রশংসায় পঞ্চমুখ—'আজকাল জলজা দেবীর রান্না নল মহারাজকেও হার মানায়।' এই ধারা অনেক দিন চলার পরে লচ্চরই সমবয়সী ওই মেয়েটির মন লচ্চর দিকে আকৃষ্ট হল।

এক বছর কেটে গেলে লচ্চ এবার ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠল। আর জন্নু ফেল করে হল লচ্চর সহপাঠী। ঐতাল এবারেও লচ্চর বিষয়ে উদাসীন হয়ে রইল, তার বিয়ের ব্যবস্থার জন্য কোনো উদ্যোগ দেখা গেল না।

এদিকে কিট্টুর হোটেলের অবস্থা মোটেই ভাল নয়। কফি-হোটেলের ভাগীদার বন্ধুর সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় সেটা বন্ধ করে দিতে হল। তার ফলে কিট্টু এখন সারাদিন বাড়িতেই থাকে। দোকানে তাকে যেতে হয় না। জলজার কাজের অর্ধাংশ আবার কিট্টুর হাতে চলে আসার ফলে, সে এখন শূন্য পাঠশালার কর্ত্রী। এই নতুন পরিবর্তিত অবস্থায় লচ্চ ও জন্নুর মজার জীবনে বড় বাধা পড়ে গেল। ঘণ্টায় দশ বার করে জল খাওয়ার বাহানায় রান্নাঘরে যাতায়াত করা, লচ্চ ও জন্নুর উপস্থিতিতে জলজার হাসি খুশি হয়ে ওঠা—এ সব ঘটনা কিট্টুর চোখে না পড়ে পারে না। সন্দেহে ও ঈর্ষ্যায় দগ্ধ হয়ে কিট্টু কারণে-অকারণে স্ত্রীকে জ্বালাতে আরম্ভ করে। স্বামী-স্ত্রীর মন-কষাকষি যতই বাড়ে, জলজার মন ততই বিষাক্ত হয়ে নিষিদ্ধ পথের সুড়ঙ্গ খোঁজে।

কিট্টু উপাধ্যায় পড়ে গেছে উভয় সঙ্কটে। জলজার চালচলন অত্যন্ত আপত্তিকর। কিন্তু লচ্চ ও জন্নুকেও এই সব অপকর্ম থেকে নিবৃত্ত করা দরকার। রাম ঐতাল একদিন কুন্দাপুরে এলে কিট্টু তার কাছে অভিযোগ করে, 'ঐতাল, আপনার পুত্র আর আমার কথা গ্রাহ্য করে না। তার চালচলন, কথাবার্তা সবই আপত্তিকর। এখানে যে সব ছেলে আসে, তারা সকলেই লচ্চর সংসর্গে বিগড়ে যায়।' কিন্তু মুখ খুলে কিট্টু নিজের স্ত্রীর প্রসঙ্গটা বলতে পারল না। ঐতাল বলল, 'তোমার হোটেলে ও যেমন করে হোক রয়েছে। অন্য কারও হোটেলে থাকলে ও আরও খারাপ হত। এই একটা বছর কেটে গেলে ওর ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা শেষ হয়ে যাবে। তার পরে আর লেখাপড়ার দরকার নেই।'

কিট্টুর এখন মহাসঙ্কট। লচ্চকে সরিয়ে দেবার উপায় নেই। হোটেলের অনেক টাকা বাকী পড়েছে বলে জন্নুকে সে সরিয়ে দিল। এবং এই ভেবে

আত্মসংবরণ করল যে জন্ন হোটেলে না থাকলে লচ্চ অতটা আশকারা পাবে না, চুপ করে থাকবে। জন্নুর অন্তর্ধানে জলজার অন্তর্দাহ বেড়ে গেল। সেও তার স্বামীকে জ্বালাতে কসুর করল না। মাসে, সপ্তাহে একবার করে স্ত্রীর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করা, পুনরায় মিটমাট করে নেয়া—এই-ই এখন কিট্টুর কাজ। এতদিনে কিট্টু এই কথাটা বুঝতে পেরে খুব আপশোস করল যে সে তার গার্হস্থ্য-জীবনকে বাজারে এনে নষ্ট করেছে।

কিন্তু কিট্টুও তো রক্তমাংসের মানুষ। স্বামীরূপে তার যে অধিকার ছিল জলজার উপর, আজ যেন তা আর নেই। এই নিয়ে সে যদি প্রকাশ্যে স্ত্রীর উপর দোষারোপ করে, তবে তাকে হোটেল বন্ধ করে দিয়ে পুনরায় পাচক ঠাকুরের চাকুরিতে ফিরে যাওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। কাজেই সে চুপচাপ রইল। কিন্তু তার দাম্পত্য জীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাকে যে পথে প্রবৃত্ত করল, তাকে ঠিক সুপথ বলা যায় না।

চৌদ্দ

বছরটা কেটে গিয়ে আবার এল গরমের ছুটি। ম্যাট্রিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার ফলে এবারকার ছুটি এপ্রিল মাসের গোড়াতেই শুরু হল। লচ্চর মনে বিরক্তির শেষ নেই—প্রতি বছর এই লক্ষ্মীছাড়া ছুটির আবির্ভাবে তার বিরক্তি। কিন্তু তবু তাকে আসতে হল কোডিগ্রামে। এই পোড়া 'বনবাস' কবে যে শেষ হবে? কোডি ভালো না লাগে তো পডুমুন্নূরু আছে। কিন্তু আজকাল সেখানে গিয়েও সুখ নেই। দাদু এখন বয়সের ভারে একেবারে জবুথবু। যে বৃদ্ধ বসে বসে দিন, ঘণ্টা, মিনিট গণনা করছে, তার সঙ্গে তরুণ লচ্চ কী আনন্দ পাবে? তবু তাকে আনাগোনা করতে হয় এই দুটি শুষ্ক গ্রামের মধ্যে—কোডি আর পডুমুন্নূরু, পডুমুন্নূরু আর কোডি। এক-একবার লুকিয়ে-চুরিয়ে অবশ্য কুন্দাপুরেও ঘুরে আসে—সেই প্রিয় হোটেলটার দর্শন লাভের জন্য।

ইস্কুল-কাছারির ছুটি হওয়ার পরে কিট্টু উপাধ্যায় তার হোটেল বন্ধ করে গ্রামে ফিরেছে। লচ্চর মনে অপূর্ব আনন্দের সঞ্চার হল এই ভেবে—জলজা দেবী তার বাড়ির কাছেই রয়েছে। নানা ছল ছুতোয় উপাধ্যায় বাড়ি গিয়ে লচ্চ জানিয়ে আসে—গরমের ছুটিতে তাকেও দেশের বাড়িতেই থাকতে হবে।

সরস্বতী ভাবছিল—লচ্চকে এই বছরেই বিয়ে করাবার জন্য দাদার কাছে সে পীড়াপীড়ি করবে, এমন সময়ে কিট্টুর মা এসে সরস্বতীর কানে কানে কী সব নালিশ করে গেল। সরস্বতীর কেমন যেন আতঙ্ক জন্মাল কিট্টুর মায়ের কথায়। একদিন সরস্বতী মাঠে গিয়েছিল গোরুবাছুর চরাতে। সন্ধ্যার একটু আগে বাড়ি ফেরার সময়ে দেখতে পেল কাজু বাগানে লচ্চ চোরের মতো পালিয়ে যাচ্ছে! 'লচ্চ এখানে কেন এই সময়ে?' এই ভেবে সরস্বতী তার আবছা দৃষ্টি নিয়ে সেদিকে এগিয়ে যেতেই দেখা গেল—সেখান থেকে আর একটি মূর্তি যেন সরে গেল উপাধ্যায় বাড়ির দিকে। আর কেউ নয়, জলজা!

সরস্বতীর গা দিয়ে যেন আগুন ছুটল। সেখানে একটি কথাও না বলে মনে মনে 'শিব শিব' বলতে বলতে বাড়ি এল সরস্বতী। পিসীমা যে বুঝতে পেরেছে লচ্চর এমন সন্দেহ হল কিনা কে জানে? বাহ্যত সে এমন ভাব দেখাল যেন কিছুই ঘটে নি।

সেদিন যজমানী কাজ শেষ করে ঐতালের বাড়ি ফিরতে প্রায় এক প্রহর রাত্রি হয়ে যায়। পা ধোওয়ার জন্য পুকুরে যাওয়ার পথে দেখে সরস্বতী সদরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। 'দাঁড়িয়ে আছ কেন' দাদার এ প্রশ্ন করবার আগেই সরস্বতীর চোখে জল দেখা দিল। সে যা শুনেছে ও দেখেছে সব কথা দাদাকে জানাল। বছর দুই যাবত লচ্চর চোখমুখ দেখে পার্বতীর সন্দেহ হয়ে আসছে। সব কথা শেষ করে সরস্বতী বলল 'দাদা, লচ্চকে এখন একটু শাসন করা দরকার। আমি তোমাকে অনেক আগে থেকেই বলে আসছি ওর একটা বিয়ে দিয়ে দাও।'

ঐতাল ঘরে এসে তার জপ সারল। ততক্ষণ সে মুখ খোলে নি। জপের শেষে হাঁক দিল—'লচ্চ!' লচ্চ শুয়েছিল বটে, কিন্তু ঘুমিয়ে পড়ে নি। পিতৃদেব আর একবার হুঙ্কার দিতেই সে এই বলে উঠে এল, 'না, এ বাড়িতে একটু ঘুমোবার পর্যন্ত যো নেই।'

লচ্চ কাছে এলে ঐতাল বলল, 'কিট্রুর মান-ইজ্জৎ তুই নষ্ট করেছিস—উপাধ্যায় আমাকে একথা বললেও আমি বিশ্বাস করি নি। এখন সব আমার গোচরে এসেছে। তুই এসব কুকর্মে লিপ্ত না হয়ে সোজা এসে বলতে পারতিস—আমার বিয়ে দাও, আমি বিয়ে করব। আজ যদি ব্যাপারটা সারা গ্রামে জানাজানি হয়ে যায়, তোর মান সম্ভ্রম কোথায় থাকবে শুনি? তোর বাপ-মায়ের মুখ কোথায় থাকবে শুনি।' এবার লচ্চর ফেটে পড়ার পালা। 'যার-তার কাছে যা-তা কথা শুনে আমাকে এই সব বলছেন?' ঐতাল জ্বলে উঠল—'কী বললি? আজ সন্ধ্যাবেলা সরস্বতী যে তোদের দুজনকে একসঙ্গে দেখেছে সে কি মিথ্যা কথা?' লচ্চ কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে বলল—'পিসীমা দিনেই চোখে দেখেনা, তাতে সন্ধ্যাবেলা দেখেছে!'

তৎক্ষণাৎ লচ্চর উদ্দেশ্যে রাম ঐতালের ডান হাতটা উপরে উঠে গেল। কিন্তু প্রহার করবার মতো শক্তি তার নেই। তাছাড়া লচ্চর রীতি সে জানে। এ কথাও জানে যে, প্রহার এ রোগের কোনো চিকিৎসা নয়। ঐতাল পুত্রের উদ্দেশ্যে এইটুকু মাত্র বলল, 'তুমি এরকম হলে আমার বাড়িতে থাকতে পারবে না। তোমার আমার সম্পর্ক শেষ। আমি তোমার বাবা নই, তুমি আমার ছেলে নও। প্রাণপাত করে তোমার জন্য যা কিছু করেছি, আমার টাকা পয়সা যা কিছু আছে, সে সমস্ত সুব্বিকে দিয়ে যাব, তোমাকে নয়। যতদিন তুমি

সরস্বতী সম্পর্কে একথা না বলছ, একথা না স্বীকার করছ 'আমার ভুল হয়েছে, পিসীমাকে ওকথা বলা অন্যায় হয়েছে,' ততদিন এ বাড়িতে তোমার অন্ন জুটবে না।' এই বলে ঐতাল ক্রুদ্ধচিত্তে গিয়ে শুয়ে পড়ল। স্বামীর কাছে সব কথা শুনে সত্যভামা বলল, 'জানতাম না যে আমার ছেলে এরকম হবে।'

লচ্চ যেখানে ছিল সেখানেই খুঁটির মতো অচল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরে বাড়ির পিছন দিককার বালিয়াড়িতে গিয়ে বসল। নিজের দোষ স্বীকার করে মাথা সে নোয়াবে না। অবশ্য সে একথাও জানে যে বাপ তাকে তাড়িয়ে দিলে তার কোনো উপায় নেই। তবু হার মেনে নিতে সে পারবে না। সারারাত বালিয়াড়িতে বসে আকাশের তারা গুনল, ঘরে এল না। শুকতারা দেখা দিল। ভোর হল। পরদিন সারাটা দিন সে হোগ্লে গাছের বাগানে তার আস্তানা করল।

লচ্চর বৃত্তান্ত শুনে পার্বতীর মনে বড় কষ্ট হল। কিন্তু তার আশঙ্কা ওকে যদি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয় তবে সে চিরকালের জন্য হাতছাড়া হয়ে যাবে। পার্বতী এখন বৃদ্ধা হয়ে পড়েছে। বয়সে সরস্বতীর চেয়ে ছোট হলেও হাঁটা-চলার মতো শক্তি তার নেই। তবু এদিক ওদিক সমুদ্রতীর, বালিয়াড়ি, হোগ্লে বন, খিড়কী-বাগান—এইভাবে ঘুরেঘুরে ছেলেকে খুঁজতে লাগল। দুপুরবেলা পার্বতীর খাওয়া হয় নি। সে সরস্বতীকে বলল, 'ঠাকুরঝি, তোমার দাদাকে একটু বোঝাও, শান্ত হতে বলো।' সরস্বতী বলল, 'পারোতি, তুমি বুঝতে পারছ না। একবার অন্তত না শক্ত হলে ও ছেলে শোধরাবে না। ক্ষিধে পেলে আপনিই ঘরে আসবে।' উপবাসে পার্বতী খুব দুর্বল হয়ে পড়েছে। সেই অবস্থায় আবার সে অপরাহ্নে ছেলেকে খুঁজতে বেরুলো। হোগ্লে বাগানে ঘুরতে ঘুরতে দেখতে পেল লচ্চ একটা গাছের নীচু ডালে গোমরা মুখে বসে আছে। পার্বতী বলল, 'খোকা, আমার কথা শোন্। বাড়ি আয়।' বড়মার ডাকে লচ্চ নীচে নেমে এল বটে, কিন্তু কোনো কথা বলল না। পার্বতী বলল, 'চল্ খোকা, বাড়ি চল্।' 'বাবা যেতে দেবে না।' 'তুই ভুল করেছিস, অন্যায় করেছিস্। তুই কি একথা বলতে পারবি না—'আমার অন্যায় হয়েছে, আর হবে না'?' বড়মায়ের কথায় লচ্চ ডুকরে কেঁদে উঠল। ছেলের কান্নায় পার্বতীর হৃদয় বিগলিত হল। যখন ও শিশু ছিল, তখন পার্বতীকে 'বড়মা, বড়মা' বলে কেঁদে কেটে কতই না জ্বালাতন করত। সেই শিশুর চলা-ফেরা, খেলাধুলার ছবি পার্বতীর চোখের সামনে আর একবার ভেসে উঠল।

'লচ্চ, মান-ইজ্জতের চেয়ে মানুষের বড় আর কী আছে ?'

'হুঁ।'

'পিসীমার কাছে গিয়ে কি তুই একথা বলতে পারিসনে—আমার অন্যায় হয়েছে পিসীমা, আমায় ক্ষমা কর ?'

'বলব, কিন্তু বাবার সামনে যেতে পারব না।'

'তুই ভাল ছেলে হলে তিনি কত খুশি হবেন। তিনি কি পাথর ? ছেলের হাতে সদ্‌গতি হবে বলেই ত তিনি আর একবার বিয়ে করেছিলেন। তোমার উপর তাঁর কি শত্রুতা থাকতে পারে ?'

পার্বতী মিটমাটের জন্য তাড়াতাড়ি গিয়ে সরস্বতীকে ডেকে আনল। লচ্চ মাথা হেঁট করে বলল, 'আমার অন্যায় হয়েছে।'

সরস্বতী বলল, 'ভবিষ্যতে আর না করলেই হল, বাছা! যা করেছ তা ত আর মুছে ফেলা যাবে না।'

'হুঁ।'

'ভগবান করলে আমরা শীগ্‌গিরই তোর জন্য ভাল মেয়ে ঘরে আনব।'

'হুঁ।'

'দেখ খোকা, শীনময়্যর ছেলেরা কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা রোজগার করে বাপের সুনাম করেছে। আর তোর বাবার 'কোটি ঐতাল' বলে এত নামডাক, সেই নাম তুই খোয়াবি ?'

একটা ঝড়ের সঙ্গে ভীষণ বৃষ্টি শুরু হয়ে হঠাৎ যেমন শান্ত হয়ে যায়, ঐতালের গৃহে তেমনি কোলাহলের ঝড় শান্ত হয়ে গেল। ছেলের সঙ্গে বাপের আর কথা বলার ইচ্ছা নেই। তবু রাগ পড়ে গেলে ঐতাল তার বোনকে বলল, 'বুঝলি সরসোতি, একটি ভালো মেয়ে দেখে বিয়েটা করিয়ে দিই। যদি স্ত্রীর দৌলতে ভদ্র হয়ে ওঠে।' পরদিন থেকে ঐতাল কনের ঠিকুজীর খোঁজে লেগে গেল। বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ে সরস্বতী বলল, 'দাদা, লচ্চ এ যুগের ছেলে। হয়ত বলবে—নিজে মেয়ে দেখব। গড়ন সুন্দর এবং রং ফরসা হয় এমন মেয়ে দেখো। ভবিষ্যতে ছেলেটা আবার বিপথে না যায়।' ঐতাল বলল, 'বেশ, তাই হবে।'

সাতদিন রোদের মধ্যে ঘোরাঘুরি করল ঐতাল। পরিচিত অনেকের কাছ থেকে ঠিকুজী আনল। ঐতাল তার ছেলের বিয়ে দেবে—একথা শোনামাত্র ও

অঞ্চলের বৈদিক বামুনেরা এগিয়ে এসে নিজ নিজ মেয়েদের গুণগান করতে লাগল। ঐতালের দুটি শর্ত। প্রথমত, ঠিকুজীর মিল হওয়া অত্যাবশ্যক। দ্বিতীয়ত, ছেলেরও মত হওয়া চাই। এদিকে যেমন হচ্ছে, তেমনি পড্ মুন্নূতেও কনে খোঁজা চলছে। ইতিমধ্যে ঐতাল ছেলের ভবিষ্যৎ লেখাপড়ার বিষয়ে ভাবিত হল। ম্যাট্রিক পাশের পরে ও কী করবে? আপাতত কুন্দাপুরে একটা কেরাণীগিরি, পরে যা হোক একটা ভাল কাজ দেখে নেবে। সরস্বতীর ইচ্ছা নয় যে লচ্চ আর লেখাপড়া করে। ঐতালকে সে বলল. 'বাড়ির এই সব বিষয়-আশয় তোমার পরে কে দেখাশোনা করবে? যাজনিক কাজকর্ম কি তোমার সঙ্গেই শেষ হয়ে যাবে?'

ঐতাল উত্তর দিল, 'সব কিছুই কি আমি ভাবব, বল। লচ্চ কি বাড়ির কৃষি-কাজ দেখাশোনা করবে বলে তুমি মনে কর? বিষয়-আশয় নকড়া-ছকড়ায় বিক্রি না করে দিলেই যথেষ্ট।' ঐতালের একসময়ে খুব আশা ছিল যে ছেলে ইংরেজি পড়ে বংশের মর্যাদা বাড়াবে। সে আশায় জলাঞ্জলি। তবু তার মনে জাগে ওই ম্যাট্রিকেই যেন ছেলের লেখাপড়া শেষ না হয়। এই যখন মনের অবস্থা তখন একদিন শোনা গেল যে ঐরোডির উকিল বাসুদেবয়্য তাঁদের গ্রামের বাড়িতে এসেছেন। উকিলবাবু তার যজমান। কোডিগ্রাম থেকে সোজা পূবে নদী পার হলেই ঐরোডি। কোডিগ্রামের উত্তরদিকের বালিয়াড়িতে দাঁড়ালে সামনের মাঠের নারকেল বাগানের ফাঁক দিয়ে ওপারে যে টালির বাড়িখানা দেখা যায় সেই হল উকিলবাবুর বাড়ি। বাসুদেবয়্য মংগলুরে ওকালতি করেন এবং বছরে মাত্র একবার গরমের ছুটিতে দেশের বাড়িতে আসেন। বাড়িঘর বিষয়-আশয় সব দেখাশোনা করে তাঁর ছোট ভাই নারায়ণয়্য। বেশ স্বচ্ছল পরিবার। গ্রামবাসীদের কোনো কিছুর ব্যাপারে বাসুদেববাবুর কাছের পরামর্শ চাওয়াই রীতি। আবার মংগলুরে উকিল হওয়ার পরে তাঁর পদমর্যাদা আরও বেড়ে গেছে। রাম ঐতাল 'হরি হরি' বলতে বলতে উকিলবাবুর বাড়িতে এল। ঐতালের উপর তাঁদের ভারি শ্রদ্ধাভক্তি। ঐতাল উপস্থিত হতেই মাদুর বিছিয়ে তার আদর-আপ্যায়নের ব্যবস্থা হল।

ঐতাল তার কাজের কথা শুরু করে দিল—'আমার ছেলে এবারে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে। বলছে পাশ করবে। ভবিষ্যতে কী করবে, এই হল আমার চিন্তা। গ্রামে রেখে কী করানো যায় বলুন দেখি। এই বিষয়ে একটা পরামর্শ

তাইতে আপনার কাছে এলাম।' রাম ঐতাল যে অবস্থাপন্ন লোক একথা উকিলবাবুর অজানা ছিল না। তিনি বললেন, 'কেন, বি.এ. পাশ করবে না? তা না হলে ডাক্তারি বা অন্য কিছুর জন্য পাঠাতে পারেন।'

ঐতাল বিস্মিত হল, 'ডাক্তারি?'

উকিলবাবু বললেন, 'ওঃ, আপনি তো বৈদিক ব্রাহ্মণ। বৈদিক বামুনের ছেলে হয়ে লাশ চেড়া-ফাঁড়া?'

'হুঁ, আপনি তামাশা করছেন। ওসব কথা যাক। অন্য কিছু একটা বলুন।'

'দেখুন আমাদের কাল হলে ম্যাট্রিক পড়েও ছোটখাট ওকালতি করা যেত। এখন কিন্তু বি.এ, বি.এল. হওয়া চাই। সকলের আগে দু'বছর পড়ে এফ্.এ. পাশ করতে হবে। তারপরে ভবিষ্যতের চিন্তা। আচ্ছা, আপনার ছেলে কী বলে জানা উচিত নয় কি?'

'ওকে আর কী জিজ্ঞেস করব? ওর কি অত বুদ্ধি আছে?'

'বুদ্ধি থাক্ বা নাই থাক্। পড়বে ছেলে, বাপে নয়। কী বলেন?'

'তা ঠিক।'

'একদিন তাকে সঙ্গে নিয়ে আসুন। আপনার ছেলে ইংরেজি পড়ছে। দেখি, তার ইংরেজি কেমন—গেঁয়ো না শহুরে ইংরেজি?'

ঐতাল উকিলবাবুর প্রস্তাবে সম্মত হয়ে এবং তাঁদের গৃহে মধ্যাহ্ন ভোজন সমাধা করে গৃহাভিমুখে রওনা হল।

ঐতাল চলে গেলে উকিলবাবুর ছোট ভাই নারায়ণয্য বলল, 'দাদা, তুমি যেখানে-সেখানে তোমার মেয়ের জন্য বর না খুঁজে, ঠিকুজী কোষ্ঠী যদি মেলে তবে এই ছেলেটিকেই দেখো না। ঐতাল নিজে থেকে কিছু বলবে না। ভাববে—উকিলবাবু কি আমাদের মতো ঘরে মেয়ে দেবেন? দেখ দাদা, ঐতাল বংশ কিন্তু ছোট বংশ নয়। বর্তমানে কোডিগ্রামের প্রত্যেকে হয় শীনময্যর কাছে নয়ত ঐতালের ঘরে বন্ধকী।'

'ঐতাল এতটা অবস্থাপন্ন হয়েছে?'

'আমাদের গাঁয়ে ওর সম্পত্তির জন্য উনি একশ টাকার বেশি ভূমি কর দেন। ওদিকে কোডিগ্রামের সম্পত্তির জন্য অন্তত দুশো টাকা দিচ্ছেন। তাছাড়া, কম করে হলেও আট-দশ হাজার নগদ টাকা রয়েছে। কেউ কেউ বলে যে ওর

বাবা কোদণ্ড ঐতালই তাঁর মৃত্যুকালে ওই পরিমাণ টাকা রেখে গেছেন। জামা-কাপড় দেখে ওঁকে বিচার কোরো না।'

উকিলেরও মনে হল যে ঐতালের ছেলের ঠিকুজীর সঙ্গে তাঁর মেয়ের ঠিকুজী মিলে গেলে একটা বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। তাঁর চার ছেলে, দুই মেয়ে। বড় মেয়েটি বিয়ের উপযুক্ত হয়েছে। নাম নাগবেণী। এগারো পূর্ণ করে নাগবেণী এখন বারোয় পা দিয়েছে। বাপের মনেও এই চিন্তা জেগেছে যে এখন যদি মেয়ের বিয়ে না হয় তবে আর কবে হবে? তিনি গিয়ে মংগলুরে বসলেও বিবাহের সম্বন্ধের জন্য তাঁকে দেশের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে।

পরদিন সূর্যোদয়ের দণ্ডখানেকের মধ্যেই ঐতাল উকিলবাবুর বাড়িতে এসে হাজির। তার পশ্চাতে পুত্র লচ্চ—মাথা আঁচড়ে চুলগুলি ঝুঁটি করে বেঁধে ফরসা জামা-কাপড় পরে এসেছে। গরমের দিন হলেও গায়ে তার শার্ট ও কোট। হাতে একটা ওয়াটারপ্রুফ ছাতা।

উকিলবাড়ির সদর দরজার সম্মুখস্থ ছাপরায় প্রবেশ মাত্রই নারায়ণয়্য অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, 'আসুন। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন? ভালই হল। দাদা আমাদের নতুন বাগানখানা দেখতে গিয়েছেন। ওখানে এ বছর একশ নারকেল চারা লাগিয়েছি। 'দেখে আসি' বলে বেরুলেন।'

'ঠিক আছে।...তা হোক। আজকে আমার যাজনিক কাজ কিছু নেই। এখানেই অপেক্ষা করা যাক।'

এই কথাবার্তার মধ্যেই বাড়ির ভিতর থেকে শোরগোল তুলে হাসতে হাসতে তিন-চারটি ছেলেমেয়ে বাইরে এল। নাগবেণী, তার দাদা ও ছোট ভাই। নাগবেণীর, চুল বাঁধা, পরণে কালো শাড়ি। বয়স কম, কিন্তু বয়সের তুলনায় বাড়ন্ত গড়ন। মংগলুরে ইস্কুলে পড়ে। কী একটা খেলার ব্যাপারে ভাই-বোনেরা হৈ চৈ করে এসে উপস্থিত হলে, কাকা ধমক দিয়ে বলল, 'ছি ছি! ভিতরে যা তোরা। ওখানে উঠোনে কুলোয় না বলে বুঝি এখানে এসেছিস?' কাকার ভৎর্সনায় দলটি নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নারায়ণ বলল, 'এরা সব দাদার ছেলেমেয়ে। ছুটিতে যখন আসে, বাড়ি-ঘর ভেঙে ফেলে আর কি।'

ঐতাল জিজ্ঞাসা করল, 'ওই মেয়েটি বুঝি আপনার?'

'আমার মেয়ের তো সবে আট বছর। ওটি দাদার বড় মেয়ে—নাগবেণী

আপনি বোধ করি আগে ওকে দেখেন নি। এরা সকলে বছরে একবার করে গাঁয়ে আসে।'

মেয়েটি লচ্চর চোখে পড়েছে। লচ্চ জানে তার ভবিষ্যৎ লেখাপড়ার বিষয়ে উকিলবাবুর সঙ্গে পরামর্শের ব্যাপারেই বাবা তাকে ডেকে এনেছে। এখন বয়স্কদের কথাবার্তায় তার মনে অন্য চিন্তা জন্মালো। এতক্ষণ পর্যন্ত তার যে মুখে কোনো ভাবলেশের পরিচয় ছিল না, এখন তা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

নারায়ণ অতিথিদের বারান্দায় বসিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের জন্য কিছু পানীয়ের ব্যবস্থা করি। কী করব—কফি, না মুগডালের শরবৎ, না ডাবের জল?' ঐতাল বলে উঠল, 'আই-আইয়ো, কফি? ও সমস্ত আজকালকার লোকদের জন্য। আমাদের মতো সেকেলেদের কফি খেলে গরম বোধ হয়। এখন অবশ্য আমার কিছুরই প্রয়োজন নেই।'

'ছি! সে কী কথা? আপনার জন্য তাহলে মুগের শরবৎ হোক। আপনার ছেলে নিশ্চয়ই কফি পছন্দ করবে। সেইভাবে ব্যবস্থা করি।' এই বলে নারায়ণ ভিতরে চলে গেল।

পিতাপুত্র দুজনেই বারান্দায় কুটুমের মতো বসে রইল। পিতা পুত্রের মুখের দিকে না তাকিয়ে নীরবে তপস্যায় উপবিষ্ট। এমন সময়ে বাগান পরিদর্শন করে ফিরে এসে উকিলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটি কে ঐতাল? আপনার ছেলে বুঝি? কোথায় পড়ছে? কুন্দাপুরে? না উডুপিতে?'

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির ভিতর থেকে কফি মুগের শরবৎ এবং তেলে ভাজা পাঁপড় এসে গেল। উকিলবাবুও প্রাতরাশের জন্য অতিথিদের সঙ্গে যোগ দিলেন। বললেন, 'দেখছেন ঐতাল, আপনার পুরোনো দিন কাল যে আর নেই তার সাক্ষী আপনার পুত্র। কফি খাওয়া শুরু করে দিয়েছে। আমারও অবশ্য কফি ছাড়া একটি দিনও চলে না।' ঐতাল প্রত্যুত্তরে বলল, 'বিলক্ষণ! আপনি হলেন উকিল মানুষ। কফি খাবেন এ আর বেশি কী? শহরের জলবায়ুতে কফি দরকার হয়। কিন্তু আমাদের মতো গ্রাম্য লোকের পক্ষে ওসব কেন? এই বেংগলুরের হাওয়া লেগে, শীনময়্যর মতো বয়স্ক ব্যক্তিরা পর্যন্ত যে কফি পান করছে তার কী অর্থ আছে বলুন।' এইভাবে কথাবার্তা শীনময়্যর দিকে ঘুরে গেল। শীনময়্যর কথা থেকে তার ছেলেপিলেদের রোজগারের কথা উঠল। সেই থেকে আবার এরকম আরও কিছু লোকের কথা এসে গেল যারা

শীনময়্যর ছেলেদের মতোই ব্যবসা করে টাকা রোজগার করছে। উকিলবাবু বললেন, 'দেখুন ঐতাল, কে আমাদের কাছে মামলা-মোকর্দমা নিয়ে আসবে সেই ভোব পাঁচজনের মুখাপেক্ষী হয়ে ওকালতি করার চেয়ে ব্যবসা ভালো।'

ঐতাল বলল, 'দেখুন না কেন, আমাদের সুব্রায় উপাধ্যায়, যার ছেলে কিট্টু কুন্দাপুরে কোনোরকমে একটু হোটেল চালায় সেই উপাধ্যায় নাকি এ বছর তার বাড়িতে টালির ছাদ করবে।' ঐতালের কথায় উকিলবাবুর মনে এই ভেবে একটু গর্ব হল যে কুন্দাপুরে এখন তাহলে তাদের কোট ব্রাহ্মণদের হোটেল হয়েছে।

মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য আগন্তুকরা নিমন্ত্রিত হল। ঐতাল উদ্বেগ প্রকাশ করে বলল, 'উকিলবাবু, ছেলের ভবিষ্যৎ লেখাপড়ার বিষয়ে তো কিছু বললেন না।' ভবিষ্যতের কর্মপন্থা স্থির করার জন্য ছেলের সঙ্গে কথা বলা দরকার। কিন্তু যা কিছু জিজ্ঞাসা করা হল সব ব্যাপারে ছেলে মৌন। উকিলবাবু অনুমান করলেন, বোধ করি বাপের সামনে ছেলে মুখ খুলতে সঙ্কোচ বোধ করছে। তাই তিনি ঐতালের অজানা ভাষা ইংরেজি কথা বলতে শুরু করলেন, 'You are in the Matriculation class,' উত্তর এল 'Yes'। অতঃপর সমস্ত কথাবার্তা ইংরেজিতেই হল। এমনকি খেতে বসেও লচ্চ উকিলবাবুর সঙ্গে 'এস্ ফেস্' কথা বলল। লচ্চর উভয় সঙ্কট। ভোজনের সময়ে সে যে পঙ্ক্তিতে বসেছে তার একপ্রান্তে বসেছে তার সমবয়সী সদাশিব—উকিলবাবুর বড় ছেলে। সদাশিবের সঙ্গে লচ্চর পাশাপাশি বসে কথা বলার সুযোগ রইল না। আর সেই যে একবার দেখা দিয়ে বিদ্যুৎগতিতে অন্তর্হিত হয়ে গেল সেই মেয়েটি, তাকে পুনর্বার দেখার সুযোগও হল না। উকিলবাবুর প্রশ্নধারা সমানে চলল।

আহারের পর লচ্চ কিছুক্ষণের মধ্যেই ঐতাল ও উকিলবাবুর কাছ থেকে একটু আড়ালে গেল। এদিকে সদাশিবও আগ্রহভরে অপেক্ষা করছিল তাদের বাড়িতে আসা এই অপরিচিত ইংরেজ পুঙ্গবের সঙ্গে কথা বলার জন্য। তারা দুজনে কথা বলতে বলতে বাড়ির দোতলায় উঠল। এদিকে উকিলবাবু বারান্দায় বসে ঐতালের সঙ্গে গল্পসল্প করতে লাগলেন। বললেন, 'ছেলে আপনার চালাক-চতুর। ইংরেজিও ভাল জানে। পাশ করলে এফ. এ. পড়াবেন।' ঐতাল খরচ পত্রের কথা জানতে চেয়ে পরে জিজ্ঞাসা করল, 'ওখানে কোথায় থাকবে? হোটেলে কিংবা অন্য কোথাও?' উকিলবাবু বললেন, 'ওসব পরে চিন্তা করা

যাবে। মাসে গোটা তিরিশেক টাকা খরচ করার ক্ষমতা কি আপনার নেই?' ঐতাল দারিদ্র্যের ভান করে অক্ষমতা জানাল না।

কথা প্রসঙ্গে উকিলবাবু বললেন, 'আপনার ছেলের ঠিকুজীটা একবার পাঠিয়ে দেবেন, ঐতাল। নয়ত, আমাদের নাগবেণীর ঠিকুজীটা আপনি নিয়ে যান।' ঐতাল অবাক হয়ে রইল। 'কী, কোনো কথা নেই যে।' ঐতাল দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'না, মানে আপনাদের মতো পরিবারের জন্য বৈদিক পরিবারের ছেলে?' 'ও সমস্ত পুরোনো কালের কথা। এখন ইংরেজি শিক্ষা হলেই হল। অন্য 'পুরাণ' কে শোনে? এখন, আপনার ছেলের ও আমার মেয়ের ঠিকুজী মিলে গেলে আপত্তির কোনো কারণ দেখছি না।' উকিলের এই প্রস্তাবে ঐতাল হর্ষ প্রকাশ করল।

সন্ধ্যা হয়ে আসতে ঐতাল ছেলের খোঁজ করলে লচ্চ সদাশিবের সঙ্গে দোতলা থেকে নেমে এল। তাদের ঘণ্টা দুয়েকের বন্ধু যুগ যুগের ঘনিষ্ঠতার মতো মনে হল। রওনা হওয়ার আগে লচ্চ তার বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানাল, 'আমাদের বাড়িতে কবে আসছ?' ওদের দুজনকে একসঙ্গে দেখে উকিলবাবু বললেন, 'দেখছেন ঐতাল, এই 'ইংরেজি' ছেলে দুটি কেমন মিলে গেছে। এই আমার বড় ছেলে সদাশিব। এবারে ম্যাট্রিক দিয়েছে। তাই বুঝি ওদের মধ্যে দেখা হওয়া মাত্রই বন্ধুত্ব হল।'

ঐতাল নাগবেণীর ঠিকুজীখানা বাড়ি নিয়ে এল। রাতে টিম্‌টিমে প্রদীপের সামনে বসে অনেকক্ষণ ধরে ঠিকুজী পরীক্ষার পরে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছল, 'এই ছেলের জন্য এই মেয়ে।' কথাটা যখন উকিলবাবুই উত্থাপন করেছেন তখন আর বাকি কী থাকল? ছেলেও মেয়েকে দেখেছে। এখন লচ্চর ইচ্ছাটা জানতে পারলে কালই কথাবার্তা বলা যেতে পারে। সেই রাতেই বাড়ির সকলকে ডেকে ঐতাল বলল, 'ভগবানের দয়ায় এই বিয়েটা যদি হয় তবে একটা দায়িত্ব নেমে যায়। পরে আরও লেখাপড়া করতে চাইলে লচ্চর থাকার জন্য আর ভাবনা থাকবে না। বুড়ো বয়সে ওর দুশ্চিন্তা নিয়ে আমাকে মরতে হবে না।'

এদিকে লচ্চ গভীর চিন্তায় মগ্ন। 'লেখাপড়া বাজে কথা, ঐরোডিতে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বিয়ের ব্যাপারে মেয়ে দেখবার জন্য। কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া ঠিকুজী যদি না মেলে তবে উপায় কী?' সরস্বতী এসে বলল, 'লচ্চ, তুই আজ গিয়েছিলি না, বাছা, সেই উকিলবাবু যদি তাঁর মেয়ের সম্বন্ধের কথা

বলেন, 'না' করিস নে কিন্তু। কুলশীল অবস্থা সবদিক দিয়ে অমন পরিবারের সম্বন্ধ অন্য কোথাও পাব না।" লচ্চ উত্তর দিল, 'তোমরা যা বলবে আমি কি তাতে না করব?' সরস্বতী নিশ্চিন্ত হল—যাক, খোকার মতিগতি আর আগের মতো নেই।

পরদিন মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে শুভ মুহূর্ত বেছে দুখানি ঠিকুজী সহ ঐতাল পুনরায় ঐরোডি অভিমুখে রওনা হল। লচ্চ পিতার সহযাত্রী হওয়ার জন্য অন্তরে খুব ব্যাকুল হলেও বাবা কী বলবে সেই ভয়ে মৌন হয়ে রইল। ঐতাল নদী পার হয়ে অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত লচ্চ পুব দিকের মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিল।

সন্ধ্যা নাগাদ ঐতাল বাড়ি ফিরে এল। উঠোনে পদার্পণ করে পায়ের ধুলোরাশি মাটির উপর সশব্দে ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'সত্য, সরসোতি, ভগবান যখন ঘটাবেন, তখন সব কিছু আপনা থেকে এসেই জোগাড় হয়—কথাটা মিথ্যা নয়।' সকলে এসে জড়ো হয়ে আগ্রহ ভরে জিজ্ঞাসা করল, 'কী, কী খবর?' আসেনি কেবল লচ্চ। সে আসেনি বটে তবে তার কান দুটি প্রসারিত ছিল এঁদের কথাবার্তার দিকে। ঐতাল শুভ সংবাদ জানাবার জন্য বলল, 'এই গরমের ছুটি শেষ হওয়ার আগেই নাকি বিবাহ সম্পন্ন হওয়া চাই। তারপরে জামাইয়ের দায়িত্ব তাঁর নিজের—এই কথা বলেছেন উকিলবাবু।'

পরদিনই কোডি থেকে খবর চলে গেল পডুমুন্নুরুতে। সেখানে লচ্চর বুড়ো দাদু খবরটা শুনে খুশি হয়ে বললেন, 'লচ্চ একবার যেন দেখা করে যায়। আমি আর কতদিন? ও মংগলুর চলে গেলে, সেখান থেকে যখন ফিরে আসবে ততদিন পর্যন্ত যে বেঁচে থাকব এমন মনে হয় না।' লচ্চ দাদুর আশীর্বাদ নিতে গেল। এদিকে ঐতালের বাড়ি বিয়ে বাড়িতে পরিণত হল। শামিয়ানা খাটানো, উঠোন লেপা, পাঁপড় বড়া তৈরি করা—এইভাবে পুরো দমে কাজ চলল। ঐতালের আহ্বানে সুব্রায় উপাধ্যায় পুনরায় প্রস্তুত হল। পার্বতী, সত্যভামা ও সরস্বতী—দিবারাত্রি কাজ করে চলেছে। বিবাহের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছে চৌদ্দ খানা গ্রামে। কেবল ঐতালের ছেলের বিয়ের কথা হলে বেশি শোরগোল হত না! কিন্তু মংগলুরের উকিল বাসুদেববাবুর মেয়ের বিবাহ, ঐরোডির সবচেয়ে বর্ধিষ্ণু পরিবারের বিবাহ—এইবলে ব্যাপারটা আরও জোরদার হয়ে উঠল। চারিদিকে একটা সাড়া পড়ে গেল।

খবরটা গ্রামের অনেকের কাছে বেশ কৌতুকপ্রদ বলে বোধ হল। কেউ কেউ শুনে খুশি হল। তবে ঈর্ষালু বোধ করবার লোকও ছিল। কেউ কেউ এমন মন্তব্যও করল—'জাত-পাত গেলেও চিন্তা নেই, সুখ হলেই হল।' শীনময়্যর মনে হল, 'উকিলবাবুর শেষ পর্যন্ত এই বৈদিক বামুনের সঙ্গে কুটুম্বিতা করবার মতো দুর্বুদ্ধি হল।' বাসুদেবয়্য হলেন মংগলুরের নামজাদা উকিল। একটা জমির মামলায় কুন্দাপুর আদালতে হেরে যাওয়ার পরে শীনময়্য যখন মনে মনে স্থির করে বলল যে মংগলুরে আপীলের জন্য বাসুদেববাবুই যোগ্য' উকিল, ঠিক তখনই এই সম্বন্ধের খবর শীনময়্যর পক্ষে মোটেই স্বস্তিকর বোধ হল না। তবু মামলার পুঁথিপত্র হাতে নিয়ে উকিলবাবুর সঙ্গে পরামর্শের জন্য তাকে ঐরোডি যেতে হল। সেখানে গিয়ে শামিয়ানা ইত্যাদি বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজন দেখে শীনময়্যর মনে হল, 'অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে এই সম্বন্ধ করছেন।' মনে হলেও কথাটা মুখে বলার মতো সাহস না হওয়ায়, শীনময়্য যেভাবে গিয়েছিল সেইভাবেই বাড়ি ফিরে এল।

উকিলবাবুর সঙ্গে কুটুম্বিতা বলে রাম ঐতাল এবারে মুক্ত হস্ত হল। স্বভাব অনুযায়ী ব্যয়কুণ্ঠ হওয়ার অভিপ্রায় আর রইল না। যেদিন বিবাহের কথাবার্তা পাকা হল, সেই দিনই ঐতাল মেয়ে-জামাই ও দৌহিত্রকে ডেকে পাঠাল। ঘরে-আসা অতিথিদের-প্রতি লচ্চ আর আগের মতো ভাব দেখাল না। বরং তার মন খুশি থাকার ফলে সকলের সঙ্গেই সে বেশ সুমধুর ব্যবহার করল, যদিও ইংরেজি-না-জানা ভগিনীপতি সুব্বির বরের প্রতি মনে মনে তার তেমন শ্রদ্ধাভক্তি ছিল না।

বৈশাখ মাসের কৃষ্ণপক্ষের সোমবার এসে উপস্থিত। হংগারকট্টের নদীর উভয় পার থেকে হাউই প্রভৃতি নানা বাজির শব্দ শোনা যেতে লাগল সকাল বেলা থেকেই। দুপুর হতে না হতেই রেশমী শাড়ি পরা স্ত্রীলোক এবং ধোপ-দুরস্ত ধুতি পরা পুরুষের ভীড়ে ও আনাগোনায় পুবের মাঠ ও পশ্চিমের মাঠ ভরে গেল। বরপক্ষ ও কনেপক্ষ দু'দিক থেকেই শীনময়্যর কাছে নিমন্ত্রণ এসেছে। তার যাওয়ার ইচ্ছা নেই। আবার না গিয়ে থাকাটাও সমীচীন হবে না। এইরূপ চিন্তা করে ছেলের বাড়ির সমাবেশে না গিয়ে সন্ধ্যার আগেই উকিল বাবুর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে কন্যাযাত্রী রূপে আসন গ্রহণ করল।

অপরাহ্ণে বরযাত্রী রওনা হল। গ্রামের ছত্র-চামর তোরণধারীর দল

সাড়ম্বরে এগিয়ে গেল। বালিয়াড়ি থেকে শুরু করে নদীর তীর পর্যন্ত বরযাত্রী সহ বাঁশিওয়ালা, বাদ্যকর, ছত্রতোরণধারী, পালকিওয়ালা প্রভৃতির জৌলুস। কেবল তাই নয়, এই বিরাট দলের সঙ্গে রয়েছে উকিলবাবুর আদেশে প্রেরিত উডুপির বিখ্যাত ব্যাণ্ডপার্টি। যেন ব্যাণ্ডপার্টিই যথেষ্ট নয় এইভেবে উকিল বাবুর ছোট ভাই নারায়ণয্য ঐতাল মহাশয়কে বলেছিল যে এক জোড়া হাতীর ব্যবস্থা করলে খুব জমকালো হয়। 'বেশ তাই হোক, আমার থাকার মধ্যে তো একটি মাত্র ছেলে'—এই ভেবে ঐতাল উডুপি মঠের দেবালয় থেকে দু'দুটো হাতীর ব্যবস্থা করে। নদী পার হয়েই বরযাত্রীরা এই দুটো হাতীর অনুগামী হয়ে ঠিক গোধুলি বেলায় বিবাহের মণ্ডপের দিকে অগ্রসর হল। ঐতাল দু বার করে শীনময্যর বাড়িতে লোক পাঠিয়ে জানতে পায় যে সে তখন বাড়ি নেই।

ঠিক সন্ধ্যাবেলা উকলিবাবুর বাড়ির সম্মুখবর্তী মাঠে এসে বরযাত্রীরা জমায়েত হল। কনে পক্ষের মেয়েরা এল অতিথিদের অভ্যর্থনার জন্য। ঠিক সেই সময়ে একসঙ্গে বেজে উঠল বাঁশী ও ব্যাণ্ড, শুরু হল হাউই প্রভৃতি বাজির বিস্ফোরণ। যেন একটা যুদ্ধই লেগে গেছে। বাজি ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকল। আর সেই সঙ্গে চলতে থাকল কন্যাপক্ষীয় রমণীদের গীতধারা।

অতিথিরা এসে প্রবেশ করল বিবাহ আসরে। সেই সুসজ্জিত মণ্ডপের যে দিকেই তাকানো যায়, কেবল গুচ্ছ গুচ্ছ সুপারি, কলা ও নারিকেল ফল ঝোলানো। সমস্ত খুঁটিতে আমের পাতা ও 'বয়নি' পাতার অলংকার। শতরঞ্জি বিছানো আসরে সারি সারি তাকিয়া সাজানো। উকিলবাবু উডুপি থেকে মণ্ডপ নির্মাতা আনিয়ে চিত্রে সুশোভিত সুউচ্চ মণ্ডপ তৈরি করিয়েছেন। কেবল কি তাই, নাগম্মার খেম্‌টানাচের দলও যথারীতি উপস্থিত। নর্তকীদের প্রথম সেলাম লাভের সম্মানের অধিকারী হল বরকর্তা রাম ঐতাল। ঐতালের জীবনে এই সর্বপ্রথম 'দৌলতজাদা' সম্বোধনে অভিহিত হওয়ার দুর্লভ সুযোগ ঘটল। এই বিচিত্র সমারোহে বিভ্রান্ত লচ্চকে নিয়ে আসা হল বিবাহ মণ্ডপে। প্রজ্জলিত অগ্নি থেকে ধোঁয়া উদ্‌গীর্ণ হতে থাকে। সম্মুখে উপবিষ্ট বিশিষ্ট অতিথিদের উপর গোলাপ জল ছিটিয়ে তাদের জন্য পাখার বাতাস এবং রুপোর গ্লাসে করে চিনির শরবতের ব্যবস্থাও করা হল। বিবাহের যাবতীয় কর্তৃত্ব উকিলবাবুর ছোট ভাই নারায়ণবাবুর হাতে। সে গ্রামের সমাজপতি। কাজেই বিবাহের ব্যবস্থায় কোন খুঁত থাকল না।

কন্যাপক্ষীয় রমণীরা গলা ছেড়ে গান ধরেছে—'জনক রাজার মতো মিথিলা পুরীর মতো …।' মিনিট খানেক পরেই অপ্রত্যাশিত বজ্র-গর্জনে রমণীদের গীত ও পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ দুই ডুবে যায়। মণ্ডপে প্রজ্বলিত অগ্নিদেবতার ধূম্র-রাশিতে হঠাৎ ঢাকা পড়ে যায় আসরের সম্মুখে স্থাপিত অগুরু বাতির মৃদু সুরভিত ধোঁয়া। নিমেষের মধ্যেই প্রবল হাওয়ায় বিবাহের আসর ধুলোয় ভরে যায়। ব্যাপার কী দেখবার জন্য নারায়ণয্য বাইরে ছুটে আসে। আকাশ ততক্ষণে ঘন মেঘে অন্ধকার এবং অন্ধকারের মধ্যে অবিরাম বিদ্যুতের ঝিলিক। এদিকে মণ্ডপে ঐতাল মনে মনে প্রার্থনা জানাল, 'হে ভগবান বিয়েটা যেন কোনোমতে সম্পন্ন হয়ে যায়।' নারায়ণয্য সোজা এসে ঐতালের কানে কানে বলল, 'বৃষ্টি নামতে পারে, কিন্তু তাতে বিয়েটা আটকাবে না। শামিয়ানার আচ্ছাদনে যে ক্যাম্বিস কাপড় দেওয়া হয়েছে তা দিয়ে জল ঢুকবে না। তবে জোর বৃষ্টি আসার ভয়ে নিমন্ত্রিতেরা যেন তাড়াতাড়ি করে খালি হাতে ফিরে না যায়, বরবধূকে আশীর্বাদ না করে। আপনি দক্ষিণা দিতে আরম্ভ করন। পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ বায়ুবেগে এগিয়ে চলে। কনের বাবা যখন 'অন্তঃপটে'র সামনে কনেকে এনে তুলে ধরল, তখনই শোনা গেল বৃষ্টির পট পট শব্দ। লচ্চর গলায় মালা পরানো হল। সেও সোৎসাহে কনের গলায় পরিয়ে দিল পুষ্পমাল্য।

ঐতাল টাকার থলেটি হাতে নিয়ে সকলকে দক্ষিণা দিতে গিয়ে দেখল যে বিবাহের শেষ গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান জলধারাবর্ষণ শেষ হয়ে গেছে। যাক্, আর ভয়ের কারণ নেই। গ্রামের সাধারণ নিয়ম—পরিবার পিছু আড়াই আনা দক্ষিণা দেওয়া, সে দিন কিন্তু ঐতাল সাধারণ গ্রামবাসীর মতো আড়াই আনার পরিবর্তে তিন আনা এবং বিশিষ্ট ঐশ্বর্যশালী গৃহস্থকে চার চার আনা করে দক্ষিণা দিল। খুশিমনে অতিথিরা আলোচনা করছিল, 'দেখলে হে, ঐতালমশাই সারা গ্রামবাসীকে হার মানিয়েছে' এই কথা বলতে বলতেই আসরের মেঝে প্রবল বর্ষণের জলে পূর্ণ হয়ে ধান ক্ষেতের মতো দেখাচ্ছিল। বিবাহের জন্য নির্মিত উচ্চ মঞ্চে অবশিষ্ট গৌণ অনুষ্ঠান কোনো রকমে চলতে থাকল। অতিথিদের মধ্যে যারা তখনও যায়নি, তারা এ ঘরে সেঘরে, বারান্দায়, গোয়াল ঘরে যে যেখানে পেরেছে আশ্রয় নিয়ে হি হি করে কাঁপছিল।

সরস্বতী ও পার্বতী অর্ধ-সিক্ত হলেও লচ্চর পার্শ্বে অবস্থিত বিবাহের

যৌতুকাদি দেখে খুব তৃপ্তি অনুভব করেছে। সরস্বতী এক সময়ে পাশ ফিরে বলল, 'পারোতি, দাদার ঠিকুজীতে, আর কিছু না থাক, এই বৃষ্টির যোগ খুব লেখা আছে।' পার্বতীর মনে পড়ল তার নিজের বিয়ের দিনের কথা। সেদিন কী তুমুল বৃষ্টি। সে বলল, 'তখনও ভগবান যেমন রক্ষা করেছিলেন, আজও তেমনি করলেন।'

লচ্চ ও নাগবেণী যখন বর বধূর আসন থেকে উঠে দাঁড়াল তখন বৃষ্টি সম্পূর্ণ ছেড়ে গেছে। বিবাহের অনুষ্ঠান শেষ হলে ঐতাল কোডিগ্রামে ফিরে এল। উদ্‌ভ্রান্ত বরযাত্রা দলের দিকে তাকিয়ে নীল আকাশে তখন চাঁদ হাসছিল।

বিবাহের চারটি দিন আনন্দ উৎসবে কেটে গেলে বর কনে তাদের বাড়িতে এসে গৃহপূর্ণ করল। তাই বিয়ের পরে লচ্চর প্রতি ঐতালের মনোভাবে কিঞ্চিৎ পরিবর্তনের ফলে পিতাপুত্রের মধ্যে পুনরায় স্বাভাবিক কথাবার্তা শুরু হল।

ছুটি শেষ হয়ে কলেজ শুরু হতে এখনও দিন পনেরো বাকী। কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য এখনও দিন কয়েক হাতে আছে। ততদিন লচ্চর হাতে কাজ কিছুই নেই। শ্বশুরবাড়ি যাতায়াতের জন্য কেবল নদীর এপার থেকে ওপার আবার ওপার থেকে এপার পর্যন্ত পারাপার করছে। বুড়ো হয়ে পড়েছেন বলে দাদু ওর বিয়েতে যেতে পারেন নি। লচ্চ একদিন নাগবেণীকে নিয়ে দাদুর ওখানে রওনা হল। এতদিন পর্যন্ত নাগবেণীর সঙ্গে লচ্চর কথা বলার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। নাগবেণী যেন লজ্জার পিণ্ড আর কি! কেবল আরতি, অক্ষত প্রভৃতি মঙ্গলাচারের সময়ে ছাড়া সর্বদাই সে মেয়েদের মধ্যে বসে থাকে। মঙ্গলাচারের সময়টুকুতে তারা পরস্পরকে লুকিয়ে দেখে নেয়। লচ্চর উৎকট আকাঙ্ক্ষা স্ত্রীর সঙ্গে একটু কথা বলে। কিন্তু নাগবেণী ভারি মুখচোরা লাজুক মেয়ে। লচ্চ সুযোগ খোঁজে কখন নাগবেণীকে একটু নিরালায় পাওয়া যাবে। যখন সেই সুযোগ আসে, তখন আর ধারে কাছে নাগবেণীকে দেখা যায় না। যখন বা দেখা যায়, লচ্চর উৎসাহকে বাধা দেওয়ার জন্য, আর কেউ না হলেও, সমবয়সী শ্যালক সদাশিব সেখানে এসে হাজির হয়।

কাজেই দাদুর বাড়িতে যাত্রা নবদম্পতির আলাপের বড় অনুকূল হল। তারা কোডি থেকে তোন্‌সে পর্যন্ত যাবে নৌকাযোগে এবং তোন্‌সে থেকে দাদুর বাড়িতে পদব্রজে। আলাপের কোনো বাধাই থাকবে না, কেউ কিছু বলতেও আসবে না। নৌকা ছেড়ে দিলে লচ্চ নাগবেণীর মুখের দিকে তাকিয়ে

মৃদু হাসল। নাগবেণীও মুচকি হাসিতে জবাব দিল, অবশ্য মাথা নীচু করে লচ্চ এই বলে স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ শুরু করে—'তুমি একটি বোবা মেয়ে।' নাগবেণী জবাব দেয়—'আর তুমি?' নৌকা তোন্‌সের কিনারে এসে না পৌঁছনো পর্যন্ত নাগবেণীর মুখে যেন কথার খই ফুটছিল। স্বামীর সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ তারও কিছু কম নয়। কিন্তু অন্য লোকের সামনে সে মুখ খুলতে পারে না, গলা যেন তার আটকে যায়।

দাদুর বাড়িতে লচ্চদের খুব আদর অভ্যর্থনা হল। দৌহিত্রের বধূ নাগবেণীর প্রতি বৃদ্ধের প্রীতি-স্নেহের অন্ত নেই। মাধপ্পয়্য মহাশয় তাঁর লোকান্তরিত পত্নীর কথা ভেবে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'আহা ওর অদৃষ্টে ছিল না নাতবৌয়ের মুখ দেখা।' দাদু অনেক পীড়াপীড়ি করলেন নাতি ও নাতবৌ তাঁর ওখানে দিন কয়েক থেকে যাক। এ বাড়িতে নবদম্পতির পূর্ণ স্বাধীনতা বলে তাদেরও কোনো আপত্তি হল না। ঐতাল যখন খবর পাঠাল যে 'পাড্যাহ্ন' উৎসবের জন্য তাদের বাড়িতে আসা দরকার, তখন নিরুপায় দম্পতি ফিরে এল। আসার পরেই নাগবেণীর মুখ বন্ধ হয়ে গেল।

'পাড্যাহ্ন' উৎসব মিটে গেলে এবং এই উপলক্ষ্যে আগত অতিথিরা যে যার স্থানে চলে গেলে লচ্চ নাগবেণীকে সমুদ্রতীরে নিয়ে যাওরার জন্য ব্যাকুল হল। একদিন শ্যালক সদাশিবকে ডেকে বলল, 'চলো, সমুদ্রতীরে যাই।' তারপরে ধীরে ধীরে তার কানে কানে বলে দিল, 'তোমার বোনকেও নিয়ে এসো।' দৌত্য ব্যর্থ হল না। দাদার সঙ্গে কথা বলতে বলতে নাগবেণী সমুদ্রের পারে গেল। সেখানে আগে ভাগেই গিয়ে লচ্চ ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু কোডিগ্রামে চোখওয়ালা লোকের অভাব নেই। খবরটা সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল। ওরা ফিরে এলে সরস্বতী লচ্চকে ডেকে বলল, 'এসব কী খোকা? বিয়ের সাত আট দিনের মধ্যেই বৌকে নিয়ে এইভাবে বেড়ানো গাঁয়ের লোকে বলবে কী?' ঐতাল রেগে গিয়ে বলল, 'আজকালকার ছেলেদের লজ্জাশরমের বালাই নেই। বিয়ের পরে এক বছর পর্যন্ত আমি পার্বতীর সঙ্গে কথা বলতে সাহস পাই নি।'

বৃষ্টি বাদল শুরু হতে বৈশাখের গরমটা ঠাণ্ডা হল। উকিলবাবু সপরিবারে মংগলুর যাত্রার জন্য তৈরি হলেন। একদিন সদাশিব এসে ঐতালকে জানাল, 'বাবা বললেন যে আপনাদের লক্ষ্মীনারায়ণ যদি আমাদের সঙ্গে মংগলুর যায়

তো ভাল হয়।' লচ্চও এই শুভ মুহূর্তের অপেক্ষা জন্য করছিল। ঐতাল সেদিন সদাশিবের সঙ্গেই ঐরোডি রওনা হল বৈবাহিক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা করবার জন্য। সেখানে সাব্যস্ত হল—লচ্চ উকিলবাবুর বাড়ির জামাইরূপে মংগলুরে লেখাপড়া করবে এবং এফ. এ. পাশ করবার পরে অন্য চিন্তা। ঐতালের মাথার বোঝা যেন নেমে গেল। বলল, 'ছেলেটা বুদ্ধিহীন। এখন থেকে আপনিই ওর বাপ মা। দোষ করলে ওকে উপদেশ দেবেন, শাসন করবেন।' উকিলবাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'ঐতাল, আমাদের মেয়ের মঙ্গল কি আমরা চাই না?' রাম ঐতালের মুখ কেন কী জানি বিবর্ণ হয়ে গেল। তার মনের মধ্যে কেবল এই একটা ভয় দেখা দিল—লচ্চ তার পিতৃকুলের মান মর্যাদা নষ্ট করবে না ত!

লচ্চ যাবার আগে আর একবার দাদুর সঙ্গে দেখা করতে গেল। এবারে বুড়ো দাদু লচ্চকে বুকের কাছে নিয়ে বললেন, 'দাদু ভাই, সদ্‌বংশে কুটুম্বিতা হয়েছে। তুমিও এখন বড়সড় হয়েছ। জানত তোমাদের বংশও কত বড়। এখন সমস্ত ছেলেমানুষী ত্যাগ করে বুদ্ধিমান ছেলের মতো বংশের মান মর্যাদা বাড়িও। এর পরে যখন আসবে, তখন আমি থাকব কি না কে জানে।' এই বলে লচ্চকে বিদায় দিলেন।

দাদুর কথাই সত্য হল। লচ্চ মংগলুরে চলে গেছে। এদিকে বর্ষাকালের প্রকোপও প্রবল। দিবারাত্রি অবিরাম সমুদ্র গর্জনে কান প্রায় বধির হওয়ার উপক্রম। গ্রামের নারকেল গাছগুলি মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে বেঁকে পড়ে। নদীর লাল ঘোলা জল মোহানা দিয়ে এসে এক নাগাড়ে সমুদ্রের বুকে পড়ছে। সেই অবিশ্রান্ত ধারাবর্ষণে বৃদ্ধ মাধপ্পয্য 'শীতজ্বরে' শয্যা নিলেন। কাশি কফ বেড়ে গিয়ে একসপ্তাহের জ্বরেই তাঁর ইহলোকের যাত্রা শেষ হয়ে গেল।

লচ্চর কলেজে ভর্তি হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে বাড়ি থেকে দাদুর মৃত্যু সংবাদ এসে পৌঁছল। লচ্চ মনে মনে ভাবল—এতদিন পরে আজ দাদুর বাড়ির বন্ধন ছিন্ন হল। মামা আছে বটে, কিন্তু লচ্চর প্রতি তার দৃষ্টি প্রসন্ন নয়।

দাদুর মৃত্যুর পরে পুরো একমাসও যায় নি। ঐতালের কাছ থেকে লচ্চর পত্র এল। বাবা লিখেছে, 'খোকা, কয়েকদিন যাবত তোমার বড়মা শয্যাগত। তোমাকে খুব দেখতে চায়, নবরাত্রির সময়ে ছুটি হলেই বাড়ি এসো।' বাবার চিঠিখানি পড়তে পড়তে অন্তত সেই মুহূর্তের জন্য লচ্চর মনে বড় মায়ের স্নেহ ভালবাসার কথা না জেগে পারে নি। পত্র পাওয়ার তিনদিনের মধ্যে লচ্চকে

গ্রামের দিকে রওনা হতে হল। বাড়ি থেকে টেলিগ্রাম এসেছে বড়মার অবস্থা ভালো নয়। ঘোড়ার গাড়িতে করে যখন সে সন্ধ্যানাগাদ গ্রামে এসে পৌছল, ততক্ষণে পার্বতী শেষ নিশ্বাস ছেড়েছে।

পার্বতীর মৃত্যুকালে ঐতাল, সত্যভামা, সরস্বতী—সকলেই তার সেবা-পরিচর্যা করছিল। ঐতাল কতদিন কত কটু কথা পার্বতীকে বলেছে সেই সব স্মরণ করে চোখের জল ফেলল। একথাও বলল, 'পারোতি, আমার কাছে তুমি কত কষ্ট পেয়েছ!' অশক্ত হয়ে পড়লেও, শেষ পর্যন্ত পার্বতীর জ্ঞান ছিল। বলেছিল, 'আপনি অমন কথা বলবেন না। আপনি যদি সত্যকে না আনতেন কে আমার শ্রাদ্ধ করত?' পরক্ষণে ও একথা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'লচ্চ কি এসেছে?' 'এসে যাবে।' সরস্বতী তার শ্বাসের টান দেখে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'পারোতি, মুখে একটু গঙ্গাজল দেব? 'নারায়ণ' বলার মতো শক্তি আছে? বলতে পারছ কি?' পার্বতীর দৃষ্টি সরস্বতীর উপর নিবদ্ধ হল। বলল, 'বলছি, 'নারায়ণ নারায়ণ' বলছি। আমার জিভ ক্ষীণ হয়ে এলে তুমি আমার কানে 'নারায়ণ' নাম শুনিও।' পার্বতীর মুখেচোখে কী যেন একটা অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা! সরস্বতী বলল, 'কি? কিসের ইচ্ছা পারোতি?' 'কিছু নয়।' 'লচ্চকে দেখতে চাও?' 'না।' অতঃপর অতি ক্ষীণ কণ্ঠে পার্বতী বলল, 'ঠাকুরঝি, উনি আমার মাথাটা ওঁর কোলের উপর একটু নেবেন?' সত্যভামা তখন সেখানেই দাঁড়িয়ে। আর, ঐতাল ঠাকুর ঘরে বসে জপ করছে। পার্বতীর কথায় সত্যভামার এই ভেবে খুব কষ্ট হল—'আমার জন্য এই রমণী আর কত কষ্ট পাবে! কত আর মুখ বুজে দুর্ভোগ ভুগবে?' সত্যভামা অশ্রুচোখে স্বামীর কাছে ছুটে গিয়ে বলল, 'একবার এসো তো। দিদির বোধ করি সময় হয়েছে। তুমি তাঁর মাথা তোমার কোলে একটু রাখবে বলে দিদি আশা করে আছে।'

জপ করতে করতে ঐতালের মুখ কেঁপে গেল। পার্বতীর কাছে যখন ছুটে এল, তখন মুমূর্ষু নারীর জিভ ক্ষীণ হয়ে এসেছে ও শ্বাসের টান উঠেছে। কিন্তু পার্বতী তার পরিপূর্ণ চোখে তাকিয়ে ছিল স্বামীর মুখের দিকে। ঐতাল তার কোলের উপর পার্বতীর মাথাটা রেখে 'নারায়ণ' নাম স্মরণ করছে আর মুমূর্ষু রমণী অতি সহজ ভাবে দেখছে তার স্বামীকে। সরস্বতী পার্বতীর মুখে একটু গঙ্গাজল ঢেলে দিল। সত্যভামা গিয়ে পায়ের কাছে বসল। পার্বতীর মুখে অগাধ শান্তি।

ঠোঁটের নিষ্পাপ শিশুসুলভ সরল হাসিটুকু যেন এই কথাই প্রকাশ করছিল —আর কী চাই।

সমস্তই মুহূর্তের জন্য। পরক্ষণেই বাড়িময় কান্নার রোল পড়ে গেল। সরস্বতীর কান্না এল না। অসহ্য বেদনায় দু'হাত দিয়ে সে নিজের বুকটাকে চেপে ধরল। তার মনে হল, 'ভগবান্, পারোতি চলে গেলে আমি আর কিসের জন্য বেঁচে থাকব?'

প্রতিবেশী যারা দেখতে এল তাদের সকলের মুখে এই একটি কথা, 'পুণ্যবতী রমণী।' লচ্চ যখন হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল, তখন কাঠের জন্য গাছের উপর কুড়ুল পড়েছে। বাড়িতে এসে পৌঁছবার আগেই কান্নার শব্দ শুনে লচ্চ এই বলে কেঁদে উঠল, 'বড়মাকে দেখার কপাল আমার হল না।'

পরবর্তী তেরো দিন পর্যন্ত লচ্চ দুঃখ কষ্টের স্বাদ অনুভব করল। এই তার প্রথম অনুভব। উঠোনে নামল, পুকুরের ঘাটে গেল, কলাই ক্ষেতের দিকে তাকাল, হোম্নে গাছের বাগানে —সর্বত্রই যেন বড়মায়ের মূর্তি।

পনের

লচ্চ আবার মংগলুরে এসে তার এফ এ পড়া শুরু করেছে। শহরের নতুন পরিবেশে লেখাপড়ার ফলে তার এমন একটা দম্ভ হয়েছে যে এখন যদি কেউ তাকে 'লক্ষ্মীনারায়ণ' না বলে 'লচ্চ' বলে ডাকে তবে সে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। অবশ্য তার সমবয়সী শ্যালক সদাশিব এখনও তাকে ডাক নামে ডাকার অধিকার বজায় রেখেছে।

শ্বশুরবাড়ির আদর আপ্যায়ন লচ্চর ভালো না লাগার কথা নয়। মাঝে মাঝে বিভ্রাট বাধায় সদাশিব। ছেলেটা আমুদে, কথাবার্তায় খুব ফাজিল, কিন্তু তার রঙ্গরসের মাথামুণ্ডু বোঝা ভার। তবু লচ্চ চুপ করে সহ্য করে যতক্ষণ না তাকে উত্যক্ত করা হয়। কিন্তু সদাশিব যখন ভগিনীপতিকে নিয়ে বাজে ঠাট্টা-ইয়ারকি করে, তখন আর ছাড়া নেই। বাঘের মতো লাফিয়ে ওঠে লচ্চ। সদাশিব সে কথা জানে বলে সময় বুঝে আরও খেপিয়ে তোলে এবং ক্ষিপ্ত ভগিনীপতির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বাড়ির ভিতর দৌড়ে গিয়ে বোনকে ডেকে বলে, 'নাগবেণী, তোর স্বামী তোকে ডাকছে।' নাগবেণী এসে বলে, 'তুমি নাকি আমায় ডেকে পাঠিয়েছ?' স্ত্রীর হাসি হাসি মুখ দেখে লচ্চর বিকৃত মুখভঙ্গী অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এলে সে আবার একবার ঠাট্টা করার সুযোগ পায়।

নাগবেণীর সাহচর্য লচ্চর পক্ষে মনোরম সন্দেহ নেই, কিন্তু শ্বশুরবাড়ি থাকার অসুবিধাও কম নয়। শ্বশুর হলেন শহরের নামজাদা উকিল। কিন্তু উপাধ্যায়ের হোটেলে লচ্চ যেমন স্বাধীন ভাবে থাকতে পারত, এখানে তেমন ভাবে থাকার উপায় নেই। এখানে শ্বশুরমশায়ের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে মান্য করে চলতে হয়। মনের ইচ্ছামতো ঘোরাফেরা করা, মৌজ করে পাশা খেলা—এ সবের কিছুমাত্র সুযোগ নেই। ঘরজামাই হয়ে যেন ভিজে বেড়ালের মতো আছে। প্রথম প্রথম লচ্চর খুবই কষ্ট হত। মনে হত, শ্বশুরের আশ্রয়ে থাকা তার পোষাবে না, কোনো হোটেলে কিংবা মেসেই সে একটা আস্তানা জুটিয়ে নেবে। কিন্তু নাগবেণীকে ছেড়ে থাকাও কষ্টকর। তার সঙ্গে গল্প করতে ভালো লাগে, ভালো লাগে তার কাছে নিজের বাহাদুরি দেখাতে। নাগবেণী পড়ে মাত্র

উচ্চ প্রাইমারীর প্রথম শ্রেণীতে। তার অজানা বিষয়গুলি জানার জন্য কারো-না-কারো সাহায্য দরকার। বিদ্বান স্বামী থাকতে অন্য কার কাছে যাবে? নাগবেণী যদি কোনো দিন না-ও যায়, লচ্চ নিজেই গিয়ে প্রশ্ন করে—'আজকের পড়া তৈরি হয়েছে? কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই?' লচ্চ আগেই দেখে নেয়, সদাশিব ধারে-কাছে নেই তো। লচ্চ ও সদাশিব একই ক্লাসে পড়ে, তবে লেখাপড়ায় সদাশিব যতটা তুখোড়, লচ্চ ততটা নয়। তাই স্ত্রীর কাছে বিদ্যা জাহির করে অতি সন্তর্পণে। দৈবাৎ সদাশিবের চোখে পড়ে গেলে সে বিদ্রূপ করে বলে, 'এ নাগবেণী, তোর স্বামী কী জানে যে তুই তাকে জিজ্ঞেস করছিস? এদিকে আয়, আমি বলে দিচ্ছি।'

দুটি বছর শ্বশুরালয়ে কেটে গেল। শ্বশুরবাড়ি তো নয়, বিধিনিষেধের পিঞ্জর। হোটেল-রেস্টুরেন্ট দেখলে ইচ্ছা হয় একবার পদার্পণ করে। কিন্তু পয়সা নেই বলে পকেটে হাত দিতে সাহস হয় না। মিথ্যা অজুহাতে যে শ্বশুরকে ঠকিয়ে টাকা নেবে তারও উপায় নেই, কারণ সঙ্গে আছে সদাশিব। কলেজে যখন যা দরকার, সদাশিবের সঙ্গে সেও পায়, তার বেশি আর কি পাবে?

দু'বছর পড়া শেষ করে লচ্চ এখন বাড়ি ফেরার উদ্‌যোগ করছে। যাওয়ার আগে নাগবেণীকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি যাবে না কি আমার সঙ্গে?' নাগবেণী উত্তর দিল, 'যাব, তবে বাবাকে একবার বলে দেখো।' লচ্চর এতটা সাহস নেই যে শ্বশুরমশায়ের কাছে গিয়ে বলবে, 'নাগবেণীকে আমার সঙ্গে যেতে দিন।' আর কিছুদিন পরেই নাগবেণীর বাবা গরমের ছুটিতে দেশে যাবেন, সুতরাং লচ্চর এত ব্যস্ততা কিসের? শ্বশুরবাড়ি থেকে রওনা হওয়ার আগের দিন লচ্চ ভ্রূকুঞ্চন করে গোম্‌রা মুখ হয়ে বসে আছে। নাগবেণীরও মন ভাল নেই। সে ধীরে ধীরে বাবার কাছে গিয়ে বলল, 'বাবা, তোমাদের দেশে কবে-না-কবে যাওয়া হয়, আমি তোমার জামাইয়ের সঙ্গে যাব?'

'না মা, তুমি আমার সঙ্গে যাবে।'

'কেন বাবা?' একথাটা জিজ্ঞাসা করবার আগেই উকিলবাবু বললেন—'এ রকম যাওয়াটা তোমার শ্বশুরমশাই পছন্দ করবেন না। জানোতো ওঁরা সেকেলে ধরণের লোক। এবারকার ছুটিতে দেশে গিয়ে 'মুহূর্ত্তু'টা হয়ে গেলে পরে যা-খুশি করতে পার।' নাগবেণী এখন 'পুষ্পবতী' এই কথা মনে হতে সে চুপ করে রইল। রওনা হওয়ার দিন লচ্চ গিয়ে তার স্ত্রীকে বলল, 'বাবাকেই

তোমার চাই, আমাকে চাই না, কেমন ?' যাওয়ার আগে নাগবেণীকে কাঁদিয়ে গেল। লচ্চ চলে যাওয়ার পরদিনই নাগবেণী, তার না আসতে পারার সমস্ত কারণ জানিয়ে স্বামীকে একখানি পত্র দিল।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে বাসুদেব উকিল সপরিবারে দেশের বাড়িতে উপস্থিত হল। খবরটা পেয়েই লচ্চ পুলকিত চিত্তে শ্বশুরবাড়িতে দৌড়ল। বোনের কাছ থেকে সদাশিব ভগিনীপতির অসন্তোষের কারণ শুনেছিল। লচ্চ আসতেই সদাশিব তাকে পরিহাস করে অভ্যর্থনা জানাল, 'কি ভগিনীপতি মহোদয়, আপনার রাগটা পড়ল ? মেজাজ এখন খুশ তো ?'

ছুটির মধ্যে পরীক্ষার ফল বেরিয়ে গেল। এফ. এ পরীক্ষায় সদাশিব প্রথম শ্রেণীতে এবং লচ্চ দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাস করেছে। কোডিগ্রামে খবর পৌঁছলে পুত্রের সাফল্যে খুশি হয়ে রাম ঐতাল বেহাই বাড়িতে গিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে জানাল, 'সবই আপনার অনুগ্রহে, আপনার কন্যার পাণিগ্রহণের কল্যাণে।' পিতৃদেবের এই জাতীয় কথাবার্তা লচ্চর মোটেই ভালো লাগল না, তবু সে গুরুজনকে সমীহ করে চুপ করে রইল। পুনর্বিবাহের প্রসঙ্গ উপস্থিত হলে ঐতাল বলল, 'এই ছুটিতেই হয়ে যাক তাহলে। পরে ও কোথায়-না-কোথায় পড়াশুনো করবে। আজকালকার ছেলে-ছোকরা ! বাধাবিঘ্ন না এসে পড়ে।'

এই ছুটিতে লচ্চকে খুব খুশিই দেখা যাচ্ছে। নদীর এপার-ওপারে তার প্রায় নিত্য যাতায়াত। একদিন সরস্বতী বলল, 'লচ্চ, নাগবেণীকে নিয়ে এসে এখানে কয়েকটা দিন সুস্থ হয়ে থাকতে পারিস নে ? তোরা সুখে থাকবি, আমরা দেখে চোখ জুড়োবো।' লচ্চ জবাব দিল, 'হ্যাঁ, ও হল উকিলবাবুর মেয়ে। ওখানে কত ভালো ভালো খাওয়া-দাওয়া ! কাজ বলতে কিছুই নেই। এখানে এলে তো তোমরা তাকে দিয়ে থালা বাসন 'মাজাবে'। সরস্বতী হাসল, হেসে বলল, 'তোর মাকে জিজ্ঞেস কর্, তোর মা যখন প্রথম এ বাড়িতে এল, আমরা তাকে দিয়ে কত কাজ করিয়েছিলাম ? ও যেচে যে সব কাজ করত, তাছাড়া আমরা কোন দিনই ওকে দিয়ে কাজ করাই নি। এখন তোর কি কি চাই বল্, করিয়ে দেব। সে যে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন বাপের বাড়িতেই থাকবে এটা ভালো নয়।'

সরস্বতীর কথায় কোনো কাজ হল না দেখে সে ভাবল, দাদাকে দিয়ে কথাটা পাড়তে হবে। ঐতাল সব শুনে লচ্চকে কিছু না বলে একদিন

ঐরোডি গিয়ে বলল, 'উকিলবাবু, নাগবেণী আমাদের ওখানে গিয়ে এক সপ্তাহ থাকুক না।' লচ্চ ধারে কাছেই ছিল। তার সামনেই উকিলবাবু বললেন, 'এক সপ্তাহ কেন? এক মাসই থাক্ না। মংগলুর যাওয়ার সময়ে এলেই হল। এখন আর আমাকে কেন বলা? আপনার পুত্রবধূ, যখন খুশি নিয়ে যাবেন।' নাগবেণীরও খুব ইচ্ছা শ্বশুরবাড়ির সকলের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হোক। কাজেই সেদিন সে শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে নদী পার হয়ে কোডিগ্রামে এল।

নাগবেণীর পশ্চাতে লচ্চও এল। নাগবেণীকে বাড়িতে নিয়ে আসা বিষয়ে লচ্চর যেন কি একটা পরাজয় হয়েছে বোধ হল। এতে সে খুশি না হলেও পিতৃদেব হস্তক্ষেপ করেছেন বলে চুপ করে রইল। শ্বশুরবাড়িতে নাগবেণীর আদর আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি হল না। নিজে থেকেই সব কাজে সে এগিয়ে আসে, 'আমি কেন ঘর নিকিয়ে দিই না? ঘোলটা আমি তৈরি করে দেব?...' একদিন সে সরস্বতীকে জিজ্ঞেস করল, 'পিসীমা, সুব্বি ঠাকুরঝির সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয় নি। ভারি দেখতে ইচ্ছে করে। আমি মংগলুর যাওয়ার আগে আপনি একবার তাকে ডাকিয়ে আনবেন?' সরস্বতী বলল, 'ভালো তো, লচ্চ গিয়ে সুব্বিকে নিয়ে আসতে পারে।' পিসীমার কথামতো নাগবেণী ব্যাপারটা স্বামীকে জানল। বলল, 'তোমার বোনকে আমি একবার দেখবো না?' লচ্চ উত্তর দিল, 'দেখবার কী আছে? তোমারই মতো তারও দুটো চোখ, দুটো পা।' নাগবেণী স্কুলে পড়া মেয়ে। হেসে উত্তর দিল, 'তাহলে আমার মতো যাদের দুটো চোখ আছে, তাদেরকে আমার দেখার দরকার নেই, কী বলো?'

অগত্যা লচ্চকেই বোনের বাড়ি যেতে হবে। হেঁটে যেতে তার ভালো লাগে না। কিন্তু কি করা? এদিকে পিসীমা বা শ্বশুরমশাই গিয়ে সুব্বি ঠাকুরঝিকে নিয়ে আসবেন এতে নাগবেণী মত দিতে পারে না। বয়সের কথা ভেবে গুরুজনকে ওকথা বলা সাজে না তাই স্বামীকে মংদর্তি যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকে। ঐতালের কানে কথাটা যেতেই সে বলল, 'সরসোতি গোবিন্দ মাঝিকে বলে দিস, কাল শুকতারা উঠলেই যেন লচ্চ ও নাগবেণীকে নৌকায় করে বারকূরু পর্যন্ত নিয়ে যায়। পরে ওখানকার ঘাটে নৌকা বেঁধে গোবিন্দ যেন ওদের দুজনকে মংদর্তি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসে। ওরা ওখানে কয়েক দিন থেকে ফেরার সময় সুব্বি ও তার ছেলেকে নিয়ে আসবে।' এই

সব প্রস্তাবে লচ্চ মৌন হয়ে থাকল। শশুরবাড়িতে দু'বছর থাকাকালে সে এই প্রকার মৌনব্রতের কৌশল আয়ত্ত করেছে।

পরদিন অতি প্রত্যুষে স্বামী স্ত্রী দুজনে মিলে যাত্রা করল। এর আগে নাগবেণী কেবল মংগলুর ও ঐরোডি দেখেছে, আর কোথাও যায় নি। কাজেই বেড়াতে খুব ভালো লাগে তার। নতুন জায়গা দেখতে, নতুন লোকের সঙ্গে পরিচিত হতে সে স্বভাবতই উৎসুক। স্বামীর এই প্রকার ঔদাসীন্য দেখে সে বলল, 'হ্যাঁগা, তুমি তো সব দেখেছ। আমি তো এর আগে কিছুই দেখি নি। তাই খুব দেখার ইচ্ছা।' সেই প্রভাতের নৌকাযাত্রা নাগবেণীকে মুগ্ধ করেছে। 'মংগলুরে এই দৃশ্য কোথা থেকে আসবে? এই বাগান, এই বালিয়াড়ি!' এই বলে নাগবেণী বিস্ময় প্রকাশ করল। ভোর হতেই নৌকা এসে বারকূরু গ্রামে পৌঁছল। ঘাটে নৌকা বেঁধে গোবিন্দ মাঝি পথপ্রদর্শক হয়ে ওদের দুজনকে কুটুম বাড়িতে নিয়ে চলেছে। নাগবেণী পদে পদে প্রশ্ন করতে থাকে—'এটা কি? ওটা কি?' সারা পথ ধরে যত ভাঙা মঠ-মন্দির, পুকুর রাস্তা দেখা গেল সেগুলি সম্পর্কে তার কৌতূহলের অন্ত নেই। গোবিন্দও উপযুক্ত শ্রোতা পেয়ে তার স্থূল পুরাণের জ্ঞান সবিস্তারে বিবৃত করল। লচ্চ এক সময়ে বিরক্ত হয়ে স্বামীর অধিকার জাহির করে বলল, 'তোমার এত বাড়াবাড়ি কেন? ঐ ভাঙা মন্দিরের এমন কি মহিমা শুনি?'

সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে লচ্চ তার স্ত্রীকে নিয়ে মংদর্তির ভগিনীপতির গৃহে এসে উপস্থিত হল। সেদিন যেন তাদের বাড়িতে একটা মহোৎসব লেগে গেল। লচ্চর পুরোনো চাল-চলনের-কথা বোন ভগিনীপতি দুজনেই কিছু কিছু জানে। আজ সেই লচ্চ বিনা নিমন্ত্রণে অযাচিত ভাবে তার স্ত্রীকে নিয়ে এসে হাজির হয়েছে এতে তারা খুবই খুশি। নাগবেণীকে যা আদর-আপ্যায়ন দেখানো হল তার তুলনা নেই। কিছুদিন তাদের সেখানে না থেকে উপায় নেই। তার উপর মংদর্তির দেব মন্দিরের আসনে দশাবতার পালা চলছে। এ রকম খোলা জায়গায় যাত্রাগান অতি শৈশবে নাগবেণী একবার শুনেছিল মনে পড়ে। বহুদিন পরে ভারি ইচ্ছা হল তার আবার সেই যাত্রা দেখার। সারা রাত ধরে গান। এক রাত না ঘুমিয়ে নাগবেণী তার স্বামী ননদ নন্দাই প্রভৃতির সঙ্গে যাত্রা গান শুনল।

মংদর্তির চারিদিকে বন ও পাহাড়। সেই বনে পাহাড়ে বানরের দল

যেন রাজ্য স্থাপন করে বসেছে। নাগবেণী আত্মবিস্মৃত হয়ে বলে, 'কি সুন্দর গ্রাম এই মংদর্তি!' ছ সাত দিন কাটিয়ে লচ্চ ও নাগবেণী পুনরায় কোডিগ্রামে ফিরে এল, সঙ্গে নিয়ে এল সুব্বি ও তার চার বছরের ছেলে 'সন্ন'কে (খোকা)।

সেদিন সরস্বতী ও সত্যভামার আনন্দের সীমা নেই। 'ভগবান লচ্চকে সুবুদ্ধি দিয়েছেন কিন্তু দুঃখ যে আজ তা দেখার জন্য পার্বতী বেঁচে নেই,' এই বলে সরস্বতী চোখের জল ফেলল।

মে মাসের ছুটিটা হাওয়ার মতো বয়ে গেল। আগামী কাল চোখ মেললেই জুন মাসের শুরু। উকিলবাবু এখন মংগলুর ফিরে যাবেন। লচ্চকেও তার পরবর্তী অধ্যয়নের জন্য কোথাও-না-কোথাও যেতে হবে। এখন সমস্যা নাগবেণীকে নিয়ে। সে অতঃপর কোথায় থাকবে? ঐতাল বলল, 'বৌমা এখন বড় হয়েছে। আর কতদিন পিত্রালয়ে থাকবে? ঘরের বৌ, তাকে পালন করবার মতো ক্ষমতা কি আমাদের নেই? আগে ছিল, সে এক কথা। এখন তো পুনর্বিয়ে হয়ে গেছে।' লচ্চর ভবিষ্যৎ অধ্যয়ন আর যে মংগলুরে হবে না একথা একরকম স্থির হয়ে গেছে। উকিলবাবু তাকে মাদ্রাসে পাঠানোই সাব্যস্ত করেছেন। ঐতালও রাজী হয়েছে। পুত্রের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ঐতালের যে আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি একেবারে বিলীন হয়ে গিয়েছিল, আবার যেন সেগুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। লচ্চরও চোখের সামনে উজ্জ্বল ছবি, ভবিষ্যতে সে বড় উকিল হবে। কিন্তু তার মনে এই একটি বিষম চিন্তা, নাগবেণীর কাছ থেকে দূরে থাকবে কেমন করে? লচ্চ তাই প্রস্তাব করল যে নাগবেণীও মাদ্রাসে গিয়ে তৃতীয় ফর্মটা শেষ করুক। ঐতাল বলে উঠল, 'মেয়েদের ইংরেজি বিদ্যা কোন্ কম্মে লাগবে?' এই সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে সরস্বতী প্রকাশ করল যে নাগবেণী বোধ করি পোয়াতি হয়েছে। এই কথায় সমস্ত সমস্যার মীমাংসা হয়ে গেল। উকিলবাবু বললো, 'মেয়েকে তাহলে মংগলুরে নিয়ে যাওয়া দরকার।' ঐতাল বলল, 'তাই হোক।'

বি. এ. ক্লাসে শুরু হতে এখনও একমাস বাকী। লচ্চর ইচ্ছা এই সময়টা সে মংগলুরে কাটায়। শ্বশুর মহাশয়ের মংগলুর যাত্রার সময়ে সেও গিয়ে দলে যোগ দিল। বাড়ি থেকে রওনা হওয়ার আগে এই বলে সে বাপকে সতর্ক করে দিল, 'বি. এ. পড়তে খুব খরচ। একটি আধলারও দরকার হলে আমাকে যেন

শ্বশুর মশায়ের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে না হয়। তাছাড়া তাঁর উপর সদাশিবেরও দায়িত্ব রয়েছে।' ঐতাল ছোটদের কাছ থেকে বুদ্ধি পরামর্শ নেওয়ার মতো লোক নয়। পুত্রের কথায় সে বলে বসল, 'পয়সার অভাবে তোমার পড়াশুনো নষ্ট হবে না তা জেনো।' পিতার এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে লচ্চ বুঝল যে তার উপর এখনও তার বাবার ভরসা জন্মে নি।

ঐতাল গৃহের আনন্দ উৎসব ভেঙে গেল। লচ্চ ও নাগবেণী চলে গেল ম.গলুর। ছেলেকে নিয়ে সুব্বি চলে গেল তার শ্বশুরবাড়ি। আবার তারা তিনজন—ঐতাল, সরস্বতী, সত্যভামা। সরস্বতী হেসে বলল—'এ কি? এ বাড়িটাতে চিরকাল তিনজন লোকই নির্দিষ্ট হয়ে আছে?'

রাম ঐতালকে দূরের বাড়িগুলির পৌরোহিত্য ছেড়ে দিতে হল। মাঝে মাঝেই সে বলতে লাগল, 'এখন আর আমি নদী পার হতে পারি না। এই বুড়ো বয়সে আর কুলোচ্ছে না।' বাড়িতে একা বসে থাকতে খারাপ লাগে। তখন সে স্ত্রীকে ডেকে বলে, 'সত্য, কাজ ছাড়াও যে টিঁকতে পারি না। একমাত্র ঘাসের কৃষি ছাড়া বাড়িতে আর কৃষিকর্মও হচ্ছে না। যাক্, আমি দিন কতক মংদর্তি ঘুরে আসি।' এই বলে সে মেয়ে বাড়ির উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে। সেখানে ঐতালের মতো তার বেহাই মশাইও বৃদ্ধ হয়েছে। দুই বৃদ্ধ বসে বসে খুঁটিতে হেলান দিয়ে গল্প গুজব করে। ঐতালের যেমন ভালো লাগে বৃদ্ধ বয়সে নাতিকে কোলে চড়িয়ে আদর করতে, সুব্বিরও তেমনি ভালো লাগে বৃদ্ধ বাপের সেবা শুশ্রূষা করতে। বাবা ওদের বাড়িতে, সংসারের সমস্ত কাজকর্ম সুব্বির কাছে যেন হালকা হয়ে যায়। এইভাবে মাসে কয়েকটা দিন মেয়ের বাড়িতে কাটিয়ে সেখান থেকে ফেরার সময়ে ঐতাল তার নাতিটিকে নিয়ে আসে।

ঐতাল আজকাল প্রায়ই বলে—তার নিজের জীবনে আর কী হওয়ার আছে? এখন ওপার থেকে ডাক এলেই সে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। তবু তার মন থেকে একটা বেদনা কিছুতেই দূর হচ্ছে না। তাদের এই বালিয়াড়ি অঞ্চলে কারও বাড়িতে টালির ছাদ ছিল না। শীনময়্য সকলকে টেক্কা দিয়ে কেমন কৌশল করে একটা টালির বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে। সেই থেকে ঐতালের খেদ। তার পরে দেখতে দেখতে আরও কয়েকখানা বাড়ি তৈরি হল। তাদের গ্রামের এবং আশেপাশের আরও কয়েকখানি গ্রামের অনেকে বেংগলুর গিয়ে পয়সা কামিয়ে বড় লোক হয়ে যাচ্ছে। কোডিগ্রাম থেকে মনূরু পর্যন্ত হিসাব করলে

অন্তত আট-দশখানা টালির বাড়ি দেখা যায়। শেষ পর্যন্ত সুব্বারায় উপাধ্যায়ও তার বাড়িতে টালি লাগাল। অথচ ঐতাল এখনও কিছু করে উঠতে পারেনি। এই বেদনাই তার কাছে মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে। গ্রামের কথা যখনই মনে আসে, তখনই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সারি সারি টালির বাড়ি। সরস্বতী মাঝে মাঝে বলে, 'দাদার ওই একটা বাতিক হয়েছে। ছাদে টালি চড়ালে বুঝি অমর হবে?' কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবে, দাদার তো বয়স হয়েছে, কোনো আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রেখে যেতে নেই। আবার সে বলে, 'দাদা আমার কোনো আপত্তি আছে তা মনে কোরো না। বাড়িতে টালি লাগাতে চাও লাগাও। কিন্তু আমার কেবল একটি চিন্তা ভবিষ্যতে এ বাড়িতে থাকবে কে? লচ্চ কি এখানে থাকবে মনে করো?' ঐতাল বলে, 'লচ্চ যে এখানে থাকবে না তা আমিও জানি। মরবার আগে আমি একবার টালির বাড়িতে কয়েকটা দিন বাস করতে চাই। আমার মৃত্যুর পরে, অন্তত কিছুদিন পর্যন্ত, পথ দিয়ে যেতে যেতে যদি কেউ বলে, 'এটা রাম ঐতালের বাড়ি—তবেই হল।' সরস্বতী বেশ বুঝতে পারে দাদার এই আকাঙ্ক্ষা কত প্রবল। আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার এই টালির বাড়ির জন্য কী কী দরকার? কাঁঠাল গাছে কুড়ুল মারতে উস্কানি দিয়েছিল হনুমাচারি; ওকে ছাড়া কাঠের কাজের জন্য যে কোনো ছুতোরকে ডাকো আমার আপত্তি নেই। এই বর্ষাটা শেষ হতেই ভালো পাথরের থাম তুলে বাড়ি তৈরি কর। করতেই যদি হয়, বেশ মজবুত করে দোতলা করে ফেল।' সরস্বতীর অতি উৎসাহ দেখে ঐতালের এক একবার সন্দেহ হয়। বলে, 'তোর যদি ইচ্ছা না থাকে, বল্। ও নিয়ে রহস্য করিস নে।' সরস্বতী ব্যথিত কণ্ঠে বলে, 'রহস্য নয় দাদা, সত্যি বলছি। আমার কেবল একটি চিন্তা, তোমার পরে এই সমস্ত কার? যদি নগদ টাকা রেখে যাও লচ্চ তোমার একটি পয়সাও রাখবে না। কাজেই বাড়িটার পিছনে অন্তত কিছু টাকা খরচ হোক। বাকী টাকা জমিজমায় না-হয় ছেলের বৌর সোনা-গয়নার জন্য ব্যয় কর। ইচ্ছা হলে সুব্বিকেও কিছু গয়না গড়িয়ে দিও। সেও তোমার সন্তান, নয় কি?' মেয়েকে সোনা-গয়না দেওয়ার প্রস্তাবে সত্যভামাও খুব খুশি হল।

সরস্বতীর কথাগুলো ঐতালের খুব মনে ধরে যায়। আর দেরি নয়, নতুন বাড়ির কাজে সে তাড়াতাড়ি হাত লাগায়। বোনের কথামতো সে জমিজমারও

খোঁজ করতে থাকে। সেও জানে নগদ টাকা বেশি রেখে গেলেই তিনদিনের মধ্যে লচ্চ তা উড়িয়ে দেবে। কন্যা ও পুত্রবধূর জন্য পাঁচ-পাঁচশ টাকার গয়না প্রস্তুত হল। ওদিকে লচ্চর কাছ থেকে প্রতি মাসে চল্লিশ পঞ্চাশ টাকার ফরমায়েশ আসতে থাকে। মাদ্রাসের খরচ সম্পর্কে ঐতালের কোনো ধারণাই নেই। তাই সে কুন্দাপুরে গিয়ে একজন উকিলবাবুর কাছে সমস্ত খবর জেনে আসে। টাকা সে যথারীতি পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তার মনে একটা সন্দেহ জাগে লচ্চ হয়ত আগের মতো শ্বশুরবাড়ি থেকেও টাকা-পয়সা নেয়। নিশ্চিত হওয়ার জন্য সে মংগলুরে তার উকিল বেহাইয়ের কাছে পত্র দেয়। কিন্তু সেখান থেকে কোনো উত্তর আসে না। দ্বিতীয় পত্র যায়। তার কোন উত্তর নেই। ঐতাল একটু বিরক্ত হয়ে ওঠে। মনে মনে বলে—'যাক্, যতদিন বেঁচে আছি, পুত্রের জন্য যা দণ্ড দেবার, তা আমি দিয়ে যাব।'

এদিকে তার সমস্ত মন পড়ে আছে গৃহ নির্মাণের উপর। ফুরসুৎ তার নেই বললেই চলে। বাড়ির নক্‌সা একবার স্থির হয়, আবার বদলে যায়। দোতলা শেষ পর্যন্ত হবে কিনা তাও অনিশ্চিত। মাথায় যেমন যেমন চিন্তা আসে, সেই সেইভাবে কাজ এগিয়ে চলে। শীনময়্য দেখেশুনে প্রতিবেশীর কাছে বিদ্রূপ করে বলে, 'ওহে ঐতালও তাহলে বাড়ি শুরু করে দিয়েছে? বলি, থাকবেটা কে? ওতো নিজে হয়েছে বুড়ো গাছের গুঁড়ি। ছেলে তো হাতে থাকার পাত্র নয়। তবে?' কথাটা ঐতালের কানে পৌঁছয়। সরস্বতী সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'দাদা, শীনময়্যার কপালের লেখনই ওই রকম। তুমি কেন ও সমস্ত কথা নিয়ে মাথা ঘামাও?'

নতুন বাড়ি শেষ হতে নববর্ষ এসে গেল। ঐতাল ভাবল দেয়ালগুলির পলেস্তরা করিয়ে বেশ সমারোহ করে গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হবে এবং উপলক্ষ্যে বেহাই বাসুদেব উকিলকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করা দরকার। গরমের ছুটি আরম্ভ হতে লচ্চও মাদ্রাস থেকে দেশে এল। ঐতাল তাকে বলল, 'কী ব্যাপার? তুমি একা কেন? বৌমাকে নিয়ে আসো নি? দুদিন পরেই আমাদের গৃহসঞ্চার, বৌমা তখন উপস্থিত থাকবে না? উকিলবাবু কবে দেশে আসবেন? সদাশিব ওরা সব ভাল আছে ত?' লচ্চ এইসব প্রশ্নের কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ উত্তর দিতে পারল না। ঐতাল গিয়ে সরস্বতীকে বলল, 'এসব কী সরস্বতী? লচ্চ যে একা একা এসেছে তাতে কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে

আমার।' সরস্বতী কোনরূপ তাড়াহুড়ো না করে ধীরে সুস্থে লচ্চর কাছ থেকে কথা বের করবার জন্য চেষ্টা করলেও সুবিধা হল না। আগেরবার গরমের ছুটিতে লচ্চ বেশ খুশি ও প্রসন্ন ছিল। এবারে ওকে কেমন বিষণ্ণ ও মনমরা দেখাচ্ছে। ঐতাল একবার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন রে লচ্চ, নতুন বাড়িতে আমাদের কুলোবে তো?' তৎক্ষণাৎ উত্তর এল, 'এ বাড়িতে কে থাকতে এসেছে?' পরে লচ্চ সরস্বতীর কাছে গিয়ে অনুযোগ করল, 'আমি গোটা দশেক টাকা বেশি চাইলে উনি দিতে চান না। আর এখানে? রাশি রাশি টাকা এই বাড়িটার জন্য ঢালা হয়েছে। এটা কি গঞ্জ না শহর যে দরকার হলে ভাড়া দেওয়া যাবে? এই পাড়াগাঁয়ে এক পয়সাও পাওয়া যাবে না।' এইভাবে পিসীমার কাছে লচ্চ তার পিতৃদেবের নিন্দা-সমালোচনা করল। সরস্বতী যেন বাড়ির কথাটা শুনতে পায়নি এমনিভাবে অন্য কথা তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'হ্যাঁরে লচ্চ, তোর শ্বশুরমশাই আজকাল তোকে টাকা দেন না?'

লচ্চ বলল, 'তাঁর নিজের ছেলে পিলে আছে না? আমাকে তিনি আর কতদিন টাকা পাঠাবেন?'

সরস্বতী বলল, 'সামনের বছরে তোর যাতে টাকা পয়সার জন্য কোন কষ্ট না হয় আমি তার ব্যবস্থা করব।'

এদিকে গৃহপ্রবেশের আয়োজন সম্পূর্ণ। উকিলবাবুর কাছে যথাকালে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠানো হল, কিন্তু তার কোনো জবাব এল না। ঐতাল ছেলেকে ডেকে বলল, 'তোর শ্বশুরমশাইকে চিঠি লিখে কোনো উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। বৌমার শরীরটা হয়ত ভাল নেই। তাই যদি হয়, সে খবরটাও তো আমাকে জানাতে পারেন। তুই এক কাজ কর্। তুই গিয়ে বৌমাকে নিয়ে আয়।' লচ্চ বলল, 'আমার দ্বারা হবে না। আসার সময়ে বলেছিলাম, নাগবেণীকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিতে। তা দেননি।' পুত্রের মুখে এই সংবাদ শুনে ঐতাল ভারি উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। জামাই-শ্বশুরে ঝগড়া ঝাঁটি হল নাকি। যদি হয়েও থাকে, লচ্চর সঙ্গে তার স্ত্রীকে না পাঠাবার কারণ কী। নাগবেণী তো খুব ভাল মেয়ে। বাড়িতে অনেক কাল কাটিয়েছে সে, এখন কি তার শ্বশুরবাড়িতে আসা উচিত নয়? সে তো শ্বশুরবাড়িকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করবার মতো মেয়ে নয়। ঐতাল কোনো উপায় না দেখে সোজা ঐরোডি গিয়ে হাজির হল এবং নাগবেণীর কাকা নারায়ণয়্যর কাছে তার দুঃখের কথা শোনাল। নারায়ণবাবু কথা বেশি না

বাড়িয়ে সংক্ষেপে জানাল, 'ঐতাল, আপনি আপনার ছেলের অন্যত্র বিয়ে দিতে পারেন। জামাইয়ের আশা দাদার মিটে গেছে।'

ঐতালের বুকটা ধক্ করে উঠল। 'বেহাই মশাই আমার ছেলে কী অন্যায় করেছে বলুন। আজ পর্যন্ত কোন খবর পাইনি। হঠাৎ এখন এমন কথা জানালেন, আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।' বৃদ্ধ ঐতালের চোখতুটি অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে এল। বলল, 'নারায়ণবাবু আমার অপরাধ হলে বলুন। আমি তাকে শাসন করব।' এই বৃদ্ধের কাকুতি মিনতিতে নারায়ণবাবু তার বংশের গোপন কথা প্রকাশ করতে বাধ্য হল। বলল, 'আপনার পুত্রবধূ এখান থেকে যাওয়ার সময়ে অন্তঃসত্ত্বা ছিল সে কথা আপনি জানেন। আমাদের সকলেরই মনে আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু মংগলুর যাওয়ার দু তিন মাসের মধ্যে নাগবেণীর অদ্ভুত রোগ দেখা দিল। ফলে তার গর্ভ নষ্ট হয়ে যায়, স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে পড়ে। এখনও সে সুস্থ হয়ে ওঠেনি। অবশেষে ডাক্তার দেখাতে হয়। আপনার ছেলের পাপের ফলে এই হতভাগিনী মেয়েটাকে সারা জীবন কষ্ট পোহাতে হবে।' নারায়ণের কথায় ঐতালের মাথা হেঁট হয়ে এল। লচ্চর উপর ভরসা কিংবা বিশ্বাস তার কোনদিনই ছিল না। তবু সে ভাবতে পারেনি যে এমন আচম্বিত ভাবে তার মাথার উপর বজ্রাঘাত হবে।

'দাদা এই কথা বলে পাঠিয়েছে যে নাগবেণীকে সে বিধবা বলেই মনে করবে।' এই বলে নারায়ণয্য তার শেষ কথা জানিয়ে দিল।

অতঃপর ঐতালের পক্ষে আর কথা বলার অবকাশ নেই। কী কথা বলবে সে? মনের গভীরে তার এই মাত্র খেদ, 'হায় পুত্র, মৃত্যুর আগে আমাকে আরও কত কী দেখতে হবে।' বাড়ি ফিরে এসে লচ্চকে সামনে পেয়ে ঐতাল আর সামলাতে পারল না। চেঁচিয়ে উঠল, 'তুই উচ্ছন্নে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই। ওই হতভাগী মেয়েটার জীবন তুই মাটি করে দিলি?' ঐতাল যেন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে এই ভাবে সকলের সামনে লচ্চকে সে প্রহার করতে উদ্যত হল। লচ্চ ক্রুদ্ধ হয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে শীনময্যর বাড়িতে উঠল। শীনময্য লচ্চকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'তোমার কোনো ভয় নেই লচ্চ। তোমার বাপের সঙ্গে আমার সদ্ভাব নেই বটে, কিন্তু তা বলে তোমার প্রতি আমার কোনো বিরূপতা নেই। তোমার লেখাপড়ার টাকা তোমার বাপ দিতে রাজী না হলে আমি দেব টাকা। লেখাপড়া শেষ হলে চাকরি বাকরি করে

আমাকে শোধ দিও।' এই বলে শীনময়্য পিতা-পুত্রের মনোমালিন্যে ইন্ধন যুগিয়ে দিল। সরস্বতী বারবার শীনময়্যর বাড়ি থেকে লচ্চকে ডেকে আনতে চেষ্টা করল। পারল না। সত্যভামা সারাদিন বসে বসে চোখের জল ফেলল। কিন্তু লচ্চ সেখান থেকে নড়বার পাত্র নয়। তার একমাত্র উত্তর, 'কে-না-কে কী-না-কী কথা লাগিয়েছে, তাই শুনে আমার উপর চোটপাট।' লচ্চর এ সব কথায় সরস্বতী আর বিশ্বাস করে না।

পুত্রকে বাদ দিয়েই ঐতালের গৃহ প্রবেশ হল। ফলে ঐতাল সম্পর্কে নানা বিরুদ্ধ কথা রটাতে শীনময়্যর ভারি সুবিধা হয়ে গেল। আরও কত সুবিধা হত যদি শীনময়্য লচ্চর সঙ্গে পিতার মনোমালিন্যের আসল কারণটা জানতে পারত। কিন্তু লচ্চ সে কথা গোপন করে পিতার অহেতুক পুত্র-বিদ্বেষকে দায়ী করল। সারা বছরের প্রয়োজনীয় টাকা শীনময়্যর কাছ থেকে হ্যাণ্ডনোট লিখে ধার নিয়ে জুন মাসে লচ্চ মাদ্রাস রওনা হয়ে গেল।

এদিকে নাগবেণীর জীবনে বুঝি সর্বনাশ ঘনিয়ে এল। আগের ছুটিতে কত খুশি মনে সে তার স্বামীর সঙ্গে দিন কাটিয়েছে, বাপের বাড়িতে, শ্বশুর বাড়িতে এবং সুব্বি ঠাকুরঝির বাড়িতে। লচ্চ যখন মংগলুর থেকে মাদ্রাস যায়, নাগবেণী হেসে হেসে বলেছিল, 'ডিসেম্বরের ছুটিতে কিন্তু অবশ্যই এসো।' তারপরে দু তিন খানা পত্রও তাকে লিখেছিল। একবার লিখেছিল, 'আমার কী একটা রোগ হয়েছে, যন্ত্রণায় বড়ই কষ্ট পাচ্ছি।' আর একখানি পত্রে ছিল, 'আমার মা হওয়ার আশা নষ্ট হয়ে গেল। আমি এখন ক্ষয়রোগে ভুগছি।' তার পরে চিকিৎসকের মতামত জানা গেল। নাগবেণীর মন কেবল বিষণ্ণ নয়, শঙ্কাকুল হয়ে উঠল। কন্যার জন্য বাসুদেববাবুর মর্মবেদনা বলে শেষ করা যায় না। সে তার মেয়েকে জামাইয়ের কাছ থেকে ভয়ে দূরে রেখে দিলেও তার লেখাপড়ার টাকা বন্ধ করে নি। অবশেষে লচ্চ একদিন ক্রোধোন্মত্ত হয়ে বাসুদেববাবুকে চিঠি দিয়ে জানাল যে সে শ্বশুরের কাছে ঋণী হতে চায় না, সে তার টাকার প্রত্যাশীও নয়। লচ্চর এই স্পর্ধায় সদাশিব তার ভগিনীপতিকে সমুচিত জবাব দিতে কুণ্ঠিত হল না। মোট কথা আত্মীয় স্বজন সকলের সঙ্গেই লচ্চর অসদ্ভাব সৃষ্টি হল। অবশেষে নাগবেণীও তার স্বামী সম্পর্কে এই কথাই ভাবতে বাধ্য হল যে লোকটা তার জীবনকে নষ্ট করবার জন্যই অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

নাগবেণীর আরোগ্য হতে আরও ছ মাস কেটে গেল। এখনও তার চেহারায় সেই শ্রী এল না। সারাদিন সে চিন্তার মধ্যেই কাটিয়ে দেয়। এক একবার এমন কথাও ভাবে, 'যা হবার তা তো হল। দুর্ভোগ যা কপালে লেখা ছিল তা তো ভোগ করলাম। স্বামীকে ছাড়া আমার অন্য উপায়ই বা কী আছে? বাবার আরও ছেলেমেয়ে রয়েছে। আমি যদি চিরটা কাল পিত্রালয়েই থাকি তবে ভবিষ্যতে একদিন তো ভাইদেরই গলগ্রহ হতে হবে।' পুনরায় স্বামীর কাছে চিঠি দিয়ে সব কিছুর জন্য ক্ষমা প্রার্থনার কথাও সে চিন্তা করে। ইতিমধ্যে ঐরোডি থেকে বাবার কাছে পত্র এল। গত ছুটির সময়ে শ্বশুরমশাই নাগবেণীদের গ্রামের বাড়িতে এসেছিলেন, ছেলের প্রতি বিরক্ত হয়ে তিনি তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন—এই সমস্ত ঘটনা কাকার চিঠিতে জানা গেল। বাসুদেববাবু বললেন, 'ছেলেটা সত্যসত্যই বয়ে গেল।' বাসুদেববাবুর স্ত্রীও খুব বিচলিত হয়ে পড়লেন। নাগবেণী আকাশের দিকে চোখ মেলে নিজের ভাগ্যের কথা ভাবতে লাগল।

ওদিকে লচ্চ ধার করা টাকা উড়িয়ে মাদ্রাসে খুব ফুর্তি করে বেড়ায়। কেবল তাই নয়, মাসে মাসে বাবাকে কটূক্তি করে পত্র লেখে। বৃদ্ধ ঐতালের পক্ষে তা সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়। অবশেষে একদিন বাসুদেব উকিলের কাছে মনের কথা জানিয়ে সে পত্র দেয়: 'আমার দুর্দৈব যে আমার পুত্রের জন্য আপনার কন্যার এই দুর্গতি। ছেলেটাকে আপনিও সুপথে আনতে পারলেন না। যাক্ ভগবান যা করান তাই হবে। কিন্তু একটা কথা আপনাকে জানাতে চাই। আপনার ইচ্ছা হলে আমার পুত্রবধূ যাতে অভাব-গ্রস্ত হয়ে না থাকে আমি তার ব্যবস্থা করব। আমার বেশির ভাগ সম্পত্তি আমার স্বোপার্জিত।' পত্রের শেষ দিকে একটি করুণ মিনতি: 'পুত্রের মুখ দেখার আকাঙ্ক্ষা আমার জীবনের তরে ঘুচে গেছে। পুত্রবধূর মুখ দেখার সৌভাগ্য আমার হবে কি?'

বড়দিনের ছুটিতে উকিলবাবু নাগবেণীকে নিয়ে দেশের বাড়িতে এলেন। আসার পরদিনই তিনি অযাচিত ভাবে কন্যাসহ তার শ্বশুরবাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। ব্যথিত চিত্তে ঐতাল এমন ভয়ে ভয়ে তাদের অভ্যর্থনা জানাল যেন ছেলের অপরাধের জন্য পিতাই দণ্ডনীয়। কিছুক্ষণ পরে বলল—'দেখুন বেহাই, এই বাড়ি, এই ফটক বারান্দা, এই দোতলা—এ সমস্ত কার জন্য? আমার তো

দিন ঘনিয়ে এসেছে।' সত্যভামা এসে কাছে দাঁড়াল, পুত্রবধূর দিকে তাকিয়ে তার চোখে জল এসে গেল। বলল, 'এসেছ মা?' নাগবেণী শাশুড়ীকে প্রণাম করল। উকিলবাবু বেহাই-বেহান দুজনকে লক্ষ্য করেই বললেন, 'আপনাদের ঘরের বৌ এসেছে। আপনারা যদি রাখতে চান রাখুন। কিন্তু আপনাদের ছেলের কথা ভেবে কেঁদে কোনো লাভ নেই।' ঐতাল বলল, 'যার কপালে যা লেখা আছে, তাই হবে। আমার সম্পত্তির বেশির ভাগ আমার উপার্জিত। তা থেকে একটু সামান্য অংশ আমার মেয়ে সুব্বিকে দিয়ে বাকী সমস্তটাই আমাদের বৌমার নামে লিখে দেব। আমার বাপ-ঠাকুরদা আমার জন্য যা রেখে গেছেন সেই অংশে আমি হাত দেব না। ও (ছেলে লচ্চ) সেটা খাক, বিক্রি করুক, উড়িয়ে দিক যা খুশি করুক।

সেদিন সারাটা দিন উকিলবাবু বেহাইয়ের বাড়িতেই কাটালেন। নাগবেণী যখন বলল যে এখন কিছুদিন সে শ্বশুরবাড়িতেই থাকবে তখন অশ্রুপূর্ণ চোখে বাসুদেববাবু ঐতালের বাড়ি থেকে বিদায় নিলেন।

এখন থেকে নাগবেণীই হল ঐতালের পুত্র স্থানীয়। সে ধনীর ঘরের মেয়ে, লেখাপড়াও শিখেছে, তবু গুরুজনদের প্রতি তার ব্যবহার নম্র ও ভক্তিপূর্ণ। সরস্বতী ও সত্যভামা তাকে সান্ত্বনা দেয়। সরস্বতী বলে, 'ব্রহ্মা যা লিখে রেখেছেন তা খণ্ডাতে পারে কে? আমাকেই দেখ না কেন।' নাগবেণীও ভাবতে শুরু করে সংসারের অসংখ্য দুঃখিনীদের মধ্যে সেও একজন।

মকর সংক্রান্তির পরে বাড়ির সকলকে নিয়ে ঐতাল গিয়েছিল সালিগ্রামের উৎসবে। সালিগ্রামের দেবতা নরসিংহ ঠাকুর তাদের কুলদেবতা। সেই দেবতার মন্দিরে বসে কাতরচিত্তে ঐতাল প্রার্থনা জানাল, 'ঠাকুর, আমাদের লচ্চকে তুমি কি এতটুকু সুবুদ্ধি দেবে না? দয়াময়, দয়া করো।' সালিগ্রাম থেকে ফিরে এসে ঐতাল জ্বরে শয্যাগত হল। জ্বর বেশি নয়, কিন্তু বয়সের ভারে, দুঃখ কষ্টের চাপে শরীর তার নিতান্তই কাহিল হয়ে পড়েছে। একমাস যায়, দু মাস যায়। ভাল হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ইতিমধ্যে বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে লচ্চ মাদ্রাস থেকে ফিরে এল। বাবা শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছে একথা শুনেও সে বাড়িতে না গিয়ে শীনময়্যর ওখানে গিয়ে উঠল। সরস্বতী বলল, 'দাদা, ওকে একবার ডেকে আনি?' ঐতাল উত্তর দিল,

থাক। আমার আর দেখার আকাঙ্ক্ষা নেই। ও যদি শীনময়্যর ওখানে গিয়ে না উঠত, শেষ কালে একটা উপদেশ দিয়ে যেতাম।'

চৈত্র মাসের অমাবস্যার দিনে ঐতালের গৃহে অন্ধকার ঘিরে এল। সেদিন ভোরবেলায় সরস্বতী, সত্যভামা ও নাগবেণী এক এক করে সমুদ্রের স্নান সেরে এসেছে। নাগবেণী আজকাল মুমূর্ষু শ্বশুরের সেবায় নিজেকে ঢেলে দিয়েছে। বৃদ্ধ রোগী এখন কচি শিশুর মতো অসহায় অক্ষম। অমাবস্যা তিথিতে রোগীর শরীরের তাপ খুব বেড়ে গেছে। মাঝে মাঝে সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। মাঝে মাঝে হুঁস হয়। শ্বশুরমশায়ের অবস্থা দেখে অশ্রুপূর্ণ চোখে নাগবেণী বলল, 'বাবা, আমি গিয়ে আপনার ছেলেকে ডেকে আনব?' পুত্রবধূর চোখের জলে বৃদ্ধের মন নরম হল। বলল, 'তুমি বললে ও কি আসবে? তোমার চেয়েও ওর আপন জন শীনময়্য আছে না?' নাগবেণীর মুখে কোনো উত্তর যোগাল না।

এদিকে অমাবস্যার স্নানের জন্য গ্রামের যে সব লোক সমুদ্রতীরে এসে জমা হয়েছে, তাদের মধ্যে রাম ঐতালের অসুখের খবর ছড়িয়ে পড়লে অনেকেই তাকে শেষবারের মতো দেখতে এল। সুব্বারায় উপাধ্যায় এসে দেখে শুনে বলল —'আজ কোনো মতে কাটলে হয়। আজকের দিনটা ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে আরও চার বছর বাঁচবে।' শীনময়্যর কানে সংবাদটা পৌঁছতে তার মন একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। ঐতাল যেমন লোকই হোক না কেন, মৃত্যুকালে একবার না দেখে থাকা যায় না। এই ভেবে শীনময়্য সমুদ্রতীর থেকে অধোবদনে ঐতালের বাড়ি এসে প্রবেশ করল। রোগীর তখন হুঁস নেই। জ্ঞান ফিরে এলে ঐতাল ধীরে ধীরে চোখ মেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'কে? শীন?' উত্তর এল, 'হ্যাঁ ঐতাল।' ঐতাল বলল, 'আমার মৃত্যুর পরে অন্তত সব শত্রুতা ভুলে গিয়ে আমার ছেলেটিকে কিছু সুবুদ্ধি দিও।' ঐতালের এই কথায় শীনময়্য তার পা ধরে শিশুর মতো কেঁদে উঠল। বলল, 'ঐতাল, আমি যা কিছু অন্যায় করেছি তার জন্য ক্ষমা চাই।' শীনময়্য আগে পরে যাই করুক না কেন, মুমূর্ষু রোগীর সম্মুখে সে অকপট চিত্তেই অনুতপ্ত হল। বহুদিন যারা পরস্পরকে শত্রু ভাবেই দেখে এসেছে আজ তাদের সেই সম্পর্ক স্নেহে প্রীতিতে সুন্দর হয়ে উঠল।

নাগবেণী ছুটে গিয়ে সরস্বতীর কাছে এই বিবরণ দিলে তারা দুজনে

শীনময়্যর বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সদর দরজায় বসে ছিল লচ্চ। নাগবেণীকে দেখে একটু অবাক হয়ে গেল। দেখল ওর দুগাল বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। 'কী, ব্যাপার কী?' নাগবেণী বলল, 'বাবার মৃত্যুকালেও কি একবার তাকে এসে দেখবে না?' লচ্চ নীরবে নাগবেণীর অনুসরণ করে সদর দরজায় এসে থমকে দাঁড়াল। বাড়ির ভিতরে ঢোকার মতো সাহস তার নেই। নাগবেণী ঐতালের কাছে গিয়ে বলল, 'বাবা আপনার ছেলে এসেছে। ভিতরে আসবে কি? আপনি আর রাগ করে থাকবেন না বাবা।' ঐতাল ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল, 'মা, তোমাকে দেখে...তোমার মতো ভাগ্যলক্ষ্মীর কাছে আমার রাগ?' কাঁদতে কাঁদতে নাগবেণী বাইরে এসে স্বামীকে হাতে ধরে শ্বশুরের সামনে নিয়ে এল। লচ্চ কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছে। শীনময়্যকে দেখে ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। শীনময়্য বলল, 'লচ্চ, বাপের পা ধরো। ওর বিরুদ্ধাচরণ করা আমাদের উচিত হয় নি। ঢের হয়েছে। এর পরে ভগবান আমাদের ক্ষমা করবেন না।' শক্তিহীনের মতো লচ্চ সেখানেই বসে পড়ল।

প্রায় সারাটা রাত রোগীর ঘোরের মধ্যে কাটল। কখনো সচেতন, কখনো অর্ধচেতন, কখনো অচেতন। যখন একটু জ্ঞান হল, তখন রোগীর নামে গোদান, ভূদান, নবগ্রহদান প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। ঐতাল ছেলের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'তোমাকে কিছু বলার মতো ক্ষমতা আমার এখন নেই। যাকে বিয়ে করে এনেছ তার মান-মর্যাদা রক্ষা কোরো। তোমার উপর আমার ভরসা নেই বলে বৌমার নামেই সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিলাম।' লচ্চ নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে বসে বসে শুনল।

অমাবস্যা ছেড়ে যাওয়ার আগেই ঐতাল ইহলোক ত্যাগ করল। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধবের কাছে ঐতালের মৃত্যু সংবাদ পাঠানো হল। সেদিন ঐতালের মৃতদেহ বহন কালে শীনময়্য কাঁধ দিয়েছে দেখে তার পরম শত্রুদের মনও শান্ত হল। সেদিন এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলে নি এমন কেউ যদি থাকে তবে সে সরস্বতী। পার্বতীর মৃত্যুর পর থেকেই সরস্বতী যেন অর্ধমৃত হয়ে ছিল। দাদার মৃত্যুর পরে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেছে। আজ আর তার চোখে জল নেই, মুখে কথা নেই। দিনের পর দিন একেবারে নির্বাক হয়ে থাকল। বাড়ির আর সকলে কান্নাকাটি করছে দেখে লচ্চর মনেও একটা দার্শনিক ভাব দেখা দিয়েছিল। 'এই সংসার সত্যই অসার অশেষ দুঃখময়।

এখানে যদি কণামাত্র সুখ থাকে তবে দুঃখ আছে পর্বত প্রমাণ।' কিন্তু লচ্চর এই দার্শনিক ভাবটা—কথায় যাকে বলে শ্মশান বৈরাগ্য। পিতার শ্রাদ্ধ শান্তি শেষ হতে আত্মীয়-স্বজন যে যার বাড়িতে ফিরে গেলে লচ্চর মনের উদাসীন ভাবটা কেটে গেল। বাড়িটাকে কেমন যেন শ্রীহীন ছন্নছাড়া বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে শীনময়্যের ওখানে যেতেও তার মন চাইল না। লচ্চর মনে হল—যে লোকটা এতদিন তার বাপের বিরুদ্ধে তাকে উস্কানি দিয়ে এসেছে, সে হঠাৎ সেদিন মুমূর্ষু বাবার সামনে তাকে সকলের চোখে ছোট করে দিয়েছে। সুতরাং তার বাড়িতে নয়, কিন্তু নিজের বাড়িতেই বা কী সুখ আছে? নাগবেণীর সঙ্গে আগের মতো কথা বলার আগ্রহ নেই। ওকে দেখে মনে হয় ও এ বাড়ির কেউ নয়, আগন্তুক মাত্র। নাগবেণীর বাপের উপর লচ্চর মনে যে ঘৃণা ও বিরক্তি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তাই দিয়ে সে বাপের মেয়েকে বিচার করে। নাগবেণীর ভাব কিন্তু বিপরীত। বয়স কম, সংসারে অনভিজ্ঞ। লচ্চ তার উপর যে অন্যায় করেছে, সে সব ভুলে গিয়ে নাগবেণী যেচেই তার স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে। কিন্তু পরক্ষণেই সে এই ভেবে বিবর্ণ হয়ে যায় যে স্বামীর সংসর্গে আবার যদি তাকে নরক যাতনা ভোগ করতে হয়, তাহলে? সরস্বতী ও সত্যভামা যখনই ওর মুখখানার দিকে তাকায়, লচ্চর দুষ্কৃতির জন্য ওরা অশ্রু বিসর্জন না করে পারে না।

বি.এ. পরীক্ষার ফল বেরুলে লচ্চ তার পাসের কথা জানতে পেল। এখন কী করা যায়? গ্রামের জীবন নরক তুল্য, এখানে বাসকরা সম্ভব নয় তার পক্ষে। সে কি আরও পড়াশুনো করবে? না কি চাকুরির খোঁজ করবে, কিছু ভেবে পাচ্ছে না। অনেক ইতস্তত করে সত্যভামাকে বলল, 'মা, তোমরা সকলে এখানে সুখেই বাস করো কিন্তু আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। বাবা নাগবেণীর নামে সব উইল করে দিয়ে গেছে। এ বাড়িতে আমার আর কী মর্যাদা থাকল? নাগবেণীব কাছে ভিক্ষা চেয়ে আমি এখানে থাকতে পারব না। তাছাড়া, আমি যে বি. এ. পাস করলাম তার ফল কী? লেখা পড়া শিখে শেষ কালে কি না এই গাঁয়ে পড়ে থাকা? এখানে আমার করার মতো কিছুই নেই। তাই ভাবছি কোথাও গিয়ে একটা চাকুরি খুঁজে নেব।'

লচ্চর কথায় সরস্বতীর আতঙ্ক হল এই পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। নাগবেণীকে ডেকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কী করবে বৌমা?' জবাব দিল

শীনময়্যর বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। সদর দরজায় বসে ছিল লচ্ছ। নাগবেণীকে দেখে একটু অবাক হয়ে গেল। দেখল ওর দুগাল বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে। 'কী, ব্যাপার কী?' নাগবেণী বলল, 'বাবার মৃত্যুকালেও কি একবার তাকে এসে দেখবে না?' লচ্ছ নীরবে নাগবেণীর অনুসরণ করে সদর দরজায় এসে থমকে দাঁড়াল। বাড়ির ভিতরে ঢোকার মতো সাহস তার নেই। নাগবেণী ঐতালের কাছে গিয়ে বলল, 'বাবা আপনার ছেলে এসেছে। ভিতরে আসবে কি? আপনি আর রাগ করে থাকবেন না বাবা।' ঐতাল ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিল, 'মা, তোমাকে দেখে...তোমার মতো ভাগ্যলক্ষীর কাছে আমার রাগ?' কাঁদতে কাঁদতে নাগবেণী বাইরে এসে স্বামীকে হাতে ধরে শ্বশুরের সামনে নিয়ে এল। লচ্ছ কেমন বিহ্বল হয়ে পড়েছে। শীনময়্যকে দেখে ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। শীনময়্য বলল, 'লচ্ছ, বাপের পা ধরো। ওর বিরুদ্ধাচরণ করা আমাদের উচিত হয় নি। ঢের হয়েছে। এর পরে ভগবান আমাদের ক্ষমা করবেন না।' শক্তিহীনের মতো লচ্ছ সেখানেই বসে পড়ল।

প্রায় সারাটা রাত রোগীর ঘোরের মধ্যে কাটল। কখনো সচেতন, কখনো অর্ধচেতন, কখনো অচেতন। যখন একটু জ্ঞান হল, তখন রোগীর নামে গোদান, ভূদান, নবগ্রহদান প্রভৃতি অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। ঐতাল ছেলের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'তোমাকে কিছু বলার মতো ক্ষমতা আমার এখন নেই। যাকে বিয়ে করে এনেছ তার মান-মর্যাদা রক্ষা কোরো। তোমার উপর আমার ভরসা নেই বলে বৌমার নামেই সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিলাম।' লচ্ছ নির্বাক নিস্পন্দ হয়ে বসে বসে শুনল।

অমাবস্যা ছেড়ে যাওয়ার আগেই ঐতাল ইহলোক ত্যাগ করল। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু বান্ধবের কাছে ঐতালের মৃত্যু সংবাদ পাঠানো হল। সেদিন ঐতালের মৃতদেহ বহন কালে শীনময়্য কাঁধ দিয়েছে দেখে তার পরম শত্রুদের মনও শান্ত হল। সেদিন এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলে নি এমন কেউ যদি থাকে তবে সে সরস্বতী। পার্বতীর মৃত্যুর পর থেকেই সরস্বতী যেন অর্ধমৃত হয়ে ছিল। দাদার মৃত্যুর পরে একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেছে। আজ আর তার চোখে জল নেই, মুখে কথা নেই। দিনের পর দিন একেবারে নির্বাক হয়ে থাকল। বাড়ির আর সকলে কান্নাকাটি করছে দেখে লচ্ছর মনেও একটা দার্শনিক ভাব দেখা দিয়েছিল। 'এই সংসার সত্যই অসার অশেষ দুঃখময়।

এখানে যদি কণামাত্র সুখ থাকে তবে দুঃখ আছে পর্বত প্রমাণ।' কিন্তু লচ্চর এই দার্শনিক ভাবটা—কথায় যাকে বলে শ্মশান বৈরাগ্য। পিতার শ্রাদ্ধ শান্তি শেষ হতে আত্মীয়-স্বজন যে যার বাড়িতে ফিরে গেলে লচ্চর মনের উদাসীন ভাবটা কেটে গেল। বাড়িটাকে কেমন যেন শ্রীহীন ছন্নছাড়া বলে বোধ হচ্ছে। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে শীনময়্যের ওখানে যেতেও তার মন চাইল না। লচ্চর মনে হল—যে লোকটা এতদিন তার বাপের বিরুদ্ধে তাকে উস্কানি দিয়ে এসেছে, সে হঠাৎ সেদিন মুমূর্ষু বাবার সামনে তাকে সকলের চোখে ছোট করে দিয়েছে। সুতরাং তার বাড়িতে নয়, কিন্তু নিজের বাড়িতেই বা কী সুখ আছে? নাগবেণীর সঙ্গে আগের মতো কথা বলার আগ্রহ নেই। ওকে দেখে মনে হয় ও এ বাড়ির কেউ নয়, আগন্তুক মাত্র। নাগবেণীর বাপের উপর লচ্চর মনে যে ঘৃণা ও বিরক্তি পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, তাই দিয়ে সে বাপের মেয়েকে বিচার করে। নাগবেণীর ভাব কিন্তু বিপরীত। বয়স কম, সংসারে অনভিজ্ঞ। লচ্চ তার উপর যে অন্যায় করেছে, সে সব ভুলে গিয়ে নাগবেণী যেচেই তার স্বামীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে। কিন্তু পরক্ষণেই সে এই ভেবে বিবর্ণ হয়ে যায় যে স্বামীর সংসর্গে আবার যদি তাকে নরক যাতনা ভোগ করতে হয়, তাহলে? সরস্বতী ও সত্যভামা যখনই ওর মুখখানার দিকে তাকায়, লচ্চর দুষ্কৃতির জন্য ওরা অশ্রু বিসর্জন না করে পারে না।

বি.এ. পরীক্ষার ফল বেরুলে লচ্চ তার পাসের কথা জানতে পেল। এখন কী করা যায়? গ্রামের জীবন নরক তুল্য, এখানে বাসকরা সম্ভব নয় তার পক্ষে। সে কি আরও পড়াশুনো করবে? না কি চাকুরির খোঁজ করবে, কিছু ভেবে পাচ্ছে না। অনেক ইতস্তত করে সত্যভামাকে বলল, 'মা, তোমরা সকলে এখানে সুখেই বাস করো কিন্তু আমার পক্ষে থাকা সম্ভব নয়। বাবা নাগবেণীর নামে সব উইল করে দিয়ে গেছে। এ বাড়িতে আমার আর কী মর্যাদা থাকল? নাগবেণীব কাছে ভিক্ষা চেয়ে আমি এখানে থাকতে পারব না। তাছাড়া, আমি যে বি. এ. পাস করলাম তার ফল কী? লেখা পড়া শিখে শেষ কালে কি না এই গাঁয়ে পড়ে থাকা? এখানে আমার করার মতো কিছুই নেই। তাই ভাবছি কোথাও গিয়ে একটা চাকুরি খুঁজে নেব।'

লচ্চর কথায় সরস্বতীর আতঙ্ক হল এই পরিবারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। নাগবেণীকে ডেকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কী করবে বৌমা?' জবাব দিল

লচ্চ, বড়ই নিষ্ঠুর জবাব : 'ওর কী অভাব ? ওদিকে আছে বাপ—পয়সাওয়ালা উকিল। এদিকে আছে খাওয়া পরার ব্যবস্থা। ওর চিন্তা কী ?' এইভাবে কথার আঘাত দিয়ে লচ্চ শীনময়্যার কাছে গেল টাকা ধার করতে। শীনময়্য আকাশ থেকে পড়ল—'ধার করবে ? তোমার এখন ধারের কী দরকার ? এখন তো তুমিই বাড়ির কর্তা।' লচ্চ তখন সব কথা খুলে বলল। ঐতাল তার নিজের উপার্জিত সম্পত্তির কিছু অংশ সুব্বির নামে, বাকী অংশ নাগবেণীর নামে লেখাপড়া করে দিয়ে গেছে। 'বাপ-দাদার আমলের সম্পত্তি কিছু করা সম্ভব নয় বলে যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে। তা না হলে তো আমাকে ভিক্ষা করতে হত। এখন আমার সম্পত্তি বলতে আমার ঠাকুরদা যা রেখে গেছে তাই।'

লচ্চ যে স্ত্রীর কাছ থেকে আলাদা হয়ে থাকবে একথাটা শীনময়্য অনুমোদন করতে পারল না। কিন্তু লচ্চ সে কথা শোনার পাত্র নয়। তার একটি মাত্র উত্তর, 'আপনার যদি সাধ্য থাকে, আমার অংশের সম্পত্তির জামিনে টাকা ধার দিন। কোথাও একটা কাজ না পাওয়া পর্যন্ত দিন তো চালাতে হবে। স্ত্রীর বাধ্য বাধকতায় থাকতে আমি চাই না।' এই বলে চলে গেল।

ঐতালের বাড়িতে কোনো পুরুষ মানুষ নেই দেখে নাগবেণীর কাকা মাঝে মাঝে এসে তাদের দেখাশুনা করে। একদিন সে সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা এখন কি করবেন ? নাগবেণীই বা কি করবে ? ও যদি এসে আমাদের ওখানে থাকে তো ভালো হয়।' সরস্বতী বলল, 'আমার আর দরকার অদরকার কি ? আর কটা দিনই বাঁচব ? এই বাড়িতেই জন্মেছি, এখানেই চোখ বুজব।' সত্যভামার ইচ্ছা যে সে তার দাদার ওখানে গিয়ে থাকে, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল কাজটা উচিত হবে না। সে বলল, 'বৌমা ছোটবেলা থেকে সুখে স্বচ্ছন্দে বড় হয়েছে। বিয়ে হওয়া অবধি ওর কষ্টের শেষ নেই। আমি বলি কি বৌমা না-হয় বাপের বাড়িতে গিয়েই থাক। এই কোডিগ্রামে থেকে ওকে কষ্ট পেতে হবে না।'

নারায়ণ এসে নাগবেণীকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার কথা বললে নাগবেণী রাজী হল না। এ বাড়িতে আসা অবধি সরস্বতীকে দেখে, তার স্বভাবে স্নেহে ভালোবাসায় অভিভূত হয়েছে সে। আজ এই অবস্থায় তাকে ত্যাগ করে বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকা নাগবেণীর কাছে অপরাধ বলে বোধ হল।

নারায়ণ কাকা নিরাশ হয়ে বাড়িতে ফিরে গেল। সত্যভামার দাদা জনার্দন শুনতে পেল তার ভাগ্নে লচ্চ বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। এই খবর পেয়ে পড়ুমুন্নরু থেকে এসে সরস্বতীর কাছে গিয়ে সে বলল, 'সত্যভামা বাপের বাড়িতে বছর খানেক আমাদের ওখানে গিয়েই থাক।' সত্যভামা বাপের বাড়িতে চলে গেলে সরস্বতী একদিন নাগবেণীকে বলল, 'মা, তুমি আমার উপর ভরসা করে কেন এখানে পড়ে আছ?' নাগবেণী চোখের জল ফেলে বলল, 'পিসিমা, শ্বশুরমশায়ের কথা মনে রেখে আমার কি এখানেই থাকা উচিত নয়? যদি কখনো আপনাদের ছেলের বুদ্ধি ফেরে, যদি আমাকে নিতে আসে, সেদিন আপনাকে নিয়ে যাব। তা না হলে আপনি যত দিন, আমিও ততদিনই আছি।'

নাগবেণী অল্প বয়স্ক ও অনভিজ্ঞ হলেও যে এই কথাগুলি বলতে পারল তার কারণ সরস্বতীর প্রতি তার গভীর ভালবাসা, এই একাকিনী বর্ষিয়সী রমণীর প্রতি গভীর সহানুভূতি। এখন থেকে বৃদ্ধা রমণী যেন তার 'দিদিমা' আর নাগবেণী তার নিশ্চিন্ত আশ্রয়। এদিকে সরস্বতী উঠোনের আবর্জনা ঝাঁট দেয়, ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জ্বালায়, অন্যদিকে নাগবেণী রান্নাবান্না প্রভৃতি ঘর সংসারের কাজ করে। এখন আর তাদের কৃষিকার্যের কোন প্রয়োজন নেই। দুজনে মিলে স্থির করল—'কেন আর এই হাঙ্গাম পোহানো। ভগবান যতদিন তার কাছে ডেকে না নেবেন, ততদিন তাঁর নামকীর্তন করে দিন কাটাব।'

প্রায় ছ মাস পরে বাবার লেখা একখানি পত্রে নাগবেণী জানতে পারে যে, তার স্বামী কি একটা সরকারী কাজ নিয়ে বল্লারিতে রয়েছে। এর বেশি কোনো খবর কেউ জানে না। এই খবরে নাগবেণীরও কিছু লাভ হল না। সে এখন জপতপ পূজা অর্চনা নিয়েই সময় কাটায়। সরস্বতী তাকে যে 'নমঃ শিবায়' মন্ত্র ও প্রার্থনাগুলি শিখিয়ে দিয়েছে, সেইগুলিই তার প্রধান সম্বল। যখন খুব খারাপ লাগে, তখন কিছুক্ষণের জন্য ঐরোডি থেকে ঘুরে আসে। সরস্বতী যতদিন বেঁচে আছেন, সম্পত্তির আয় ব্যয়ের চিন্তা নাগবেণীর নেই।' তেমন তেমন অসুবিধা হলে নারায়ণ কাকা এসে জমির আদায়-উসুল করে দিয়ে যায়। মাঝে মাঝে মংগলুর থেকে বাবা চিঠি লিখে জানায়—এই টাকা এইভাবে খরচ করবে, ওই টাকা ওখানে সুদে খাটাবে। ওদিকে লচ্চর যাবতীয়

সম্পত্তির দেখাশুনার কাজ শীনময়্যই চালায়। ওটা আর ঐতাল-পরিবারে ফিরে আসার কোনো আশাই নেই।

*   *   *   *

দীর্ঘ তিন বছর পরে লচ্চ তার গ্রামে এসে পৌঁছল। এবারেও সে নিজেদের বাড়িতে না উঠে সোজা শীনময়্যের ওখানে গিয়ে উঠল। এবং পরদিন ভোরবেলায় বাড়িতে এসে একবার দর্শন দিল। সমস্ত বাড়িটা কেমন নিষ্প্রাণ, নির্জীব হয়ে গেছে। নাগবেণী তখন পুকুর থেকে স্নান সেরে ঘরে ফিরে আসছিল। তার মনে হল দূরে তাদের বাড়ির দিকে কে যেন আসছে। কাছে এলে আগন্তুককে সে কিন্তু চিনে উঠতে পারল না। মুখের উপর গোঁফ বেশ ভাল করেই গজিয়েছে। পোশাক-পরিচ্ছদ নতুন রকমের। লচ্চ তার নতুন জীবনের ঠাটবাট নিয়ে নাগবেণীকে ভড়কে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার? চিনতেই পারলে না?' নাগবেণী মুখ তুলে তাকাল। চেহারা ও পোশাক নতুন হলেও গলার স্বর সে চিনতে পেরেছে। নাগবেণীর মুখে একটা সুখে দুঃখে মেশানো হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলল, 'এভাবে তামাসা করার মানে কি?' পরক্ষণেই তার কান্না এসে গেল। লচ্চ গিয়ে দাওয়ায় বসতে সরস্বতা ভিতর থেকে দ্রুতবেগে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল—'খোকা এসেছিস? কখন এলি? কোত্থেকে এলি?' এক সঙ্গে এতগুলি প্রশ্ন করে ফেলল। কখন এসেছে সে কথাটা জানাতে লচ্চ ইতস্তত করছিল। সরস্বতী বলল, 'বাছা, যারা কোলে তুলে তোকে বড় করেছে, তাদের কথা ভুলে গেলেও কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু অগ্নিসাক্ষী করে যাকে বিয়ে করে এনেছ, তাকে কষ্ট দেওয়া কি উচিত? মুমূর্ষু পিতাও সকলের সামনে লচ্চকে এই উপদেশই দিয়েছিল। সরস্বতীর কথায় সে চুপ করে থাকলেও ঘন অন্ধকারে শুকতারা ওঠার মতো সে দন লচ্চর আসার ফলে ওই বাড়ির নীরব নির্জীব পরিবেশ সামান্য রূপে হলেও আলোকিত হয়ে উঠল।

কিশোরী নাগবেণী এখন পূর্ণ যৌবনা। নিদারুণ দুঃখ কষ্টেও তার সেই যৌবনশ্রী অটুট রয়েছে। লচ্চর মনে হল নাগবেণীর সৌন্দর্য বুঝি জ্যোৎস্নাকেও হার মানিয়ে দেয়। সে কি পাগল যে অন্ধের মতো এই রূপরাশি উপেক্ষা করে নাগবেণীকে ছেড়ে গিয়েছিল? লচ্চর মধ্যাহ্ন ভোজন এখানেই সমাধা হল। আহারের সময়ে কোনো কথাবার্তা নেই, অতিথির মতো নিঃশব্দে খেয়ে উঠল। আহারান্তে লচ্চ সরস্বতী ও নাগবেণীর কাছে তার নিজের কথা সবিস্তারে বর্ণনা

করতে লাগল, 'আমি তো এখন 'মণেগার' (কানুনগো)। বল্লারি জেলার অনেক ভিতরে কাজের জায়গা, খুব সুবিধার চাকুরি। আমার কাজ দেখে পরে তশীলদার করে দিতে পারে। আপাতত বেতন বেশি না হলেও উপরি পাওনা খুব আছে।'

গল্পগুজবে সন্ধ্যা হয়ে গেল। নৈশ আহারের পর লচ্চ বাড়ি থেকে বেরোবার উদ্যোগ করছে দেখে নাগবেণী জিজ্ঞাসা করল—'কোথায় যাচ্ছ?' 'শীনময়্যর বাড়িতে। কাল তাদের ওখানেই এসে উঠেছি। এখন যেতে হবে না?' নাগবেণী বলল, 'কেন? এখানে থাকা যায় না? এটা কি তোমার বাড়ি নয়? আমি কি পরস্ত্রী?' শেষের কথাটা বলার সময়ে নাগবেণী ঠোঁট কেঁপে উঠেছিল। লচ্চ বলল, 'আমাকে তোমার দরকার আছে কিনা কি করে জানব? তাই চলে যাচ্ছিলাম।' 'বিবাহিতা স্ত্রীর সঙ্গে এভাবে কথা বলতে নেই।'

নাগবেণীর রূপ ও যৌবন পুনরায় সেদিন লচ্চর করায়ত্ত হল। পতিব্রতা নাগবেণী স্বামীর সঙ্গে ধর্মে বাঁধা, ভালোবাসায় বাঁধা। অন্য সমস্ত কথা ভুলে গিয়ে লচ্চকে সে তার শয্যায় স্থান দিতে কুণ্ঠিত হল না। স্বামীর উপর তার পুরোনো বিরূপতা মিলিয়ে গেল।

ছুটি শেষ না হওয়া পর্যন্ত লচ্চ তাদের বাড়িতেই থাকল। যেন সেই আগের দিনগুলি ফিরে এসেছে এইভাবে নাগবেণী তার স্বামীর কাছে বিষয় সম্পত্তি ও টাকাপয়সার বিলি-ব্যবস্থার কথা খুলে বলল।

একদিন এই আমোদ-আহ্লাদ শেষ হয়ে এল। লচ্চ বলল, 'আমার ছুটি শেষ হয়ে এসেছে। এবারে বল্লারি গিয়ে আবার আমাকে কাজে যোগ দিতে হবে।' সরস্বতী বলল, 'লচ্চ, তোর বাড়িতে থাকলে ক্ষতি কি? না গেলে চলে না?' নাগবেণী বলল, 'যাওয়ার দরকার থাকলে অবশ্যই যাবে। তবে আমাদের দুজনকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে। এখানকার জমিজমা আদায়-উসুলের কাজ কাকাবাবু দেখবেন।' লচ্চ খানিকক্ষণ কি সব ভাবল। ভেবেচিন্তে বলল, 'আমি ওখানে গিয়ে বাসাবাড়ির ব্যবস্থা করে পরে এসে তোমাদের নিয়ে যাব।' সরস্বতী বলল, 'বেশ তাই হবে।' এই বৃদ্ধা রমণীর একান্ত বাসনা যেমন করে হোক লচ্চ-নাগবেণীকে স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক জীবনে সংযুক্ত করে দেবে। তার পরে সে নিজে এই কোডিগ্রামের মাটির সঙ্গে মিলিয়ে যাওয়ার জন্য বছর, মাস, দিন, মুহূর্ত গণনা করবে।

বল্লারি থেকে নিয়মিত চিঠিপত্র আসে নাগবেণীর নামে। পত্রলেখক কানুনগো সাহেব শ্রীমান্ লক্ষ্মীনারায়ণ রাও। নাগবেণীও তার স্বামীর চিঠির যথারীতি উত্তর দেয়। এই ভাবে তাদের ছিন্ন স্নেহবন্ধন আবার জোড়া লাগবে বলে আভাস পাওয়া যাচ্ছে। নাগবেণীর বাবা কিন্তু এর বিন্দু বিসর্গও জানে না। নাগবেণী প্রত্যেক চিঠিতেই তার স্বামীকে অনুরোধ জানিয়ে লেখে, 'বাসা বাড়ির কি করলে? আমাদের এইভাবে এখানে ফেলে রাখা উচিত নয়। এমন কিছু কোরো না যাতে তোমার পিসিমার মনে কষ্ট হতে পারে।' লচ্চর কাছ থেকে উত্তর আসে, 'আমি সর্বদা ট্যুরের উপরেই আছি। তাছাড়া চাকুরি-ক্ষেত্রেও বার বার বদলি হচ্ছে।' এই কৈফিয়ত ছাড়া প্রতিটি পত্রেই 'আমি এই আসছি, 'সুযোগ পেলেই আসব', 'কিছুদিন পরেই আসছি' ইত্যাকার স্তোক বাক্য শোনানো হয়। অবশেষে নাগবেণী একদিন জানাল, 'আমি মা হতে চলেছি। কাজেই আপাতত কোনো বাসা বাড়ি করবার প্রয়োজন নেই।'

লচ্চর গ্রাম থেকে চলে যাওয়ার মাস ছয়েক পরে চিঠি এল বল্লারি থেকে নয়, কেরল থেকে। লিখেছে, 'কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবের সাহায্যে আমি এখানকার আবগারী বিভাগে একটা ইন্‌স্‌পেক্‌টরের কাজ পেয়েছি। কানুনগোর কাজ থেকে এইটেই ভালো। এতে উপরি আয় যথেষ্ট। তাছাড়া এখান থেকে চট করে একদিন আমাদের জেলায় বদলী হতেও পারি।'

লক্ষ্মীনারায়ণ যে কেরলে গেছে সে কথা সত্য। সেখানে যে সে একটা চাকুরি পেয়েছে তাও মিথ্যা নয়। কিন্তু সেখানে সে কতদিন টিঁকতে পারবে বলা যায় না। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার আকাঙ্ক্ষা খুব প্রবল। উপার্জনের দিক থেকে আবগারী বিভাগ বেশ লাভজনক। নানা দিক থেকে ভেট আসে— ঘুষ, দস্তুরী, উপহার কোনো কিছুর জন্য সে সঙ্কোচ বোধ করে না। তবে তার আয় থেকে কত টাকা বাঁচে বলা কঠিন। যেমন আয় তেমন ব্যয় হলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তার চালচলন, ঠাটবাটের জন্য আয়ের তুলনায় ব্যয়ের পরিমাণই বেশি। আর অমিতব্যয়িতার প্রধান কারণ চরিত্র দোষ। অবৈধ আসক্তি যাকে

নিরন্তর খুঁচিয়ে মারে, তার আয় যতই হোক না কেন, হাত তার খালিই থাকে। লচ্চরও সেই দশা। একবার ভাবে টাকার জন্য বাড়িতে সে চিঠি লিখবে। কিন্তু এখানে তার আয় আর নেই, যা আছে তা ব্যয়ের পক্ষে যথেষ্ট নয় এই বলে চাওয়া কি ভালো হবে? তাতে ওর বাড়ির লোকের কাছে ছোট হয়ে যাবে না কি? কাজেই বেশ কৌশল করে একখানি পত্র লিখে জানাল, 'তোমারা ওখানে বাড়ির ফসল-বেচার টাকা যার-তার কাছে অল্প সুদে ধার দাও। ওটা ঠিক নয়। এখানে টাকার সুদ খুব বেশি পাওয়া যায়। কাজেই ফসল আসা মাত্রই তা বিক্রি করে টাকাটা এখানে পাঠিয়ে দিও।'

এই পত্র যখন পৌঁছল, নাগবেণীর শারীরিক অবস্থা তখন মোটেই ভালো নয়। পেটে ছ মাসের শিশু। চিঠির মর্ম তাকে খুব বিচলিত করে তুলল। বাড়ির ফসল বিক্রি করে নারায়ণকাকা নাগবেণীর নামে নগদ টাকা সুদে লাগিয়েছে। এখন স্বামীর কাছে সে কী উত্তর দেবে? যা হয়েছে তা'ই কি লিখবে? অথবা কাকার কাছে ব্যাপারটা জানিয়ে তিনি যা বলবেন সেই মতো লিখবে? চিঠির কথা শুনে সরস্বতী জিজ্ঞাসা করল, 'লচ্চ আসবে না কি? বাড়ি আসার কথা কিছু লিখেছে?' নাগবেণী চিঠির মর্ম শোনালে পরে সরস্বতী বলে উঠল, 'না, এখান থেকে টাকা নিয়ে সে যে ওখানে বসে ধ্বংস করবে, তা হতে দিও না, বৌমা। সে যে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে পায়, তাতে তার খরচ চলে না?' নাগবেণী কিন্তু ঠিক ওভাবে তার স্বামীকে অবিশ্বাস করে না। আবার যদি সে লেখে, 'ফসলের টাকা তোমার চিঠি পাওয়ার আগেই সুদে লাগানো হয়েছে?' তবে নিশ্চয়ই বিদ্রূপ করে লিখবেন, 'ওঃ, তুমিই সংসারের কর্ত্রী, আমাকে জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন নেই?' কি করা যায়? কোনো উপায় না দেখে নাগবেণী কাকাকে খবর পাঠাল। সে এসে এইভাবে লিখে দিতে বলল, 'এখানে ভালো সুদ পাওয়া যায় বলে কাকা আমার নামে টাকা ধার দিয়েছে। বাড়ির খরচের জন্য প্রয়োজনীয় চাল ছাড়া আর কিছু হাতে নেই।'

নাগবেণীর সেই চিঠি পৌঁছবার আগেই লচ্চর কাছ থেকে আর একখানি পত্র এসে হাজির, 'অবিলম্বে অন্তত পাঁচশ টাকা পাঠিয়ে দাও। চক্রবৃদ্ধি সুদে এখানে টাকা ধার নেওয়ার গাহক আছে। আমাদের দেশ গাঁয়ে শতকরা ছ'টাকার বেশি সুদে কে ধার নেবে?'

নাগবেণী ভাবল স্বামীর দ্বিতীয় পত্রের উত্তরে তার প্রথম পত্রই যথেষ্ট।

কিন্তু লচ্চও নাছোড়বান্দা। সেই এক মাসের মধ্যে টাকার জন্য উপর্যুপরি চিঠি। শেষের চিঠিতে লচ্চ একটা কৌশল খাটাল, 'আমি অসুস্থ হয়ে পড়ে আছি। ওষুদ পত্রের জন্য দু'শ টাকা পাঠাও।' লচ্চর কথায় সরস্বতীর কিছু মাত্র বিশ্বাস নেই। কিন্তু স্বামীর অসুখ শুনে নাগবেণী উদ্বিগ্ন হয়ে কাকার কাছে গিয়ে চোখের জল ফেলতে থাকলে কাকা বলে উঠল, 'তুমিই ওকে সর্বনাশের পথে এগিয়ে দিচ্ছ। টাকা পাঠিও না। হাতের টাকা ফুরোলেই বাড়ি এসে পড়বে।' তবু সেবার লক্ষ্মীনারায়ণের হাতে টাকা গিয়ে পৌছল। সেই টাকা শেষ হলে আবার একখানি পত্র। পত্রের বিষয় অল্পবিস্তর একই রকম। এবার উত্তর দিল নাগবেণী নয় তার কাকা। 'তুমি যথাসম্ভব শীঘ্র দেশে চলে এসো। এখানে ডাক্তার দেখিয়ে আবশ্যক মতো চিকিৎসা করানো যাবে। এছাড়া, তোমার স্ত্রীও আসন্ন-প্রসবা। সরস্বতীদেবীরও যথেষ্ট বয়স হল। তাঁর পক্ষে এখন আর কোনো কাজ করাই সম্ভব নয়। তাঁকে ছেড়ে, বাড়ি ঘর ছেড়ে নাগবেণী কোথাও নড়তে পারে না। এই সময়ে বাড়িতে একটা পুরুষ মানুষ থাকা একান্ত দরকার।' এই ভাবে নারায়ণকাকা আরও কিছু উপদেশ দিয়ে পত্র দিল।

বহুদিন পর্যন্ত তার সেই চিঠির কোনো উত্তর নেই। লচ্চর অসুখও হয়নি, অন্য কোনও বিপদও ঘটেনি। খালি বাড়ি থেকে টাকা আনার ফন্দি, সে কেরলেই বসে থেকে নাগবেণীর কাকার উদ্দেশে গালিগালাজ পাড়তে লাগল— 'এই বেটা নারায়ণয়্য আমাকে বাগড়া দিচ্ছে। আমার বাপের পয়সা আমি যা খুশি তাই করব তাতে ওর কী?' কিন্তু একথা তার মনে হল না যে নাগবেণীর এই দুঃসময়ে তাকে দু'একটা সান্ত্বনার কথা লেখা কর্তব্য।

এদিকে নাগবেণীর ন'মাস পার হয়ে গেল কাকা খুব পীড়াপীড়ি করা সত্ত্বেও নাগবেণী পিত্রালয়ে যেতে রাজী হল না। সে এই জিদ ধরে বসল, 'পিসিমা যেখানে, আমিও সেখানে থাকব।' সরস্বতী একে তো বৃদ্ধা তার উপর পার্বতীর মৃত্যু, দাদার মৃত্যু তাকে অত্যন্ত কাতর করে ফেলেছে। নাগবেণীর জিদ দেখে সরস্বতী বলল, 'বাছা, আমার ভরসায় থেকে কী হবে? আজ যদি সত্যভামা এখানে থাকত ··' এই বলে সে দুঃখ প্রকাশ করল। পড়ুমুন্নরুতে খবর পাঠানো হলে সত্যভামা খুব ব্যস্ত হয়ে ফিরে এসে মনে মনে তার এই বলে অনুতপ্ত হচ্ছিল, 'আহা, আমার কী ভুল গো! আমি এতদিন ওদের ছেড়ে কিনা ভাইয়ের ওখানে পড়ে ছিলাম!' সত্যভামা এসেছে দেখে সরস্বতীর বুকে প্রাণ

এল। 'নাগবেণী, ভগবান সত্যকে সময় বুঝে পাঠিয়েছেন।' সত্যভামা যে মুহূর্তে এসে বাড়িতে পা দিল তখন থেকে আর নাগবেণীকে কোনো কাজ করতে দেয়নি। এখন তার সম্পূর্ণ বিশ্রাম। লচ্চ যে সব চিঠি পত্র লিখেছে, একদিন সেই কথা উঠলে সত্যভামা কেবল এইটুকুই বলল, 'আমার কাছে তোমরা ওর নাম মুখে এনো না।'

ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন সকাল থেকে নাগবেণী প্রসব বেদনায় ছটফট করতে থাকল। খবর পেয়ে ঐরোডি থেকে ছুটে এল নারায়ণকাকার স্ত্রী। সারাটা দিন নাগবেণীর চোখে মুখে দুঃসহ যন্ত্রণার চিহ্ন। সরস্বতী তার পাশ ছেড়ে নড়ে না। সত্যভামা রান্নাঘর ও আঁতুড় ঘরের মধ্যে দৌড়োদৌড়ি করতে থাকে। আর কাকিমা সর্বক্ষণ সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'ভয় নেই নাগবেণী ভয় নেই।'. কিন্তু তার মনের মধ্যে এই এক মাত্র আপশোস যে নাগবেণীর সাধ নেই, সীমন্ত নেই, কষ্টের দিনে স্বামীও কাছে নেই। নাগবেণীর সেজন্য কোনো দুঃখ নেই। ভবিষ্যতে কী জানি কী বিপদ হবে এই তার ভয়। একবার তিন মাসের পোয়াতি হয়ে সন্তান নষ্ট হওয়ার কথা কি সে ভুলতে পারে? সরস্বতী ও সত্যভামা সে কথা না জানলেও কাকিমার তা অজানা নেই। নাগবেণীর মুখে চোখে সেই আকাঙ্ক্ষা, সেই নৈরাশ্য, সেই বেদনার ছায়া দেখতে পেয়ে কাকিমা বলল, 'কেন ভাবছ মা? ভগবান আছেন। 'সেবারের মতো' হবে না। ভগবান কি তোমায় ত্যাগ করবেন?' সরস্বতী কাছেই ছিল। 'সেবারের মতো' কথাটার তাৎপর্য সে বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, 'কী, আগে কী হয়েছিল?' নাগবেণী অকস্মাৎ চিৎকার করে উঠল, 'দোহাই কাকিমা, বোলো না! বোলো না সে কথা।' কাকিমা সামলে নিল। সরস্বতী বুঝল ও সব কথা নিয়ে এখন কিছু জিজ্ঞাসা না করাই ভাল। নাগবেণীকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'ভয় নেই বাছা। কিচ্ছু হবে না। আমরা নরসিংহ দেবতার উপর নির্ভর করে আছি। তিনিই রক্ষা করবেন।'

রাত্রি তখন দ্বিপ্রহর। ঘণ্টাখানেক হল একটি শিশু পুত্রের জন্ম দিয়ে গভীর ক্লান্তিতে ঘুমোচ্ছিল নাগবেণী। এক সময়ে সদ্যোজাত শিশু কেঁদে উঠল। সেই কচি কান্নার শব্দে সমস্ত যন্ত্রণা দূর হয়ে নাগবেণীর মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। বলল, 'ঠাকুর!' সরস্বতী বলল, 'হ্যাঁ মা, ঠাকুর দয়াময়। মানুষ মানুষকে ত্যাগ করলেও ভগবান ত্যাগ করে না।' বৃদ্ধার কথার তাৎপর্য বুঝতে পেরে

অস্ফুট কণ্ঠে নাগবেণী বলল, 'না পিসিমা, ওকথা বোলো না। সময় হলে উনিও বাড়ি আসবেন।'

পরদিন সকালেই শুভ বার্তা দিয়ে চিঠি লেখা হল। সেই চিঠিতে এমন অনুরোধও ছিল, 'ছেলের নামকরণের সময়ে তোমার উপস্থিত থাকা চাই। তুমি অবিলম্বে চলে এসো।' তার পরদিন নাগবেণীর পীড়াপীড়িতে লচ্চর নামে তারবার্তাও পাঠানো হল। নাগবেণী অত্যন্ত দুর্বল ও ক্লান্ত হলেও তার পাশেই শুয়ে থাকা কচি শিশুকে দেখে দেখে মন তার খুশিতে ভরে উঠল।

ছ'টা দিন কেটে গেলে পরদিন সকালে কাকিমা 'বাড়িটা একবার দেখে আসি' বলে ঐরোড়ি গিয়েছিল। দুপুরবেলা সকলের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে। চোখ বুঝে শিশু অঘোরে ঘুমোচ্ছে। নাগবেণীও শান্ত মনে শুয়ে ছিল। সরস্বতী ও সত্যভামা প্রসূতির কাছেই উপবিষ্ট। নাগবেণী ধীরে ধীরে বলল, 'সে দিন যে আমি চিৎকার করে উঠেছিলাম...'

সরস্বতী বলল, 'হ্যাঁ মা মাঝে মাঝে হয় ওরকম। সেদিন কি তুমি ভয় পেয়েছিলে ?'

সত্যভামা বলল, 'আমি তো তখন কাছে ছিলাম না। তোমার চিৎকার শুনে ছুটে এলাম মনে হল তুমি যেন কিছু একটা দেখছিলে।'

নাগবেণী বলল, 'আমি দেখি নি কিছুই। আমার কাকিমা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন বলে ভয় পেয়ে গেলাম।'

'হ্যাঁ মা আমার মনে পড়ছে তোমার কাকিমা 'সেবারের মতো' এই রকম কী একটা বলছিল। কি হয়েছিল বাছা ?'

নাগবেণী বলল, 'আপনারা জানেন না, এই আমার দ্বিতীয়বার ··। প্রথম-বার তিন মাসের মধ্যেই...' এই বলে পুরোনো কথা স্মরণ করে নাগবেণী না কেঁদে পারল না। সরস্বতী ও সত্যভামা কিছুই বুঝতে না পেরে নাগবেণীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেঁদো না মা। ভগবান এবার তোমাকে রেহাই দিয়েছেন।'

কাকিমা ঐরোড়ি থেকে ফিরে এসে সেদিন রাতে সমস্ত পুরোনো কথা শোনাল। বলল, 'আমার মনে হয় ওর ভয় হচ্ছিল এবার কিন্তু জন্মালেও মৃত শিশু হবে।'

সরস্বতী সমস্ত কথা শুনে নাগবেণীকে সান্ত্বনা দিয়ে অবশেষে বলল, 'মা, পূর্ব

জন্মের পাপের ফলে মানুষ মেয়ে হয়ে জন্মায়। তাই এই নারী জন্ম সুখের জন্য নয়, নরক যন্ত্রণা ভোগের জন্য।'

নাগবেণী প্রতি মুহূর্তেই প্রত্যাশা করছিল তার স্বামীর কাছ থেকে হয় চিঠি অথবা টেলিগ্রাম আসবে। নাগবেণীর বড় আশা ছিল শিশুর নামকরণের দিনে পুত্রকে কোলে নিয়ে সে স্বামীর পাশে বসে থাকবে। এ কথা সত্য যে আজ আর স্বামীর জন্য তার মন মমতায় উথলে ওঠে না; বিবাহের পরে প্রথম প্রথম স্বামীর প্রতি যে গভীর অনুরাগ সে বোধ করত আজ আর তা নেই। না থাক, জীবনের প্রতি মমতা ও অনুরাগ তো লুপ্ত হয় নি, নবম দিনে নারায়ণ কাকা হংগারকট্টের ডাকঘর থেকে একখানা কাগজ এনে দিল—চিঠি নয় টেলিগ্রাম। এখান থেকে যে টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিল, তার প্রাপককে খুঁজে পাওয়া যায় নি বলে সেটি ফেরত এসেছে। নাগবেণী বলল, 'আমার মনে হয়, কাকা, ওঁর আর কোথাও বদলি হলে কি সেখানে টেলিগ্রাম যেত না? ও নিশ্চয় চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চলে গেছে।'

নাগবেণীর অশৌচের দিনগুলি পার হয়ে গেল, শিশুর নামকরণ অনুষ্ঠান আর হল না। কিন্তু শিশুকে যা হোক একটা নামে ডাকতে তো হবে। বড়রা ভাবল যে প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী ঠাকুরদার নামেই শিশুর নামকরণ হওয়া উচিত। কিন্তু পরে সকলেই একমত হয়ে স্থির করল যে নবজাত পুত্রকে 'সন্ন' (অর্থাৎ খোকা) অথবা 'পুট্টু' (অর্থাৎ মণি) বলেই ডাকা উচিত। 'খোকা' নামটি মাত্র তিন চার দিন চলল। পরে পুট্টু নামটা পছন্দ হওয়াতে সকলেই শিশুকে ঐ নামে ডাকতে লাগল। পুট্টুর পরিচর্যায় নাগবেণী নিজের দুঃখ কষ্ট ভুলে গেল, শিশুও হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল। মাস দুই পরে শিশুর দাদু বাসুদেব উকিল ছুটিতে দেশে আসার সময়ে 'পুট্টু'র জন্য একগাছা সোনার 'বোটর' তৈরি করে আনেন। দৌহিত্রের আদর সোহাগের মধ্য দিয়ে ছুটির অর্ধেক ভাগ তার মেয়ের বাড়িতেই কেটে যায়। একদিন যখন বাপেতে মেয়েতে একা বসে আছে, উকিলবাবু বলল, 'মা তোর আবার ছেলেপুলে হবে শুনে আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। আবার তোকে সেই নরক যন্ত্রনা ভোগ করতে হয় নাকি সেই ভয় ছিল। তুই মা হয়েছিস, সুস্থ আছিস—এতে যে আমার কত আনন্দ হয়েছে তোকে বলে বোঝাতে পারব না।

দিদিকে দেখার জন্য মাঝে মাঝে নাগবেণীর ছোট বোন কৃষ্ণবেণীও তার

বাবার সঙ্গে আসে। কৃষ্ণবেণীর বয়স এখন বারো। নাগবেণী একদিন উকিল বাবুকে বলল, বাবা, কৃষ্ণির এখন বিয়ে দেবে না?' বাবা উত্তর দিল, 'তোমার বিয়ের ফল দেখেই ভয় পাচ্ছি. মা। তুমি যে নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছ, তার পরে আর মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে তাড়াহুড়ো করতে চাই না।' 'কী করবে বাবা? আমার কপালে যেমন লেখা ছিল, তেমনি হয়েছে। কৃষ্ণিরও যে তাই হবে তার কী কথা আছে?' বাবা বলল, 'তোমার কপালে যে এই রকম লেখা ছিল সেটা তো জানা গেল বিয়ে দেওয়ার পরেই। আমি যদি কুন্দাপুরে গিয়ে যে কোন লোককে জিজ্ঞেস করতাম, 'এই ছেলেটা কেমন?' তবেই তো সব জানা যেত। এখন তো সকলেই বলছে, ওটা আগে থেকেই তোমার কপালের লিখন হয়ে ছিল।'

শুনে নাগবেণীর আরও কষ্ট হল। লচ্চর প্রাক্‌বিবাহ কাহিনী তার কিছুই জানা ছিল না বলে সে অনুমান করে নিয়েছিল যে মংগলুরে থাকতেই তার স্বামী বিপথগামী হয়ে থাকবে। সে যেখানে যাই হোক তার তো স্বামী। নাগবেণী বাপের কাছে অনুরোধ করল, 'বাবা, তোমার জামাই যাতে বাড়ি ফিরে আসে, একবার তাই করে দেখো না। শত হলেও সে এখন সন্তানের বাবা।' কিন্তু এ বিষয়ে উকিলবাবুর সিদ্ধান্ত একটিই। 'মা ও হল গিয়ে ভেজাল সোনা কোনো দিনই খাঁটি সোনা হবে না। আমি ওর বিষয়ে অনেক খোঁজ নিয়েছি কাছাকাছি কোথাও সে নেই। সে নাকি উপরস্থ কর্মচারীর সঙ্গে ঝগড়া করে চাকরি ছেড়ে চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ বলতে পারেনা।' বাবার কথা-গুলিতে নাগবেণীর নিরাশা বাড়ল বৈ শান্তি হল না।

উকিলবাবু মুখে যাই বলুন, মংগলুরে ফিরে যাওয়ার আগে ছোট মেয়ে কৃষ্ণবেণীর বিবাহের জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। সেই সঙ্গে বড় ছেলে সদাশিবের জন্য যদি একটি সুপাত্রী জোটানো যায়, মন্দ হয় না। সদাশিব ওকালতি পাশ করে মংগলুরে ফিরে বাপের মতোই উকিল হয়ে বসেছে। এ পর্যন্ত সে 'বিয়ে করব না' বলাতে বিবাহ তার সম্মতির জন্য আটকে ছিল। কিন্তু বাড়িতে পাত্রী পক্ষের ঠিকুজী জমা হতে কোনো বাধা ছিল না। সেই বহুসংখ্যক ঠিকুজীর মধ্য থেকে একটি বাছাই করলেই হল। কিন্তু মেয়ের বিয়ে দেওয়া তো অত সহজ ব্যাপার নয়। ভাল ছেলের খোঁজ পেলেও তাঁর এগোতে সাহস হয় না। ভাবেন, 'এক মেয়ের বিয়ে দিয়ে ঠেকে শিখেছি এবারে আর ভালো করে খোঁজ-

খবর না নিয়ে পা বাড়ানো চলবে না। দরকার হলে জামাইকে বাড়িতে রেখে কষ্টিপাথরে পরখ করে তারপরে না হয় বিয়ের কথা ভাবা যাবে। কিছুই যার জানা নেই এমন উদবেড়ালকে ধরে এনে যদি দেখা যায় সেটি বনবেড়াল তবে তার চেয়ে দুঃখকর আর কিছু নেই।'

নাগবেণীর বিবাহ দিয়ে উকিলবাবু যতটা ভয় পেয়েছেন, দেশের অবস্থা সত্যই তত ভয়ানক নয়। তাঁর মতো সামান্য ও ধনী পরিবারের মেয়ে নিতে আগ্রহশীল ভালো ছেলের কিছু অভাব নেই। ভালো পরিবার থেকেই সম্বন্ধ এল। আসলে এটি পরিবর্ত সম্বন্ধ। যে পরিবার থেকে সদাশিবের জন্য মেয়ে আনা হচ্ছে, সেই মেয়েরই দাদার সঙ্গে কৃষ্ণবেণীর সম্বন্ধ হয়ে গেল। উকিলবাবুর বিশ্বাস এই বদল সম্বন্ধের ফলে একে অন্যের প্রতি নিষ্ঠুর হবে না। বর্ষা শুরু না হতেই ছেলের বিয়ে দিয়ে উকিলবাবু ঐরোডি ছেড়ে তাঁর কর্মক্ষেত্রে রওনা হয়ে গেলেন। নাগবেণী তার শিশুসন্তানকে নিয়ে ছোট বোনের বিয়েতে উপস্থিত হয়েছিল বটে, কিন্তু দাদার বিয়েতে যোগ দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হল না।

কোডিগ্রামের বাড়িতে বসে তিনজন অনাথা রমণী ভাবছে—'অলসভাবে বৃষ্টি-ফোঁটার হিসেব না করে যাহোক কিছু ক্ষেতখামার করলে মন্দ হয় না। সরস্বতী বলল, 'আমাকে দিয়ে যেটুকু করা সম্ভব আমি তা করব।' কিন্তু ঘরের কাছাকাছি ক্ষেতে যাতায়াত করা ছাড়া আর কী কাজ সে করতে পারবে? স্বামী জীবিত থাকা পর্যন্ত সত্যভামা কোনো দিন কৃষিকাজে হাত দেয় নি। কিন্তু এখন সময় কাটাবার জন্য সে বলল, 'বেশি না হোক, আমরা এক 'মুড়ি' (৪২ সের) ধানের বীজ বুনব।' যাকে বলা যায় 'গৃহকৃষিকর্ম', সেই বর্ষা-কালে তারা ততটুকু করল। ফলে এবারকার নবরাত্রির উৎসবে নতুন খাওয়ার জন্য তারা যে পায়েস তৈরি করল, তার ধান অন্য বাড়ি থেকে চেয়ে-চিন্তে আনতে হয় নি, এ তাদের ক্ষেতের ধান। নাগবেণী মনে মনে ভবিষ্যতের কল্পনা করে, 'আগামী বছর আর এক 'মুড়ি' নয়, অন্তত তিন 'মুড়ি'র কৃষি করা যাবে। এবছর কিছু 'অজব' কিছু রবিশস্য কিছু কলাই ডালের প্রয়োজন। শশার ক্ষেতে জল দেওয়া সম্ভব নয়, কাজেই ওটা থাক।' সে কিন্তু কৃষিকর্মের বিন্দুবিসর্গও জানে না। তবু তার ভালো লাগে পিসিমার ওই কথাটা, 'কোনো কাজ না করে বাড়িতে বসে বসে খাওয়া কি ভালো?'

কিন্তু নাগবেণীর স্বপ্ন অত সহজে সফল হওয়ার নয়। ছমাস বয়স হতেই

ছেলে 'পুট্টু'কে যকৃতের রোগ ধরল। ছেলের সেই চটপটে ভাবটুকু আর নেই, তার মুখের হাসি বন্ধ হয়ে গেছে। সারাটা দিন পড়ে পড়ে কাঁদে। নাগবেণীর মন স্বভাবতই কৃষিকর্মের কথা ভুলে শিশুর চিন্তায় মগ্ন। সরস্বতী ও সত্যভামা যাকে পায় তার কাছেই শিশুর রোগের ঔষধের কথা জিজ্ঞাসা করে, এ অঞ্চলের সমস্ত দেবদেবীর কাছে মানত করে। নবরাত্রির পরে তিনটি মাস পর্যন্ত এই তিনটি রমণীর উদ্বেগ, কষ্ট ও শ্রমের কথা বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হল। একদিন বারান্দায় শুয়ে শুয়ে পুট্টু হাসছিল। অন্য দিন যেমন কাঁদে তেমন কোনো কান্না নেই। মুখে কেবল একটি মাত্র ধ্বনি—তা…তা… তা । নাগবেণী সরস্বতীকে ডেকে বলল, 'দেখছেন পিসিমা, অনেক দিন পরে পুট্টুর মুখে আজ হাসি ফুটেছে।' নাগবেণী জানত না যে এইটুকু সুখও তার কপালে সইবে না। পরে তাকে অনেক দিন এই বলে আক্ষেপ করতে হয়েছিল, 'পিসিমা, কেন সেদিন আমি পুট্টুর মুখে হাসি দেখে সুখের কথা ভেবেছিলাম ? কোন্ মুখে সে কথা বলতে গেলাম ?'

সত্যভামার দুঃখ কিছু কম নয়। তবু সে আত্মসংবরণ করে পুত্রবধূকে সান্ত্বনা দিয়ে বলে, 'মা, ভগবান আমাদের কপালে যা লেখেন নি, আমরা তা চাইলে কী হবে ? শিশুর ঋণ চুকে গেল, ঠাকুরই তাকে নিয়ে গেছেন।' সরস্বতী অনেক দুঃখ পেয়েছে, অনেক প্রিয়জনের বিয়োগবেদনা সহ্য করেছে। তবু নাগবেণী যখন তার মৃত শিশুসন্তানের জন্য কাঁদে, সরস্বতীর বুকের ভিতরটা কুরে কুরে খায়। কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাগবতের অথবা মহাভারতের কোনো দুঃখের কাহিনী স্মরণ করে বলে, 'বাছা, গান্ধারী প্রসব করল একশ' সন্তান। শেষপর্যন্ত কে থাকল তার ? আমরা এ সংসারে কেন যে আসি , কেন যে যাই জানি না। তবে আমার মনে হয় ছেলের জন্মদান ও লালন পালনের জন্যই আমরা আসি না। ভগবানের নিশ্চয়ই কী একটা হিসাব আছে। আমরা তার কী জানি, কতটুকু জানি ?' দুঃখের মুহূর্তে সরস্বতীর মুখের এক একটা গল্পে নাগবেণীর অস্থির মন অনেকটা শান্ত হয়ে আসে। 'পিসিমা, আপনি যে দুঃখ ভোগ করেছেন, আমি তো তার কিছুই পাই নি। তবু অদৃষ্টের কথা ভেবে কষ্ট হয়। কিন্তু আমি শিখব, পিসিমা, আপনাকে দেখে সহ্য করতে শিখব।'

বছর দুই যাবত লক্ষ্মীনারায়ণের কোনো খবর নেই। অবশেষে একদিন শীনময়্যার বড় ছেলে নরসিংহ পিতা মৃত্যুশয্যাগত শুনে বেংগলুর থেকে দেশে এল

বাবাকে দেখতে। সরস্বতীও খবর পেয়ে শীনময়্যর ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। ময়্য বলল—'এসেছ সরসোতি? তোমাদের লচ্চর ছেলের এমনটা হল! ভগবান আমাদের মতো বুড়োকে না নিয়ে ওই ক্ষুদ্র শিশুকে নিয়ে কী করবেন?'

শীনময়্যর বাড়ি থেকে চলে আসার সময়ে সরস্বতী নরসিংহকে জিজ্ঞাসা করল. 'আচ্ছা বাবা, আমাদের লচ্চর কোনো খবর তুমি জান?'

'কেন, লচ্চর খবর আপনারা জানেন না? ও তো আজকাল 'বেরিংগাপেটে'তে আছে। ভালই আছে। মাঝে মাঝে বেংগলুরে আসে। আমাদের হোটেলেও আসে। বেরিংগাপেটেতে কী যেন চাকরি করে বলেছিল। আবার কেউ কেউ বলে—সব নাকি খুইয়েছে। তবে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। বাড়ি আসার দিন পনেরো আগে একবার দেখা হয়েছিল। ও বলল যে বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে।'

'সব মিথ্যা. বাবা। তিন বছর হতে চলল সে বাড়িমুখো হয়নি। কোথায় আছে তা দু'একবার জানিয়েছিল। যখনই চিঠি লিখত, এত টাকা পাঠাও, অত টাকা পাঠাও' এই কথাই লিখত। যখন টাকা পাঠানো বন্ধ হয়েছে, তারপর থেকেও চিঠি লেখাও বন্ধ করে দিয়েছে।'

শীনময়্য সঙ্কটজনক অবস্থার জন্য সেদিন আর নরসিংহের সঙ্গে বেশি কথা-বার্তা হল না। আট দশদিনের মধ্যেই শীনময়্যকে বিদায় নিতে হল। তার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরস্বতীকে প্রতিবেশীর শোকের শরিক হতে হল। শীনময়্যর মৃত্যুর পরে গ্রামের বাড়ি ঘর ও জমিজমার তদারকির ভার পড়ল নরসিংহের সেজো ভাই ওরটের উপর। নরসিংহকে বেংগলুর ফিরে যেতে হবে। যাওয়ার আগে গ্রামের ধার কর্জের হিসাব-নিকাশ করে যাওয়া দরকার। শীনময়্যর কাছ থেকে লচ্চ যে টাকা ধার করেছিল, সেটা বাবা-দাদার সম্পত্তির বন্ধকীর উপর ধার। এ পর্যন্ত তার সুদ বা আসল কিছুই পাওয়া যায় নি। সুদে-আসলে মিলে এখন তা তিন হাজারের বেশি হয়েছে। লচ্চকে জিজ্ঞাসা করে কোনো ফল হবে না জেনে নরসিংহ একদিন তাদের বাড়িতে এসে হাজির হল। সরস্বতীকে দেখে বলল, 'কেমন আছেন পিসিমা?' একটু দূরে নাগবেণী কী একটা কাজে ব্যস্ত ছিল। তাকে দেখে নরসিংহ জিজ্ঞাসা করল, 'এই আপনাদের লচ্চর স্ত্রী, পিসিমা?'

সরস্বতী নরসিংহকে সমাদর করে অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, 'হ্যাঁ বাবা,

আমদের নাগু—নাগবেণী। বিয়ের পর থেকে একটি দিনের তরেও সুখ শান্তি কাকে বলে জানল না। আমি স্বামী হারিয়ে বিধবা ; ওর স্বামী বেঁচে থাকতেও বিধবা।' এইভাবে সরস্বতী নরসিংহের কাছে তাদের দুঃখ কষ্টের কথা বলল।

যে উদ্দেশ্যে নরসিংহ এসেছে, সে কথাটা জানাতে অনেক সময় লাগল। সরস্বতীর দুঃখের কথা শোনা শেষ হলে পরে তার নিজের দুঃখের কথা পাড়তে হল। সে ধীরে ধীরে শুরু করল, 'দেখুন পিসিমা, আমি থাকি বেংগলুরে। বাড়ি-ঘর জমিজমা সব বাবাই দেখাশোনা করতেন। তখনকার ব্যাপার আমার ঠিক মতো জানা নেই। তবে বাড়িতে রেকর্ড-পত্র দেখার সময়ে চোখে পড়ল আপনাদের লচ্চর বন্ধকী ঋণ হাজার তিনেক টাকার মতো হবে। অনেক দিন হয়ে গেল। ঋণ নেওয়ার পর থেকে একটি পয়সাও তার কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। আমি আবার মাস ছয়েক পরে দেশে আসব। তার মধ্যে কিছু একটা ব্যবস্থা করবেনন।'

সরস্বতী ও সত্যভামা এ সবের কিছুই জানে না। এমন কি রাম ঐতালও কিছু জানত না। লচ্চ শীনময়্যর কাছ থেকে যত টাকা ধার নিয়েছিল পরে এক সময়ে তা বন্ধকী ঋণে পরিণত হয়। এখন সে কথা কে অস্বীকার করবে? বসতবাটি, পৈতৃক সম্পত্তি বন্ধক হয়েছে শুনে সরস্বতী যারপরনাই মর্মাহত হল। এই খবর পাঠানো হল ঐরোডিতে নাগবেণীর কাকার কাছে। সেখান থেকে খবর গেল মংগলুরে উকিলবাবুর কাছে। উকিলবাবু জানালেন যে আগামী ছুটিতে দেশে ফিরে তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

ছুটির সময়ে উকিলবাবু মংগলুর থেকে দেশে এলেন। ঋণের ফয়সলা করার জন্য বেংগলুর থেকে নরসিংহও এসে উপস্থিত। স্থির হল যে ছুটির পরে কোর্ট-কাছারি খুললেই নরসিংহ ঋণের টাকার জন্য মামলা দায়ের করবে। সম্পত্তি নীলামে উঠলে নাগবেণীর নামেই সেটা কিনে নেওয়া হবে। কোর্ট থেকে নোটিশ পেলেও লচ্চ ওদিকে মুখ দেখাল না, চুপচাপ দূরে বসে থাকল। সম্পত্তি নীলামে উঠলে নাগবেণীর নামে কিনে নেওয়া হল। উকিলবাবু মেয়েকে বলল, 'টাকা যা যাবার তা তো গেলই। ছোঁড়াটা যদি বাপ দাদার বাড়ি-ঘর বিক্রি করে দিত তবে তো হাত ছাড়া হয়ে যেত। এখন নীলামে কিনেছি বলে অন্তত এইটুকু সান্ত্বনা যে সম্পত্তিটা তোর নামেই হল।' নাগবেণী উদাস কণ্ঠে বলল, 'এখন কিছু হলেই বা কী, না হলেই বা কী? হয়েছিল একটা ছেলে,

বেঁচে থাকলে তবু প্রাণের জন্য মায়া হত। যখন আমার তাও নেই কার জন্য এই বাড়ি-ঘর? কার জন্য এই সম্পত্তি বাবা?' মেয়ের কথা শুনে বাপ ব্যথিত চিত্তে ভাবল, 'নাগবেণীকে আমি একরকম নিজের হাতেই হত্যা করলাম।'

সময় থেমে থাকে না, কারও জন্য সে অপেক্ষা করে না। তবে কি লক্ষ্মী-নারায়ণের সুবুদ্ধি ফিরে আসুক বলে সে অপেক্ষা করবে?

নাগবেণী বসে বসে অতীত দিনের কথা ভাবে—জ্যৈষ্ঠমাসে ধানের চাষ, অগ্রহায়ণে কলাই ডালের খন্দ, মকর সংক্রান্তির সময়ে খিড়কীর বাগানে শশা গাছের কৃষি—একের পর এক আসে আর যায়। মাঝে মাঝে সে আরও ভাবে একান্তভাবে নিজের কথা—'কত কাল হল গলায় মঙ্গলসূত্র উঠেছে (বিয়ে হয়েছে), কত বছর কেটে গেল তাঁর মুখ দেখি না, কত দিন হল পুট্টু আমায় ছেড়ে চলে গেছে!'

নাগবেণী এখন দিন রাত আগলে রাখে সরস্বতীকে। সত্তর বছরের বৃদ্ধা একটি শিশুর মতো অসহায়। দেহের মাংস শুকিয়ে হাড় মাস এক হয়ে গেছে। চোখ ঝাপসা হয়েছে বলে কেবল পরিচিত স্থানগুলিতে আন্দাজে হাতড়ে হাতড়ে চলে। এহেন সরস্বতী নাগবেণীর চোখে যেন গৃহদেবতা। দিনরাত তার সঙ্গে কথা বলতেই নাগবেণীর আনন্দ।

সরস্বতী নাগবেণীর হাত দুখানি ধরে তার প্রথম জীবনের গল্প বলে। তাদের দারিদ্র্য, তাদের দুঃখের কথা শোনায়। রাম ঐতাল ও পার্বতীর দাম্পত্যজীবনের কথা বর্ণনা করে। সব শেষে বলে, 'এত সব দেখাশোনার পরেও দেহের এই শুকনো খাঁচাটা এখনও তো পড়ে আছে। ভেঙে তো যায় নি।' নাগবেণী শিশুর মতো বলে, 'পিসিমা, যে পর্যন্ত আমি আছি, তুমিও সেই পর্যন্ত থাকলেই হল।'

সরস্বতী বলে, 'মা, তুমি ছেলেমানুষ, আরও কত কাল তুমি বাঁচবে। ঠাকুর হয়ত একদিন ওর মতিগতি ফিরিয়ে ওকে তোমার কাছে এনে দেবে। তুমি বেঁচে থাকো মা। কিন্তু আমি বেঁচে থাকব কিসের জন্য তবে মা। আমার একটা বাসনা—কেন জানি না একটা অসাধ্য কামনা আমার মনকে খুঁচিয়ে তোলে। দাদা যখন বেঁচে ছিল, তখন তাকে বললে সম্ভব হত। এখন তো কেবল অরণ্যে রোদন।'

নাগবেণী বলল, 'তোমার কী ইচ্ছা, বলো পিসিমা।'

সরস্বতী বলল, 'মৃত্যুর আগে যদি একবার কাশী যেতে পারতাম! ভাগীরথীর জলে যদি ডুব দিতে পারতাম। ঠাকুর যদি সেখানেই আমার গতি করে দেন বড় ভাল হয়; কিন্তু সেই সৌভাগ্য সকলের হয় না মা। এখন তো অন্ধ হয়েছি, ভাইপোটাও কুপথে গেল, এখন আমার কাশীই বা কী, কুম্ভকাশীই বা কী, সবই আমার এই ঘরে।'

সরস্বতী নাগবেণীর কাছে কাশীর নানা গল্প বলে। তার বাবা কোদণ্ড ঐতাল কীভাবে পদব্রজে কাশী ভ্রমণ করে এসেছিলেন—সেইসব কাহিনী বর্ণনা করে। কাশীর এই গল্পের মধ্য দিয়েই যেন সে তার আকাঙ্ক্ষা মেটাতে চায়।

পুট্টুর মৃত্যুর পরে দীর্ঘ পাঁচ বছর কেটে গেছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে এক রাত্রির জন্যও নাগবেণী বাড়ি ছেড়ে যায় নি। এক একদিন ঐরোডিতে সকালে গিয়ে আবার সন্ধ্যার আগেই ফিরে এসেছে। সরস্বতী আজকাল চোখে দেখে না, চলতে গিয়ে যদি সে হোঁচট খায়, যদি পুকুরে পড়ে যায়—এই ভয়ে নাগবেণী পিত্রালয়ে গেলেও তাড়াতাড়ি ছুটে আসে।

নববর্ষ কেটে গিয়ে বৈশাখ মাস এলে উকিলবাবু মংগলুর থেকে দেশে ফিরে মেয়ের বাড়ি এসে লচ্চর খবর দিলেন। বললেন, 'মৈসূর (মহীশূর) বেংগলুর (ব্যাঙ্গালোর) যেখানেই গেছে হোটেল চালানোর চেষ্টা করে দেনার দায়ে ডুবেছে। ও কী হোটেল চালাবে? জুয়াখেলা এবং আরও সব ব্যাপারে টাকা উড়িয়ে ধারকর্জ করে পালিয়েছে। এই তো কিছুদিন আগে আমি বাড়িতে ছিলুম না, এমন সময়ে নাকি আমাদের সদাশিবের খোঁজে এসেছিল। সদাশিব খেয়ে যেতে বললেও খেল না। গ্রামে আসবার জন্য মোটরের ভাড়া দরকার বলে সদাশিবের কাছ থেকে পাঁচটি টাকা নিয়ে সরে পড়েছে।'

সরস্বতী বলল, 'এখনও যদি ওর মতিবুদ্ধি ফেরে এই বাছার (নাগবেণীর) জীবনটা বাঁচানো যায়।'

নাগবেণী বলল, 'এ জীবন থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি।'

সরস্বতী উকিলবাবুকে জিজ্ঞাসা করল, 'লচ্চ কি আর গ্রামে আসবে?'

উকিলবাবু বললেন, 'আমি যতদিন দেশে থাকব, ততদিনে আসবে না। তবে তারপরে আসতে পারে টাকার জন্য। ওকে বলিস, নাগবেণী, টাকা পয়সার কথা যেন আমার সঙ্গে বলে।'

সেদিন রাতে বাসুদেব উকিল মেয়ের বাড়িতেই থাকলেন এবং বাপে-মেয়েতে

বসে অনেকক্ষণ ধরে নানা কথাবার্তা বলতে লাগল। ছোটমেয়ে কৃষ্ণবেণীর কথা উঠতে উকিলবাবু বললেন, 'মেয়ে-জামাই এখন মাদ্রাসে আছে, ভালোই আছে সেখানে। মাঝে মাঝে আমাদের কাছে চিঠিপত্র দেয়। জামাই বেশ উপযুক্ত হয়েছে। এখন তার মাইনে একশ' টাকা।...' বেশ খুশি মনে কথাগুলি বললেন। অতঃপর মংগলুরের খবর, দাদা-বৌদি ছোটভাইরা কে কেমন সেই সব খবর। কুশলবার্তা শেষ হলে বাবা একটু খুশি রয়েছেন দেখে নাগবেণী বলল, 'বাবা আমি একটা অনুরোধ করছি, না বলতে পারবে না?' 'কি অনুরোধ মা?' মেয়ে বলল, 'অনুরোধটা রাখবে তো?' 'আমার দ্বারা সম্ভব হলে আমি নিশ্চয়ই রাখব।' মেয়ে বলল, 'আর কিছু নয়, বাবা, পিসিমার বয়স তো অনেক হল। এই বাড়িটা যে এখনও দাঁড়িয়ে আছে সেটা ওঁরই জন্য। ওঁর একটা ইচ্ছা পূরণ করা যায় না কি?'

'কি ইচ্ছা মা?'

'উনি একবার কাশী ঘুরে আসতে চান। মুখ ফুটে বলার সাহস নেই। বলেন কি না এই অন্ধের বোঝা কে নেবে? বাবা, মৃত্যুর আগে যদি উনি তীর্থযাত্রা করতে পারেন, কে জানে বাবা, তাহলে হয়ত ওঁর পুণ্যবলেই আমাদের গ্রহের কুফল কেটে যেতে পারে।'

বাসুদেবয়্য কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে বললেন, 'তোমার কথাই হবে মা। আমারও চুল পেকে গেল। ওকালতির কাজকর্ম সদাশিবের হাতেই ছেড়ে দিয়েছি। বেশ, তোমার পিসিমাকে নিয়ে কাশী যাব। তোকেও সঙ্গে নিয়ে যাব মা?'

'আমি যাব না বাবা। ছোটশাশুড়ি যাবেন কিনা জিজ্ঞেস করব। কিন্তু আমার কাশীবাস এখানেই।' বাসুদেবয়্য কিছুতেই মেয়েকে রাজি করাতে পারলেন না। অবশেষে স্থির হল—সরস্বতী ও সত্যভামা যাবে। পরদিন থেকে যাত্রার আয়োজন শুরু হল।

নাগবেণী গিয়ে সরস্বতীকে বলল, 'পিসিমা, বাবা কাশী যাচ্ছেন এবং তোমাদের দুজনকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন।' সরস্বতী উত্তর দিল, 'আমাকে যে উনি নিয়ে যেতে চেয়েছেন এতেই খুশি হলুম মা। আমার মতো একটা অন্ধ বুড়িকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কষ্ট করতে হবে না। আমি যদি পথেই মরি, তবে কি অবস্থা হবে? আমার জন্য যদি কারো কোনো কষ্ট হয়, তবে সেটা কি কাশী-

যাত্রা? সত্যভামা তুমি যাও।' কাশীযাত্রার কথা শুনে সত্যভামা খুশি হল। কিন্তু একটি চিন্তা, 'বাড়িতে কে থাকবে?' 'সে যাই হোক না, মোট কথা তোমরা দুজনে যাবে। রেলগাড়ি আছে, মোটরগাড়ি আছে, তোমাদের হাঁটতে হবে না। এক মাসের মধ্যে ফিরে আসতে পারবে।' চোখের জলে নাগবেণী পীড়াপীড়ি করতে তার ইচ্ছাই জয়ী হল। স্থির হল, চাষবাসের পরে রওনা হয়ে পুনরায় ফসল কাটার আগে দেশে ফিরে আসবে।

অবশেষে যাত্রার দিন ঘনিয়ে এল। নাগবেণীর আনন্দের সীমা নেই। পিসিমার অনেক দিনের মনোবাঞ্ছা এবার তাহলে পূর্ণ হতে চলেছে। যাত্রার আগের দিন রাতে নাগবেণীর চোখে ঘুম নেই, সারা রাত ধরে কথাবার্তা বলেও তার শেষ হল না, উকিলবাবু কোডিগ্রামে এলেন দুই তীর্থযাত্রিনীকে নিয়ে যেতে। গৃহত্যাগের সময় হলে সরস্বতীর কণ্ঠরোধ হয়ে এল। বলল, 'মা, আমি আর ফিরে আসব কিনা জানি না। আমি যেখানেই মরি না কেন, ঠাকুর তোমাকে রক্ষা করলেই হল।' নাগবেণী আশ্বাস দিয়ে বলল, 'তুমি এখানে অবশ্যই ফিরে আসবে পিসিমা। তোমার পদসেবার ঋণ এখনও যে আমার বাকী আছে।

নাগবেণীর ইচ্ছা পিসিমা পাল্কিতে করে যাবে। 'পালকি দরকার নেই। আমি হাঁটতে পারব। আগেকার দিনে বুড়োরা কাশী যেতেন আগাগোড়া পায়ে হেঁটে।' এই বলে সরস্বতী পায়ে হেঁটে যাবে বলে জিদ ধরল। এবং নাগবেণীর হাত ধরে নদীর কিনারা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে তার জিদ বজায় রাখল। গ্রামের সমস্ত লোক বাজনা বাজিয়ে নদীতীর পর্যন্ত এসে তাদেরকে বিদায় দিয়ে গেল। নাগবেণী তাদের সঙ্গে ঐরোডি গিয়ে সেখান থেকে সকলের রওনা না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে পুনরায় চোখের জলে বিদায় দিল।

নাগবেণী আর ঐরোডিতে অপেক্ষা করেনি। নারায়ণকাকা বলেছিল, 'একটা দিন থেকে যা নাগবেণী। ওখানে তোদের বাড়িতে আমি লোক পাঠিয়ে দিই। কোনো চিন্তা নেই।' নাগবেণী বলেছিল, 'কাকা ঠাকুরঘরের প্রদীপ তো আমাকেই জ্বালাতে হবে। এতদিন পিসিমা ছিলেন, একদিনও বাদ পড়েনি সেই কাজটি। যাওয়ার সময় আমাকেই ভার দিয়ে গেলেন। সেই একটা কাজও কি আমি করব না কাকা?' নারায়ণকাকা আর দ্বিরুক্তি না করে নাগবেণীর সঙ্গে ভৃত্যস্থানীয় একটি লোক দিয়ে দিল। বাড়ির কাছাকাছি এসে তারা দেখল উঠোনে কে যেন পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। সঙ্গের ভৃত্যটি বলল,

'দিদিমণি, কোনো চোর-টোর হবে বোধ হয়। নইলে আপনিও বাড়ি ছেড়ে গেলেন ঠিক সেই সময় বুঝে অন্য কেউ এখানে আসল কি ?'

'চোরের নেওয়ার মতো কী আছে বাড়িতে ?' এই বলে নাগবেণী উঠোনের দিকে তাকাল। সত্য বটে একজন লোক দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তাকে ঠিক চেনা গেল না। পরনে ছেঁড়া নোংরা কাপড়, মাথায় উস্কোখুস্কো চুল, মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, চোখের কোলে কালিমা। ভৃত্য জিজ্ঞাসা করল, 'কে ওখানে ?'

লোকটা চুপ করে রইল। ভৃত্য ধমক দিয়ে বলল, 'কে তুমি ? বাড়িতে যখন লোকজন নেই, তখন কী কাজ এখানে ?' আগন্তুক হাসল।

নাগবেণী বিস্মিত হয়ে আগন্তুকের কাছে গেল, 'তুমি ? তুমি এসেছ ? খাওয়া হয়েছে ?'

আগন্তুক বলল, 'চিনতে পেরেছ তাহলে ?'

ভৃত্যের মুখের দিকে তাকিয়ে নাগবেণী খুশি মনে বলল, 'উনি এসেছেন !'

সেদিন রাতে নাগবেণীর চিত্তে বিচিত্র ভাবোন্মাদ। স্বামীর দেখা পেয়ে মুখে যে হাসি ফুটেছিল, তা মিলিয়ে গেল মৃত শিশুপুত্রের স্মরণে। সরস্বতী বাড়ি নেই বলে অপ্রত্যাশিত আনন্দও ব্যথায় পরিণত হল। অনেক, অনেক অনেক চিন্তা তার হৃদয় সরোবরকে তরঙ্গিত করে তুলল।

সতেরো

বাড়িতে আসার পরে দু-তিন দিন পর্যন্ত লক্ষ্মীনারায়ণ একেবারে অতিথির মতো রইল। নাগবেণীরও মন ছিল না যে সে তাকে আদর অভ্যর্থনা করে। বিয়ের পর স্বামীর সঙ্গে যে স্নেহ-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা তো কবেই ছিন্ন হয়ে গেছে। পুট্টুর মৃত্যুর পরে স্বামীর বিরুদ্ধে একপ্রকার জুগুপ্সাই উদ্রিক্ত হয়েছে তার মনে। কিন্তু সে যখন নিজে থেকেই বাড়ি এসে উপস্থিত হয়েছে, তখন তাকে 'যাও' বলার মতো হৃদয়হীনাও সে নয়। আবার সহজভাবে কথা বলতেও সে সঙ্কুচিত। 'চান করতে যাও', 'খেতে এস' এই সমস্ত দরকারি কথাও ঘুরিয়ে বলা হয় এইভাবে, 'স্নানের সময় হল ?' 'আহারের সময় হল' ইত্যাদি। শোওয়ার সময় হলে বারান্দায় একটা মাদুর পেতে দিয়ে সে নিজে গিয়ে শোয় গৃহের অভ্যন্তরে। লক্ষ্মীনারায়ণও নাগবেণীর সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলার চেষ্টা করেনি। তার অনুপস্থিতকালে যা যা ঘটেছে, পৌঁছবার আগে সবই সে শুনেছিল অন্য লোকের কাছে। সুতরাং স্বামী স্ত্রীর কথা বলার অবকাশই বা কোথায় ?

কিন্তু নিরাশ নিস্পৃহ হয়ে বসে থাকার মতো লোক লচ্চ নয়। দিন তিনেক চুপচাপ থাকার পরে চতুর্থ দিনে সে মুখ খুলল। রান্নাঘরে উনুন ধরাবার জন্য কাঁচা কাঠে ফুঁ দিয়ে দিয়ে নাগবেণী যখন চোখ ডলছিল, সেই মুহূর্তে লচ্চ এসে জিজ্ঞাসা করল, 'নাগবেণী, আমি কি থাকব, না চলে যাব ?'

'আমি সেভাবে কিছু বলেছি কি ?'

'না বলোনি বটে। তবে কথাবার্তাও বলছ না।'

'আমার কাছে বলার মতো কী আছে যে বলব ? আমরা তো জঞ্জালেরও অধম। এখন আমার উপরেই কেন কথার ভার চাপিয়ে দিচ্ছ ?'

'যা হবার হয়েছে। আমার অদৃষ্টই খারাপ। আমি কিছু করলেও ভালো হয় না। যতই কষ্ট করি না, দ্বিগুণ লোকসান ছাড়া লাভ হয় না। কিন্তু সে সমস্ত দুঃখের কথা কার কাছে বলব ?'

নাগবেণীর কাছে এই সমস্ত কথা হেঁয়ালির মতো বোধ হল। লচ্চ বলল, 'বাইরে ঢের মেহনত করে দেখলুম। এখন এখানেই থাকব বলে এসেছি।'

নাগবেণী একথার পরেও চুপ করে রইল দেখে লচ্চ অবাক হয়ে ভাবছিল এত মনের জোর সে পেল কোথায়। 'কী আমি থাকব না এখানে? তাহলে বলো সে কথা। কারও বোঝা হয়ে থাকার ইচ্ছা আমার নেই। এটা আমার বাবার সম্পত্তি হলেও এখন ভিক্ষার জন্য তোমাদের সকলের কাছে হাত পাতার মতো অবস্থা আমার। মানমর্যাদা নিয়ে মানুষ থাকতে পারে না এভাবে। তবু বললাম, 'আমি এখানে থাকব বলেই এসেছি।' তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, আমি চাইনা থাকতে। আমার নামে যে সামান্য সম্পত্তিটুকু ছিল, ধার শোধের অছিলা করে তোমার বাবা সেই সম্পত্তি তোমার নামেই করে দিয়েছেন। তোমাদের এত সমস্ত থাকা সত্ত্বেও আমি যাতে ভিক্ষা করে খাই তাই করে দেন নি কি?'

নাগবেণী এ পর্যন্ত নীরবেই শুনছিল। কিন্তু শেষের বিষময় কথাগুলি সইতে না পেরে অত্যন্ত বিরক্তি সহকারে বলল, 'আমার সুখের জন্য কিছুই করেননি বাবা। তুমি যাতে সম্পত্তি না খোয়াতে পার, তার জন্যই এই ব্যবস্থা করেছেন। নরসিংহময়্যকে যে তিন হাজার টাকা দিতে হল, সেটা কার টাকা নষ্ট হল? তোমারই টাকা। তোমার বাবার তৈরি এই বাড়ি, এই বাস্তুভিটা কি পরের হাতে চলে গেলে ভাল হত? এখানে যা কিছু রয়েছে, সব তোমারই জন্য, আমার একা বসে খাওয়ার জন্য নয়।'

নাগবেণীর এই সব সরল সহজ যুক্তিপূর্ণ কথার কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে লচ্চ একেবারে চুপ হয়ে গেল। পূর্বের মতো আরও কয়েকদিন আহার-নিদ্রায় এবং তারই ফাঁকে দু'একবার তার পুরোনো বন্ধু ওরটময়্যর বাড়ি যাতায়াতে কেটে গেল। গ্রামে আসার পরে চুল দাড়ি ফেলে, ফরসা জামা কাপড় পরে সে অনেকটা ভদ্রস্থ হয়েছে, এখন আর ভিখারির বেশ নেই। কিন্তু তবু সে আর আগেকার লক্ষ্মীনারায়ণ নয়। তার হৃষ্টপুষ্ট চেহারা শুকিয়ে এখন অস্থি কঙ্কাল-সার হয়েছে। তা দেখে নাগবেণী খুশি হল না। একদিন আহারের সময়ে নাগবেণী বলল, 'তোমার এ চেহারা কেন? এসেও তো চুপ করে নেই···কোনো ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করাতে পার না? এখানে ইচ্ছা না হলে উডুপিতে গিয়ে ইংরেজি ডাক্তার দেখাও।'

'অ্যালোপ্যাথি ডাক্তারের চিকিৎসা টাকা না ঢেলে এমনি এমনি হয় নাকি?'

'তার জন্য আমি তোমায় টাকা দেব না বলেছি কি।' যাহোক, সেই

দিনই নাগবেণীর কাছ থেকে পাঁচটি টাকা নিয়ে লক্ষ্মীনারায়ণ সন্ধ্যাবেলা উডুপি গেল। ফিরল তিন দিন পরে। এসে বলল, 'ডাক্তার বলে, চিকিৎসার জন্য অন্তত পঞ্চাশ টাকা দরকার। এখন কী একটা খাবার ওষুদ দিয়েছে—অত্যন্ত তেতো ওষুদ। কোন্ পিশাচী তা খাবে।'

'সুস্থ হতে হলে ওষুদ খেতে হবে। কিন্তু পঞ্চাশ টাকা আমি কোথায় পাব? বাবা কাশী থেকে ফিরে এলে তাঁর কাছ থেকে চেয়ে দেব।'

'কেন! আমার বাড়িতে আমি ভিক্ষুক, বলেছি কিনা? তোমার বাবার কাছে আর্জি পেশ করে তোমার টাকা 'স্যাংকশন্' করিয়ে আমার অসুখ ভাল হতে হতে আমার 'অর্ধ-শ্মশান' যাত্রা হয়ে যাবে।'

নাগবেণী স্বামীর রূঢ় কথায় ঠোঁট কামড়ে চুপ করে রইল। ইতিপূর্বেই কয়েকটি শ্মশানযাত্রার সাক্ষী সে হয়েছে। নিজের 'কুঙ্কুম' (সিঁদুর) মুছে যাওয়ার কথা শোনামাত্র তার দেহের মধ্য দিয়ে যেন বিদ্যুৎ চলে গেল। সেদিন সারাদিন একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বেরুলো না। পরদিন ভোরে হাতের বালা দুগাছি খুলে দিয়ে বলল, 'এই নাও। গিয়ে ওষুদ নিয়ে এস। এখানেই এসে থাকো। পথ্য-উপচার যা দরকার হয়, আমিই করে দেব। খাঁটি দুধ মাখন ইত্যাদি বাড়ির মতো আর কোথাও পাবে না।'

লচ্চ খুব খুশি হল। বুঝতে পারল, নাগবেণীর কৃপা হলে ভবিষ্যতে আরও কিছু পাওয়ার আশা আছে। পরদিনই ওরটদের বাড়ি গিয়ে বালা দু'গাছি বন্ধক রেখে পঞ্চাশ টাকা নিয়ে উডুপিতে গেল। উডুপিতে ডাক্তারের কাছে সে গিয়েছিল সত্য। কিন্তু ডাক্তারবাবুর নির্দিষ্ট বিধি নিষেধ পালন করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। এই অসুখের পক্ষে স্ত্রী-সংসর্গ নিষিদ্ধ। ডাক্তারের এই একটি ব্যবস্থাই অতি সাংঘাতিক বলে মনে হল। ডাক্তারের দেওয়া ওষুধের শিশি হাতে নিয়ে, পথ্যের জন্য বাড়ি প্রশস্ত নয় মনে করে লচ্চ মহোদয় উডুপির দক্ষিণ-বাজারের বেশ্যাপল্লীতে 'অস্ত' গেলেন। বাড়ি ফিরে এলেন তিন দিন পরে।

লচ্চর গ্রামে আসার খবর ঐরোডিতে পৌছলে নাগবেণীর কাকা নারায়ণবাবু একদিন নাগবেণীর কাছে এসে বলল, 'মা, ওকে অন্নজল দিবি নে একথা বলি না আমি। তবে নগদ পয়সা হাতে একটিও দিবিনে, আর তোর ঘরের মধ্যেও ওকে ঢুকতে দিসনে। আজকাল নাকি ওর অনেক রোগ—সব দুরারোগ্য ব্যাধি।' এই বলে কাকা সাবধান করে দিয়ে গেল।

আট দশদিন ধরে চিকিৎসা চলবার পরে লচ্চ বলল যে এই ওষুধে তার উপকার হচ্ছে! কিন্তু নিজের বাড়িতে শান্ত হয়ে বসে থাকতে তার ভাল লাগে না। আজকাল কেবল খাওয়ার জন্যই বাড়িতে আসে। বাকী সময়টা সে ওরটের সাহচর্যেই থাকে। সেখানে গ্রামের যাবতীয় ভালো মন্দ গল্প শোনা যায়। ওরট এখন নানা কাজে হাত দিয়েছে, সম্পত্তি কেনাবেচা, টাকা ধার দেওয়া, ধারের টাকা আদায় উসুল করা, আদালতে মামলা-মোকদ্দমা ইত্যাদি লেগেই আছে। ফলে তার ওখানে লোকজনের আসা যাওয়ার বিরাম নেই। লক্ষ্মীনারায়ণ সেখানে গাল গল্প করে টপ্পা মেরে বেশ আনন্দেই সময় কাটায়।

গ্রাম্যজীবনে ওরটেরও একজন সঙ্গী প্রয়োজন। কয়েক বছর যাবত বেংগলুর শহরে বাস করে শহরের আদবকায়দায় অভ্যস্ত ওরটের পক্ষে গ্রামে বাস করা মোটেই পোষায় না। সে নিজের ইচ্ছায় শহর ছেড়ে পাড়াগাঁয়ে আসে নি, এসেছে দাদার নির্দেশে। কাজেই বাল্যবন্ধু লচ্চকে পেয়ে তার খুব আনন্দ হল। ওরটের মা লচ্চ সম্পর্কে ছেলেকে সাবধান করে দিলে ওরট তার মাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'আমি কি কচি শিশু যে লচ্চর হাতে ফেঁসে যাব। বাড়িতে সময় কাটে না, একা একা ভালো লাগে না বলে একটা লোকের সঙ্গ চাই। তা ছাড়া আর কী।'

আজ দেড় মাস হয়ে গেল লচ্চ বাড়ি এসেছে। নির্দিষ্ট সময়ে ওষুধ পথ্য উপচার-আহারাদির জন্য তার দুর্বল চেহারা অনেকটা সবল হয়ে উঠেছে। যে রোগ হয়েছে তার উপশম তাড়াতাড়ি হওয়ার মতো নয়। কিন্তু চিকিৎসার সুফল দেখা দিয়েছে।

নাগবেণী সম্পর্কে কামুক প্রকৃতির লচ্চর মনে দুর্বলতা দেখা দিলেও নাগবেণীর সঙ্গে কথা বলার সাহস তার নেই। হয়ত সে এই কড়া উত্তর শুনিয়ে দেবে— 'দু'দুটো সন্তান নষ্ট হয়ে গেছে, তাই যথেষ্ট নয় কি।' তাছাড়া এটাও লচ্চর দৃষ্টি এড়ায়নি যে, সন্ধ্যার পরে নাগবেণী তার সঙ্গে খুব সাবধানে ও ভয়ে ভয়ে ব্যবহার করে। তার জন্য লচ্চ দু একবার এই বলে খোঁটা দিয়েছে, 'আমি কি একটা কুষ্ঠরোগী নাকি।' নাগবেণী এর কোন জবাব দেয় নি। মনে মনে কেবল এই প্রার্থনাই করেছে যে শাশুড়ি ও পিসিমা তীর্থযাত্রা থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসুন। তবেই সে এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে।

কাশী যাত্রায় আর কত সময়ই বা লাগে। সাবেক দিনের লোকেরা পায়ে হেঁটে

কাশী যেত। কোদণ্ড ঐতাল তাঁর বাবার সঙ্গে অর্ধেকটা রেলপথে, বাকী অর্ধেক পদব্রজে কষ্ট করে কাশী ঘুরে এসেছিলেন। সে তুলনায় এখনকার তীর্থযাত্রা তো কিছুই নয় এ যুগে মাটিতে পা না লাগিয়েও কাশী ঘুরে আসা যায়। উকিল-বাবু সাত সপ্তাহ পরে কাশী রামেশ্বর শেষ করে দেশে ফিরে এলেন। খবর পেয়ে নাগবেণী ঐরোডিতেই ছুটে গেল। সরস্বতীর কানে কানে বলল, 'পিসিমা, তোমরা চলে যাওয়ার দিন তোমার ভাইপো এসে হাজির।' সরস্বতীর মনে খবরটা কিছুমাত্র রেখাপাত করল না। সে বলল, 'ও এলেই বা কী না এলেই বা কী।'

সরস্বতী ও সত্যভামা কোডিগ্রামে এলে দু'দিন ধরে তাদের বাড়ি কাশীযাত্রার বাড়িতে পরিণত হল। গ্রামের সুমঙ্গলীরা একে একে এসে ভীড় জমাল। সরস্বতীকে উদ্দেশ করে বলল, 'ঠাকুমা, তোমার জোর কপাল। তা না হলে এই বয়সে তুমি যে কাশীযাত্রা শেষ করে ফিরে এসেছ এতো ভগবানের লীলা।' এই বলে সকলে একে একে তার পায়ের ধুলো নিল। সত্যভামাকেও সকলে 'ধন্য ধন্য' করতে লাগল।

বাড়িতে ফিরে এসে সরস্বতীর মুখে হাসি ফুটে উঠল। মনে তার তৃপ্তির সীমা নেই। নাগবেণীকে কাছে ডেকে বলল, 'মা, তোমার বাবা আমাদের তীর্থ ঘুরিয়ে আনলেন। তুমি আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছ, মা। এই পুণ্যের ফল একদিন-না-একদিন তোমার হবেই।' এই বলে সরস্বতী বার বার আশীর্বাদ করল। নাগবেণী বলল, 'পিসিমা, তোমাদের আশীর্বাদে উনি যদি সুস্থ হয়ে, ভালো হয়ে ওঠেন।' সরস্বতী বলল, 'ভগবান মন করলে কী না হয়?' এই কথা শুনে সত্যভামা মনে মনে বলল, 'মুষলে যেদিন অঙ্কুর গজাবে, সেদিন ওর সুবুদ্ধি হবে।'

গ্রামের লোক যারা দেখা করতে এসেছিল তারা সকলেই চলে গেলে লচ্চ ধীরে ধীরে এসে গৃহে পদার্পণ করল। মা, পিসিমা, স্ত্রী, কারও সঙ্গে সে যেচে কথা বলল না। সরস্বতী লচ্চকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন আছিস বাবা?' 'আছি কোনো রকমে বেঁচে। বাড়ির লোকও আমাকে চায় না, যমরাজাও চায় না।' ব্যথিত কণ্ঠে সরস্বতী বলল, 'যমরাজা আমাদের মতো বুড়োদের জন্য, তোমার মতো বয়সের ছেলেপিলেদের জন্য নয় বাবা।'

লচ্চ যে বিষবাক্য দিয়ে আঘাত করতে চেয়েছিল একথা নাগবেণীর অজানা ছিল না। সেদিন সন্ধ্যায় স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে বলল, 'পিসিমার

সামনে তুমি এইভাবে কথা বললে? ওর সঙ্গে কথা বলার এই কি রীতি? আচ্ছা বল ত, তোমার মৃত্যু এ বাড়িতে কে কামনা করে?' লচ্চ রেগে গিয়ে বলল, 'সম্পত্তির অহঙ্কারে তুমি আমাকে উপদেশ দিতে এসেছ? আচ্ছা, দেখা যাবে। তোমাকে সজুত্ করা এমন কী কাজ?' গম্ভীর মুখে নাগবেণী উত্তর দিল, 'কী কথায় কী কথা বলছ? আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে পিসিমার মনে তোমার আঘাত দেওয়া উচিত নয়।'

'এ বাড়ির আসল মালিক যে তুমিই তা আমার জানা আছে। নইলে সেই যখন আমি কষ্টের সময়ে তিনচার শ' টাকা চেয়েছিলাম, সে টাকা পাঠাতে তোমার মন রাজী হল না। আমাকে এখানে ওখানে গিয়ে ভিক্ষে করতে হল। এই এত বছর আমাকে বনবাসে ঠেলে দিয়েছিলে। এখন দ্যাখো, তোমার যারা আপন লোক, তাদের কাশী রামেশ্বর পাঠানোর জন্য রাশি রাশি টাকা খরচ করতে এতটুকুও কষ্ট হল না। এই যখন আমার অবস্থা তখন যম ছাড়া আর কার কাছে যাব? ওকথা আমার বলা উচিত হয়নি, তাই না? যন্ত্রণায় যখন বুকটা খেয়ে যাচ্ছে, তখনও চুপ করে থাকব?'

এ কথার উত্তর দেওয়া নিরর্থক বুঝে নাগবেণী তখন বাড়ির ভিতর চলে গেল। পুত্রের কটূক্তি শুনে সত্যভামা রেগে আগুন, 'তোর কর্জ তিন হাজার টাকা শোধ দেওয়া কি কম কথা হল? এখন আমাদের কাশীযাত্রার খরচ দেখে দেখে তোমার চোখ টাটায়। তোমার হীন বুদ্ধি না হলে কি আর এমন হত?'

সরস্বতী ধীরে ধীরে বলল, 'সত্য, চুপ করো। এ বাড়িতে ও কথা না বললে কে বলবে? আমি তো আর বেশি দিন নেই। ওর মুখ থেকে এইসব কথা শুনে আমার মরতে হবে ব্রহ্মা যদি কপালে এই কথাই লিখে থাকেন, তবে তাই হোক।'

সেদিন সন্ধ্যায় সরস্বতীর খুব অনুতাপ হল এই ভেবে যে তীর্থযাত্রা করে সে নাগবেণীর কাছে ঋণবদ্ধ হয়ে রইল। নাগবেণীর কাছে ঋণবদ্ধ হওয়া মানে অনিচ্ছুক লচ্চর কাছে ঋণগ্রস্ত থাকা। একথাও তার মনে হল যে এই বাড়িতে থাকতে হলে এভাবে আর কত ঋণ স্বীকার করতে হবে। সরস্বতীর মন তা চায় না। নাগবেণীকে ডেকে সে বলল, 'মা, সত্য এখানে আছে ঠিকই আছে। ওর স্বামীর সম্পত্তি। কিন্তু আমি তো অন্য গোত্রের। আমার

এখানে থাকাটা লচ্চর ভাল লাগে না। আমার জন্য তুমি যে কিছু খরচ কর এটা ঠিক নয়। কাল ভোর হলে আমি মংদর্তি চলে যাব। মৃত্যুকালে সেখানে বাইরে ঠেলে দিতে পারবে না।'

স্বামীর কথায় ও আচরণে পিসিমা যে ভারি মর্মাহত হয়েছেন সন্দেহ নেই। নইলে তাঁর মতো মানুষের মুখ থেকে সহজে এমন কথা বেরোবার নয়। লচ্চর প্রতি রাগে দুঃখে উদ্ভ্রান্ত নাগবেণী বলল, 'পিসিমা, এই সম্পত্তি তো ওঁর নয়। বাপদাদার সম্পত্তি যা পেয়েছিলেন, সবই তো খুইয়েছেন। এই বাড়িটা যে এখনও এখানে দাঁড়িয়ে আছে সে কেবল তোমারই পুণ্যের জোরে। তুমি চলে যাবে, একথা বলার মতো কে আছে বাড়িতে? উনি যদি এ বাড়িতে থাকতে চান, থাকুন। কিন্তু তোমাকে অসম্মান করে থাকতে পারবেন না। ওঁকে ছাড়া তো পাঁচ বছর দিব্যি কেটে গেছে। কিন্তু তোমাকে ছাড়া এই দেড় মাস আমার কাছে শূন্য বলে বোধ হয়েছিল।'

সান্ত্বনার এই কথাগুলি পিসিমার দিকে তাকিয়ে বলা হলেও নাগবেণীর উদ্দেশ্য ছিল তার স্বামীকে শুনিয়ে বলা। সরস্বতী পুনরায় দুঃখ করে বলল, 'মা, লচ্চ, যেমনই হোক, তোমার স্বামী। ওঁকে এমন কথা বোলো না। আমি থাকি বা নাই থাক, ওর সঙ্গে তোমার বিরোধ করা ভালো নয়!'

এমন সময়ে লচ্চ সেখানে হাজির হয়ে বলল, 'ওঃ, উকিলের মেয়ে কি না। আইন-কানুন খুব জানো। বেশ, তোমার বাড়িঘর নিয়ে তুমি থাকো। আমি এখানে ওখানে ভিক্ষে করে খাব।' তিলমাত্র অপেক্ষা না করে লচ্চ বেরিয়ে গেল। বেশি দূরে যায়নি, গিয়েছে ওরটের বাড়িতে। লচ্চর কথাবার্তা ওরটের খুব ভাল লাগে। তাছাড়া ওরা প্রতিবেশী বাল্যবন্ধু। বন্ধুর বাড়িতে কি আশ্রয় মিলবে না?

দু' মাস পর্যন্ত লচ্চ বাড়িমুখো হয়নি। বাড়িমুখো না হলেও নাগবেণীর উদ্দেশে ছোঁড়া তার বিষবাক্যগুলি যথাস্থানে এসে পৌঁছত। কতগুলি কথা সত্যই হৃদয়বিদারক। 'নতুন সোয়ামী পেলে পুরোনোটা তো ফালতু' এমন কথা বলতেও তার জিভে বাধল না। শুনে নাগবেণীর মন পাথরের মতো কঠিন হয়ে গেল। লচ্চর দুর্বচন ও দুর্ব্যবহার সত্ত্বেও স্বামীর প্রতি নাগবেণীর মনের কোণে সহানুভূতি লুকোনো ছিল। কিন্তু এখন আর দয়া নয়, সহানুভূতি নয়, এখন থেকে নিদারুণ বিতৃষ্ণা। তবু মুখে সে কিছু বলল না। কেবল

সত্যভামা আহত কৃষ্ণসর্পের মতো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। বলল, 'এমন ছেলে বেঁচে না থেকে মরে গেলে ক্ষতি কী?' তীর্থযাত্রার ফলে সরস্বতীর মনে যে শান্তি ও তৃপ্তি লাভ হয়েছিল, লচ্চর ব্যবহারে তা নষ্ট হয়ে গেল। সরস্বতী বলতে লাগল, 'আমি যত তাড়াতাড়ি চোখ বুঝি, ততই ভাল। কিন্তু এখন তো দক্ষিণায়ণ, স্বর্গের দুয়ার বন্ধ। মকরসংক্রান্তির পরে মরলেই ভালো হয়, কিন্তু আর তো সহ্য হয় না।'

সত্যভামা বলল, 'একথা কেন বলছেন, ঠাকুরঝি? আপনার জন্য স্বর্গের দুয়ার সর্বদাই খোলা। কিন্তু ঠাকুরঝি, মৃত্যু তো আমাদের হাতে নেই।'

একদিন ওরটের ছোট ছেলে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'নাগবেণীমা নেই?' বালকের ডাক শুনে নাগবেণী বাইরে এল। ছেলেটি বলল, 'বাবা বলে পাঠিয়েছেন যে নাগবেণীমা একবার আমাদের বাড়িতে আসতে পারলে ভালো হয়।'

নাগবেণী জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কেন? আমাকে দিয়ে কী কাজ?' ছেলেটি বলল, 'তা তো আমি জানি না। আপনাদের বাড়ির লোককে নাকি পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে।' একথা শুনে সকলেই খুব ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল।

'তোমায় যেতে হবে না বৌমা। তুমি গিয়ে রান্না করো। আমি দেখে আসি ব্যাপারটা কী।' এই বলে সত্যভামা সেই ছেলেটির পশ্চাতে রওনা হয়ে ওরটদের বাড়িতে গেল। সেখানে এক ভিন্ন দৃশ্য—লচ্চ কয়েদীর বেশে দাঁড়িয়ে। মালাবারে (কেরলে) থাকা কালে সে একজায়গায় টাকা ধার নিয়ে শোধ দেয়নি বলে তাকে ধরবার জন্য ওয়ারেণ্ট বেরিয়েছে। জানা গেল ঋণের জন্য জামিন না দিলে লচ্চকে জেলে নিয়ে যাবে। 'জেল' কথাটা শুনতেই সত্যভামার প্রাণ উড়ে গেল। সে ছুটে এসে বাড়িতে খবরটা জানাল। শত হলেও নাগবেণী তার স্বামীর অপমান সহ্য করতে পারে না। সরস্বতীও বলল, 'লচ্চ যেমনই হোক, টাকার জন্য জেলে যাচ্ছে এটা কি দেখা যায়?'

নাগবেণী সেখানে উপস্থিত হয়ে 'এখন কী করা যায়' জিজ্ঞাসা করতে ওরট বলল, 'ওদের ঋণের টাকা, আট শ' টাকা, ফেরত দিলে লচ্চকে ছেড়ে দেবে।' নাগবেণীর কাছে কি অত নগদ টাকা থাকা সম্ভব? ওদিকে বাবাকে খবর দিয়ে টাকা আনবার মতো সময়ও হাতে নেই। অবশেষে সাব্যস্ত হল, আপাতত ওরটই টাকাটা দিয়ে লচ্চকে ছাড়াবে এবং তারজন্য নাগবেণীকে একখানা হ্যাণ্ডনোট লিখে দিতে হবে।

সমস্ত ব্যাপার মিটে গেলে নাগবেণী বাড়ি ফিরে শাশুড়িদের কাছে সমস্ত কথা জানিয়ে বলল, 'ধার কর্জ যদি এই একটাই হয়, তবে তেমন চিন্তা নেই। কিন্তু কে জানে এরকম ব্যাপার আরও কত করেছে?' যেমন করে হোক একটা ঋণের জাল থেকে লচ্চকে উদ্ধার করা হল। কিন্তু লচ্চর বাড়ি ফেরার নাম নেই। ওরটের বাড়িতেই তার আস্তানা। মাঝে মাঝে ওরটকে সঙ্গে নিয়ে উডুপিতেও ঘুরে আসে। লচ্চ সংবিদ্যাগুলিতে ওরট আয়ত্ত করে নিলে দুজনের অন্তরঙ্গতা ও উডুপি যাত্রা এতই বেড়ে গেল যে ওরটের মা শঙ্কিত না হয়ে পারল না। সে তাড়াতাড়ি বেংগলুরে পত্র দিয়ে বড় ছেলে নরসিংহকে সব কথা জানাল।

মকরসংক্রান্তির আর দেরি নেই। ছোট ভাইয়ের কীর্তিকলাপ শুনে নরসিংহ তাড়াতাড়ি বেংগলুর থেকে দেশে এল। অসময়ে তার দেশে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলে মুখে সে বলত, 'কুলদেবতার উৎসবের জন্য এসেছি।' মুখে যাই বলুক, আসলে সে এসেছে ছোট ভাইটাকে বুদ্ধিপরামর্শ দিতে যাতে লচ্চর সঙ্গে সে মেলামেশা না করে। ওরটকে ডেকে বলল, 'বাড়ির লোকেরা, এমন কী স্ত্রী পর্যন্ত যাকে বার করে দিয়েছে, এমন লোককে তুমি ঠাঁই দাও?' ওরট ছেলেবেলা থেকেই একগুঁয়ে, লচ্চর কুপরামর্শে মেজাজ আরও তিরিক্ষি হয়ে উঠেছে। সুতরাং ভাইয়ে ভাইয়ে কলহ-বিবাদ লেগেই থাকল। নরসিংহ বুঝল বাড়িঘর জমিজমার দায়িত্ব ওরটের হাতে আর নিরাপদ নয়। দাদার মনোভাব ওরটের আজানা রইল না। লচ্চও তাকে প্ররোচনা দিচ্ছিল যাতে পৈতৃক সম্পত্তির ভাগ সে বুঝে নেয়।

ফলে শীনময়্যর সম্পত্তি ভাগ হয়ে যায়। ভাগের কথা উঠতে পাঁচ ভাইয়ের জন্য পাঁচ ভাগ হল। অন্যান্য ভাইরা দাদার সঙ্গে থাকতে রাজী হওয়ায় তাদের মধ্যে একজনকে বেংগলুর থেকে আনিয়ে চার ভাইয়ের সম্পত্তির দেখাশোনার ভার দেওয়া হল।

এই ঘটনায় লচ্চ তার মনের মতো কাজ পেয়ে গেল। নানা মিথ্যা কথা দিয়ে ভাইদের বিরুদ্ধে ওরটকে উস্‌কে দিয়ে শীনময়্যের পরিবারে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে লচ্চর দিন যাপনের পক্ষে বেশ সুবিধাই হল। ভিন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওরট নাগবেণীকে টাকার জন্য তাগাদা দিতে থাকে। নিরুপায় নাগবেণী বাবার কাছ থেকে তার টাকা এনে দণ্ড শোধ দেয়। কিন্তু এক দণ্ডেই

শেষ নয়। পর পর আরও দু' তিনটে ওয়ারেন্ট এসে হাজির। বল্লারি বোরিংগপেট, বেংগলুর প্রভৃতি যেখানে যেখানে লচ্চ টাকা ধার করেছিল। সব জায়গা থেকে পাওনাদারের তাগাদা, জেলে পাঠাবে বলে হুম্‌কি। 'নাগবেণী কিছুতেই তার স্বামীকে জেলে যেতে দেবে না' এই খবরটুকু জানতে পেরে পাওনাদারদের সুবিধাই হল। নাগবেণীর মনের ভাব—'মুখে যতই বলি না কেন, স্বামীকে কি কান্নাস্থরে (কান্নাস্থর জেলে) পাঠাতে পারব ?' সেই স্বামীর দেনার টাকা শোধ দিয়ে দিয়ে বাড়ির সঞ্চিত নগদ টাকা সব নিঃশেষ হয়ে গেল। শেষ দেনাটা শোধ করতে গিয়ে নগদ টাকায় আর কুলোলো না, সম্পত্তি বন্ধক রেখে টাকা ধার করতে হল। সেই টাকা পরিশোধের সময় উকিলবাবু দেশে এলেন। লচ্চকে ডাকিয়ে স্পষ্ট দু'কথা শুনিয়ে দিলেন, 'তোমার এই দেনাও শোধ করেছি আমরা ধার করে। তোমার বাপদাদা যে নগদ টাকা রেখে গিয়েছিলেন, সব শেষ হয়েছে। তোমার যদি আরও ধার দেনা থাকে, আমরা তা শোধ করতে প্রস্তুত নই। তোমার মতো লোক জেলের বাইরে থাকা আর ভিতরে থাকা একই কথা। তুমি যদি রাজী হও যে ভদ্রভাবে বাড়িতে থাকবে, তোমার রোগের চিকিৎসা করবে আর বাড়ির লোককে দুঃখকষ্ট দেবে না, তবে এই দেনাও আমি শোধ করে দিচ্ছি। নইলে তুমি এ গ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও গিয়ে থাকো।'

'সঙ্কটে বেঙ্কটরমণ' (বিপদে মধুসূদন)। পাওনাদারের দায় মেটাতে লচ্চ যে কোনো শর্তে প্রস্তুত। দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিল, 'কী জানি কেন আমার অদৃষ্টই খারাপ। গ্রহের ফেরে আমাকে দিয়ে আপনাদেরও কোনো সুখ হল না, আমারও কোনো সুখ হল না।' যাই হোক, ওরটের বাড়ির বারান্দা ছেড়ে লচ্চ নিজের বাড়িতে এল, নাগবেণীর পীড়াপীড়িতে শরীরের চিকিৎসাও চলতে থাকল।

এদিকে সরস্বতী দিনে দিনেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। তবু তার জিদ সে তার সকল কাজ নিজ হাতেই করবে, কারও সাহায্য নেবেনা। দেয়াল জানালা ধরে ধরে, লাঠিতে ভর করে ছাড়া তার চলার উপায় নেই। একদিন তার মনে হল, 'লচ্চ বলছিল গ্রহের ফেরেই তার যত দুর্গতি। তা গ্রহের ফের কাটাবার জন্য একটা শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করলে কেমন হয়? কোনো জ্যোতিষীকে দিয়ে ওর ঠিকুজীটা একবার দেখাই না কেন ?' সরস্বতীর কথামতো সত্যভামা একদিন

পুত্রের ঠিকুজীটা নিয়ে এক জ্যোতিষীকে দেখিয়ে আনল। জ্যোতিষী যা যা বলেছে সব এসে বাড়িতে শোনাল. 'এখন সপ্তশনির উপদ্রব চলছে, তবে ছাড়বার যোগও দেখা যাচ্ছে। কিছুদিন পরেই ছেড়ে যাবে মনে হয়। এই সময়ে একটা চণ্ডিকা হোম ও স্বস্ত্যয়ন করিয়ে ব্রাহ্মণভোজন করালে ভবিষ্যতে শুভ ফল হবে।'

নাগবেণীর আশা অঙ্কুরিত হল। পিসিমা ও শ্বাশুড়ি ওই যে ঠিকুজী কোষ্ঠীর ফলাফল নিয়ে কথাবার্তা বলছেন, এ যেন একটা নূতন পথের ইঙ্গিত দিচ্ছে বলে মনে হল। 'তবে তাই করে দেখি না কেন?' এই ভেবে নাগবেণী উপযুক্ত আয়োজন করে ফেলল। লচ্চ স্বয়ং ব্রাহ্মণদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে শান্তিস্বস্ত্যয়ন উপলক্ষ্যে মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ করে এল। এই তুটি নরনারী কতকাল একসঙ্গে উপবেশনের সুযোগ পায় নি; শান্তি স্বস্ত্যয়নের দিন পাশাপাশি বসে তারা একই অনুষ্ঠানের অংশীদার হল। লচ্চর কাছে বসতে নাগবেণীর অন্তর যে খুশি হয়ে উঠেছিল তা ঠিক বলা যায় না। তবু স্বামীর কল্যাণের পথে সে যেন একটা অন্তরায় হয়ে না থাকে, এই ভেবে সর্বক্ষণ হাসি মুখেই তাকে শুচিবস্ত্র পরে লচ্চর পাশে বসে থাকতে হয়েছিল। ব্রাহ্মণমণ্ডলী উদর পূর্তি করে আহারান্তে দম্পতীকে পুনঃপুনঃ আশীর্বাদ করে গেল।

লচ্চকেও সেদিন থেকে বেশ উৎফুল্ল দেখা যেতে লাগল। নাগবেণীকে খুশি করবার জন্তও তার চেষ্টার ত্রুটি নেই। আট-দশ মাস যাবত বাড়িতে তার আচার-ব্যবহার দেখে সত্যভামা পর্যন্ত বলতে লাগল, 'বাছা, তোর এই সুবুদ্ধি ঠাকুর কি আগেই দিতে পারতেন না?' লচ্চ এখন সকলের কাছ থেকেই স্নেহ ভালবাসা পাচ্ছে। শান্তি স্বস্ত্যয়নের দিন থেকে সে বলতে শুরু করেছে, 'যেমন করে হোক, এ বছর অন্তত এক 'মুড়ি' ক্ষেতেও চাষবাস করব।' কেবল মুখের বলা নয়, মনের আনন্দে সে কাজও শুরু করে দিল।

বর্ষাকাল দেখা দিতে লচ্চর হাতে করা প্রথম কৃষিক্ষেত সবুজ হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে ঐতাল পরিবারেও যেন একটা নতুন জীবনের আশা মাথা তুলে দেখা দিল।

খুব জোর বর্ষা নেমেছে। এই বৃষ্টিতে সর্দি-কাশি হওয়া কিছু অস্বাভাবিক নয়। রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ করে শুতে যাওয়ার সময়ে লচ্চ বলল, 'নাগবেণী, তোমার যদি অসুবিধা না হয়, খানিকটা শুকনো আদা ও গোলমরিচ

মিশিয়ে আমাকে একটু 'কোয়াথ' তৈরি করে দাও। ঠাণ্ডা লেগে কাশি হয়েছে আমার।' নাগবেণী বলল, 'বেশ তো, তার জন্য এত বিনয় কেন?' শুকনো আদা ও গোলমরিচের ক্বাথ তৈরি করে নাগবেণী লচ্চর শয়নগৃহে উপস্থিত হল। সেখানে দুজনেই বসে কথাবার্তা বলছে। ক্বাথটা খেয়ে নিয়ে লচ্চ আগামী বছরের চাষবাস সম্পর্কে স্ত্রীর কাছে নানা উজ্জ্বল স্বপ্নের কথা বলতে লাগল। কথায় কথায় কখন এক সময়ে নাগবেণীর হাত দু'খানি ধরে লচ্চ বলল, 'নাগবেণী, কতদিন হল আমরা পরস্পরের হাত ধরি নি!' কথাটা বলতে গিয়ে তার কণ্ঠস্বর কেঁপে উঠল। স্বামীর স্পর্শে নাগবেণীর দেহ রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এবারে আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত সে স্বামীর শয্যাসঙ্গিনী হয় নি, বরং তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে। পূর্বের দুঃখ কষ্ট শারীরিক যন্ত্রণার কথা মনে হতেই নাগবেণী শিউরে উঠল। তবু কেন আজ আর সে বাধা দিতে পারল না। স্বামীর আদর-সোহাগ সে কি চায় নি? চেয়েছিল। মাঝে মাঝে সে দুঃখ করত যে তার স্বামী বেঁচে থাকতেও সে বিধবা। কিন্তু পতিস্নেহের পরিণামের কথা ভেবে সে আতঙ্কিত না হয়ে পারত না। তাছাড়া, বাবা যে এই বিষয়ে কঠোর আদেশ করেছেন তাও তার মনে হত, কিন্তু কচি প্রাণ। দৈহিক কামনা অনেক দিন পরে তাকে দুর্বল করে ফেলাতে সে সুযোগের জন্য অপেক্ষমাণ স্বামীর কাছে আত্মসমর্পণ করল। তার পরেই কিন্তু তার মনে দেখা দিল সেই পুরোনো আশঙ্কা।

কিছুদিন কেটে গেলে নাগবেণীর মনে হল তার ঘরের শনি দূর হয়ে গেছে, বিবাহের পরবর্তী সুখের দিনগুলিই যেন তার জীবনে ফিরে এসেছে।

সে বছর ফসল ভালই হয়েছে, লচ্চর পরিশ্রম ব্যর্থ হয় নি। কিন্তু লচ্চ বলে যে এ ভারি মেহনতের কাজ, ফসল যা পাওয়া যায় তাতে মজুরী পোষায় না। অতঃপর দু এক মুডির ক্ষেতে চাষ হলেই যথেষ্ট।

রাশি রাশি ধান বারান্দায় এসে জমা হয়েছে। উঠোনে চারজন লোকের সমান উঁচু খড়ের গাদা স্তূপীকৃত। দীপাবলীর রাতে বাড়ির ভিতরে ও বাইরে আলোর সজ্জা। এমনি দিনে নাগবেণী সরস্বতীর কানে কানে বলল, 'পিসিমা তুমি কি বলবে জানি না, পরে আমার কী হবে তাও জানি না। আমি আবার গর্ভবতী।' কথাগুলি বলার সময়ে নাগবেণীর ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠছিল।

সরস্বতী বলল, 'মা, শনির ফেরে তোমার অনেক কষ্ট হয়েছিল। ঠাকুরের

কৃপায় সে শনির দশা কেটে গিয়ে ওর এখন সুমতি হয়েছে। ভগবান তোমার ভালো করবেন। কোনো চিন্তা কোরো না।' নাগবেণী চোখের জল ফেলে প্রার্থনা জানাল, 'পিসিমা, তুমি আমায় আশীর্বাদ কর। তোমার আশীর্বাদে আমি যেন মা হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করি।' বলতে বলতে নাগবেণী ঝুঁকে পড়ে সরস্বতীর পা দুখানি জড়িয়ে ধরল। মা যেমন শিশু সন্তানের শরীরে হাত বুলোয়, সেই ভাবে নাগবেণীর মুখে চোখে ও মাথায় হাত বুলিয়ে সরস্বতী বলল, 'বাছা ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করো, তিনিই সব করবেন।'

নাগবেণী উত্তর দিল, 'আমার কাছে তুমিই ঠাকুর, পিসিমা।' সরস্বতী লজ্জা পেল, বলল, 'আমার বয়স হয়েছে বলেই তুমি একথা বলছ, কেমন? হ্যাঁ, তেঁতুল গাছের গুঁড়ির মতো আমারও বয়স কম হল না। এখন একদিন চোখ বুজলেই হল। সেবার উত্তরায়ণের সময়ে ডাক আসবে ভেবেছিলাম। এল না। এখন আবার দক্ষিণায়ন চলছে। মকরসংক্রান্তি পার হলেই ঢের হল।'

নাগবেণী বলল, 'মকরসংক্রান্তি পার হবে। তার পরে আমার ছেলে হবে। সেই ছেলের মুখে তুমি এক চামচ দুধ ঢেলে দেবে।'

'ভেবো না। সব ঠাকুর করে দেবেন।' সরস্বতীর অচল বিশ্বাসে নাগবেণী সান্ত্বনা পায়।

মকরসংক্রান্তি এসে গেল। এক সপ্তাহ পরে সালিগ্রামের রথযাত্রা। ঐতাল পরিবারের কুলদেবতা ওই সালিগ্রামের নরসিংহ ঠাকুর। সরস্বতী একদিন লচ্চকে ডেকে বলল, 'বাবা, তুই একদিন আমাদের ঠাকুর মন্দিরে নাগবেণীকে সঙ্গে নিয়ে যা, গিয়ে কলা নারকেলের পূজো দিয়ে আয়।' ভূতে ও ঠাকুর দেবতায় লচ্চর একই রকমের বিশ্বাস। সে মাথা নেড়ে বলল, 'আচ্ছা, আচ্ছা পিসিমা, সে হবে।' লচ্চ মা ও স্ত্রীকে সঙ্গে করে সালিগ্রামের উৎসবে গিয়ে কলা নারকেল উৎসর্গ করে এল। নাগবেণী ফুল ও প্রসাদ এনে সরস্বতীর হাতে দিল।

লচ্চর একদিকে এই পারিবারিক সুখ ও শান্তি, অন্যদিকে মাঝে মাঝে ওরটের গৃহে যাতায়াত, ভাইদের বিরুদ্ধে ওরটকে উস্কে দেওয়া, এ সবও চলছিল। অবশেষে একদিন ওরট বলল, 'লচ্চ, আমার আর গাঁয়ে থাকতে ভালো লাগে না। এই সম্পত্তির আয় থেকে বছরের খোরাকী চলে? না, বাড়িতে বসে থাকলে হবে না দেখছি। দাদারা হোটেলের অংশ নিজেদের

চারজনের মধ্যে রেখে বেশ রোজগার করছে, আর আমি পড়ে থাকব এখানে? ওরা নাকি মৈসূরেও একটা নূতন হোটেল খুলেছে। সেখানেও নাকি খুব লাভ হচ্ছে। আমি এখানকার সম্পত্তি খাজনায় দিয়ে মৈসূরে গিয়ে নিজে একটা হোটেল খুলব।' লচ্চ সায় দিয়ে বলল, 'খুব ভাল কথা।'

সেই বৈশাখে কোডিগ্রামের দুটি নূতন খবর হল: গ্রাম ছেড়ে ওরটের বাইরে যাওয়া এবং নাগবেণীর একটি পুত্রসন্তান লাভ। ওরট একাই মৈসূরে গিয়ে সেখানে ভাইদের 'শ্রীরামা রেস্টরেণ্টে'র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেই একটা হোটেল খুলে ফেলল। নাম দিল 'ডিল্লি দরবার রেস্টোরেংট'। মাঝে মাঝে লচ্চর সঙ্গে তার পত্র বিনিময় হয়।

প্রসবকালে নাগবেণী পিত্রালয়ে যেতে সম্মত হয় নি। সরস্বতী অনেক পীড়াপীড়ি করেছিল। নাগবেণীর একটি মাত্র উত্তর, 'উনি তো এখন বাড়িতে রয়েছেন। আমার বাপের বাড়ি যাওয়া ঠিক হবে না, পিসিমা।' কিন্তু মাস পূর্ণ হওয়ার আগেই নাগবেণী অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ঠাকুরের দয়ায় প্রসবকালে কোনো বিঘ্ন ঘটে নি। তবে সন্তান খুব দুর্বল হয়েছিল এবং প্রসূতির বুকেও দুধ ছিল না। সত্যভামা শিশুকে কোলে নিয়ে গোরুর দুধের মধ্যে তুলো ডুবিয়ে শিশুর মুখে ফোঁটা ফোঁটা করে ঢেলে তাকে পালন করতে লাগল। অসুস্থ নাগবেণীর সন্তান পালনেরও শক্তি ছিল না। বার বার উডুপি যাতায়াত করে লচ্চ তার প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্র এনে দিত এবং স্ত্রীর প্রতি তার সান্ত্বনা বাক্যেরও ত্রুটি ছিল না। কিন্তু সেই দিনগুলিতে লচ্চর মন যে বাড়িতে ছিল না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

তিন মাস পার হওয়ার পরে শিশুর পেট ঠিক না হলেও দেখতে সে বেশ চট্‌পটে হয়ে উঠল। মে মাসের ছুটিতে উকিলবাবু মেয়ে বাড়িতে এসে নাগবেণীর প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রের ব্যবস্থা করে দিলেন। বললেন, 'নাগু, তোকে একটা বলকারী ওষুদ খেতে হবে।' আগেকারদিন হলে হাসপাতালের অশুচি ওষুধ খেতে দিতে সরস্বতী নিশ্চয়ই রাজী হত না। কিন্তু এবারে সে বুঝল নাগবেণীর একমাত্র সন্তানের বেঁচে থাকার পক্ষে ওই ওষুধটাই হয়ত দরকারী এবং ভগবানের ইচ্ছাও বোধ করি তাই।

নবরাত্রি এসে পড়ল। বয়সের তুলনায় শিশুর শরীর একটু অপুষ্ট থাকলেও অন্যদিক থেকে তাকে বেশ স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। সত্যভামার সদাজাগ্রত

সযত্ন দৃষ্টি শিশুর উপর। নাগবেণীর সংশয় তবু এখনও যায় না। এই আশঙ্কার মধ্যে এক একবার এই বলে সান্ত্বনা লাভ করে—'পিসিমা তো বলেছেন, ঠাকুরই সব করেন। তবে আমি কেন চিন্তা করি? যা হয় তিনিই করবেন।'

বস্তুত নাগবেণী আজকাল শিশুপুত্রের চেয়েও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়েছে স্বামীকে নিয়ে। সে লক্ষ্য করছে লচ্চর মুখে আর আগেকার মতো হাসি-খুশি ভাবটি নেই। কেমন যেন বিষণ্ণ ভাব। একা একা থাকে, নিজে নিজেই কথা বলে। অবশ্য নাগবেণীর উদ্দেশে কোনো রূঢ় কথা বা কটু কথা এখনও বলে নি, কিন্তু তার মনমরা উদাসীন রকম দেখে নাগবেণীর মনে এই প্রশ্ন না জেগে পারল না—'উনি এমন কেন হয়েছেন?' গত আট-দশ মাস যাবত যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখিয়েছেন আজ কেন তা উবে গেল বোঝা ভার। নাগবেণী একদিন সাহস করে জিজ্ঞাসা করল, 'এমন গোমরামুখো হয়ে আছ কেন?' লচ্চ নিরুত্তর। তিন চারবার ওই একই প্রশ্ন করাতে লচ্চ বলে উঠল, 'কী আমার জীবন! বিধবার জীবন!'

'তার মানে?'

'পরের টাকায় খেয়ে পরে আছি। লেখাপড়া শিখেছিলাম কেন, যদি আমার রোজগার আমিই না করি?'

'তোমার এখানে কিছুর অভাব আছে? এটা কি তোমার বাড়ি নয়?'

'আমার বাড়ি? গাঁয়ের লোক যা বলাবলি করে তা শুনে তো প্রতিমুহূর্তে 'আমারই বাড়ি' বলে বোধ হচ্ছে!'

'একথার মানে কী? কী বলে তারা?'

'দু বেলা দুমুঠো ভাতের জন্য স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে এমন জীবনে প্রয়োজন কী? পাড়ার লোকের কথা শুনে শুনে ঘেন্না ধরে গেল।'

নাগবেণীর মুখে আর কথা যোগাল না।

এইভাবেই কয়েকদিন কেটে গেল। একদিন লক্ষ্মীনারায়ণ শিশুকে নিয়ে আদর করতে করতে জিজ্ঞাসা করল, 'নাগবেণী, ছেলের কি কোনো নাম রাখবে না? 'কুন্থু' (খোকা) বলে ডাকা কি ভালো? ওকি চাকর-বাকরের ছেলে নাকি? নাম রাখার দরকার নেই?

নাগবেণী বলল, 'নিশ্চয়ই নাম রাখা হবে। ভালো দেখে একটা নাম দেখো তো। জন্মদিন এলে সেই নাম রাখব। এখন কোনো তাড়া নেই?'

'ওর নামকরণটা হয়ে গেলে কোথাও চলে যাব ভাবছিলাম।'

নাগবেণী বলল, 'আবার আমাকে ফেলে যাবে নাকি।'

'তোমাকে ফেলে যাবার কথা বলছি না। বাইরে কী সুখ পাই যে তোমাকে ফেলে যাব? কিন্তু আমার পেটের ভাত যে আমাকেই রোজগার করতে হবে। আমার এক শালা উকিল, আরেকজন ডাক্তার। আমার সহপাঠী বন্ধুরা ভালো ভালো চাকরি করছে। আমিই কেবল ভেরেণ্ডা ভাজছি। এভাবে থাকলে আমি বেশি দিন বাঁচব না।'

নাগবেণী বলল, 'কয়েকটা দিন সবুর করো।' সেই কয়েকটা দিন আকাশ-পাতাল চিন্তা করল নাগবেণী। জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড়ের দিনে সমুদ্রে যেমন ঢেউ ওঠে তেমনি ঢেউ নাগবেণীর অন্তরে। কয়েক দিন পরে সে স্বামীকে বলল, 'দেখ, আমার জন্য আমি এই সম্পত্তি রাখি নি। ওটা আবার তোমার নামেই হবে। তোমার মনের কষ্ট আমি বুঝি! তুমিই যদি কষ্টে থাকো, আমার কী সুখ বলো।'

সালিগ্রামের উৎসব শেষ হলে লচ্চ একদিন মা ও পিসিমাকে জানাল যে নাগবেণীকে নিয়ে সে উডুপির মন্দির দেখিয়ে আনবে। উডুপির নাম করে তারা দুজনে গিয়ে হাজির হল ব্রহ্মাবরের রেজিস্ট্রি অফিসে এবং নাগবেণীর নামের সমস্ত সম্পত্তি লচ্চ নিজের নামে লেখা পড়া করে নিল। লচ্চ এ বিষয়ে কারও কাছে মুখ খুলল না। এমন কি নাগবেণী পর্যন্ত খবরটা শাশুড়ি বা পিসিমার কাছ থেকে গোপন রাখল। লচ্চর চালাকি বুঝতে না পেরে সকলেই মনে করল যে ওরা কৃষ্ণদেব দর্শনের জন্যই উডুপি গিয়েছিল।

গরমের দিন এল। শিশুর এক বছর বয়স পূর্ণ হতে কী নাম রাখা যায় এই নিয়ে খুব জল্পনাকল্পনা হল। সরস্বতী বলল, 'এই সময়ে কয়েকজন ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে দাদুর নামেই খোকার নাম রাখা হোক।' সত্যভামা বলল, 'তাই ভাল।' নাগবেণী শ্বশুরমশায়ের স্নেহ-মমতার কথা স্মরণ করে পিসিমার প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিল। বাপের উপর লচ্চর নিদারুণ বিরূপতা সত্ত্বেও কথাটা তাকে নীরবে মেনে নিতে হল। শিশুর জন্মদিনে পৌত্রের নামকরণের জন্য রাম ঐতালের প্রেতাত্মা তৃপ্তিলাভ করে থাকবে।

এর মাসখানেক পরে ওরটময়্য মৈসুর থেকে ফিরে এসে সগৌরবে প্রচার করতে লাগল যে শুরু থেকেই তার 'ডিল্লি দরবার হোটেল'-এর নাম ছড়িয়ে পড়েছে এবং তার হোটেল আরম্ভ হওয়ার পর থেকে দাদার হোটেলে মাছিটি

পর্যন্ত প্রবেশ করে না। এখন তার গ্রামে আসার উদ্দেশ্য হল—জমিজমা বন্ধক রেখে বেংগলুর শহরে সে ডিল্লি দরবার-এর একটা ব্রাঞ্চ খুলবে।

নিজের সম্পত্তির উপর পুনরধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ওরটের কথা শুনে লচ্চর মনে নতুন উৎসাহের সৃষ্টি হল। ভাবল, সমান অংশীদাররূপে ওরটের সঙ্গে সেও হোটেল ব্যবসায়ে লেগে যাবে। দুজনে মিলে অনেক সলা-পরামর্শ করল। স্থির হল একজন মৈসুরের হোটেল দেখাশুনা করবে, আরেকজন দায়িত্ব নেবে বেংগলুর হোটেলের।

দুই বন্ধুর সলা-পরামর্শটা খুব গোপনেই করা হয়েছিল। এমন কি নাগবেণীকে পর্যন্ত কিছু জানানো হয়নি। লচ্চ জানত, খবরটা নাগবেণীর কানে পৌঁছলে বাড়ির বুড়ো পেঁচাগুলো কাজের পথে বাগড়া দেবে। 'আমি একবার উডুপি থেকে ঘুরে আসি। পাঁচ-সাতদিন ওখানে থেকে চিকিৎসাপত্র করিয়ে আসব।' এই বাহানা করে লচ্চ বাড়ি থেকে রওনা হল। যাওয়ার সময় শিশু পুত্রকে কোলে নিয়ে একটু আদর করে। 'রামের জন্য কী আনতে হবে উডুপি থেকে?' এমন কথাও জিজ্ঞাসা করে গেল।

এক সপ্তাহ যায়। পনেরো দিন যায়। লচ্চ আর ফেরে না। সরস্বতী খুব উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। নিদারুণ বিতৃষ্ণার সঙ্গে সত্যভামা বলে, 'ওটা হল কুকুরের লেজ, যতই আদর যত্ন করো সোজা হবার নয়।' সরস্বতী ও নাগবেণীর ধারণা কিন্তু অন্যরকম। তাদের বিশ্বাস—লচ্চ নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। ইতিমধ্যে নরসিংহময্য প্রায় বছরখানেক পরে দেশে এল। সরস্বতীদের ওখানে বেড়াতে এসে একথা-সেকথার পরে লচ্চর প্রসঙ্গ উঠে পড়ল। নরসিংহ বলল, 'লচ্চ বেংগলুর গেছে আমার ছোট ভাইটার সঙ্গে মিলে হোটেল খুলবে বলে। আগেকার দিনে হোটেল খুলে পয়সা রোজগার করা যেত। কিন্তু এখন আর নয়। ওরটের জিদ—ওর ব্যবসা না চলুক, আমার ব্যবসা মাটি করে দেবে। লচ্চ গিয়ে মিলেছে ওর সঙ্গে।' এই সমস্ত কথা শুনে সরস্বতীর প্রাণ উড়ে গেল।

নাগবেণী চুপ করে রইল। শিশুপুত্রকে বুকে নিয়ে চোখের জল ফেলা ছাড়া তার আর কোনো উপায় রইল না। নরসিংহ চলে গেলে নাগবেণী বলল, 'পিসিমা, আমি নিজের হাতে ছেলের মুখে মাটি দিলুম (মুখের গ্রাস কেড়ে নিলুম)? উনি যে আমাকে এইভাবে ঠকিয়ে যাবেন এ তো স্বপ্নেও ভাবিনি।' এই বলে নাগবেণী সবিস্তারে জানাল কি ভাবে সমস্ত সম্পত্তি তার হাতছাড়া

হয়ে গেছে। নাগবেণীর কথায় সরস্বতী ও সত্যভামার বুকে যেন দাবানল জ্বলে উঠল। নিরুপায় হয়ে তারা ঐরোডিতে খবর দিল নাগবেণীর নারায়ণকাকাকে। সমস্ত বিবরণ শুনে নারায়ণকাকা আর ক্রোধ সামলাতে না পেরে বলল, 'নাগু এই সব করার আগে আমাদের কাছে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করলি নে?' নাগবেণী কোনো উত্তর দিতে পারল না, কেবল কাঁদতে লাগল।

লচ্চর ঠিকানাপত্র জেনে নিয়ে নারায়ণ চলে গেল বেংগলুর। সেখানে অনেককে দিয়ে লচ্চকে নানা উপদেশ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। খুড়শ্বশুরকে লক্ষ্য করে লচ্চর একমাত্র উত্তর এই—'আপনারাই কি আমাকে আমার সম্পত্তির জন্য আপনাদের মেয়ের পা ধরতে বাধ্য করেন নি?'

আঠারো

সাধারণ এক আধটু বিপদ-আপদেই সত্যভামা খুব বিচলিত হয়ে পড়ে। কাজেই গুণধর পুত্রের নতুন কাণ্ড-কারখানার কথা শুনে সে আর আত্মসংবরণ করতে পারল না। নাগবেণী যে লচ্চর কথায় ভুলে গিয়ে তার প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে এমন বিপদ ডেকে আনবে তা সে ভাবতে পারেনি। সত্যভামা আত্মহারা হয়ে পুত্রবধূর উদ্দেশে কয়েকটি কটূক্তি বর্ষণ করল। বলল, 'এমন তো নয় যে তুমি ওকে জানতে না। সব জেনেশুনেও তুমি আমাদের মতো বুড়ি-ধুড়িদের কাছে একটি কথাও না বলে এই কাণ্ডটি ঘটালে। ও কি আর মা-পিসিমার কথা ভাববে? এই তোমাকে বলে দিচ্ছি ও যার তার কাছে বাড়ি-ঘর বিক্রী করে আমাদের ঘরছাড়া করে তবে ছাড়বে। মৃত্যুকালে আমাদের এই দুর্গতি হল।' সরস্বতী যেখানে বসেছিল সেখান থেকেই সত্যভামাকে শান্ত হওয়ার জন্য বলল, 'ও বেচারাকে কেন মিছিমিছি বকছ? গ্রহের ফের হলে সকলেরই এই রকম হয়। ও কী করবে? লচ্চর হাবভাব দেখে, কথাবার্তা শুনে আমরাও তো বিশ্বাস করেছিলুম। তা নাগবেণী তো ছেলেমানুষ।'

সত্যভামার মন কিছুতেই সান্ত্বনা মানে না। সমস্ত রাত তার কেবল এই দুঃস্বপ্নেই কাটল যে কে-একটা লোক বাড়ি থেকে তাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে। পরদিন সকালে সে বলল, 'তোমরা আমাকে যা-খুশি বলো আমার চিন্তা নেই। কিন্তু ওই দুধের শিশুটার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি স্থির থাকতে পারছি না। মানুষের সহ্যশক্তিরও একটা সীমা আছে। কয়েকদিন আমি না হয় সুব্বির বাড়িতে গিয়ে পড়ে থাকি।' সেই দিনই সত্যভামা সুরোকে সঙ্গে নিয়ে মংদর্তি গ্রামে মেয়ের বাড়িতে রওনা হল।

এখন বাড়িতে কেবল নাগবেণী, সরস্বতী ও শিশুপুত্র রাম। নিজের আহাম্মকির কথা ভেবে নাগবেণীর লজ্জার সীমা নেই, দুঃখেরও সীমা নেই। কিন্তু এখন অনুতাপ করা সম্পূর্ণ নিষ্ফল, কারণ সে বুঝতে পেরেছে যে তার স্বামী আর বাড়ি ফিরবে না। যদিও বা ফেরে সর্বস্ব খুইয়ে তবে ফিরবে। সরস্বতী আগে তবু এক আধটু চোখে দেখতে পেত, কিন্তু এখন একেবারেই অন্ধ। বসে বসে শিশুকে আদর করে আর মাঝে মাঝে নাগবেণীকে ডেকে এই

বলে সান্ত্বনা দেয়, 'মা চিন্তা করো না। ভগবানের দেওয়া দুঃখকষ্ট মানুষ কি এড়াতে পারে?' নাগবেণীর মনে কিন্তু বারবার একটি প্রশ্নই দেখা দেয়, 'কেন বেঁচে থাকব? এই ছেলে বড় হয়ে তো সেই যাতনাই ভোগ করবে যা আমি নিজে ভোগ করছি। ওই শিশুর জন্যই কষ্ট। একবার এই জীবনটা শেষ হয়ে গেলে সকলেরই সুখ।' কিন্তু বৃদ্ধা পিসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকে বেঁচে থাকতে হবে। সে এখন পিসিমার মৃত্যুদিনের অপেক্ষায় দিন গুণছে। তার মুখ দিয়ে বার বার এই কথাটাই বেরিয়ে আসছে, 'আমাদের মতো লোকের বাঁচন-মরণ দুই-ই সমান।' এই কথা শুনে সরস্বতী তার স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে নলরাজার গল্প শোনায়। নাগবেণী বলে পিসিমা আমার যা-ই হোক ভাবি না। কিন্তু এই ছেলেটা যে পথে পথে ভিক্ষা করে খাবে, আমার ভয়। আগের দুটো মরে স্বর্গে গেছে। আর ও বেঁচে থাকবে নরকযন্ত্রণা ভোগের জন্য।'

সত্যভামার আশঙ্কাই সত্য হল। মাস তিনেকের মধ্যে জানা গেল যে ঐতালের বাড়ি-ঘর-সম্পত্তি নকড়া-ছকড়া দামে বিক্রী হয়ে গেছে। উডুপির জনৈক ধনী ব্যক্তির কাছে সব কিছু বিক্রী করে নগদ টাকা নিয়ে লচ্চ সেইদিনই স্থান ত্যাগ করে। খরিদ্দার মালিক তাড়া হুড়ো না করে সাত-আট মাস পরে নাগবেণীকে নোটিশ দিয়ে জানাল যে সে তার কেনা বাড়ি ও সম্পত্তির দখল নিতে চায়।

সেদিন আর নাগবেণীর পেটে অন্ন জোটেনি। একটি গ্রাসও মুখে তুলতে পারল না সে। ছেলেকে একটু দুধ খাইয়ে পিসিমার কাছে ছেড়ে দিয়ে দৌড়ে গেল কাকার ওখানে। নারায়ণকাকা সমস্ত শুনে উডুপিতে গিয়ে সেই খরিদ্দার মালিকের সন্ধান পেল বটে, কিন্তু বিশেষ কিছু করা সম্ভব হল না। মালিকের বক্তব্য যে সে নগদ আট হাজার টাকা দিয়ে সম্পত্তি কিনেছে, কম টাকা নয়। নারায়ণকাকা যে অতগুলো টাকা দিতে পারে এমন সাধ্য নেই। অবশেষে নাগবেণীর মুখের দিকে তাকিয়ে তার নিজের নামে রাম ঐতালের বসতবাটি ও তিনমুডি ধানের ক্ষেত (তিন খণ্ড জমি) খাজনা করে নিল।

কোডিগ্রামে ফিরে বৃদ্ধা সরস্বতীর কাছে বসে নারায়ণকাকা বলল, 'যা হবার তো হল বেহান। এখন কাজ করে খাবার দিন এল। আমার পক্ষে যতটা সম্ভব করব। কিন্তু ফুলের বদলে এখন শুল বিক্রী করতে হবে।' সরস্বতী আক্ষেপ করে বলল, 'ভগবান আমার চোখ বোজালে নাগবেণীকে তার বাবাই

দেখতে পারবেন। আমার দাদার ওই একটি নাতি। বড় হয়ে ও মায়ের মুখে ফেনাভাত অন্তত দেবে সেটুকু বিশ্বাস আমার আছে। বাপের দুবুদ্ধি ওর হবে না। কিন্তু আমি তখন কোথায় কে জানে? তবে যতদিন আছি, নাগবেণীকে ভিক্ষে করে খেতে দেব না। এখন গায়ে খেটে জমির খাজনা দিয়ে ছেলেকে খাওয়াতে হবে।'

নারায়ণ বলল, 'আমরা তো আছি বেহান। আপনাদের দেখব না? আমার চেষ্টা ছিল যাতে বাড়িটা আপনাদের হাতছাড়া না হয়। খাজনায় নিলেও ওই আশ্রয়ে থাকা যাবে তো। তবে খাজনার কথা বলা যায় না। যখন তখন বলতে পারে, 'চলে যাও।' তাই বলি কি, আপনারা আমার ওখানে চলুন। তিনজন তো মানুষ আপনারা, আমি আপনাদের বোঝা (গলগ্রহ) বলে মনে করব না বেহান।'

সরস্বতী নাগবেণীকে ডেকে বলল, 'কাকার কথা শোনো মা। তুমি ছেলে নিয়ে ওর ওখানে যাও। সত্যভামা ও আমি, আমরা দু'জন, যতদিন বেঁচে আছি, এখানেই দিন কাটাব। বাড়িটা তো দাদারই ছিল। ভাবছি যদি আমরা কাশীতেই থেকে যেতাম, মরণটা ওই তীর্থক্ষেত্রেই হত। এখন তাও নেই কপালে।'

নাগবেণী কি পিসিমাকে ছেড়ে যেতে পারে কখনও? সে কাকার কাছে বলল, 'আপনি আসুন তো কাকা। এখনই কোনো তাড়া নেই। গরমের দিন পর্যন্ত চলতে পারে এমন চাল ঘরেই আছে। ছুটিতে বাবা এলে পরে সব ভেবে দেখব।' এই বলে কাকাকে বিদায় দিয়ে নাগবেণী বসে চোখের জল ফেলতে লাগল। মায়ের কান্না দেখে শিশুও কান্না শুরু করে দিল। ছেলের খিদে পেয়েছে মনে করে নাগবেণী খানিকটা ফেন গরম করে আনল। সরস্বতীর রাত্রিতে খাওয়া নেই, নিজের দরকার নেই। কিন্তু শিশুকে তো কষ্ট দেওয়া যায় না। তাই তাকে খাওয়াতে হল। একটা কেরোসিন বাতি জ্বালিয়ে ঘরের মেঝেটা ঝাঁট দিয়ে পাশাপাশি দুটো মাদুর পেতে মাঝখানে শিশুকে শুইয়ে দিল। তারপরে ধীরে ধীরে পিসিমার হাত ধরে নিয়ে এসে তাকে শুইয়ে দিয়ে নিজের শরীরটা এলিয়ে দিল। সেদিন নাগবেণীর মুখ থেকে একটি কথাও বেরুল না, পিসিমাও চুপ করে রইল।

কয়েকদিন এইভাবে কেটে যাওয়ার পরে একদিন সন্ধ্যায় উকিলবাবু ব্যস্ত-

সমস্ত হয়ে নাগবেণীর বাড়িতে ছুটে এলেন। ছোট ভাই নারায়ণের পত্রে তিনি জানতে পান যে মেয়ের বাড়ির সকলেই অনাথ হয়ে পড়েছে। অন্য কোনো উপায় না দেখে তৎক্ষণাৎ তিনি মংগলুর থেকে রওনা হয়ে পড়েন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সংসার বড় হয়ে উঠেছে। ছেলেমেয়ে নাতি নাতনিতে ঘরভর্তি লোক। মংগলুরের মতো ব্যয়বহুল শহরে তাঁর আয়ের চেয়ে ব্যয় কিছু কম নয়। অভাব বা দারিদ্র্যের কষ্ট তাঁকে পোহাতে হয় না সত্য। তবু আরও তিন-চারিটি প্রাণীর দায়িত্ব বহন করা তাঁর পক্ষে খুব সহজ হবে না। কিন্তু বহন না করেও তো উপায় নেই। সেই নিয়ে মেয়ের সঙ্গে পরামর্শ করবার জন্যই তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন।

নাগবেণী জিজ্ঞাসা করল. 'কে তোমাকে আসতে লিখেছেন? কাকা বুঝি? আমি তো কাকাকে বলে দিয়েছিলাম—গরমের দিন পর্যন্ত কোনো অসুবিধা নেই। পরে ছুটিতে যখন আসবে তখন কথাবার্তা হলেই হল। কাকা যে কেন এভাবে তাড়াহুড়ো করে তোমায় পত্র দিলেন জানি না।'

উকিলবাবু হেসে বললেন, 'মা তোর বুদ্ধি নেই। তুই ওই শিশুটিকে নিয়ে বুড়ো পিসিমা ও শাশুড়িকে নিয়ে খাজনা করা জমিতে বেঁচে থাকতে পারবি? তোর শাশুড়ি যদি তার মেয়ের বাড়িতে থাকেন, তবে তোদের দুজনকে আমি সঙ্গে করে মংগলুরে নিয়ে যাই। নয়তো তোর পিসিমা ঐরোডিতে নারায়ণের কাছেই থাকবে। খোকাকে নিয়ে তুই মংগলুরে চল। তুই যদি আমার কথা মতো আগেই মংগলুরে চলে যেতিস তবে এই সর্বনাশটি হতে পারত না।'

নাগবেণীর মুখখানি বিবর্ণ হয়ে গেল। কারণ বাবার কথা থেকে এটুকু বুঝতে তার অসুবিধা হল না যে শাশুড়ির দায়িত্ব বহন করতে তিনি চান না। পিসিমা যে কোডিগ্রাম ছেড়ে অন্য কোথাও যাবেন না। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি তো প্রায়ই বলেন, 'আমি এখানেই ভিক্ষা করে খাব আর আমার রামের বাড়ির উঠোনে শুয়ে চোখ বুজব। বাকী থাকল নাগবেণী। বিয়ের পরে কোনো মেয়েই আর বাপের সংসারের লোক নয়। নাগবেণীও নয়। আজ কি সে নিজের কষ্টের কথা ভেবে বুড়ো পিসিমা ও শাশুড়িকে ত্যাগ করে পিত্রালয়ে উঠবে? অনেক ভেবেও কোনো সিদ্ধান্তে আসা গেল না। রাত্রিতে বাবাকে খেতে দিয়ে নাগবেণী কাছে বসে বলল, 'বাবা তুমি যখন গরমের ছুটিতে আসবে তখন বলব। ততদিন ভেবে দেখি।' পিতা কন্যার মুখের দিকে তাকিয়ে

বলল, 'মা ওই ছেলেটার কথা ভেবে ছাখ্। মাত্র ছু'বছর বয়স। নিজের পায়ে দাঁড়াতে এখনও বিশ বছর লাগবে। ওর কথাটা ভেবে কথা বলিস।' নাগবেণী ভেবে দেখল। এই বয়সে পিসিমার পক্ষে অন্য কোথাও গিয়ে খাপ খাইয়ে থাকা সম্ভব নয়। তা ছাড়া কাকা ভালোমানুষ হলেও কাকিমার স্বার্থপরতা ও নিষ্ঠুরতা ভয়ের বস্তু। সবচেয়ে বড় কথা, 'এতদিন পর্যন্ত এখানে জীবন কাটালাম, আজ কেন এই আশ্রয় ছেড়ে যাব?' নাগবেণীর এই গর্ব, এখানকার মাটির প্রতি ভালোবাসা। নাগবেণী বলল, 'বাবা, এখন কিছুই করার দরকার নেই।'

উকিলবাবু: 'আমি এখনই বাড়ি গিয়ে নারায়ণের সঙ্গে কথা বলে কাল আবার আসব। আদালত কাছারি খোলা রয়েছে, আমার পক্ষে তো মংগলুর ছেড়ে থাকা সম্ভব নয়। কাল আমার কথা মতো মংগলুর যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে থাকিস।' এইভাবে তাগিদ দিয়ে উকিলবাবু রওনা হয়ে গেলেন।

নাগবেণী ও সরস্বতীর মধ্যে এই নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছিল। সরস্বতী বলল, 'সত্য কোথায় থাকবে? এখন না হয় সে মেয়ের বাড়িতে গেছে। ছু দিন পরে তো ফিরে আসবে। তখন কি সে বাপের বাড়ি গিয়ে থাকবে? আমার কথা ছাড়ো, আমার কাছে এই মাটিই ঢের। কুটুমবাড়িতে গিয়ে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে পড়ে থাকব, সে আমি পারব না মা', এই বলে সরস্বতী সবিস্তারে বর্ণনা করল কি ভাবে তারই এক সমবয়স্কা বিধবা রমণী এ কুটুমবাড়ি সে কুটুমবাড়ি ঘুরে ঘুরে সকলের কাছে লাঞ্ছনা গঞ্জনা সয়ে সয়ে শেষ কালটায় মারা গেল।

নাগবেণী কোনো কথা বলল না, চুপ করে রইল। রাত্রি তখন পনেরো দণ্ড হয়ে গেছে। শুয়েও নাগবেণীর ঘুম আসছে না। বিছানায় উঠে বসল। কাছেই নিশ্চিন্তে নিদ্রিত ছেলে। নাগবেণীর মুখে একবার একটু হাসির রেখা, পরমুহূর্তেই চোখের জল। শিশুর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বলল, 'রাম তোর দাছু তোকে লালন পালন করবেন। কাল সকালেই এসে নিয়ে যাবেন তোকে।'

বিছানা থেকে উঠে পিসিমার পায়ের কাছে বসে প্রণাম করল নাগবেণী। তারপর ধীরে ধীরে উঠোনে এসে নামল। বাইরে তখন ঠাণ্ডা হাওয়া। আকাশ থেকে অযুত নক্ষত্র ঝুঁকে পড়ে নাগবেণীর দিকে চেয়ে আছে। রাম

নাম মুখে নিয়ে সদর দরজায় এসে দাঁড়াল। কখন এক সময়ে বালুকাস্তূপ ভেঙে ভেঙে পশ্চিম টিলায় এসে উপস্থিত হল। সেখানেও না দাঁড়িয়ে সামনে সমুদ্রের পথে অগ্রসর হল। প্রতি অমাবস্যায় সমুদ্রের যেখানে নেমে সে স্নান করে ভাঁটায় সেখান থেকে জল সরে গেছে। সমুদ্রের কিনারা ধরে ধরে স্খলিত চরণে সে দক্ষিণ দিকে হাঁটতে লাগল। চোখে তার পলক নেই, দেখে মনে হয় যেন স্বপ্নাবিষ্ট। শান্ত সমুদ্রের মৃদু তরঙ্গ ঘুমপাড়ানি গানের মতো তাকে বিহ্বল করে তুলেছে। মাঝখানে একটা শেয়াল 'হু য়্যো' বলে ডেকে উঠল। শেয়ালটা এসেছিল তার দৈনন্দিন কাজে সমুদ্রের কাঁকড়া শিকারে। কোনো দিন কেউ আসে না, আজকে আগন্তুক এসেছে দেখে সে শব্দ করে প্রতিবাদ জানাতে নাগবেণী একবার সেদিকে তাকিয়ে যেন কিছুই হয়নি এইভাবে আবার সামনের দিকে এগিয়ে চলল। এক দণ্ডের মধ্যে মোহানা এসে গেল। বিছানো মাদুরের মতো পড়ে থাকা সমুদ্রসৈকত এখানে হঠাৎ খণ্ডিত হয়ে নদীর সঙ্গমে সমাপ্ত হয়ে গেছে। নদীর জল কল্ কল্ করে সমুদ্রে গিয়ে পড়ছে। 'তোমাকে আমার চাই না' বলে সমুদ্র যেন সেই নদীর জলস্রোতকে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে।

নাগবেণীর খেয়াল হল তার যাত্রার সীমা এসে গেছে। একবার ছেলের কথা ভাবল, একবার পিসিমার কথা। সেই অন্ধ বৃদ্ধা রমণীর স্নেহপ্রীতি ভালোবাসা তার এতদিনের জীবনকে আগল দিয়ে রেখেছিল। 'পিসিমা, আমার এই অপরাধ কি তুমি ক্ষমা করতে পারবে না?' এই বলে খেদ প্রকাশ করে একবার আকাশের দিকে তাকাল। নক্ষত্রমণ্ডলী যেন নিষ্পলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে আছে। আর একবার তার ধ্যান ভঙ্গ হল। এবারে শেয়াল নয়, কুকুরের ডাক। দূরে ছায়ার মতো দণ্ডায়মান নাগবেণীকে দেখে যে কুকুরটা ডেকে উঠল, সেদিক থেকেই মানুষের সাড়া পাওয়া গেল। মনে হল কে যেন তার দিকেই এগিয়ে আসছে। 'আর দেরি নয়' এই ভেবে সে সৈকত থেকে মোহানার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

কুকুরটার সঙ্গে সঙ্গে যে দুজন লোক ছুটে এল তারা ওই অঞ্চলেরই জেলে। হাতে তাদের কাঁকড়া ধরার ঝুড়ি। তারা দেখল অন্ধকারে নদীর জলে কী যেন একটা ডুবছে, ভেসে উঠেছে আবার ডুবে যাচ্ছে। হয়তো কুকুরের ভয়ে কেউ জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে মনে করে একজন জেলে জলে লাফিয়ে পড়ল। সমুদ্র ও নদীর জলের আবর্তের মধ্যে পড়ে মূর্ছিত নাগবেণীই ওখানেই ঘুরপাক খাচ্ছিল।

তার শাড়ীর আঁচলটা জেলের হাতে লাগতেই শক্ত করে ধরে নাগবেণীকে তীরের কাছে টেনে আনল। সমস্ত ব্যাপারটা বিদ্যুত নিমেষে ঘটে গেল। জেলেদের শুশ্রূষায় কয়েক মিনিটের মধ্যে নাগবেণী চোখ খুলতে জেলেরা কাছের নারকেল বাগানের বাড়ি থেকে লোকজন ডেকে আনল। নাগবেণীকে সেখানে নিয়ে গিয়ে প্রদীপ জ্বালতেই সেই বাড়ির বৃদ্ধা জেলেনী কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মা আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি, আচ্ছা আপনি কি ঐতাল ঠাকুরের ছেলের বৌ ?'

নাগবেণী কেঁদে উঠে বলল, 'হ্যাঁ, আমায় তোমরা মোহানায় নিয়ে গিয়ে ফেলে দাও। সুখে মরতে দাও, ওগো, আমায় সুখে মরতে দাও।'

এদিকে ঐতালের বাড়িতে নিদ্রিত শিশু ভোরবেলায় জেগে উঠে মাকে না পেয়ে কান্না শুরু করে দেয়। সরস্বতী নাগবেণীর সাড়া না পেয়ে বলে, 'ঘুমোও দাদু, ঘুমোও। তোমার মায়ের কী জোর ঘুম!' এই বলে শিশুর গায়ের উপর হাত থাপড়ে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা করে। শিশুর কান্না না থেমে বরং আরও প্রবল হয়ে ওঠে। 'নাগু, নাগু' বলে সরস্বতী খুব জোরে চিৎকার করে ডাকল। 'কোথায় গেলি নাগু ? এদিকে রাম কাঁদছে যে!' অবশেষে নিজেই নানা উপায়ে রামকে শান্ত করতে করতে ভাবতে লাগল, 'নাগবেণী আজ এত তাড়াতাড়ি উঠল কেন ? কোথায় গেল ? শুকনো পাতা কুড়োতে, না কি, থালাবাসন ধুতে ? থালাবাসন ধোয়ার কাজ হলে তো পুকুর পাড়ে গিয়েছে। তাহলে তো আমার ডাক নিশ্চয়ই শুনে থাকবে।' হয়ত সময়ের আন্দাজ করতে না পেরে হোন্নে গাছের তলায় ঝাঁট দিতে গিয়ে থাকবে।' সরস্বতী যখন মনে মনে এইসব চিন্তা করছে, তখন বাইরে আলো ফুটে এসেছে। এমন সময়ে সদর দরজা থেকে কার যেন গলার সাড়া পাওয়া গেল, 'মা! মা ঠাকরুন!' সরস্বতী জিজ্ঞাসা করল, 'কে ডাকছে ? কাকে চাই গো ?' সঙ্গে সঙ্গে নাগবেণী আধোমুখে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করল। বৃদ্ধা জেলেনী বলল, 'ঠাকুমা, ইনি কে গো ? আপনাদের বৌমা তো ? দুপুর রাতে 'মোহানায় ঝাঁপ দেব' বলে বেরিয়েছিলেন। ওই সময়ে যারা কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিল, তারা দেখতে পায় বলে প্রাণটা বাঁচল,' শুনে সরস্বতীর বুক কেঁপে উঠল। কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'ও নাগু, কী করেছিলি তুই ?' তারপরে জেলেনী ও জেলেদের উদ্দেশে বলল, 'তোমরা, বাবা, আমার বাছাকে বাঁচিয়েছ। আহা, ও কী

করবে ? ভগবান এত কষ্ট দিলে,' এই বলে যারা নাগবেণীকে নিয়ে এসেছিল তাদের কাছে দুঃখের কথা বলতে লাগল।

জেলেরা চলে গেলে নাগবেণী ঘরে এল। সরস্বতী বলল, 'মা তুমি এমন কাজ করতে গেলে ? তোমার এই ছেলে তোমাকে এক দণ্ড দেখতে পায়নি বলে কেঁদে কেটে অস্থির। তুমি যে ওকে ছেড়ে গেলে এটা কেমন কথা মা ? কেবল কি আমরাই এ সংসারে দুঃখ কষ্ট পাই ? আমাদের চেয়ে হাজার গুণ বেশি কষ্ট পায় এমন লোক নেই কি ?' সরস্বতী এইভাবে নাগবেণীকে অনেক উপদেশ দিল।

সূর্য ওঠার কয়েক দণ্ড পরে নাগবেণীর বাবা এসে সরস্বতীকে সম্বোধন করে বললেন, 'বেহান, ঐরোড়িতে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। আজই সকালে আমাদের ওখানে থেকে পরে আমি নাগবেণীকে মংগলুর নিয়ে যাব।' বাবার এই কথা শুনে নাগবেণী আর সেখানে দাঁড়াতে পারল না, গোয়ালঘরের দিকে গেল এবং গোরুর বাছুরগুলির গলার দড়ি খুলে দিয়ে মাঠের দিকে নিয়ে গেল। উকিলবাবু বসে বসে ভাবছিলেন নাগবেণীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে সব ঠিক করে ফেলবেন। কিন্তু তার দেখা নেই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে সরস্বতীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, বেহান, নাগবেণী কোথায়, ও এরকম করছে কেন ? আমাকে যেন এড়িয়ে চলতে চায়।' সরস্বতী বলল, 'আমার চিন্তা আপনি করবেন না। সত্যভামা ও আমি কোনো রকমে এখানে বেঁচে থাকতে পারব। কিন্তু নাগবেণীকে ও আপনার নাতিকে পালনের ভার আপনার। কাল রাতে নাকি ও মোহানায় ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল।' এই বলে সরস্বতী যা যা শুনেছে সব কথা উকিলবাবুকে শোনাল। সমস্ত বিবরণ শুনে উকিলবাবু ভারি বিমর্ষ হয়ে পড়েন। বার বার কেবল এই বলে আক্ষেপ করতে থাকে, 'হায় আমার মেয়ের এই দুর্গতি ! ফুলের মতো বড়ো করে ওকে রোদের মধ্যে ফেলে দিলুম শুকিয়ে মারবার জন্য !' নাগবেণীর নাম ধরে ডাকতে ডাকতে উকিলবাবু তার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। এই মাত্র সরস্বতীর কাছে যা শুনেছেন মনের মধ্যে কেবল সেই কথাগুলিই ওলট পালট করছে। সোজা সমুদ্রের কিনারে গিয়ে দক্ষিণমুখো হয়ে মোহানার দিকে এগিয়ে যান। পথে একজনকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'আমার মেয়ে, রাম ঐতালের পুত্রবধূ এদিকে এসেছে কি ?' 'আপনার মেয়ে তো বাড়ির পিছনে গোরু বাছুর ছেড়ে দিয়ে বসে আছে।' 'বাড়ির পিছনেই ?' 'হ্যাঁ গো, ওই হোম্নে বনের কাছে। এক্ষুনি দেখে এলাম গো।'

তাড়াতাড়ি করে আবার তিনি বাড়ির পথ ধরলেন। এসে দেখেন বাড়ির পিছন দিকে হোম্নে গাছের ছায়ায় নাগবেণী মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। সামনের মাঠে গোরু বাছুর চরছে। উকিলবাবু কাছে এসে দাঁড়ালেও নাগবেণীর যেন ভ্রূক্ষেপ নেই। তার চোখ দুটো তার পায়ের আঙুলে পরা রুপোর আংটির দিকেই নিবদ্ধ। উকিলবাবু আরও এগিয়ে এসে বললেন, 'মা, কাল যে তোকে বলেছিলাম, আমার সেই কথায় কি তোর মত নেই? তুই কি রাগ করেছিস? কাল রাতে তুই অমন কাজ করতে গিয়েছিলি মা?' নাগবেণী মাথা তুলে অশ্রু প্লাবিত চোখে পিতার মুখের দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ পরে বলল, 'বাবা আমাকে তোমার ওখানে নিয়ে যাবে বলেছ। কিন্তু এঁদের কে আছে বাবা? এই বয়সে এঁরা দুজন পরের আশ্রিত হয়ে কি থাকতে পারবে? পিসিমা তো বলেন, এই দাওয়ায় বসে চোখ বুজতে পারলেই তাঁর যথেষ্ট।'

'সকলের ব্যবস্থা আমি কী করে করব মা? তবু কিছু করতেই হবে। কিন্তু তুই যদি এখানেই থাকবি বলে জিদ ধরিস, তাহলে আমি কী করব?'

'ওঁরা তোমার ওখানে যাবেন না, এই বাড়িতেই থাকবেন। আর ওঁরা যত দিন আছেন, ততদিন আমিও ওঁদের সঙ্গে থাকব বাবা।'

'তোর ছেলের কি হবে, তোর কি হবে ভেবে দেখেছিস মা?'

'যা হোক হবে বাবা। এখানেই থাকব আমরা। খাজনা হলেও যে পর্যন্ত বেঁচে আছি খাজনা দিয়েই থাকব। আমাকে দিয়ে কি একটা ছেলের লালন পালন হবে না? লোকে যেন বলে ছেলের বাপ ছেলেকে ত্যাগ করলেও রাম ঐতালের নাতিকে ভগবান ত্যাগ করেন নি। লোকে যেন একথা না বলতে পারে যে, ছেলের মা ছেলেকে পরের দুয়ারে হাত পাততে দিয়েছিল। এইটুকু হলেই হল।'

'তোর মন যদি এতই শক্ত হয় মা, তবে কালরাতে ওভাবে কেন মরতে গিয়েছিলি?'

'তুমি আমাকে পিসিমার কাছ থেকে নিয়ে যেতে চেয়েছ বলে। তুমি নিয়ে যেতে চাইলে পিসিমাও আমার অবস্থা দেখে আমাকে যেতে বলবেন বলে। ভেবে দেখো বাবা উনি কি এখানে একা থাকতে পারবেন? পঁচাত্তর বছর বয়স হল, চোখের দৃষ্টি নেই, হাঁটার শক্তি নেই—এই অবস্থায় আমার কি ওঁর কাছেই থাকা উচিত নয়?'

নাগবেণীর কথায় উকিলবাবুর অন্তর গর্বে ভরে উঠল, 'মা, তুই যদি আমার মেয়ে না হয়ে ছেলে হতিস...।' পরক্ষণেই ওর দুরবস্থার কথা ভেবে পিতৃহৃদয় স্নেহে ও করুণায় বিগলিত হল।

'তাই হোক মা। তোর মতো মেয়েকে ভগবান কখনো পায়ে ঠেলবেন না। তুই বেয়ানদের সঙ্গেই থাক। তবে আমার একটা কথা আছে। নদীর ওপারে আমাদের যে জায়গা রয়েছে সেখানেই তোমাদের জন্য বাড়িঘর তৈরি করে দেব। এখানে এই বাড়িতে পরের ঘরে খাজনা দিয়ে সুখ কী? লাভই বা কী? চাষীকে খোরাকী দিয়ে কৃষিকাজ করতে গেলে হাতে কী-ই বা থাকবে?'

'থাকতে হলে এখানেই থাকব বাবা। যিনি এই বাড়ি কিনে নিয়েছেন, তিনি যদি আমাদের থাকতে না দেন, তবে বালিয়াড়ির দিকে সরকারের যে পতিত জমি পড়ে রয়েছে ওখানেই একটা খড়ের ঘর বেঁধে থাকব। জীবনে যদি তোমার জামাই কখনো ফিরে আসে, তবে যেন সে নিজের চোখেই দেখে তার স্ত্রী-পুত্রকে কী অবস্থায় ফেলেছে।'

নাগবেণীর মনে এখন দুটি প্রবল আবেগ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। একদিকে সত্যভামা ও সরস্বতীর প্রতি তার শ্রদ্ধা ও মমতা, অন্যদিকে স্বামীর উপর দুরন্ত ক্রোধ—যে স্বামী প্রতারণা করে তাকে আজ এই অবস্থায় টেনে এনেছে। নাগবেণী সংকল্প করল যে সে মরবে না, তাকে বেঁচে থাকতে হবে, তার জন্য কঠোর পরিশ্রম করতেও সে বিমুখ হবে না। তাকে দেখাতে হবে যে স্বামী পরিত্যাগ করে চলে গেলেও নাগবেণী মরে যায় নি।

অনেকক্ষণ পরে পিতা-পুত্রী বাড়ি ফিরে এল। উকিলবাবু সরস্বতীর কাছে এসে বললেন. 'বেহান, আমার মেয়ের সঙ্গে আপনার যে গভীর সম্পর্ক ভগবান গড়ে তুলেছেন, আমি তা ছিন্ন করার চেষ্টা করব না। কিন্তু একটা কথা বলব, যখনই কোনো প্রয়োজন হবে আমাকে পর মনে না করে খবর দেবেন। আমি যদি দেশে নাও থাকি, বাড়িতে আমার ভাই নারায়ণ রয়েছে। যদি আপনারা সঙ্কোচ বোধ করেন, তবে আমার দিব্যি রইল।' মেয়ের পীড়াপীড়িতে উকিলবাবু সেদিন মধ্যাহ্নভোজনের জন্য সেখানেই থেকে গেলেন। কিন্তু আহারের সময়ে বারবার এই কথাই মনে হল যে তার নাতির মুখের এক একটা গ্রাস গিয়ে তাঁর নিজের গলায় প্রবেশ করছে। আর তিনি পারলেন না খেতে। সরস্বতীকে বললেন, 'বেহান, এই সংসার কিসের জন্য? ভগবান কেন যে এই সংসার সৃষ্টি করেছেন

জানি না।' ইতিপূর্বে কখনও উকিলবাবুর মনে এই জাতীয় দুঃখবেদনা উদিত হয় নি। আজ হল এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত থেকে গেল।

উকিলবাবুর প্রস্থানের কয়েকদিন পরে সত্যভামা মংদর্তি থেকে ফিরে এল। সরস্বতীর কাছে বাড়ির যাবতীয় বৃত্তান্ত শুনে তার বোধ হল তাদের পুত্রবধূ নাগবেণী সাধারণ মেয়েমানুষ নয়, তাকে দেবী বললেই চলে। সত্যভামার ভারি লজ্জা হল যে সামান্য বিপদেই বিচলিত হয়ে বাড়িঘর ছেড়ে সে গিয়ে মেয়ে-বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। মনে মনে বলল, 'আমাদের মতো লোকের বেঁচে থেকে লাভ কী? নাগবেণী মংগলুর ছেড়ে কোডিগ্রামে আসার পর থেকে আর বাপের বাড়িতে যায় নি, এমন কি ঐরোডিতে গিয়েও একটি রাতও সেখানে কাটায় নি। প্রয়োজন হলে বাবা কাকা এখানে এসে নাগবেণীর সঙ্গে দেখা করে গেছে। ওর এই যে তপস্যা, এই যে ত্যাগ ও কষ্ট, তা কি ব্যর্থ হতে পারে? ও যে চোখের জল ফেলেছে তাতেই আমাদের নাতির জীবনে সুখ সমৃদ্ধি হবে।'

আজ একবছর হল লচ্চ সকলকে ঠকিয়ে উধাও হয়ে গেছে। এই এক বছরের মধ্যেই ঐতাল পরিবার তাদের নিজেদের বাড়িতেই নিজেরা খাজনাদারী প্রজা হল। নাগবেণী বৃদ্ধ সুরোকে ডাকিয়ে তার কাছে নিজেদের দুর্ভাগ্য ও দুঃখ কষ্টের কথা শুনিয়ে শেষে বলল, 'দেখো সুরো, ভগবানই এইসব করেছেন। তোমার এখন বয়স হয়েছে সত্য, কিন্তু তোমার ছেলেপিলেরা তো কাজকর্মের উপযুক্ত হয়েছে। ওদের কেউ যদি চাষ করে দেয়, তবে আমাদের তিনমুড়ি ক্ষেত তৈরি করে কিছু কৃষিকাজ করব ভাবছি।' দাওয়ায় উপবিষ্ট সরস্বতী বলল, 'ভগবানের খেলা দেখলি সুরো?' সুরো একদিন ঐতাল পরিবারের রায়ত ছিল। তার প্রাক্তন মুনিবদের এই দুর্গতি দেখে খুবই কষ্ট হল তার। চোখের জল ফেলে সে উত্তর দিল, 'মাঠান, আমার ছেলেরা তেমন বাজে ছোকরা নয়। যদি বলি আপনাদের জমিতে কাজ করে দিতে, 'না' বলতে পারবে না।' নাগবেণী বলল, 'সুরো, তোমার খোরাকী বাদ যাবে না। সেটুকু চাল ঘরে আছে। এখন একবার হাল চালিয়ে দিলে, পরে শেষ বর্ষার দিনে যদি ফসল নষ্ট না হয়ে যায় তবে ফসল কাটার সময়ে দু'একজন এসে সাহায্য করলেই হল।' লাঠি ভর করে সুরো বাড়ি চলে গেল। বৃষ্টি নামার আগেই হাল টাল দিয়ে ঐতাল পরিবারের তিনমুড়ির ক্ষেত বীজ বোনার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। দু'এক পশলা বৃষ্টির পরেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। নাগবেণী ও সত্যভামা

পালা করে রামকে কোলে নিয়ে রোঁয়ার ক্ষেতে গিয়ে পাহারা দেয় যাতে প্রতিবেশীদের মুর্গীর উপদ্রবে কচি চারাগুলি নষ্ট না হয়ে যায়।

রোদের তাপ প্রখর হয়ে উঠেছে। পশ্চিম আকাশ থেকে রাশি রাশি মেঘ ছুটে আসছে পূর্বঘাটের দিকে। মেঘ দেখে এ অঞ্চলের বিবাহ, উপনয়ন প্রভৃতি অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা প্রমাদ গণনা করে। কিন্তু রোঁয়ার মাঠে দুনী দিয়ে জল সেচন করতে গিয়ে কৃষকদের যাতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে না হয়, যেন সেই কথা ভেবেই মেঘেরা মাঠে মাঠে কয়েক ফোঁটা জল ঢেলে দেয়। ধানের চারা বড় হয়ে সবুজ হয়ে ওঠে। ভগবানের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সরস্বতী বলে, 'সত্য, দুনীর জলের জন্য খোরাকী দিতে হলে ঘরে আর কটা চাল আসত? ভগবানই গরীবকে বাঁচালেন।' পরদিন সকালে রামের কান্না শুনে সরস্বতী বলল, 'সত্য, রামের জন্য যাহোক কিছু বানিয়ে রাখো। এই তো বর্ষা আসছে। খিদে পেলে কী খাবে? আর কিছু না হয় তো চালের পাঁপড় করে রাখ।' নাগবেণী মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, 'পিসিমা, রোঁয়া, নিড়ানি, ফসল কাটা এসবের জন্য খোরাকী দিতে হবে না? পাঁপড়ের জন্য যদি চাল কোটা হয় তবে সুরোকে দেব কোথা থেকে।' সরস্বতী হেসে বলল, 'মা, খোকার পাঁপড় বানাতে গিয়ে যদি খোরাকীর চালে টান পড়ে, তবে আমরা তিনজন মিলে এক একদিন 'একাদশী' (উপবাস) করলেই হল।' সরস্বতীর কথায় নাগবেণী লজ্জা পেল বটে, কিন্তু ঘরে চাল মজুত রাখার ব্যাপারে সে মোটেই উদাসীন রইল না। চালের পাঁপড় করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। এদেশে যতই আকাল দেখা দিক, কাজু গাছের কোনো অভাব নেই। কাজু ফলের ছড়াছড়ি, অত কাজু খায় কে? নাগবেণী কাজু বাদামের বড়া ও পাঁপড় তৈরি করে সত্যভামাকে বলল, 'মা, পাঁপড় বড়া তো করেছি, কিন্তু বর্ষা নামলে গন্ধ না হয়ে যায়।' সত্যভামার মনে হল মেয়ের বাড়ির কথা। বলল, 'ওখান থেকে (সুব্বিদের ওখান থেকে) গোটা কয়েক কাঁঠাল আনতে পারলে কোনো ভাবনাই ছিল না।' নাগবেণী বলল, 'ওখান থেকে এখানে কাঁঠাল বয়ে আনা কি সহজ কথা মা?' মংদর্তি থেকে কোডিগ্রামে কাঁঠাল বয়ে আনার কথা উঠলে সরস্বতী তার প্রথম বয়সের সেই গল্প শোনাল। কেমন করে সে সুরো ও তার স্ত্রীকে নিয়ে পূব পরগণা থেকে ঝুড়িভর্তি আম বয়ে এনে আচার বানিয়েছিল। সত্যভামা বলল, 'ঠাকুরঝি, আপনার সাহস ও সহ

শক্তি আমাদের কৈ ?' তবু কিন্তু সত্যভামা নাতির মুখ যাতে মলিন না হয়, ও যাতে ক্ষুধার জন্য মাকে জ্বালাতন না করে এই ভেবে মংদর্তির উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। 'দু'দিনের মধ্যে আসব' বলে গেলেও তার ফিরে আসতে দু'দিনের জায়গায় চারদিন হয়ে যায়। ফেরার সময়ে সত্যভামা একা নয়, সঙ্গে তার সুব্বির ছেলে। ছেলেটির মাথায় একটা বোঝা, তার দিদিমার মাথার উপরেও একটা ন্যাকড়ার পুঁটুলি। সত্যভামা এসে রামকে ডেকে বলল, 'খোকামণি, পিসিমার বাড়ি থেকে তোমার দাদা পাঁপড় নিয়ে এসেছে দেখ এসে।' সত্যভামা নাতিকে নাম ধরে ডাকতে পারে না, তাহলে যে স্বামীর নাম উচ্চারণ করতে হয়। রাম যে এখনও কেন তার ঠাকুমার কাছে 'রাম' না হয়ে 'কুস্থু' (খোকা মিষ্টি) হয়ে আছে, তার রহস্যভেদ করা সম্ভব না হলেও পাঁপড় কথাটার তাৎপর্য সে বুঝতে পারে। সত্যভামা মেয়ের বাড়িতে বসে কাঁঠালের এঁচড় সিদ্ধ করে পাঁপড় বানিয়ে নিয়ে এসেছে। সুব্বিও তার দাদার ছেলের জন্য মিষ্টি আলুর পাঁপড় তৈরি করে দিয়েছে। সত্যভামার মনে আজ আনন্দ আর ধরে না। তার খোকামণির জন্য সে যে এই পরিশ্রমটুকু করতে পেরেছে তাতেই তার সুখ।

বৃষ্টি শুরু হয়েছে। অন্য বছরের তুলনায় এবার কিছু আগেই বর্ষা নেমে গেল। গ্রামের পুকুর, ক্ষেত কোলা ব্যাঙের ঐকতানে পূর্ণ হল। ওদিকে প্রবল হয়ে উঠল সমুদ্রের নিরন্তর গর্জন। সরস্বতী অবাক হয়ে বলল, 'বরুণদেব আমাদের বালিয়াড়িকে এবার গিলে ফেলবে নাকি।' বৃষ্টির তালে তালে কচি ধানের চারাগুলি হেলছে দুলছে। নাগবেণী ও সত্যভামা সুরোর ছেলেপুলে ও নাতিদের সঙ্গে মাঠে নেমে রোঁয়ার ক্ষেতে ধানচারাগুলি নেড়ে দিতে লাগল এবং তাদের তিন মুড়ির জমি তিন দিনেই সবুজ হয়ে উঠল। নাগবেণী ভাবনা সুরোর বাড়ি থেকে কেউ তো খোরাকীর চালের জন্য আসছে না। গতমাসে চাষ করার মজুরী নেয় নি, এমাসে রোঁয়ার কাজেও মজুরী বাকী রইল। সব নিয়ে মজুরীর পরিমাণ তো কম হবে না। দুই 'কাল্‌সে' (১ কাল্‌সে = ১৪ সের) চালের জন্য তারা কি সুরোর কাছে ঋণী হয়ে থাকবে? নাগবেণী বারবার সুরোর কাছে খবর পাঠায়। সুরো তার ছেলেপিলেদের কাছে আগেই বলে রেখেছে, 'শোন্‌রে তোরা, ওই যে বুড়ো মাঠান, উনি যে কতদিন আমাদের আচার-টাচার খাইয়ে পালন করেছেন তার হিসাব নেই। আর ঠাকুরমশাই

যখন বেঁচে ছিলেন, কোনো বছর যদি ফসল না হত, আমাকে বলতেন—'যাক্ সুরো, ভগবান যদি করেন, খাজনার চাল আগামী সাল দিবি।' সেই লোকের বাড়িতে আজ অভাবের দিন যখন এসেছে, তখন তেনারা মজুরী দিলেও আমরা নেব না। বুঝলি?' নাগবেণীর খবর পাঠানোতে কোনো কাজ হয় নি দেখে একদিন সে নিজেই সুরোদের বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সুরো, খোরাকীর চাল কবে আনবে? বর্ষার ঠাণ্ডায় পোকা ধরে গেলে?' সুরো বলল, 'মা, চাল এখন আছে ঘরে। আমাদের পাওনা চাল এখন তোমার ঘরেই থাক্।' নাগবেণী একথার অর্থ বুঝতে পারল না। সে ভাবল মাঠে নিড়েন দেওয়ার পরে হয়ত সুরো খোরাকীর চাল নিতে আসবে।

নাগবেণী এখন ঘরের কাজে কর্মেই ব্যস্ত থাকে। যখন একটু ফুরসুৎ পায়, ক্ষেতে গিয়ে নিড়েন দিয়ে আসে। অন্য কোনো কাজ না থাকে তো গোরুবাছুর নিয়ে টিলার মাঠে চরাতে যায়। যখন বৃষ্টি থাকে না, রামকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। রামের শরীর এখনও তেমন শক্ত হয় নি বটে, কিন্তু কথা বলতে ও ছুটোছুটি করতে সে বেশ পটু হয়ে উঠেছে। তার মিষ্টি মিষ্টি কথা শুনতে মা-ঠাকুমাদের অতৃপ্তি নেই। রামকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যেতেও খুব আগ্রহ। একেবারে বর্ষাবিহীন দিনগুলিতে রোদ যখন পড়ে আসে, সে তার ছেলেকে কোলে নিয়ে বালির টিলার উপর গিয়ে ওঠে। রাম সমুদ্রের দিকে হাত তুলে দেখায়, 'ওটা কী চক্চক্ করছে মা?' 'সমুদ্র।' 'সমুদ্র কী মা?' মা হেসে বলে, 'সমুদ্র মানে মস্ত বড় পুকুর।' রাম বলে, 'ওর মধ্যে পদ্মফুল আছে কি না দেখি তো।' কাছে গিয়ে সমুদ্র না দেখানো পর্যন্ত বালক তার জিদ ছাড়ে না। ছেলেকে জলের কিনারে ছেড়ে দিতে নাগবেণীর বড় ভয়। ছেলে কিন্তু পাগল হয়ে ওঠে একের পর এক যে ঢেউগুলি সমুদ্রসৈকতে এসে আছড়ে পড়ে সেইগুলি তার কাছ থেকে দেখে চাই, স্পর্শ করা চাই। নাগবেণী যদি বলে, 'চল্ খোকা বাড়ি যাই, বালক জেদ করে বলে, 'না মা, এখানেই বসে খেলা করব।' এইভাবে কয়েক দিন পরপর অন্তত একবার করে রামকে নিয়ে সমুদ্রের কিনারে যেতে হয়। রাতে শুয়ে শুয়ে সমুদ্রের গর্জন শুনে বালক বলে, 'মা, ওটা কার চিৎকার?' 'সমুদ্রের।' বালক জিজ্ঞাসা করে, 'চিৎকার করে কেন? ও বুঝি কিছু চায়, না মা?' রামের যদি মন মেজাজ বিগড়ে যায় তবে একবার বললেই হল 'খোকা, সমুদ্র দেখবি যাবি?' এমন কিছু দূরে নয়। বাড়ি থেকে একশ গজ হেঁটে গেলেই সমুদ্র।

বর্ষা শেষ হয়ে মহালয়া অমাবস্যা এসে উপস্থিত। এদিনটি গ্রামবাসীদের সমুদ্র স্নানের দিন। এইদিনে তারা পিতৃপুরুষকে পিণ্ডদান করে। সরস্বতীর ইচ্ছা হল এবারে সে সমুদ্রে স্নান করবে। কাশী থেকে ফিরে আসার পরে এতদিনে আর সমুদ্র স্নান হয় নি। তার পক্ষে হেঁটে যাওয়া এবং সমুদ্রের জলে ডুব দেওয়া সম্ভব নয় বলে সে এতদিন চুপ করে ছিল। আজ হঠাৎ বলে বসল, 'নাগু, একবার স্নান করে এলে হত আর কটা দিন বা আছি?' নাগবেণী বলল, 'অতদুর তুমি হেঁটে যেতে পারবে পিসিমা?' সরস্বতী বলল, 'হুঁ, হাঁটতে না পারার কী? চোখে দেখি না। হাত ধরে নিয়ে গিয়ে জলে ডুবিয়ে দিবি। পারের কাছে দাঁড়িয়েই ডুব দেব। আর কী, আমার তো আর তীর্থ-মন্দির নেই। আজ এইটুকু করিয়ে দে।'

সেদিন সকালেই সে বাড়িতে একবার স্নান করে কারও সাহায্য না নিয়ে ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রণাম করে এল। বলল 'সত্য, কে নিয়ে যাবি? তুই না নাগবেণী? ·· তুই-ই পারবি। পথে জিরোতে জিরোতে যাব। একেবারে না জিরিয়ে যেতে পারব না। আমাদের উপাধ্যায় গিন্নি তো আসবে। তোরা দুজনে মিলে আমাকে ডুব দেওয়াবি। নাগবেণী রামুকে নিয়ে বাড়িতেই থাকবে।'

রাম কি বাড়িতে থাকার পাত্র? সে ধরে বসল যে সেও সমুদ্রে যাবে। নাগবেণী যখন রামকে বলল, 'খোকা, তুমি আমার সঙ্গে বাড়িতেই থাকো। তুমি যদি যাও, আমার একা একা ভয় করবে না বুঝি?' রাম সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, 'আমি না গেলে ঠাকুমার যে ভয় করবে।' সুতরাং বাড়ির সকলেই একসঙ্গে রওনা হল। সরস্বতীর হাত ধরে রাম বলল, 'এসো ঠাকুমা, আমি তোমায় নিয়ে যাব।' রামের কথায় সকলে হেসে উঠল। সরস্বতী একহাতে সত্যভামাকে ধরে সাবধানে ধীরে ধীরে পা ফেলে চলেতে লাগল। যেতে যেতে বলল, 'সত্য, সব কথা মনে পড়ছে। পারোতি যখন বেঁচে ছিল, আমরা দুজনে কোনো অমাবস্যার স্নান বাদ দিইনি। সত্য, পারোতি যে চলে গেল সেও তো অমাবস্যা তিথি, না?' পার্বতীর কথা বলতে বলতে সরস্বতীর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। সকলেই সমুদ্রের তীরে পৌঁছল। শত শত লোক এসে সমুদ্র-সৈকতে জমা হয়েছে। কিছু লোকের স্নান ইতিপূর্বেই হয়ে গেছে, কিছু লোক তখনও স্নান করছে, কিছু লোক তন্ময়চিত্তে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তিল-তর্পণ

করছে। রাম এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, 'মা, আমিও ওইরকম করব।' এই বলে সেখানেই বসে ভাতের অভাবে মাটির পিণ্ড বানিয়ে, পিতৃপুরুষকে পিণ্ডদানকারী চতুর্দিকস্থ মানুষের মতো ওঁবা ওঁবা বলে মন্ত্র আওড়াতে লাগল। তার মন্ত্রপাঠ কানে গেলে সরস্বতী হেসে বলল, 'সত্য, দাদার ইচ্ছা এই রামুর মধ্যে পূর্ণ হল, ত্যাখ। আজ দাদা বেঁচে থাকলে এই সময়ে সেই ত মন্ত্রপাঠ করত।'

রাম ধরে বসল সকলের মতো সেও সমুদ্রে স্নান করবে। সত্যভামা ও নাগবেণী দু'জনে দুহাত ধরে জলের মধ্যে দু'একটা ডুব দেওয়াল। চোখে নোনা জল গিয়ে জ্বালা করলেও রাম ঢেউয়ের আঘাতে হেসে হেসে বলতে লাগল, 'চান করতে কী মজা, চান করতে কী মজা! আমি আরও চান করব। আমি অনেক চান করব।' রামের স্নান পর্ব শেষ হল। এদিকে রোদ চড়ে উঠেছে। নাগবেণী ও সত্যভামা, বাড়ি ফেরার সময়ে সরস্বতীর যাতে কষ্ট না হয়, তাড়াতাড়ি উপাধ্যায়ের স্ত্রীকে খুঁজে বার করল। নাগবেণী রামের হাত ধরে দাঁড়ালে সত্যভামা ও উপাধ্যায় গিন্নি দুজনে দুদিক থেকে ধরে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের মুখে সরস্বতীকে স্নান করাল। স্নান শেষে সরস্বতী নাগবেণীর কাছ থেকে তিনটি পাই-পয়সা নিয়ে এক বৈদিক ব্রাহ্মণকে দান করল। অতঃপর সত্যভামাও তাড়াতাড়ি স্নান সেরে গিয়ে সরস্বতীর মতো তিনটি পাই পয়সা দিয়ে ওই ব্রাহ্মণকে তৃপ্ত করল।

সরস্বতী বলল, 'এখন চলো যাই।' পূব দিকে মুখ করে সকলেই বাড়ির দিকে রওনা হল। ফেরার সময়ে মনে হচ্ছিল যে সমুদ্র স্নানে যাওয়ার সময়কার সমস্ত পরিশ্রম যেন একযোগে এসে দেখা দিয়েছে। মাঝে মাঝে জিরিয়ে নিয়ে উপাধ্যায় গিন্নির সঙ্গে কথা বলতে বলতে সরস্বতী সুস্থ দেহেই বাড়ি ফিরল। উঠোনে পা দিয়ে বলল, 'নাগু, আজ আর আমি কিছু মুখে দেব না, আমায় একটু পানা করে দাও।' নাগবেণী তাকে বারান্দায় বসিয়ে পানা আনতে গেল। রাম বলল, 'আমি তোমায় পানা খাওয়াব ঠাকুমা।' সরস্বতী বলল, 'আচ্ছা বাবা।' এই বলে সরস্বতী যেন মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার মতো সেখানেই শুয়ে পড়ল। পানা এলে একটু একটু করে রামের হাত দিয়ে খানিকটা পানা খাওয়ার পরে সরস্বতীর হুঁস হল। রামের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'ভালো হোয়ো বাবা। মাকে সুখী কোরো, বংশের শ্রীবৃদ্ধি কোরো।' এই বলে রামের মাথায়

হাত রেখে আশীর্বাদ করল সরস্বতী। পরে বলল, 'কাশী থেকে যে ভাগীরথীর জল এনেছিলাম তার এক চামচ জল খাইয়ে দিলে বোধহয় ভাল হত।' সত্যভামা ভিতর থেকে একটি ঘটি এনে তার মুখের গালা খুলে ফেলে জিজ্ঞাসা করল, 'ঠাকুরঝি জল দেব কি?'

রাম বলল, 'ঠাকুমা, আমি তোমার মুখে জল দিই?' সরস্বতী বলল, 'হ্যাঁ বাবা তুমিই দাও।'

পিসিমার জন্য পানা তৈরি করতে করতে নাগবেণীর বুকটা যেন হঠাৎ কেঁপে ওঠে! তাড়াতাড়ি সে সুরোর ওখানে ছুটে গিয়ে কাকার কাছে খবর পাঠিয়ে দেয়। সুরোর বাড়ি থেকে ফিরে এসে দেখে রাম তার ঠাকুরমার মুখে জল দিচ্ছে। উপাধ্যায়গিন্নি সরস্বতীর মুখের অবস্থা দেখে ভীত হয়ে নাগবেণীকে বলল, 'তোমার পিসিমার অবস্থা ভালো দেখছি না। এই সময়ে বাড়িতে একটা পুরুষ মানুষ থাকলে হত।' কথাটা সরস্বতীর কানে পৌঁছলে সে মৃদু হেসে বলল, 'কেন গো রাম তো রয়েছে। আমার রাম কি পুরুষ মানুষ নয়?'

সেই তার শেষ কথা। পরিশ্রমে ক্লান্তিতে যেন সে ঘুমিয়ে পড়ল এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সমস্ত দেহখানা পাথর হয়ে গেল। নাগবেণী কেঁদে কেঁদে বলল, 'উনি যখন বললেন, 'পারোতি তো অমাবস্যার দিনই চলে গেল, না?' তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। মনে হয় যেন বড়ো মা এসেই পিসিমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন।'

রাম কিছুই বুঝতে না পেরে ঠাকুরমার কাছে গিয়ে বার বার নাড়া দিয়ে কথা বলতে লাগল। এই দৃশ্য দেখতে না পেরে নাগবেণী তার ছেলেকে কোলে নিয়ে বাইরে গেল। খানিক পরে নারায়ণকাকা এসে উপস্থিত হলে সত্যভামা বলল, 'ওঁর ইচ্ছামৃত্যু হল। আজ মহালয়া অমাবস্যায় সমুদ্রস্নান করে ফিরে এসে যে মুহূর্তে মৃত্যুকে ডাক দিলেন, তখনই মৃত্যু এসে তাঁকে নিয়ে গেল। আমাদের মতো পাপীদের এরকম কি হবে কোনোদিন?'

উনিশ

নব রাত্রি কেটে গেছে। মাঠে মাঠে ফসল পেকে উঠেছে। সমুদ্রের গর্জন ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে। বড় বড় জাল নিয়ে জেলেরা সমুদ্র কিনারে এসে দেখা দিয়েছে। ওদিকে হংগারকট্টের মোহানায় এ অঞ্চলের পালতোলা নৌকাগুলি আসতে শুরু করে দিয়েছে। কয়েকদিন যাবত রাম 'ঠাকুমা ঠাকুমা' বলে কান্নাকাটি করেছিল। ছেলেকে শান্ত কররার জন্য নাগবেণী নিত্য অপরাহ্নে বালিয়াড়ি ও সমুদ্রতীর ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। একদিন তারা হাঁটতে হাঁটতে মোহানার মুখে সেই নারকেল বাগান পর্যন্ত চলে যায়—যে বাগানখানি একদিন তাদেরই ছিল। শিশুর ঠাকুরদা রাম ঐতাল ওই বাগানখানি কিনেছিল ঐতু পূজারির কাছ থেকে। শিশুর বাপের দোষে এখন ওটা হাতছাড়া হয়ে গেছে। তবু নাগবেণী রামকে কোলে নিয়ে পায়চারি করতে করতে সেই বাগানেই গিয়ে উপস্থিত হল। বাগানটাকে নন্দনবন বলা চলে। সারি সারি নারকেল গাছ অজস্র ফলের গুচ্ছে পরিপূর্ণ। নাগবেণীর মনে পড়ল একদিন সত্যভামার সঙ্গে সে এই বাগানে বেড়াতে এসেছিল। সেই পুরানো কথা মনে পড়ায় নাগবেণী ছেলেকে বলল, 'খোকা ভগবান আমাদের কপালে লেখেন নি। নইলে এ বাগান তো তোমারই ছিল।' রাম গাছে গাছে ঝুলন্ত ফলগুলির দিকে হাত বাড়িয়ে বলতে লাগল, 'মা ওটা চাই, ও-ইটা···।' 'খোকা ওগুলো তো আমাদের নয়। এই বলে ছেলেকে শান্ত করে নাগবেণী বাড়ি ফিরে এল।

সরস্বতীর শ্রাদ্ধের দিনে তার শ্বশুরবাড়ির লোকজন ঐতাল গৃহে এসে পরলোকগতা বিধবার 'উত্তর ক্রিয়া' সম্পন্ন করল। ঐতাল পরিবারের অবস্থা দেখে সত্যভামার জামাই অনেক দুঃখপ্রকাশ করে বলল, 'আমাদের ওখানেও বাবা মরে যাওয়ার পরে পরিবার ভাগ হয়ে তিনটে পরিবার হয়ে গেছে। কিন্তু বেশি হোক, কম হোক সম্পত্তি আমাদের হাতছাড়া হয়নি। এখানকার দুরবস্থা দেখলে ভারি কষ্ট হয়।' যারা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল, তারা একে একে চলে গেল। যাওয়ার সময়ে কেউ কেউ রামের হাতে একটি করে গোল সিকি দিয়ে যায়। রাম জিজ্ঞাসা করে 'মা এগুলো কী? কেন দিয়েছে?' সত্যভামা নিজেদের দারিদ্র্যের কথা ভেবে বলে, 'ওই দিয়েই তো সব কাজ হয়

বাবা।' নাগবেণী হেসে বলে, 'কিছু না বাবা। ওগুলো তোমাকে খেলতে দিয়েছেন।' 'আমাকে ওগুলো দিয়ে চাকা করে দেবে? আমি 'গাড়ি গাড়ি' খেলব।' রামের এই কথা শুনে নাগবেণী রামের হাতে একটা টাকু এনে দিল। শ্বশুরমশাই পৈতার সুতো কাটবার জন্য এই টাকুটি ব্যবহার করতেন।

মৃত্যু, অশৌচ— এ সব আছে বলে কি রোজকার খাওয়া-পরার কথা ভুলে থাকা যায়? পেটের জন্য মাঠে মাঠে যে ফসল পাকতে শুরু করেছে তার কথাও ভোলা গেল না। মাত্র কয়েক দিনের জন্য কাজে ঢিলেমি দিলে মেঘমহারাজ যা কিছু দিয়েছেন ক্রুদ্ধ হয়ে তার সবটাই নষ্ট করে ফেলবেন।

ফসল কাটার সময় হয়েছে বটে, কিন্তু মুশকিল এই যে সত্যভামা বা নাগবেণী কেউই কোনোদিন হাতে কাস্তে ধরেনি। এই অবস্থায় কাজটা কি নিজেরাই করবে? না মুনিষ দিয়ে করাবে? সুরোকে যে ডাকবে, সে তো তার পুরোনো মজুরীই পায়নি, কোনোদিন চাইতেও আসেনি। সুরোর ছেলেপিলেদের নিয়ে ফসল কাটার কাজ করাতে হলে পরে ধান মাড়াবার কাজ তাদের নিজেদেরই করতে হবে। সুরো কিন্তু তার নিজের ক্ষেতে হাত দেওয়ার আগেই মাঠানদের মাঠের কাজ শেষ করে ধানের আঁটি এনে উঠোনে জমা করল। সুরোর ছেলেরা এখন বড় হয়েছে, কাজকর্মে তারা সুপটু। বাড়িতে পুত্র ও পুত্রবধুরা থাকতে মাঠানদের কোনো কাজই সুরোর কাছে বেশি বলে মনে হয় না। সত্যভামা ও নাগবেণী মিলে প্রাঙ্গণে স্তূপীকৃত আঁটি আঁটি ধান পাটায় পিটিয়ে ঝাড়াই করতে লাগল। এই ধান ঝাড়াইয়ের কাজটা রামের কাছে বড়ো মজার খেলা বোধ হওয়াতে সেও এসে যোগ দিয়ে লুটোপুটি করতে কসুর করল না। রাশি রাশি ঝাড়াই করা ধান বারান্দায় এনে ভূর করা হয়েছে। অতঃপর নাগবেণীর প্রথম চিন্তা হল, সবচেয়ে আগে সুরোর ঋণ শোধ করা দরকার। কতজনের কাজ হল? মজুরী কত? এইভাবে হিসাব করে তদুপযুক্ত ধান মেপে আলাদা করে রাখা হল। সুরোর কাছে লোক পাঠালে সুরো মাঠানদের অভিপ্রায় বুঝতে না পেরে সরল মনে এসে হাজির হল। নাগবেণী বলল, 'সুরো এই ধান তোমার মজুরী বাবদ আলাদা করে রেখেছি। ওগুলো তুমি নিয়ে যেও।' এই বলে নাগবেণী সুরোর জন্য আলাদা করে রাখা ধানের স্তূপ দেখিয়ে দিল। সুরো বলল, 'মা এবছর আমরা মজুরী চাই না। জনচারেক লোক আপনার বাড়িতে এসে একটু কাজ করে দিলে আমাদের কোনো ক্ষতি হবে না।'

নাগবেণী বলল, 'সুরো, আমি কারও কাছে ঋণী হয়ে থাকতে চাই না। বাবা আমায় তাঁর ওখানে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, আমি যাইনি। এখন কি তোমার ঋণে আমাকে ডোবাতে চাও?' এই বলে নাগবেণী ঘরের ভিতর চলে গেল।

নাগবেণীর কথা শুনে সুরো ভারি মুশকিলে পড়ে গেল। সে বেশ বুঝতে পারে। জমিদারের খাজনা দিয়ে ওই ফসলে আর কতটা উদ্‌বৃত্ত থাকবে। কিন্তু যদি সে তার মজুরীর ফসল না নেয় তবে মাঠান বড় রুষ্ট হবেন। তার মনে ব্যথা দিয়ে কাজ নেই—এই ভেবে সুরো তার এক পুত্রবধূকে দিয়ে মজুরীর ধান নিয়ে গেল।

এতক্ষণে নাগবেণীর তৃপ্তি হল। ধান মেপে দেখা গেল পঞ্চাশ মুড়ির মতো ধান হয়েছে। জমিদারকে খাজনা দিয়ে বাকী থাকবে মুড়ি দশেক। দশ মুড়ি ধানে তাদের বছর কি চলবে? নিজেদের খোরাকী ছাড়া, ওই ধান দিয়েই তো কাপড়-চোপড়, তেল, লবণ, তেঁতুল কিনতে হবে। কাজেই ছোট একখানি ক্ষেতে রবিশস্যের বীজ বপন করে যদি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জলসেচের ব্যবস্থা করা যায় তবে আরও তিন-চার মুড়ি চাল পাওয়া যেতে পারে। লাঙল চালাবার কাজটা সুরোকে দিয়ে করিয়ে বাকী সব কাজই নিজেদের হাতে করতে হবে, এ ছাড়া উপায় নেই। তারপর থেকে প্রত্যেকটি দিন পরিশ্রমের কাজ—ছাই বহন করা, জল ঢালা, শাক সবজীর কৃষি এই সমস্ত কাজেই দিন কেটে যায়। ধান কুটে চাল করবার জন্য কাউকে ডাকার সাহস রইল না। ধান কাটার ফাঁকে ফাঁকে খানিকটা তিল, খানিকটা কলাই এই সমস্ত শস্য বুনছিল।

বোনার কাজ শেষ হলে বাড়ির পিছন দিককার হোম্নে গাছগুলির শুকনো পাতা কুড়োবার কাজ শুরু হয়ে যায়। গোরুর জন্য ফেন-বিচালি গরম করা, ধান সিদ্ধ করে শুকোতে দেওয়া, অল্প অল্প করে সেই ধান কোটার কাজ চালিয়ে যাওয়া—এ সব তো আছেই। নাগবেণী কখনও এসব কাজ করেনি। চিঁড়ে কোটার জন্য বছরে দু'একবার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল মাত্র। এখন পর পর কয়েকদিন একই কাজ করে করে হাতে তার কালো দাগ পড়ে গেছে, বাহু ফুলে উঠে ব্যথায় টন্‌টন্ করছে। কিন্তু কাজ থেকে তো নিষ্কৃতি নেই, কাজ করেই তো তাকে জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। মা ও ঠাকুরমা যে সমস্ত কাজ করে, শিশু রামও সেই কাজগুলি চেষ্টা করে দেখে নাগবেণীর একপ্রকার কৌতুকমিশ্রিত আনন্দ হয় সন্দেহ নেই, কিন্তু সেইসঙ্গে এই দুর্ভাবনাও

তার মনে না এসে পারে না যে এই ছেলে কি এইভাবেই বড় হয়ে উঠবে? এমনি দারিদ্র্যের মধ্যে? সত্যভামা বলল, 'বাছার এইবার পৈতাটা হয়ে গেলে বংশের কাজকর্মগুলো তো করতে পারবে। ও গোটা কয়েক মন্ত্র শিখতে পারলে ওকে আর দুঃখকষ্ট পোহাতে হবে না। চাল বলো চাল, তরকারি বলো তরকারি—সবই আপনা থেকে ঘরে আসবে।' নাগবেণী বলল, 'কে জানে মা, ভগবান ছেলের কপালে কী লিখে রেখেছেন? ও মামার মতো লেখাপড়া করে বড় হবে, না দাদুর মতো বৈদিক পুরোহিত হবে, না শীনময়্যর ছেলে নরসিংহের মতো হোটেল চালাবে, না নিজেই কোনো রাস্তা ঠিক করে নেবে কে তা বলতে পারে? সবই ভগবানের খেলা। শ্বশুর মশাই তাঁর ছেলেকে পাঠিয়েছিলেন যাতে লেখাপড়া শিখে সে ওকালতি করে। কিন্তু কী করল? গেল কী না হোটলে চালাতে?' নাগবেণী হাল ছেড়ে দিতে রাজী না হলেও পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু নিশ্চিত করে বলবে এমন কি ভাবতেও সে সাহস পায় না।

ঘরের গৃহস্থালি, বাইরে চাষবাস—এত সব কাজের মধ্যেও শাশুড়ী ও পুত্রবধূ রাম সম্পর্কে মোটেই উদাসীন নয়। চার বছর পূর্ণ হতে আর বেশি বাকি নেই। পাঁচ বছর হলেই ইস্কুলে পাঠিয়ে দেবে। কোডিগ্রামের কাছেই একটা নতুন ইস্কুল হয়েছে এবং ওই ইস্কুলের জন্যই শঙ্করপণ্ডিতের গ্রাম্য পাঠশালাটি উঠে গেছে। এখন আর শঙ্করপণ্ডিতের কথা কেউ জিজ্ঞাসাও করে না। চাষচাস করে পণ্ডিত যেটুকু সময় পায়, সেই অবসর কালে গ্রামবাসীদের কাছে যক্ষগানের কথকতা করে। রামের এখন সময় কাটে মায়ের সঙ্গে সমুদ্র দেখে, গোচারণের ক্ষেত্রে ছুটোছুটি করে। কখনো-সখনো কাছাকাছি গ্রামের উৎসব ও মেলা দেখাতেও তাকে নিয়ে যাওয়া হয়। তার খেলার সামগ্রী হল সমুদ্র তীরে কুড়োনো চিত্র-বিচিত্র ঝিনুক, আর বাড়ির পিছন দিককার হোন্নে গাছের কাঁচা ফল। রামের আরও একটা নতুন খেলা জুটে যায়। কোডিগ্রামের জেলেরা মাঝে মাঝে মংদর্তির অথবা মারণকট্টের যাত্রাদলকে ডাকিয়ে নাচগানের বন্দোবস্ত করে। যেখানে যাত্রাগানের আসর বসে, সেখান থেকে ঢোলের ডিমি ডিমি শব্দ উঠলে রাম মায়ের কাছে বায়না ধরে তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। মা ঠাকুরমা এই বলে সান্ত্বনা দেয়, 'এখন তুমি ঘুমিয়ে পড়ো, ভোরবেলা যখন আকাশ রঙিন হয়ে উঠবে তখন তোমায় ডেকে নিয়ে যাব। আকাশে যখন

শুকতারা দেখা দেয়, সত্যভামা গানের আসরে নিয়ে যাওয়ার জন্য রামকে ডেকে তোলে। দূর থেকে দেখে রামের তৃপ্তি নেই। আসরের খুব কাছে যাওয়ার জন্য জিদ ধরল। সত্যভামা বলে, 'রাম ওখানে দেখছ না কত লোকের ভীড় ? সব নোংরা জামা কাপড়ে বসে আছে। এসো এখান থেকেই দেখি।' এই বলে ঠাকুরমা তার ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে চলে। অবশেষে পালাগান শেষ হয়ে গেলে যখন ভীড় পাতলা হয়ে আসে তখন সে সাজঘরের কাছে রামকে নিয়ে গিয়ে বলে, 'দ্যাখো, ওই যে রাবণ, ওই যে ভীম, ওই যে আর একজন।' বাড়িতে এসেই রাম ঘরের ঘটিবাটিতে আওয়াজ তুলে পালার লোকদের মতো চিৎকার করে বলে, 'অললল কোহু', আর সারা উঠোনে নেচে নেচে বেড়ায়। মা ঠাকুরমা যদি বলে, 'রাম, তুমি ওরকম কোরো না। তুমি কি যাত্রাদলের লোক ?' রাম সহজ কণ্ঠে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ ঠাকুমা, আমি উপল্লিশেশ— রাবণের পাট করছি। এই দ্যাখো, এখন আমি পাণ্ডেশ্বর পুট্টয়্য—অর্জুনের পাট করছি।' দলের নামকরা অভিনেতারা রামের চোখে আর অপরিচিত নেই।

একদিন অভিনয় হল গ্রামের মধ্যে 'অরম' দেবতার মন্দিরের সামনে। রাম তো বায়না ধরল প্রথম রাত্রিতে সে অভিনয় দেখবে। কোনোরকমে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাত্রিশেষে সত্যভামা নাতিকে নিয়ে গেল গানের আসরে। রামকে কোলে নিয়ে আসরের কাছাকাছি একটা বালির টিলার উপর দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখানো হল। সেদিন যেমন ভালো করে অভিনয় দেখতে পেয়েছে, এমন আর আর কোনো দিন পারে নি। ঠাকুরমার কোলে বসেই ঢোলের তালে তালে রামের পা নেচে ওঠে। নাতির এই উৎসাহ দেখে সত্যভামাও বোধ করি উৎসাহ বোধ করছিল।

যাত্রাগান থেকে ফেরার সময়ে সত্যভামা হাত বুলিয়ে দেখে শিশিরকণায় রামের সারা মাথা ভিজে গেছে। ভারি ভয় হল সত্যভামার রামের যদি ঠাণ্ডা লেগে থাকে। অনিবার্যভাবে তার মনে জেগে উঠল বহু পুরোনো দিনের একটি ঘটনা। তখন কোথায় রাম, কোথায় নাগবেণী ? লচ্চ তখন কচি খোকা মাত্র। সেদিন পার্বতী লচ্চকে নিয়ে যায় কলাই ক্ষেতে। ফিরে এসে লচ্চ জ্বরে শয্যাগত হওয়ায় সত্যভামা অনেক কটু কথা বলে সপত্নী পার্বতীকে কাঁদিয়েছিল। সেই সব কথা মনে পড়ল সত্যভামার। সেদিনকার প্রতিটি কথা ভাবতে ভাবতে সে যখন রামকে নিয়ে বাড়ি এসে পৌঁছল, তখন তার চোখ দুটি জলে ভরে

গেছে। রাম যে তার কাঁধের উপর ঘুমিয়ে পড়েছে সে খেয়াল নেই। ঘরের দুয়ারে পা দেওয়ার সময়ে সত্যভামার মুখখানি ভয়ে ও গ্লানিতে এতটুকু হয়ে গেছে। নাগবেণী বলল, 'মা, রাম কি ঘুমিয়ে পড়েছে? পালা দেখেছে তো? পালা বলতে পাগল ছেলেটা।' অপরাধিনীর মতো সত্যভামা বলল, 'বৌমা, তুমি কী ভাববে জানি না। বাছা আমার হিমে ভিজে গেছে। কোথায় যে ছিল আমার বুদ্ধি-সুদ্ধি?' 'খানিকটা হিম লেগেছে তো হয়েছে কী? তার জন্য আপনি কেন এত সঙ্কুচিত হচ্ছেন, মা?' এই বলে নাগবেণী রামকে কোলে নিল। সত্যভামা বলল, 'না বৌমা, যদি ওর জ্বর-টর হয়?' নাগবেণী বলল, 'জ্বর হবে না, কিছুই হবে না।' সত্যভামা তখন পুরোনো দিনের সেই কাহিনী নাগবেণীর কাছে বলল। শুনে নাগবেণী বলল 'মা, বড়মা ও পিসিমা এঁরা দুজন যেন যমজের মতো জন্মেছিলেন। দেবতারাও বোধ করি অমন হতে পারে না।'

নাগবেণী রামকে বিছানায় শুইয়ে দিলে শাশুড়ি ও পুত্রবধূ মিলে ঘর-গৃহস্থালীর কাজে লেগে গেল। যার যার কাজে ব্যস্ত থাকায় দুজনের কারো খেয়াল হল না ছেলেটাকে জাগাতে হবে। গোয়ালঘরের কাজ সেরে নিয়ে নাগবেণী স্নান করে এল। রান্নাঘরে যাওয়ার আগে নিদ্রিত রামের গায়ে একবার হাত বুলোতে গেল। কপালে হাত দিয়ে দেখল, একটু যেন গরম-গরম লাগছে। 'দূর! গরম কোথায়? আমার যত পাগলামি।' এই বলে গায়ে হাত দিতে গাটাও গরম বোধ হল। কিন্তু নাগবেণীর তবু বিশ্বাস হচ্ছে না। শাশুড়ি যে পুরানো দিনের গল্পটা বলেছে তাতেই বোধ করি নাগবেণীর মনে ভ্রম হয়ে থাকবে। সে রান্নাঘরে উনুন ধরিয়ে ভাতের জন্য গরম জল চাপিয়ে দিল। মনে মনে বলল, 'খোকার গায়ে হয়ত কোনো হাওয়া-টাওয়া লেগে থাকবে। আচ্ছা এমনও তো হতে পারে কেউ দৃষ্টি-টিষ্টি দিয়েছে?' এইরূপ সন্দেহ হওয়ায় নাগবেণী উনুনের আগুনে একটা হাতা ঢুকিয়ে দিলে সেটা যখন গরম হয়ে গেল, তখন রামের মুখের কাছে এনে গরম হাতাটা জলের মধ্যে ডুবিয়ে দিল। গরম ভাপের আওয়াজে রাম চোখ মেলে তাকাল। জিজ্ঞাসা করল, 'কী করছ, মা?' মা বলল, 'দৃষ্টি ছাড়াই বাবা।'

'দৃষ্টি কী মা?'

'পরে বলব বাবা। তোমার জ্বর হয়েছে, ঘুমোও।'

এই বলে নাগবেণী রান্নাঘর থেকে লবণ-মরিচ এনে ছেলের মুখের চারিদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে উনুনে ফেলে দিল। গরম জলে চাল ছেড়ে দিয়ে নাগবেণী রান্নাঘর থেকে চুপি চুপি উপাধ্যায়ের বাড়ি গেল সম্বার লতা আনতে। সম্বার লতার রস দিয়ে ছেলের চিকিৎসা করতে হবে।

নাগবেণী চলে গেলে রাম ঘুম থেকে উঠে চোখ খুলে তাকিয়ে 'মা' 'মা' বলে ডাকল। কেউ সাড়া দিল না। আবার ডাকল, 'মা'। রামের খিদেও পেয়েছে খুব। সত্যভামা খোকার কান্না শুনে দৌড়ে এল। নাতির মুখের দিকে তাকাতেই ঠাকুরমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। কাছে গিয়ে শিশুর গায়ে হাত দিয়েই হাতটা ঝট করে পিছনে সরে এল। 'যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই হল।' রাম বলল, 'ঠাকুমা, মা কোথায়? আমার যে খিদে পেয়েছে।' সত্যভামা নাতিকে কোলে নিয়ে রান্নাঘরে এসে দেখে হাঁড়ির জল টগবগ করে ফুটছে আর চালের দানাগুলি সেই গরম জলে সিদ্ধ হয়ে উথল পুথল করছে। 'এই তো ভাত হয়ে গেল খোকামণি, ভাতটা হয়ে গেলেই তোমাকে একটু কাঞ্জি দেব 'খন।' এই বলে সত্যভামা নাতিকে আশ্বাস দিলেও সে নিজে কিন্তু খোকামণির জ্বর দেখে ঘাবড়ে গিয়ে সমানে কাঁদতে লাগল। রাম শুকনো মুখে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কাঁদছ কেন ঠাকুমা?' এমন সময়ে সম্বার পাতা হাতে নিয়ে নাগবেণী এসে উপস্থিত। শাশুড়িকে কাঁদতে দেখে নাগবেণী বলল, 'আপনি পাগল হলেন, মা? খোকার গা যদি একটু গরমই হয়ে থাকে তাতে কী হবে? আমি ওর 'দৃষ্টি' ছাড়িয়েছি। তাছাড়া, এই দেখুন উপাধ্যায় গিন্নির ওখান থেকে সম্বার লতার পাতা নিয়ে এসেছি। সিদ্ধ করে খানিকটা রস কপালে লেপে দিলেই ওর জ্বরটা ছেড়ে যাবে।' রাম জিজ্ঞাসা করল, 'মা, ঠাকুমা কাঁদছে কেন?' নাগবেণী উত্তর দিল, 'কী একটা ময়লা পড়েছে চোখে, তাই কাঁদছে।' তারপর শাশুড়িকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনি তো রামের চেয়েও অস্থির হয়ে পড়েছেন।' সত্যভামা বলল, 'না মা, আমার পুরানো পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে।' পার্বতীর প্রতি রূঢ় আচরণের কথা সত্যভামা কিছুতেই ভুলতে পারে না।

নাগবেণী রামকে নিয়ে উনুনের কাছে বসিয়ে বলল, 'এই তো ফেনা ভাত হয়ে গেল বাবা। ঠাণ্ডা করে তোমায় খাইয়ে দেব।' আহারের শুধু ফেনাভাত আর লবণ। আচার ফুরিয়ে গেছে। বাড়িতে দুধ মাঠার নাম

গন্ধও নেই। তাই শুধু মিষ্টি কথা দিয়ে ছেলের খাদ্যকে সুস্বাদু করে তুলতে হয়। খাওয়া শেষ হতে রাম বলল, 'মা তোমার কোলে শোব। মায়ের কোলে শুয়ে যাত্রাদলের কথা মনে হতে রাম বলল, 'মা, কাল ভীম যে এত-গুলি মুড়ি চিবিয়ে খেল, আমাকে একটুও দেয় নি।' নাগবেণী বলল, 'আর ৭।৮ দিন পরেই তো সালিগ্রামের রথযাত্রা আসছে, সেখান থেকে আমি তোমার জন্য মুড়ি কিনে আনব।' মায়ে ছেলে এই ভাবে কিছুক্ষণ কথা বলার পরে ছেলে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লে নাগবেণী রামকে নিয়ে বিছানার উপর শুইয়ে দিয়ে গায়ে একটা শাড়ি জড়িয়ে দিল।

ভাত তো হয়ে গেছে। এখন ব্যানোন কী হবে? ঘরে তো কোনো তরিতরকারিই দেখা যাচ্ছে না। খানিকটা তেঁতুলজল কচলে নিয়ে জ্বাল দিয়ে তাতে লবণ-মরিচ মিশিয়ে দিয়ে নাগবেণী শাশুড়িকে বলল 'মা, চান হয়েছে আপনার?' সত্যভামা ইতিপূর্বে চোখের জলেই একবার স্নান করে নিয়েছে। পুকুর থেকে চানটা সেরে এলে শাশুড়ি-পুত্রবধূ দুজনেই একসঙ্গে খেতে বসল। নাগবেণী দেখছে শাশুড়ির গলা দিয়ে ভাতের গ্রাস নামছে না। তিনি যেন জোর করে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছেন। নাগবেণী একটু রূঢ়ভাবেই বলল, 'আচ্ছা মা, আপনি কি পাগল হলেন? আমার ছেলের কিছুই হবে না। পিসিমা ওকে মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে গেছেন। তাঁর পুণ্যের জোরে রামের কোনো অনিষ্ট হবে না বলছি। আপনি একটু সুস্থ হয়ে খান তো দেখি।'

আহার শেষ করে সত্যভামা সেই যে রামের বিছানায় গিয়ে বসল, সারাটা দিন আর সেখান থেকে নড়ল না। সন্ধ্যার দিকে ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেলে সত্যভামার মুখ থেকে আপনা থেকেই বেরিয়ে এল, 'ঠাকুর!'

আগামী সোমবারেই সালিগ্রামের উৎসব। সালিগ্রামের নরসিংহ ঠাকুর ঐতালের কুলদেবতা। সেই কুলদেবতার মন্দির নাগবেণী একবার দেখতে গিয়েছিল তার স্বামীর সঙ্গে। সেই কথা মনে পড়ল তার। খোকার ইচ্ছা হয়েছে সে মুড়ি খাবে। নাগবেণী ইচ্ছা হল খোকাকে সঙ্গে নিয়ে মেলা থেকে মুড়ি কিনে দেবে। কিন্তু মেলা কি এমনি-এমনি হয়? পয়সা লাগে না? অন্তত এক আনা নগদ পয়সা চাই। নারকেল ফল বাড়ি থেকে নিয়ে গেলেও পাকা কলার জন্য এক পয়সা, দেবতার মন্দিরে এক পয়সার ভেট আর মুড়ির জন্য দু' পয়সা, সব নিয়ে মোট চার পয়সার প্রয়োজন। কোথা থেকে আসবে,

চারটে পয়সা? নাগবেণী শাশুড়ির কাছে কথাটা বলতে সত্যভামা উত্তর দিল, 'আমিও খোকার জ্বরের সময়ে নারকেল-কলা মানত করেছিলাম। ঠাকুর জ্বরটা ভালো করে দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। আমিও রথে যাব। না হয় একসের চাল বেচে রথের খরচা জোগাড় করব।'

রথের দিন দলে দলে লোক সালিগ্রামের দিকে রওনা হল। রামকে সঙ্গে নিয়ে নাগবেণী ও সত্যভামা ভোরবেলাতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল। রামের পরনে একখানা পুরোনো ছেঁড়া ধুতি। মেলায় গিয়ে পৌছতে দূর থেকে নাগবেণী নারায়ণকাকাকে দেখতে পেয়ে সত্যভামাকে বলল, 'মা, এদিকে না গিয়ে চলুন ওদিক দিয়ে যাই।' এই বলে নাগবেণী লোকের ভীড়ের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। বিমূঢ় সত্যভামা নাগবেণীর আচরণের তাৎপর্য বুঝতে না পেরে রামকে নিয়ে ভীড়ের মধ্যে প্রবেশ করল। দেবতার গর্ভগৃহ প্রদক্ষিণ করে আসার সময়ে নারকেল ভেঙে অর্ঘ্য দিতে হয়। নাগবেণী ও সত্যভামা যেখানে দাঁড়িয়ে অর্ঘ্য দিচ্ছে, নারায়ণকাকাও সেখানে এসে ডাক দিল, 'নাগবেণী!' এই এক বছরের মধ্যে নাগবেণী শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গেছে। মেলার দিনে সকলেই যখন নতুন জামাকাপড় পরে এসেছে, তখন নাগবেণীর পরনে একখানি রং-ওঠা পুরোনো শাড়ি, তার ছেলের পরনে ছেঁড়া ধুতি।

নারায়ণকাকার ডাক শুনে নাগবেণী আর এড়াতে পারল না। দারিদ্র্যের লজ্জায় তার মুখ ছেয়ে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নারায়ণ 'এসো দাদু, তোমায় মেলা দেখাব' এই বলে রামকে কোলে তুলে বাইরে এসে একটা জামা-কাপড়ের দোকানে গেল এবং একটি রঙিন জামা কিনে রামের গায়ে পরিয়ে দিল। রাম জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কি আমার?' 'হ্যাঁ দাদু তোমার।' 'ওই ধুতিটা আমার দাও' এই বলে রাম নারায়ণের হাতে-ধরা নিজের ছেঁড়া ধুতিখানি টেনে নিল। তারপর এক মিঠাইয়ের দোকানে গিয়ে নারায়ণ এক আনার চিনির খেলনা কিনে রামের হাতে দিলে রাম দাদুর মুখ ধরে বলল, 'তুমি খুব ভালো না?' লজ্জা পেয়ে নারায়ণ বলল, 'আমি আর কি ভালো দাদু?' এই বলে রামের নতুন জামার পকেটে একটি আনি দিয়ে পুনরায় তাকে মায়ের কাছে এনে ছেড়ে দিল।

নারায়ণকাকা বলল, 'নাগবেণী, তোরা সকলে আমার সঙ্গে ঐরোভিত্তে

চল্। ওখান থেকে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি যাবি।' নাগবেণী এই দরিদ্র বেশে কাকার বাড়িতে গিয়ে আত্মীয়-স্বজনের করুণার পাত্রী হতে চাইল না। বলল, 'কাকা, বাড়িতে গোরু বাছুর রয়েছে যে।' সত্যভামা বলল, 'বেশ ত মা, আমি গিয়ে গোরু বাছুর দেখব। তুমি খোকাকে নিয়ে ঐরোডি ঘুরে এসো।' শাশুড়ির কথায় নাগবেণীর আর 'না' বলার উপায় রইল না। মনে মনে বলল, 'আমার দরকার নেই। তবে কাকার আগ্রহে আজকের এই উৎসবের দিনও যদি রামের ভাগ্যে একটু পায়েস খাওয়া জোটে, আমি কেন তাকে বঞ্চিত করি?' এই ভেবে নাগবেণী ঐরোডি যেতে রাজী হল। তখন নারায়ণয্য সত্যভামাকে লক্ষ্য করে বলল, 'আপনিও এলে পারতেন।' সত্যভামা বলল, 'গোরুবাছুর গোয়ালঘরে বেঁধে কেবল এক আঁটি খড় দিয়ে এসেছি। না খেয়ে থাকবে তাহলে।'

নিরুপায় হয়ে নারায়ণকাকা নাগবেণী ও রামকে নিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হল। পথে একসময়ে নাগবেণী রামকে কোল থেকে নামিয়ে দিলে নারায়ণ বলল, 'তুই একা আর কতক্ষণ কোলে নিবি? এখন আমি নিচ্ছি।' নাগবেণী বলল, 'না কাকা, ও এখন চেম্পু পর্যন্ত হেঁটে চলুক।' নারায়ণকাকা হেসে বলল, 'এই শিশু যাবে হেঁটে? আমাদের কি বাড়ি পৌঁছতে হবে না?' সূর্য মাথায় চড়বার আগেই সকলে ঐরোডি পৌঁছে গেল। সরস্বতীর কাশী থেকে ফেরার দিন সেই যে নাগবেণী গিয়েছিল কাকার বাড়িতে, তার পরে আর আসেনি। বাড়ির সকলে নাগবেণীর চেহারা দেখে অবাক হল। তাকে চেনাই মুশকিল। কাকার ওখানে নাগবেণীর আদর আপ্যায়নের কোনো অভাব হল না। প্রত্যেকেই রামের সঙ্গে সস্নেহে কথাবার্তা বলল। দুপুরে খাওয়ার সময়ে যখন পাতে পায়েস পড়ল, রাম খেতে খেতে মায়ের কানে কানে বলল, 'মা, আমাদের বাড়িতে তুমি এই খাবার করো না কেন?' 'করব বাছা', এই কথা বলতে গিয়ে নাগবেণীর এক ফোঁটা চোখের জল পায়েসের সঙ্গে মিশে গেল। তাড়াতাড়ি সে উপচে-আসা অশ্রু আঁচল দিয়ে মুছে ফেলল।

সেদিন অপরাহ্ণে কাকার বাড়ির সকলে রথের মেলায় যাবে বলে স্থির করেছিল। কাকিমা বলল, 'নাগু, আজ এখানেই থাক্ না। তুই থাকলে আমরা আর রথের মেলায় যাব না।' নাগবেণী বলল, 'না কাকিমা, শাশুড়ি একা একা বাড়িতে থাকবেন।' নারায়ণকাকার স্ত্রী স্বভাবতই মুখরা ও রুক্ষ-

জাখিণী। তবু নাগবেণীকে দেখে আজ সত্যই তার বুকটা কেমন করে উঠল। 'তুই বড় জেদী মেয়ে। তোকে বলে কোনো লাভ নেই। আচ্ছা, তুই না থাকিস, ছেলেটাকে দিন কয়েক রাখবি এখানে?' নাগবেণী উত্তর দিল, 'রাম ছাড়া আমার আর কে আছে কাকিমা?'

অতঃপর নাগবেণী পুত্রের হাত ধবে কোড়ির পথে রওনা হল। নারায়ণ কাকা নদীতীর পর্যন্ত এসে ওদের পার করিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে গেল। সেদিন সে বাড়িতে সকলের মুখেই কেবল নাগবেণীর কথা।

অপরাহ্নে রাম উঠোনে বসে খেলা করছিল। হঠাৎ তার মেলার কথা মনে হওয়াতে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, মেলায় কি মুড়ি উঠেছিল?' নাগবেণী যে মুড়ির কথা ভুলে গিয়েছিল তা নয়। তবে কাকার সামনে সে আর দু'পয়সা মুড়ি কেনার কথা তুলতে পারে নি। রামের প্রশ্নে তখন তার মুখখানি মলিন হয়ে গেল। বলল, 'আমার পোড়া মনে আগুন লেগেছিল।' সত্যভামা মুড়ির কথা ভোলে নি। নাগবেণীদের ঐরোড়ি রওনা হওয়ার পরে সে মুড়ি কিনে ছিল। বলল, 'আমি কিনে এনেছি নাগু।' এই বলে একমুঠো মুড়ি মেঝেটা ঝেড়ে পরিষ্কার করে রামের সামনে রাখল। বলল, 'আরও আছে দাদুমণি। কালকের জন্য রেখে দিলুম, কেমন?' রাম বলল, আচ্ছা।' এক একটি করে দানা তুলে তুলে রাম সেই মুড়ি খেতে লাগল। খাওয়া শেষ হলে রোজকার মতো আজও সে বড়দের সঙ্গে গোয়ালঘর, পুকুর ইত্যাদি ঘুরে বেড়াল।

রাতে ঘুমোবার আগে নাগবেণী বলল, 'রাম, তোমার নতুন জামাটা গা থেকে খুলে দেব?' রাম উত্তর দিল, 'থাক্ মা. খুলো না। ওটা সুন্দর।' রাতে যখনই নাগবেণী ছেলের গায়ে হাত বুলোতে চাইল, ওই জামাটায় এসে হাত লাগছিল। জামাটা যেন বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে নাগবেণীদের দুর্দশার কথা। সেই স্মরণের ফাঁকে ফাঁকে একথাটাও মনে না জেগে পারল না যে সে একবার গর্ভবতী অবস্থায় তার স্বামীর সঙ্গে সালিগ্রামে রথের মেলা দেখতে গিয়েছিল।

কয়েক দিন ধরে সারা গ্রামে কেবল মেলার কথা। মেলা শেষ হলেও তার গল্প শেষ হয় না। মেলার গল্প শেষ শেষ হতে-না-হতেই সারাগ্রাম জুড়ে একটা দুঃসংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। কী যেন একটা অদ্ভুত জ্বর কোথা থেকে কী ভাবে এসে বাড়ির পর বাড়ি, গ্রামকে-গ্রাম উজাড় করে দিচ্ছে। কোড়ি, ঐরোড়ি,

মুনূক্, উডুপি, তাদের চেনা-শোনা সমস্ত অঞ্চল থেকে কেবল একটি সংবাদ, ভয়ংকর সংবাদ এসে পৌঁছতে থাকে। নাগবেণী শুনে বলে, 'মা কী ব্যাপার ?' সত্যভামা বলে, 'কী ব্যাপার সুরো ?' সুরো বলে, 'তাই তো মাঠাকুরুন, কী ব্যাপার বলুনত।' এইভাবে সকলেই পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করে। কী রকম জ্বর, কী রকম ব্যাধি কেউ কিছু বলতে পারে না।

দুটো দিনও পার হয়নি, এরই মধ্যে খবর এসেছে সুরো শয্যাগত। সকালবেলা পুকুরে এসেছিল সুরোর বড় ছেলের বৌ। তার কাছ থেকেই খবরটা পাওয়া গেল। অপরাহ্ণেই শোনা গেল সেই বধূটিও শয্যা নিয়েছে। পরদিন শোনা গেল সুরোর বাড়িতে সকলেরই নাকি জ্বর। সত্যভামা ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে পারল না। প্রকৃত ঘটনা জানবার জন্য সে যখন সুরোর বাড়িতে উপস্থিত হল, তখন, সুরোর শ্মশান যাত্রা শুরু হয়েছে। সকলে বলাবলি করছে বড় ছেলের বৌটিরও বাঁচবার আশা নেই। ভয়াকুল সত্যভামা দ্রুত বাড়ি ছুটে এল। এ কেমন জ্বর বাবা ? সান্নিপাতিক জ্বরেও মানুষ পনেরো দিন থাকে। এ যে আজ জ্বর হয়ে কালই সব শেষ।

পরদিন ভোরবেলায় সত্যভামার সারা শরীর জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। নাগবেণী মরীয়া হয়ে খিড়কীর বাগান থেকে কী একটা পাতা এনে সিদ্ধ করে পাচন তৈরি করল। তার পরে সে বেরিয়ে পড়ল ওষুধের জন্য। উপাধ্যায় বাড়ির নিকটবর্তী বালিয়াড়িতে পা দিতেই সেদিক থেকে কান্নার রোল শোনা গেল। নাগবেণী তাড়াতাড়ি সেখান থেকে পিছন ফিরে দ্রুতপদে এল ময়্যদের বাড়ি। বারান্দায় বসে ছিলেন নরসিংহের বৃদ্ধা মা। তাঁর সামনে পর পর কয়েকখানা বিছানা পাতা। নাগবেণীকে দেখে বৃদ্ধা হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। নাগবেণী জিজ্ঞাসা করল, 'কী হবে মাসিমা ?' বৃদ্ধা উত্তর দিলেন, 'ভগবান জানেন।'

কাঁদতে কাঁদতে নাগবেণী বাড়ি ফিরে এল। সেদিন সন্ধ্যায় রাম জ্বরে পড়ল। দু'দিকে দু'খানি বিছানার মধ্যে বসে নাগবেণী ভাবছে, 'ভগবান, একী হল ?' ঘরে পাচন তৈরি ছিল। এই পাচনের বলেই রোগ ভাল হয়ে যাবে বিশ্বাস করে নাগবেণী একবার শাশুড়িকে একবার ছেলের মুখে পাচন দেবার চেষ্টা করছিল। রাত্রিতে রোগীর শিয়রে জেগে বসে থাকতে থাকতে বোধ হল তার শরীরটাও যেন গরম গরম লাগছে। তাড়াতাড়ি সে নিজেও

খানিকটা পাচন খেয়ে নিল। রাত্রি শেষে যখন ভোরের আলো ফুটে উঠল, তখন আর কারও কথা বলার শক্তি নেই। জ্বরের ঘোরে সকলেই বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে।

দিনগুলি যে কিভাবে কেটে গেল সেকথা শয্যাগত রোগীদের বোঝার ক্ষমতা রইল না। প্রকৃতপক্ষে নাগবেণীর জ্ঞান ফিরে এল দু দিন পরে। জ্ঞান ফিরে এল বটে, কিন্তু কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাব। বাড়ির কথা, ছেলের কথা এমন কি নিজের কথাও সে মনে করতে পারে না। একবার খেয়াল হল কে যেন চামচ দিয়ে তার মুখে কাঞ্জি ঢেলে দিচ্ছে। তৃতীয় দিনে তার হুঁস হল। শরীরটা যেন আর নিজের শরীর বলে বোধ হচ্ছে না। চতুর্থ দিনে জ্বরটা নামতে সে চোখ মেলে তাকাল। দেখল নারায়ণ কাকা চামচ দিয়ে তার মুখে কাঞ্জি ঢেলে দিচ্ছে। জিজ্ঞাসা করল, 'কাকা, আমি কোথায় আছি?'

'তোমাদেরই বাড়িতে মা।'

'কে আপনাকে খবর পাঠাল কাকা?'

'কেউ না। আমিই বিপদ আশঙ্কা করে চলে এলাম।'

নাগবেণীর মনে পড়ল সে নিজে শয্যাগত হওয়ার আগে একদিন ভয় পেয়ে ওষুধের জন্য এবাড়ি সেবাড়ি গিয়েছিল। তখন তার কারণটাও মনের মধ্যে জেগে উঠল আর মনে পড়ে গেল শাশুড়ি ও রামের কথা। 'খোকা! মা!' এই বলে নাগবেণী পাশ ফেরার চেষ্টা করল। মনে আছে ছেলে ও শাশুড়ির কাছেই সে শুয়ে পড়েছিল। কিন্তু সেখানে এখন কেউ নেই দেখে নাগবেণী চিৎকার করে উঠল। নারায়ণকাকা বলল, 'ভয় পেয়ো না মা। দাদুমণি আমার বাড়িতেই আছে। সুস্থ আছে।' 'শাশুড়িঠাকরুন?' নারায়ণকাকা চুপ করে রইল। 'শাশুড়ির কী হল বলুন। কে নিয়ে গেল তাকে?' 'ভগবান।' শুনে নাগবেণী বেহুঁস হয়ে পড়ল। পুনরায় হুঁস আসার পরে তার কান্না আর থামে না। নারায়ণকাকা অনেক সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'এমন করে কাঁদলে কী লাভ হবে? তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। আর না, সুস্থ হয়ে ঘুমোও। যারা চলে যায়, আর কি তারা ফিরে আসে?'

নাগবেণীর মনে আর এক আশঙ্কা। তবে কি রামও চলে গেছে? 'কাকা, আমার রামও নেই। মিথ্যা বলছেন আপনি। সেও মরে গেছে, ওই সুরোর বাড়ির লোকেদের মতো।' কাকা বলল, 'না রে নাগু, তোর ছেলে বেঁচে আছে।

আমি তাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে গেছি। এখানে তো দেখবার কেউ ছিল না। কালই ওর জ্বরটা ছেড়েছে।' 'আপনি মিথ্যা বলছেন কাকা, আমাকে সকলেই ছেড়ে গেল। আপনি এসে একা আমাকে কেন বাঁচালেন?' এই বলে নাগবেণী কাঁদতে লাগল। নারায়ণকাকা বলল, 'শোন্ মা, আমি শপথ করে বলছি, তোর ছেলে বেঁচে আছে। কাল তোর ছেলেকে নিয়ে এলে পরে দেখতে পাবি। এখন ঘুমো।' নাগবেণী পুনরায় 'মা' বলে কেঁদে উঠল। শাশুড়ি ও সন্তানের চিন্তায় আবার সে অসুস্থ হল। যে জ্বর একবার ভাল হয়ে গিয়েছিল, আবার সেই জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আরও চার পাঁচ দিন বেহুঁস হয়ে পড়ে রইল। সুস্থ হওয়ার পরে কাকাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কাকা, গ্রামের আর সকলের খবর কী? এই রোগ কি কেবল এই কোডিগ্রামেই? সুব্বির বাড়ির খবর জানেন?' 'কে খবর দেবে বলো।' 'আপনাদের ওখানে সব ভালো তো? 'যেদিন তোমার শাশুড়ি চলে গেলেন, তোমার কাকিমাও সেদিন গেলেন।'

পাঁচ ছ দিন পরে নাগবেণীর জ্বর সম্পূর্ণ ছেড়ে গেল। ছেলেকে না দেখে সে খুব অস্থির হয়ে পড়েছে বলে নারায়ণকাকা রামকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। রোগক্লিষ্ট শীর্ণ দুই মাতা পুত্রের সাক্ষাৎ করুণ ও মর্মস্পর্শী। ছেলের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে নাগবেণী বলল, 'কাকা, শাশুড়ি ঠাকরুনের শ্রাদ্ধ শান্তি হবে না?' নারায়ণকাকা, 'হওয়া তো উচিত। কিন্তু লচ্চ কোথায় আছে সেটা আগে জানা দরকার।' এই বলে সে নিরুপায় হয়ে শীনময়্যর বাড়িতে গেল। ময়্যদের বাড়িতে অশৌচের পালা। শীনময়্যর বিধবা স্ত্রীসহ আরও দু তিনজন বিদায় নিয়েছে। খবর পেয়ে বেংগলুর থেকে ছুটে এসেছে নরসিংহ। বেংগলুর শহরেও নাকি এই রোগের খুব প্রাদুর্ভাব। সে সব কথা বলে নরসিংহ তার ব্যক্তিগত শোকের কথা শোনাল। নারায়ণয়্য তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'ভাই, তুমি তো বলছ সাড়া দেশ জুড়ে এই বিপদ এসেছে। কাঁদলে কী হবে? আর কার জন্য কে কাঁদবে? আমার বাড়িতেও বিপদ ঘটে গেছে। এক এক অঞ্চলে নাকি এমন ভাবে বাড়ির পর বাড়ি উজোড় হয়ে গেছে যে মৃতদেহ তোলার মতো লোকও সেখানে নেই।' অন্যান্য কথাবার্তার পরে নারায়ণয়্য বলল, 'শুনেছ বোধ হয়, আমাদের নাগবেণীর শাশুড়িও মারা গেছেন। তুমি তো তোমার মায়ের জ্বরের কথা শুনেই বাড়িতে এসেছ। কিন্তু আমাদের জামাইকে যে খবর দেব, তা সে কোথায় আছে কিছুই জানিনা। মৃতব্যক্তি আর ফিরে

আসবে না ঠিকই। কিন্তু তাকে তো একটা পিণ্ড দেওয়া দরকার। ছেলে থাকতে সে কাজ আর কে করবে?' নরসিংহ বলল, 'লচ্চ আমার ছোট ভাইটার সঙ্গে মৈসূরে রয়েছে। টাকা পয়সা যেমন হাতে আসে, পাশা জুয়া এবং আনুষঙ্গিক ব্যাপারে খরচ করে ফেলে। মনে হয় না যে এরকম করে বেশি দিন চলবে।'

লচ্চর ঠিকানা নিয়ে নারায়ণয়্য নাগবেণীর বাড়িতে ফিরে এসে বলল, 'জামাইয়ের মৈসূরের ঠিকানাটা পাওয়া গেল। তাকে একটা টেলিগ্রাম করে দেখি। জানিয়ে দিই সে যদি আসতে চায় তবে যেন অবিলম্বে জানায়। এলে ভাল, না এলে অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। আর একটা কথা বলছি নাগু। আমাদের বাড়িতেও রোগের উপদ্রব হয়ে গেছে। তোমাদের এটা অশৌচের বাড়ি, ওটাও অশৌচের বাড়ি। কিন্তু আমাদের ওখানে রান্না বান্না করার মতো দু একজন শক্ত সমর্থ লোক আছে। আমার তো এখানে বসে থাকলে কাজ হবে না। তাই বলেছিলাম কি চল আমাদের বাড়ি। তোর কাকিমার শ্রাদ্ধশান্তি হয়ে গেলে তুই না-হয় ফিরে আসবি। আর লচ্চ যদি ইতিমধ্যে এসে পৌঁছয় তো চলে আসিস।'

নাগবেণী বলল, 'কাকা, আমার তো হাত পা নাড়বার মতো একটু বল হয়েছে। এখন রান্না করতে পারব। আপনি আসুন গে, আমার জন্য চিন্তা করবেন না।' নারায়ণয়্য রুষ্ট হয়ে বলল, 'মা, সব সময়ে জেদ করা ভালো নয়। তোমার যারা গুরুজন, তাদের কথার মর্যাদা দিও।' কাকার মনে ব্যথা লেগেছে বুঝে নাগবেণী বলল, 'আমি যাব কাকা। রোদটা একটু পড়ে এলে রওনা হব। কিন্তু কাকা, একটা কথা একেবারেই ভুলে গেছি। আমি চলে গেলে গোরু বাছুরকে কে খেতে দেবে?' কাকা বলল, 'তোদের গোরু বাছুর আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। সেখানে চড়াবার মতো লোক আছে। এ গাঁয়ের গোরুবাছুর তো লোকের অভাবে যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।' সেদিন অপরাহ্ণে রোদ পড়ে আসতেই নারায়ণকাকা ও নাগবেণী ঐরোডি রওনা হল। কাকার কোলে নাগবেণীর ছেলে। পথের মাঝে নাগবেণীকে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করতে দেখে নারায়ণকাকা বলল, 'ছাখ, তুই বলেছিলি তুই রান্না করতে পারবি? মিছিমিছি কষ্ট পাওয়া একটা মজার খেলা বুঝি?' নদী পার হওয়ার সময়ে রাম তার মাকে বলল, 'আমি বড় হই, তারপরে তোমাকে কোলে করে

নেব, কেমন ?' পুত্রের কথায় নাগবেণীর হাসি পেল। বলল, 'আচ্ছা খোকা বড় হলে তুমি আমায় কোলে করে পার করবে।' পুত্রের এক একটি কথা শুনে দীন দরিদ্র নাগবেণীর মনের অন্ধকার দূর হয়ে যায়। এক মুহূর্তের জন্য হলেও আশার আলো ফুটে ওঠে। নদী পার হতে হতে রাম আবার বলল, 'মা, ঠাকুমাকে রেখে এলাম। সে আসবে না ?'

'ঠাকুমা তোমার কোথা থেকে আসবে ?'

'কেন, ঠাকুমা কি সালিগ্রামে রথের মেলায় গেছে ?'

'ওকথা এখন থাক, বাবা। তুমি বুঝতে পারবে না। আমি যদি বলি যে তিনি মরে গেছেন, তবে কি তুমি বুঝতে পারবে ?'

'বড় হলে আমি বুঝতে পারব। সেদিন বট্‌ঠাকুরমা যেমন ঘুমিয়েছিল, তেমন করে ঘুমিয়ে'ছ না মা ?'

'হ্যাঁ বাবা।'

রামের কথায় নারায়ণয়্যের অন্তর যেন সূচীবিদ্ধ হচ্ছিল। 'দাদু, আর কথা বলো না। বেশি কথা বললে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। চুপ করে আমার কাঁধের উপর শুয়ে থাকো।' দাদুর কথায় রাম চুপ করল। খুব ধীরে ধীরে পথ চলে তারা যখন ঐরোডি এসে পৌঁছল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। নাগবেণীর মনে হল যেন এক অরণ্য থেকে আর এক অরণ্যে এসে পড়েছে। বাড়িতে একমাত্র পুরুষ তার কাকা, হাত পা শক্ত করে, বুক বেঁধে, নিজের দুঃখের কথা কিছুমাত্র প্রকাশ না করে সকলকে অভয় ও আশ্বাস দিয়ে ফিরছে।

পরদিন হংগারকট্টে বন্দরে গিয়ে নারায়ণকাকা মৈসূরে টেলিগ্রাম করে দিল। লচ্চকে বিশ্বাস নেই বলে টেলিগ্রামে যাতে উত্তর দেয় ডাকঘরে সেই টাকা জমা দিতেও সে ভুল করল না। পর দিন নয়, তার পরের দিন লচ্চর কাছ থেকে উত্তর এল। সেই উত্তরের কথা নাগবেণীকে জানালে সে মনে মনে বলল, 'যাক, মায়ের কথা অন্তত মনে আছে তার। বেঁচে থাকতে শাশুড়ি কত কান্নাকাটি করে বলতেন, 'আমি মরলে পরে কেউ কি আমায় পিণ্ড দেবে না ?' যাক, ভগবান তাঁর মনের কথা শুনেছেন।'

সত্যভামার মৃত্যুর পর নবম দিন সন্ধ্যায় লচ্চ এসে হাজির। তার চেহারায় অশৌচের কোনো লক্ষণ নেই। শহুরে বাবুর মতো ফিট-ফাট পোশাক পরে

মোটর গাড়িতে করে ঐরোভি পৌছান। গাড়ি থেকে নেমে নারায়ণয্যর বাড়িতে এসে উপস্থিত। লচ্চ জানত না যে নাগবেণী ও তার ছেলে সেখানে আছে। বাড়ির ভিতরে খবর গেল যে হ্যাট্‌কোট পরে কে একজন লোক এসেছেন। নারায়ণয্য বাইরে এসে দেখল দাওয়ায় উপবিষ্ট শ্রীমান্ লক্ষ্মীনারায়ণ। জিজ্ঞাসা করল, 'জল-টল কিছু খাবে লচ্চ ?' লচ্চ উত্তর দিল, 'ওসব কিছু দরকার নেই। সামনের ব্যবস্থা কী হবে বলুন। ওখানে এখন কে কে আছে ? নাগবেণী ওরা বেঁচে আছে কি ?'

'বেঁচে আছে। তোমার মা যখন চলে যান তখন তোমার স্ত্রী পুত্র জ্বরে অচৈতন্য। গ্রামের লোক জানতেও পারেনি। আমি যখন গিয়ে পৌছালাম, তখন রাত্রি এক প্রহর। ওই রাতে কী আর করি ? মৃতদেহ আমি একাই বহন করে নিয়ে বাড়ির পিছনে বালিয়াড়িতে দাহ করলাম।'

লচ্চ একটু ক্ষুব্ধ হওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'অসুখের কথা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে লিখে জানালে আমি কি আসতে পারতাম না ?'

নারায়ণয্য বুঝল লচ্চর সঙ্গে এই নিয়ে কোনো কথা বলা বৃথা। অন্য প্রসঙ্গ তুলে বলল, 'তুমি এখন মাতৃশ্রাদ্ধের কথা চিন্তা কর। নাগবেণী খুবই দুর্বল। তার দ্বারা কোনো কাজ সম্ভব নয়। যদি তোমার আপত্তি না থাকে, তবে এখানে সব কাজ করাও।' লচ্চ প্রশ্ন করল, 'নাগবেণী কোথায় ?' নারায়ণ কাকা লচ্চকে নিয়ে ভেতরে গেল। নাগবেণী অধোমুখে এক কোণে বসে ছিল। রাম তখন অন্য ঘরে ঘুমোচ্ছে। লচ্চ কিন্তু নাগবেণীর সঙ্গে কোনো কথা না বলে বাইরে চলে এল। বলল, 'আমি একবার ওরটের বাড়ি ঘুরে আসি। ওখানকার খবর সব জানা যাবে। রাতে আমি এখানেই খেতে আসব।' এই বলে দ্রুতপদে চলে গেল।

নারায়ণয্য ভিতরে গিয়ে বলল, 'আমাদের এখানটা তোর স্বামীর পছন্দ হল না। 'ওরটের বাড়িটা দেখে আসি' এই বলে চলে গেল।' নাগবেণী বলল, 'আপনার কাজ আপনি করেছেন, কাকা। ভগবান যেন ওকে সুবুদ্ধি দেন।'

ঘুম থেকে উঠে রাম মায়ের কাছে এল। নাগবেণীর মনে পড়ে সেদিনের কথা যেদিন খোকার নামকরণ করা হল। নাগবেণী বলল, 'খোকা, তোর বাবা এসেছেন।' রাম জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা ? কে সে মা ?' নাগবেণী উত্তর দিল, 'খোকা তুই যখন ছোট ছিলি তখন তোকে কোলে নিতেন।'

'এখনও কি কোলে নেবে? দরকার নেই, আমাকে কোলে নিতে হবে না। আমি এখন হাঁটতে পারি, না মা?'

'হ্যাঁ বাবা, তুমি এখন খুব বড় হয়েছ।'

'পরে আমার গোঁফ হবে। তখন আমি তোমার মতো বড় হব।' শিশুর কথা শুনে মা খুব খুশি মনে হাসতে লাগল।

লচ্চ বলে গেছে ওরটের বাড়ি থেকে ফিরে সে এখানেই আহার করবে। নারায়ণয়্য অনেক রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করে করে বুঝল সে আর আসছে না। পরদিন ভোরে সেখান থেকে একটি ভৃত্যস্থানীয় লোক এসে খবর দিল যে লচ্চ শ্রাদ্ধের সব বিধি-বিধান নাকি সেখানে বসেই পালন করবে, সেখানে সবরকম সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। নাগবেণী ভাবল শাশুড়ির শ্রাদ্ধের সময়ে তার উপস্থিত থাকা উচিত। কিন্তু 'ওখানে' মানে তাদের নিজের বাড়িতে না ওরটের বাড়িতে? লোকটিকে বলে দেওয়া হল সে যেন এই খবরটা দিয়ে যায়। লচ্চর কাছ থেকে খবর এল, 'কাজকর্ম ওরটদের বাড়িতে বসেই হবে এবং নাগবেণী যখন দুর্বল ও অসুস্থ তখন আর তাকে কষ্ট করে আসতে হবে না।'

খবরগুলোতে নাগবেণী খুবই মর্মাহত হল। ব্যথিত কণ্ঠে কাকাকে বলল, 'শাশুড়ির শ্রাদ্ধ আমি চোখেও দেখতে পারব না?'

নারায়ণকাকা বলল, 'ও যা জানিয়েছে, সেইভাবেই করুক। তার কর্মের পাপপুণ্য তারই।'

যথাসময়ে শ্রাদ্ধ বৈকুণ্ঠ ভোজন প্রভৃতি অনুষ্ঠান খুব ধুমধাম করে সম্পন্ন হল। ব্রাহ্মণগণ হাতভরা দক্ষিণা পেলেন। তেরো দিনের দিন নারায়ণ্যকেও নিমন্ত্রণ জানানো হলে সেদিন সকালেই সে নাগবেণীকে সঙ্গে নিয়ে কোড়িগ্রামে উপস্থিত হল এবং লচ্চর কাছে গিয়ে বলল, 'ব্রাহ্মণভোজনটা অন্তত তোমাদের বাড়িতে করাবার ব্যবস্থা করো। রান্নাটা না হয় তোমার বন্ধুর বাড়িতেই হল।' বাড়ি দুটি কাছাকাছি বলে এরকম ব্যবস্থা করতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু লচ্চ অজুহাতে দেখিয়ে বলল, 'যে বাড়ি বিক্রী হয়ে গেছে, সে বাড়ি আবার আমাদের বাড়ি কী করে হয়?'

নারায়ণয়্য বিরসমুখে ঐরোডি ফিরে যাওয়ার উদ্‌যোগ করল। নাগবেণীও সমস্ত শুনে আর একমুহূর্ত সেখানে থাকতে রাজী হল না। রাম ও কাকাকে নিয়ে নিজেদের বাড়ি এল। রওনা হওয়ার সময়ে নারায়ণকাকা নাগবেণীকে

এই বলে সতর্ক করে দিয়ে গেল, 'মা, ও যদি এখানে আসে সাবধান হয়ে ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলবে।'

পরদিন ভোরবেলায়, লচ্চ নিজেই যে বাড়িটি বিক্রী করে দিয়ে গেছে, সেই বাড়িতে হাজির হয়ে নাগবেণীকে বলল, 'তোমাদের আর এখানে থাকবার প্রয়োজন নেই। আমার সঙ্গে মৈসুরে নিয়ে যাব বলে ভেবে রেখেছি। এখন তোমার কাকার সঙ্গে গিয়ে পরামর্শ করো—তোমার স্বামীর সঙ্গে তুমি যাবে কিনা। তিনি যদি 'আচ্ছা' বলেন তবে চলো আমার সঙ্গে।' এই সহজ কথার মধ্যেও একটা বিদ্রূপের জ্বালা ছিল। নাগবেণীও তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়ে বলল, 'কাকার কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে না বা অন্য কাউকেও জিজ্ঞেস করতে হবে না। আমি ভালোই জানি যার যার মাথা, তার তার হাত।' কাছে দাঁড়িয়ে রাম উপরে চোখ তুলে পিটপিট করে দেখছিল। বলল, 'মা, কে ইনি। আমরা এখানেই থাকব। ওঁর সঙ্গে যাব না।'

আত্মাভিমানে আঘাত খেয়ে লচ্চ জ্বলে উঠল। 'এই ছোঁড়াটাকেও এই সব কথা শিখিয়ে ফেলেছ? বেশ...।' এই বলে আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে গটগট করে সে বেরিয়ে গেল। নাগবেণী কিছুক্ষণ উদ্বিগ্ন মুখে চুপ করে থেকে অকস্মাৎ কী ভেবে গুমরে কেঁদে উঠল।

ত্রিশ

নাগবেণীকে এবার স্থির করতে হবে তার ভবিষ্যতের পথ। এখন তার সংসার বলতে কেবল রাম। লচ্চ ইতিমধ্যে মৈশূর চলে গেছে, যাওয়ার আগে স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করারও প্রয়োজন বোধ করেনি। অবশ্য লচ্চ পীড়াপীড়ি করলেও নাগবেণী তার সঙ্গে যেত না। মন তার একেবারেই ভেঙে গেছে। সেই ভাঙা মন আর জোড়া লাগার নয়। 'আমার উপর স্বামীর স্নেহমমতা নাইবা থাকল। কিন্তু সংসারে কি এমন বাপও আছে যে তার নিজের শিশু পুত্রকে একবার দেখতে চায় না?' এই কথা ভাবতে ভাবতে নাগবেণীর রক্ত গরম হয়ে উঠছিল। পরক্ষণেই তার চিন্তা এল অতঃপর কী করণীয়। শিশু রামকে কোলে নিয়ে জীবন সংগ্রামের পথে সে কি একাকিনী চলতে পারবে? অতবড় বাড়িতে একটা চার বছরের ছেলেকে নিয়ে সে কিভাবে দিন কাটাবে? কৃষিকর্মের দায়িত্ব তার একার পক্ষে বহন করা সম্ভব কি? কিছুকাল আগে পর্যন্ত তার দুঃখকষ্টে ভাগ নেওয়ার মতো দুই বর্ষীয়সী রমণী বেঁচে ছিলেন। পিসিমার মৃত্যুতে বড় আঘাত পেয়েছিল নাগবেণী। সেই আঘাতের বেদনা মিলিয়ে যেতে না যেতেই তার অজ্ঞাতসারেই কবে একদিন শাশুড়িও বিদায় নিলেন। এখন সে যেখানেই যাক—দাওয়া, গোয়ালঘর, পুকুর, বালিয়াড়ি, সমুদ্র সমস্ত দিক থেকে হু-হু-করা হাওয়া যেন উচ্চকণ্ঠে এই প্রশ্নই করছে, 'এই বাড়িতে তুমি একাকিনী একটি শিশুসন্তান নিয়ে জীবন যাপন করবে? কেউ কি তোমার নেই? তোমার চোখের জলে অবোধ শিশুর ক্ষুধা কি মিটবে? কাল তুমি চলে গেলে ওর কী অবস্থা হবে ভেবে দেখেছ?' এই প্রশ্নগুলি মনে হতেই উদ্‌ভ্রান্ত হল নাগবেণীর মন। জোয়ার ভাঁটার সন্ধিক্ষণে নদীর জলের সংঘর্ষণে অবরুদ্ধ জলের পথ যেমন একটা ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি করে কোনো একদিকে বয়ে যায়, নাগবেণীর মনও তেমনি নিরুপায়ের মতো পথ খুঁজে বেড়াচ্ছে। রামের অসহায় করুণ চোখের দিকে তাকিয়ে তার অশ্রু ঝরে। কেবল এই কথাই মনে হয়, ভগবান তাকে কোথায় নিয়ে এলেন? এই কি তার অদৃষ্টলিপি? শেষ পর্যন্ত কি বাবার ওখানে গিয়েই আশ্রয় নিতে হবে? তবে যে সে বড় অহঙ্কার করে শপথ করেছিল যে কারও দানের ভরসায় না থেকে

সে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করবে, সেই অহঙ্কার কোথায় থাকবে? পরাজয় স্বীকার করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা নেই। এখানে থেকে ভাতের ফেন খাইয়ে রামকে বড় করতে চাইলে ভবিষ্যতে সে তে ভিখারিই থেকে যাবে। ওর এক মামা ডাক্তার, এক মামা উকিল, একজন হয়েছে শিক্ষক। কোডি পড়ু করে প্রভৃতি গ্রামের কত ছেলে লেখাপড়া শিখে আজ জীবনের নতুন পথ খুঁজে পেয়েছে, এখন আর তারা 'অবডে' আচার 'পলন্থ' খেয়েই দিন কাটায় না। আর তার নিজের ছেলে রাম? যে শ্বশুরমশাই তার পুত্রের জন্য উচ্চাশা পোষণ করে অবশেষে চরম নৈরাশ্যের মধ্যে সমস্ত সম্পত্তির ভার দিয়ে গেলেন নাগবেণীর হাতে, সেই রাম ঐতালের প্রেতাত্মা এখনও বোধ করি বাড়ির চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাঁকে দাহ করা হয়েছিল বাড়ির পিছন দিকে অবস্থিত হোন্নে গাছের বাগানে। সেখান থেকে তিনি হয়ত দেখবেন তাঁর অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নাতিকে দিয়ে পূর্ণ হয় কিনা।

সত্যভামার শ্রাদ্ধ শান্তির পরে একমাস কেটে গেছে। এই এক মাসের মধ্যে নারায়ণকাকা মাত্র দু'তিন বার এসে জিজ্ঞাসা করে গেছে নাগবেণীর কোনো সাহায্যের দরকার আছে কি না। কিন্তু কাকা কখনও একথা বলেনি 'চল্ নাগবেণী, আমাদের ওখানে চল। এখন আর এখানে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই।' কাকা যে তাকে তার বাড়িতে যাওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায় নি তার কারণ সে তার ভ্রাতুষ্পুত্রীর মনোভাব ভালো করেই জানে। নাগবেণীর অনিচ্ছুক মনের উপর সে তার নিজের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে চায় না। নাগবেণী ভাবছে, 'যার ক্ষুধা নেই, পায়েস রান্না করে লোকে তাকেই ডাকে। যখন আমি যাব না বলে সংকল্প করেছিলাম তখন তিনি আমায় দু'বার করে ডেকেছিলেন। এখন না-যাওয়ার সংকল্প অনেকটা শিথিল হয়ে এসেছে, কিন্তু ডাক আর আসে না।'

নাগবেণার সেই হাসি আর নেই। মুখের ভাব সর্বদাই কঠিন। তার মৌন কঠিন মুখের দিকে তাকিয়ে রাম যদি বলে, 'মা, আমার সঙ্গে তুমি কথা বলো না কেন?' নাগবেণী উত্তর দেয় 'বলব বাবা। তোমার সঙ্গে কথা না বললে কার সঙ্গে কথা বলব?' 'তবে একটা গল্প বলো মা।' নাগবেণী গল্প শুরু করে কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই গল্পের খেই হারিয়ে গেলে শ্রোতার রসভঙ্গ হয়। সে তক্ষুনি বলে ওঠে, 'মা, এ কেমন গল্প? তুমি কী জানি সব চিন্তা কর....।

তোমার মন ভালো নেই মা ? ঠাকুমা কি আর বাড়ি আসবে না ?' পুত্রের মন থেকে ঠাকুরমার মৃত্যুভাবনা দূর করবার জন্য নাগবেণী তাকে বেড়াতে নিয়ে যায়।

একদিনের কথা বলি। তিথিটা ছিল শুক্লা চতুর্থী কি পঞ্চমী। অপরাহ্ণে খানিকটা ফেনভাত সিদ্ধ করে উঠোনে বসে নাগবেণী আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখছিল হাল্কা হাল্কা মেঘ ভেসে ভেসে যাচ্ছে। রাম বলল, 'মা, চলো যাই সমুদ্রে।' মা বলল, 'বেলা যে পড়ে এল বাবা। কাল গেলে হয় না ?' রাম বলল, 'না মা, এক্ষুনি যাব। আমার এখানে খারাপ লাগছে। তুমিও কথা বলোনা আমার সঙ্গে।'

'সমুদ্রে তোর সঙ্গে কে কথা বলবে ?'

'সমুদ্র বলবে।'

'ও কি বাবা তোর সঙ্গে কথা বলবে ?'

'হ্যাঁ মা, আমাদের খুব ভাব কিনা। এসো যাই।'

সমুদ্র কিনারে গেলে যদি ছেলের মনে শান্তি ফিরে আসে, তবে তাই হোক, এইভেবে নাগবেণী রামকে নিয়ে অগ্রসর হল। আকাশ ততক্ষণে লাল হয়ে উঠেছে। উত্তর দক্ষিণ জুড়ে পিঙ্গল বর্ণের যে বিশাল মেঘখণ্ড পশ্চিম দিগন্তে ছড়িয়ে আছে, অস্তগামী সূর্যের স্বর্ণ কিরণে সেই মেঘের প্রান্ত ঝলসে উঠেছে। সেই আলোয় মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রাম বলল, 'মা, কী সুন্দর তোমার মুখখানি।' নাগবেণী হাসল। হেসে ছেলের দিকে তাকিয়ে দেখল তার মুখের কোমল কান্তি সোনালী আলোয় পাকা নিম ফলের মতো তুল তুল করছে। প্রফুল্লকণ্ঠে বলল, 'রাম, তুমি যেন একটি খাঁটি সোনার পুতুল বাবা।'

কেবল নাগবেণী বা রামের মুখেই নয়, সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে সোনালী রঙের খেলা। রাম বলে উঠল, 'দেখছ মা কী সুন্দর।' এই বলে দু'হাত তুলে সমুদ্রের দিকে ছুটে গেল। ছোট ছোট পায়ে বালির উপর দিয়ে চলেছে তো চলেইছে। ভীত নাগবেণী দৌড়ে গেল শিশুর পিছনে পিছনে। 'জলের মধ্যে পড়ে যাবে রাম, যেওনা যেওনা।' সমুদ্রের কিনারে গিয়ে ঝুঁকে সোনালী জল স্পর্শ না করা পর্যন্ত রাম থামল না। মাথা তুলে দূর সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে কেমন যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেল বালক। বলল, 'দেখছ মা কী সুন্দর।'

মাতা পুত্র দুজনেই জলের কিনারে বসল। সেই কিনারা থেকে দিগন্ত পর্যন্ত

সমুদ্রের উপর দিয়ে যেন একটি স্বর্ণরেখা আঁকা হয়ে গেছে। নিমজ্জমান সূর্যের দিকে তাকিয়ে নাগবেণী চোখ বুজে হাত জোড় করে প্রণাম করল। কিছুক্ষণ পরে রাম জিজ্ঞাসা করল, 'মা সূয্যিঠাকুর গেল কোথায় ?'

'সমুদ্রের মধ্যে ডুবে গেল না কি।'

'আর আসবে না ?'

'আসবে বাবা। কাল সকালে পূর্বঘাট থেকে আসবে। সারারাত ধরে ঘুরবে কিনা।'

'মা, বড়ঠাকুমা, ছোটঠাকুমা তারাও কি এইভাবে ঘুরে আসবে ? তুমি দুঃখ কোরো না মা। আমি জানি তারা আসবে।'

ছেলের কথায় নাগবেণীর কান্না এসে গেল। বলল, 'হয়ত আসবে বাবা। জন্ম মৃত্যু না কি এড়ানো যায় না।'

মা ও ছেলে অনেকক্ষণ সেখানে বসে রইল। ওঠার কোনো তাড়া নেই। কখন একসময় রাম মায়ের কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। বাড়ি ফেরার সময় হল ভেবে নাগবেণী পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল পঞ্চমীর চাঁদ উঠেছে। সন্ধ্যার শান্ত পরিবেশে মনের সমস্ত বেদনা দূর হয়ে ক্ষণেকের জন্য মুখে তার হাসি ফুটে উঠল। ঘুমিয়ে পড়া ছেলেকে কাঁধে তুলে নিয়ে নাগবেণীর মনে পড়ে গেল, ঠাকুরঘরে এখনো সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বলেনি। দ্রুতপদে চলতে চলতে বাড়ির পিছনকার বালিয়াড়িতে এসে থমকে দাঁড়াল, সামনের দিক থেকে কে একজন এগিয়ে আসছে না ? আর কেউ নয়, নাগবেণীর বাবা বাসুদেব উকিল। মেয়ের বাড়িতে এসে কাউকে না পেয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে তাঁর পূর্ববৃত্তান্ত মনে হতে তিনি সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

শাশুড়ির মৃত্যুর পরে নাগবেণী যে নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে এ খবর উকিলবাবু তাঁর ছোটভাইয়ের কাছ থেকে পান। নারায়ণকাকা যখন বুঝতে পারল যে তার কথা নাগবেণীর উপর খাটবে না এবং কোনো ক্রমেই সে শ্বশুরের ভিটা ছেড়ে যেতে প্রস্তুত নয়, তখন এদিককার সব খবর জানিয়ে নারায়ণয্য তার দাদাকে আসতে বলে চিঠি দিয়েছিল। উকিলবাবু ওকালতি থেকে অবসর নিলেও তাঁর বিশ্রাম ছিল না। সম্প্রতি তিনি ছেলেদের জন্য আলাদা আলাদা বাড়ি তৈরির কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁর ভাবখানা এই যে যার দায়িত্ব বুঝে নিয়ে পৃথক হয়ে বেঁচে থাকাই ভাল। একই বাড়িতে থেকে পরস্পরের মধ্যে কলহ বিবাদ করে

কারও কোনো সুখ হবেনা—এই ভেবে বিষয়-সম্পত্তিও ছেলেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দিয়েছেন। ঠাকুরের কৃপায় ছেলেরা আয়-উপার্জন করে সুখেই আছে। উকিলবাবু তাঁর নিজের প্রয়োজনের বহর কমিয়ে সরল ও অনাড়ম্বর ভাবে জীবনযাপন করেন। অবসর ও একাকিত্বের ফলে স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই এখন প্রচুর সময়। ইতিমধ্যে খবর পৌঁছায় যে নাগবেণী খুব দুরবস্থায় পড়েছে। চট্ করে বেরোব বললেই বেরোনো যায় না। নাগবেণীর ছোট বোন কৃষ্ণবেণী অন্তঃসত্ত্বা হয়ে মাদ্রাস থেকে পিত্রালয়ে এসেছে। তার প্রসব না হওয়া পর্যন্ত উকিলবাবুকে মংগলুরে অপেক্ষা করতে হয়। এখন সেই দৌহিত্রের মুখ দেখে এই দৌহিত্রকে দেখবার জন্য ছুটে এসেছেন।

নাগবেণীর কাঁধ থেকে ঘুমন্ত নাতিকে তুলে নিতে নিতে উকিলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এই অন্ধকারে কোথায় গিয়েছিলি মা?' নাগবেণী উত্তর দিল, 'রাম বায়না ধরল, 'সমুদ্রে যাব, তাই গিয়েছিলাম। ছেলেটার যতই মন খারাপ হোক সমুদ্র দেখলে সব কথা ভুলে যায়। আজ ওখানে গিয়ে আমার মনটাও একটু ভাল বোধ হল।' বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর কতদিন তুমি এইভাবে সমুদ্রের ঢেউ গুণে কাটাবে?' মেয়ে বাবার কথার উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কবে এলে বাবা?'

'আজ সন্ধ্যায় মোটরে করে এসেই তোর এখানে এলাম। সাত আট দিন আগেই আসতে পারতাম। কিন্তু কৃষ্ণবেণী বাড়িতে এসেছে। তার প্রসবের জন্য অপেক্ষা করে তবে আসতে হল।'

'কৃষ্ণির সন্তান হল? ছেলে না মেয়ে? ভালো আছে তো?'

'ছেলে হয়েছে। ভালোই আছে। দেখতে ছোট-খাট, ওর বাপের মতো আদল। জামাইও এসেছিল কয়েকদিনের জন্য।'

'কৃষ্ণি পুণ্যবতী বাবা'।

'মা, কী যে পাপ আর কী যেন পুণ্য জানি না। তবে ভগবান মাঝে মাঝে আমাদের সকলকে পরীক্ষা করেন।' এই বলে পিতা কন্যাকে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন।

বাড়ি পৌঁছে রামকে শোয়াতে গেলে সে জেগে উঠল। মা বলল, 'রাম দাদু এসেছেন দেখেছ?' 'দাদু? দাদু?' বলে রাম আশ্চর্য দৃষ্টিতে তাকাল। ততক্ষণে দাদামশাই নাতির সামনে কয়েকটি 'মাইসোর পাক' রেখে দিলেন।

নাতির কথা ভেবে মিষ্টিগুলি তিনি মংগলুর থেকে নিয়ে এসেছেন। নাতি বলল, 'দাদু, তুমি এনেছ এগুলো? মায়ের জন্য আছে? এর মধ্যে কোনটা আমার?'

'সব তোমারই, দাদু। তোমার মাকে দিতে হবে না।',

'মাকে দিতে হবে, দাদু। জানো, মা ঠিক মতো খায় না।'

এই কথায় পিতা কন্যার মুখের দিকে তাকালে, নাগবেণী বলে উঠল, 'রাম, মিথ্যা কথা বলছ। আমি খাই না তোমার সঙ্গে?' রাম উত্তর দিল, 'অল্প অল্প খাও তুমি। বেশি খাও না।'

নাতির কথায় উকিলবাবু নাগবেণীর মুখের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'দাদু তুমি মাইসোর পাক খাবে না?' বালক একটা নিয়ে মুখে পুরে বলল, 'বেশ লাগে দাদু। তোমাদের বাড়িতে এ রকম বানায় নাকি? রোজ বানায়? তুমি যখনই আসবে এই মিষ্টি এনে দেবে? ছোট দাদু, সালিগ্রামের মেলায় আমাকে চিনির খেলনা কিনে দিয়েছিল।...'এইভাবে রাম তার দাদা মশাইর কাছে নানা কথা বলতে লাগল। রামের কথায় নাগবেণী লজ্জা পেয়ে সেখান থেকে উঠে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বলল, 'বাবা তোমার জন্য দুটো ভাত চাপিয়ে দিই। কেবল আমাদের দুজনের জন্য রান্না করেছি কি না?' বাবা বলল, 'খালি ভাতই যথেষ্ট মা। আর কিছু কোরো না।' শুধু ভাত তাঁরা কোনোদিনই খান না। কিন্তু তাঁর মনে হল নাগবেণীর ঘরে বোধ করি আর কোনো কিছুই নেই।

রান্না হতে সময় লাগল। নাগবেণী প্রথম খানিকক্ষণ শিলনোড়া নিয়ে গড়গড় করে বাটনা বাটল। তারপরে তরকারি সাঁতলে নিয়ে ফোড়ন দিল। এই সমস্ত কাজ করতে করতে আজ রান্নাঘরখানি তার চোখে নতুন রূপ নিয়ে দেখা দিল যেন। বস্তুত এতদিন ধরে ভালো কিছু খাবে বলে একদিনের জন্যও রান্নায় হাত দেয় নি। হাতের কাছে যা জুটেছে তাই সিদ্ধ করে খেয়েছে। রান্না যখন শেষ হয়ে এল, তখন সুরোর এক পুত্রবধূ এসে জানালা দিয়ে বলল, 'মাঠান, আজ কি আমায় আর শুতে আসতে হবে? আপনার বাবাঠাকুর বারান্দায় বসে আছেন দেখলাম।' 'হ্যাঁরে বচ্চি, আমার বাবা এসেছেন। আজ আর তোকে আসতে হবে না। তোর ছেলের জ্বর এখন কেমন রে?' বচ্চি উত্তর দিল, 'ওর জ্বরটা আজ ছেড়েছে মাঠান। জ্বরে-জ্বরে কী যে হয়ে গেল আমাদের বাড়িটা!' যাওয়ার আগে আর একবার গলার আওয়াজ করে

বলল, 'মাঠান, বাবাঠাকুর যদি আপনাকে মংগলুর নিয়ে যেতে চান, তুমি কিন্তু এখানে থাকার জন্য জিদ কোরো না।'

কথাটা নাগবেণীর মনেও সেই মুহূর্তে জেগে উঠল। বাবা বোধ করি কোত্তি-গ্রাম থেকে তাদের মংগলুরে নিয়ে যাওয়ার জন্যই এসেছেন। বচ্চির পরামর্শের উত্তরে নাগবেণী বলল, 'ভগবান যা করবেন তাই তো হবে। আমার কপালে যেমন লেখা রয়েছে তেমনি হবে।'

ইতিমধ্যে উকিলবাবু বললেন, 'নাগু, দাদুভাই হাই তুলছে। আগে ওকে দুটো খাইয়ে দে। আমরা না-হয় পরে খাব।' রাম বলে উঠল, 'দাদু, আমি তোমার সঙ্গেই খাব। মা, দাদুর জন্য কী রান্না করেছ। আমিও রান্না করতে জানি দাদু···তেঁতুলের টক, 'তম্বুলি' (এক প্রকার টক ডাল), 'পলন্য' সব করতে পারি।'

'বাঃ তুমি বেশ চতুর ছেলে তো ? মৈসূরপাক বানাতে পার ?'

'মৈসূরপাক কী দাদু ?'

'কিছুক্ষণ আগে যা তুমি খেলে ?

'ওর নাম মৈসূরপাক। না, 'হালুবায়ি'। শুকনো হালুবায়ি না ?'

'হ্যাঁ শুকনো হালুবায়ি। তুমি ওটা বানাতে জান ?'

হ্যাঁ, গুড় দিয়ে ভাত মেখে নিলে হালুবায়ি হয়।'

ততক্ষণে খাওয়ার ডাক এসে গেল। নাগবেণী তার বাবা ও ছেলের জন্য আলাদা আলাদা দু টুকরো পাতা পেতে আচার ও ভাত পরিবেশন করল। রাম যে তখন হালুবায়ির কথা বলছিল তাও দেওয়া হল। উকিলবাবু একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এখন কেন হালুবায়ি করতে গেলে ?' নাগবেণী একটু ম্লান হেসে বলল, 'বাবা, রুক্মিণীর বাড়িতে গেলে তারা তোমাকে কত কী খেতে দেবে। আমি কি তোমার জন্য এটুকুও করতে পারি না ? অনেক দিন হল ছেলেটাকেও কোনো মিষ্টি খাবার করে দিই নি।' রাম খুব তৃপ্তি সহকারে হালুবায়ি খেল। কন্যার আদর যত্নে উকিলবাবু খুবই তৃপ্ত হলেন। জিহ্বায় হালুবায়ির স্বাদ লেগে থাকার মতো কন্যার মমতা হৃদয়ে লেগে রইল।

কন্যার দুরবস্থার কথা ভেবে উকিলবাবু কিছুক্ষণের জন্য কোনো কথা বলতে পারলেন না। খানিকক্ষণ পরে বললেন, 'নাগু, তুইও পাতা পেতে বসে যা, মা।' আহারান্তে উকিলবাবু হাত মুখ ধুতে গেলে নাগবেণী খেতে বসল। রাম খেয়ে

মেয়ে মায়ের সঙ্গে গল্প করতে গিয়ে দেখল, তার পাতে হালুবায়ি নেই, শুধু ফেনা ভাতে লবণ-মরিচ মেখে মা খেয়ে যাচ্ছে। 'মা, তোমার হালুবায়ি?' আমি তো আগেই খেয়ে নিয়েছি।' 'মিছে কথা। খাওনি তুমি' রামের মনে খুব কষ্ট হল। দৌড়ে গিয়ে দাদুর কাছে নালিশ করে বলল, 'দাদু মায়ের জন্য ঘরের হালুবায়ি নেই। তুমি যে হালুবায়ি নিয়ে এসেছ, তাই দাও না মাকে।'

বাসুদেববাবু রান্নাঘরে এসে নাগবেণীর পাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ কী নাগু, তুই যা ঘরে তৈরি করলি, সব আমাদের দিয়ে এখন খালি ফেনা ভাত খাচ্ছিস? তাই তুই আমাদের সঙ্গে খেতে বসিস নি।' নাগবেণী হেসে বলল, 'বাবা আমার খাওয়ার চেয়ে বেশি আনন্দ হয়েছে তোমাদের খেতে দেখে। তোমার স্নেহের ঋণ আমি কি কখনও শোধ করতে পারি?' কী একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা উকিলবাবুর মনটাকে কুরে কুরে খেতে লাগল। বারান্দায় গিয়ে রামকে ডেকে সে বললেন, 'দাদুভাই, এইটে নিয়ে মাকে দাও। তোমার জন্য আরও আছে। মা তো খায়নি এই হালুবায়ি।' এই বলে নিজের আনা একখণ্ড মৈসুরপাক নাতির হাতে দিয়ে পাঠালেন। রাম সেই মিষ্টিটা নিয়ে মাকে দিয়ে বলল, 'তুমি খাও। তোমারটা আমি খাব না।' ছেলেকে খুশি করার জন্য নাগবেণীকে খেতে হল। খেয়ে বলল, 'খেতে বেশ লাগে না রে?' রাম বলল, 'মা, তোমার তৈরি হালুবায়ি আরও ভাল, আরও মিষ্টি। সী সী সী বেল্ল মিদু মিদু বেন্নে (মিষ্টি মিষ্টি গুড়, নরম নরম মাখন)।

'এটা অন্য মিষ্টি খোকা। হালুবায়ি নয় দোকানের তৈরি খাবার।'

আহারান্তে নাগবেণী হাতমুখ ধুয়ে এঁটো থালা বাসন মেজে ঘরে এসে রামকে একটা মাদুর পেতে দিল এবং সেই মাদুরের উপর বালকের ঠাকুরদা রামঐভালের আমলের একটা সবুজ রঙের জীর্ণ চাদর বিছিয়ে দিয়ে বলল, 'রামু, রাত অনেক হল। ঘুমোও এখন।' রাম বলল, 'দাদু গল্প বলবে না, মা?' 'গল্প উনি জানেন না বাবা', রাম বলল, 'তুমিই কেবল গল্প জান, না মা?' নাগবেণী হেসে বলল, 'আমি কেবল আমার গল্পই জানি বাবা।' রাম বলল, 'মা, আমি তোমার কোলে শুয়ে ঘুমোব।' এমন সময় উকিলবাবুর ডাক শোনা গেল, 'এসো দাদু, আমার কোলে ঘুমোও।' রাম এসে তাঁর পদ্মাসনবদ্ধ উরুর উপর শরীর এলিয়ে দিয়ে নিদ্রা গেল। ছেলে ঘুমিয়ে পড়লে নাগবেণী তাকে তুলে নিয়ে জায়গা মতো শুইয়ে দিয়ে বাবার জন্য একটা মাদুর

পেতে তার উপর তালপাতার তৈরি একটা বালিশ রাখল। হেসে বলল, 'আমার কিছু নেই বাবা।'

'আয়, বোস' এই বলে বাবা মেয়েকে কাছে ডেকে বসালেন। 'মা, এখন আর জিদ করিসনে। এখনও তোকে এখানে পড়ে থাকতে হবে এমন কোনো দায় আছে কি? তোর শাশুড়ি পিসশাশুড়ি সকলেই তো চলে গেলেন। এখানে থেকে আর লাভ কী? তোর পক্ষে একলা এ বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়। ঐতাল মশাই বুড়ো বয়সে কী পাগলামি করে এখানে এই বাড়ি বানিয়েছিলেন। এখন বাড়িতে ঝাঁট দেওয়ার মতো একটা লোক নেই। এখানে থেকে চাষবাস করে খেয়ে থাকার ক্ষমতা তোর নেই; যদি বলিস চাষবাসের কাজ তুই করতে পারবি, ভালো কথা। তোর ওই ছেলের অবস্থা কী হবে? ওকে লেখাপড়া শিখিয়ে বড় করতে হবে না? আগে যে ভাবে দিন কেটেছে, পরেও কি সেই ভাবে দিন যাবে? চারিদিকে চেয়ে ছাখ চাকরির খোঁজে লোক নানা জায়গা ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি যখন ছোট ছিলাম, তখন দেখেছি গ্রামে যারা জন্মাত, গ্রামেই তাদের 'মোক্ষ' হত। এখন আর সেদিন নেই। এখন অন্নবস্ত্রের জন্য সকলেরই চাহিদা বেড়ে গেছে। একখানি গামছা বা ধুতি পরে মানুষের দিন কাটবে বলে মনে হয় না। তুই কি মনে করিস তোর ছেলে সেই ভাবেই থাক?'

নাগবেণী বুঝতে পারল বাবার কথার বিরুদ্ধে যুক্তি দিয়ে রামের জীবনের কোনো সুরাহা হবে না। ভবিষ্যতে যদি নাগবেণী বেঁচে থাকে, তবে তাকে বেঁচে থাকতে হবে কেবল রামের জন্য। 'আমায় এখন কী করতে হবে বাবা?' 'করা আর কী? মংগলুরে চলে আয়। আমাদের বাড়িটাতো খালিই পড়ে থাকে। কৃষ্ণবেণী এসেছে দিন কয়েকের জন্য। সে চলে গেলে আবার যে-কে সেই। ছেলেরা যার যার বাড়িতে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে আছে। তুই আমার বাড়িতে এলে, যতদিন আমি বেঁচে থাকব, তোকে আর তোর ছেলেকে লালন-পালন করে যদি আমার শান্তি হয়, হোক না। রামের অদৃষ্টে যেমন আছে, সেই মতো লেখাপড়া করুক। লেখাপড়া জানা লোক সকলেই আর লচ্চর মতো হয় না।' নাগবেণী বলল, 'বেশ তোমার কথাই হবে কিন্তু মনের একটা সংশয় কিছুতো যায় না, বাবা। এই সমস্ত বাড়ি ঘর জমি বাগান সব ছেড়ে দিয়ে যাব?'

'এ সব কি সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সম্ভব? তাছাড়া, এ সবের উপর এখন আর কী অধিকার আছে? লচ্চ তো এ সব বিক্রী করে খেয়ে ফেলেছে।'

'এখন ও তো আমাদের খাজনা স্বত্ব আছে।

'তা আছে। কিন্তু খাজনা দিতে হবে না? চাষের জমি অন্য লোককে দিয়ে দিলে বাড়ি কে নেবে?'

'কাকা বলছিলেন, খাজনা স্বত্বটা রেখে দেওয়া ভাল। ভবিষ্যতে একদিন এখানে থাকার ইচ্ছে হলে থাকা যাবে। বড় হয়ে রামের যদি ইচ্ছা হয় সে তার জন্মভূমি ও পৈতৃক ভিটে দেখবে, তবে দেখতে পারবে। আমি বলি কি, জমিজমাগুলো বর্গা দিয়ে বাড়িটা হাতেই রাখি।'

মেয়ের কথার যে বিশেষ কোন মূল্য আছে উকিলবাবুর তেমন মনে হল না। কিন্তু ওর মনে ব্যথা দেওয়াটা ঠিক হবে না ভেবে বললেন, 'বেশ তাই হবে।' নাগবেণী বাবাকে বোঝাবার জন্য আরও একটু চেষ্টা করল, 'দেখ বাবা এখানকার এই সমুদ্র হল রামের প্রাণ। ভবিষ্যতে ও যদি এসে এই সমুদ্র দেখতে চায়, এখানে বাস করতে চায়, আমার পক্ষে তার সেই আসার পথটা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া উচিত হবে না।'

বহুদিন পরে আজ নাগবেণী তার চিন্তার বোঝা নামিয়ে নিশ্চিন্ত মনে শান্তিতে নিদ্রা গেল। পরদিন ঘুম থেকে উঠে উকিলবাবু বললেন, 'আজ আমরা রওনা হই, চলো। এখানে জিনিসপত্তর তেমন কিছু নেই। বাসন কোসন যা আছে নারায়ণ এসে নিয়ে যাবে। আর ওখান থেকেই কাউকে খুঁজে পেতে জমিজমা বর্গায় দিয়ে দেবে···। আর কী ব্যবস্থা করতে হবে বলো।'

নাগবেণীর মনে পড়ে গেল কাল রাত্রিতে সুরোর পুত্রবধূ বচ্চি এসে তার সঙ্গে কথা বলে গেছে। বচ্চিকে ডাকিয়ে সে বলল, 'বচ্চি, আমাদের এখানকার ঋণ কেটে গেল বলে মনে হচ্ছে। বাবা বললেন তাঁর সঙ্গে যেতে হবে। আমি রাজি হয়ে গেলাম।'

বচ্চি বলল, 'সেই ভালো মাঠান। আপনার শ্বশুরমশাই, সরস্বতী মাঠান মাথার ঘাম পায়ে ফেলে এই জমিজমা করেছিলেন। তা বলে আপনি কি খোকামণিকে নিয়ে কষ্ট করতে পারবেন? যান, একদিন হয়ত খোকাবাবু লেখাপড়া শিখে আপনাকে সুখী করবে।' একটু থেমে পরে বলল, 'আচ্ছা, মাঠান, আপনাদের জায়গা তো খাজনা করা শুনেছি। খাজনার স্বত্ব ছাড়বেন না, এমন কিছু বেশি খাজনা নয়। আর যদি বর্গা দিয়ে চাষবাস করান, তবে আমাদের কথা মনে রাখবেন।' উকিলবাবু এই কথা শুনে বচ্চির স্বামীকে আসতে বললেন।

বচ্চির স্বামী সব কথাই জানত। সে এসে নিবেদন করল, 'দাদাঠাকুর, আপনাদের জায়গা বর্গাস্বত্বরূপে আমাদের হাতেই দিন। এক সময়ে আমরা বুড়ো ঠাকুরমশায়ের রায়ত ছিলাম। এখনও আপনাদের কাছে আমাদের ঋণ জমা হয়ে থাক।' উকিলবাবু এক কথায় সম্মতি দিতে হঠাৎ যেন তাঁর দায়িত্বের বোঝা নেমে গেল।

সেদিন মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে তারা যাত্রা করবে স্থির হল। নাগবেণী ছেলেকে কোলে নিয়ে প্রতিবেশীদের, বিশেষ করে শীনময়্য ও উপাধ্যায়দের, বাড়িতে দেখা করে এল। উপাধ্যায় গিন্নি আশীর্বাদ করে বললেন, 'তাই হোক মা, সুখে থাকো, ভগবান, তোমাদের ভালো করুন। সবই তো তাঁর লীলা।' বাসুদেবয্য আগেই বাড়ি চলে গেছেন। মা ও ছেলে খাওয়া শেষ করে যা কিছু অল্প স্বল্প মালপত্র ছিল বেঁধে ফেলল। এখন একবার কালি কপিলার খোঁজ নেওয়া দরকার। বড় শাশুড়ি ও পিসিমার আমলের গাই চম্পি কেম্পির সন্তান-সন্ততি এরা। এখানেই জন্মে এখানেই বড় হয়েছে। একবার ভাবল ওদের ঐরোডিতে পাঠিয়ে দেয়। সেদিন সকালে যাত্রার আয়োজনের ব্যস্ততায় গোরু দুটোকে মাঠে পাঠাবারও সুযোগ হয়ে ওঠে নি। দুপুরের পরে যখন ঐরোডি থেকে লোকজন এল মালপত্র বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, তখন নাগবেণীর এই ভেবে খুব কষ্ট হল যে যে গোরু দুটি এতদিন বাড়ির সঙ্গে জড়িত হয়ে ছিল আজ তাদের অন্যত্র নিয়ে যাবে। এমন সময়ে বচ্চি ও তার স্বামী কালো দুজনেই মাঠাকরুনকে বিদায় দিতে এসে উপস্থিত হল। নাগবেণীর কি যেন কি মনে হল, বলল, 'কালো এই গোরু দুটিকে ঐরোডি নিয়ে যেতে মন চায় না। তুমি আমাদের জমিজমা বর্গা নিলে। এই গোরু দুটিকেও উৎসর্গ করে তোমার হাতে দিয়ে যাই। যখন আমরা মাঝে মাঝে এসে এখানে দু'চারদিন থাকব, তখন আমার রাম যেন একহাতা দুধ খেতে পায়।'

কালি কপিলাকে বচ্চির হাতে তুলে দিতে গিয়ে নাগবেণী আর অশ্রুসংবরণ করতে পারল না। রাম জিজ্ঞাসা করল, 'মা, গাই দুটো কি ওদের?' নাগবেণী বলল, 'ওরা পালবে কি না, তাই ওদের হাতে তুলে দিলাম।' ক্রমে ক্রমে রামের কাছেও কঠিন সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এই বাড়ি তারা ছেড়ে যাচ্ছে। উকিল-বাবু পুনরায় ঐরোডি থেকে এসে বললেন, 'এসো দাদুভাই, মংগলুরে আমাদের বাড়িতে চলো।' দাদু এখান থেকে তাকে নিয়ে যাবে শুনে রাম কাঁদতে

আরম্ভ করল। নাগবেণী সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আমিও তোমার সঙ্গে যাব, রাম। এখানে আমাদের কে আছে ?' কিন্তু ছেলে কেঁদে কেঁদে বলতে থাকল, 'আমরা এখানেই থাকব। এ বাড়ি ছেড়ে যাব না কোথাও।' নাতির কথা শুনে উকিলবাবু হতভম্ব হয়ে গেল। রামের কান্না আর থামে না। অবশেষে নাগবেণী নিরুপায় হয়ে বলল, 'চল রাম, আমরা সমুদ্রে গিয়ে ঝিনুক কুড়িয়ে আনি।' এই কথা শুনে রাম শান্ত হল। সেই তৃতীয় প্রহরের রোদে নাগবেণী ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রতীরে গিয়ে শাদা পালতোলা নৌকা দেখিয়ে অনেকগুলি ঝিনুক কুড়িয়ে আনল। পরে মৃদু কণ্ঠে বলল, 'বাবা, এখানে তো আমাদের কেউ নেই। চলো, আমরা দাদুর বাড়িতে যাই।'

'পরে আবার এখানে আসব ?'

'হ্যাঁ বাবা, দরকার হলেই আসব।'

'সত্যি বলছ ?' এইভাবে রাম প্রতিশ্রুতি আদায় করে ছাড়ল।

এবারে রওনা হতে হবে। বাড়ি থেকে আজ বিদায়ের ক্ষণে নাগবেণীর মনে পড়ে গেল অতীতের এক বিদায়ের কথা যেদিন শাশুড়ি ও পিসিমা কাশী যাত্রার পথে রওনা হয়ে যান। নিরুদ্ধ বেদনায় নাগবেণীর বুক ভরে আসছে। কেঁদে যে সান্ত্বনা লাভ করবে তারও উপায় নেই, পাছে রাম দেখে ফেলে এই ভয়। নদী পর্যন্ত বচ্চি ও তার স্বামী তাদের বিদায় দিতে গেল। উপাধ্যায়ের বর্ষীয়সী স্ত্রীও গিয়েছিলেন। নাগবেণী তাঁর সামনে ছেলেকে তুলে ধরে বলল, 'ঠাকুমা, আমার রামকে ছুঁয়ে আশীর্বাদ করুন ভগবান যেন ভাল করেন।' উপাধ্যায় গিন্নির চোখের সামনে ভেসে উঠল সরস্বতীর মৃত্যুদিনের ছবি। তিনি রামকে আশীর্বাদ করতে করতে বললেন, 'নাগু, তোমার ছেলে সরস্বতীর আশীর্বাদ পেয়েছে। আমি আর বেশি কি আশীর্বাদ করব। সরস্বতীর পুণ্যে তোমার ছেলে সুখে থাকবে।'

জোয়ারের জলে ভরে গিয়ে অপরাহ্নের দিকে নদী ভাঁটার টানে সমুদ্রের দিকে ছুটে চলেছে। উকিলবাবুর কোলে রাম, পশ্চাতে নাগবেণী। নদীতে জল নিতান্ত কম নয়, স্রোতও প্রবল। কিন্তু নাগবেণীর সেদিকে খেয়াল নেই, যেতে যেতে সে ফিরে ফিরে দেখছে তাদের বাড়িখানাকে, রাম ঐতালের তৈরি দোতলা বাড়ির প্রতি টালিখানাকে বুঝি গুণে গুণে দেখছে। ক্রমে একসময়ে গাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল বাড়িখানা।

নারায়ণয়্য নাগবেণী ও তার ছেলেকে রাস্তা থেকে ঘরে ডেকে নিয়ে গেল। রামের মুখের হাসি থেকেই বোঝা গেল যে সে তার ছোটদাদুকে চিনতে পেরেছে। বাড়ির সকলেই ওদের দুজনকে খুব আদর অভ্যর্থনা জানাল।

সে রাত্রিতে কেবল নাগবেণীর মনে কোনো শান্তি ছিল না। আদি অন্তহীন ভাবনায় তার মন আন্দোলিত। শ্বশুরবাড়িতে যে জীবন কাটিয়ে গেল তার বহুদিনকার বহু ছবি একে একে স্মৃতির পটে আঁকা হয়ে যাচ্ছে। আর অতীতের সেই স্পষ্ট ছবিগুলির উপর অস্পষ্ট ছায়ার মতো কেঁপে কেঁপে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে আগামী দিনের ছবি, যে বাড়িতে সে জন্মেছে ও মানুষ হয়েছে সেই বাড়িতে তার নতুন জীবন, রামের ভবিষ্যৎ জীবন সবই তো অজানা। বারবার সে নিদ্রিত রামের শরীরে হাত বুলিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চায় তার ছেলে রাম তার বাপের মতো নাগবেণীকে না বলে ছেড়ে তো যায় নি।

বাসুদেব উকিল তার মেয়ে ও নাতিকে সঙ্গে নিয়ে মংগলুর রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত। ছোট ভাই নারায়ণ বলল, 'দাদা, নাগু তো চলেই যাচ্ছে। যাওয়ার আগে কয়েকটা দিন না-হয় আমার এখানে থাক।' ছোট মেয়ে কৃষ্ণবেণীর কথা ভেবে বাসুদেববাবু তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য উদ্‌গ্রীব হলেও ছোটভাই ও বড়মেয়ের জন্য দুটো দিন ঐরোডিতে থাকাই মনস্থ করলেন। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ছোটদাদুর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রামের খুব চেনাপরিচয় হয়ে গেল। একদিন সে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের এখানে সমুদ্র নেই?' তারা তাকে হংগারকট্টে বন্দরে নিয়ে গিয়ে সেখান থেকে নদী ও সমুদ্র সঙ্গমের সুন্দর দৃশ্য দেখাল। রাম বলল, 'চলো ওখানে যাই।' কিন্তু রামের এই আগ্রহে তারা সাড়া দিল না। সন্ধ্যার সময়ে বাড়ি ফিরে রাম বলল, 'মা, এখান থেকে সমুদ্রে যাওয়া যায় না। মাঝখানে বড় নদী কি না। দূর থেকেই দেখতে হয় সমুদ্রকে, কাছে যাওয়ার উপায় নেই।'

নাগবেণী ভাবল, 'মংগলুর যাত্রার আগে কাল আর একবার রামকে সমুদ্র দেখিয়ে আনব। মংগলুর গিয়েও যদি পুত্রের এই সমুদ্রপ্রীতি বজায় থাকে তবে তো মাঝে মাঝে রামকে নিয়ে কোডিগ্রামে আসতে হবে।' পুত্রের আকাঙ্ক্ষার কথা নাগবেণী তার পিতার কাছে প্রকাশ করল উকিলবাবু নাতিকে ডেকে বললেন, 'দাদুভাই, তোমাকে জেলেদের জালের মতো একটা মস্ত বড় মাছ ধরার জাল করে দেব। মংগলুরে রোজ সমুদ্রে গিয়ে জাল দিয়ে মাছ ধরবে, কেমন?'

নাগবেণী বলল, 'অমন কথা বোলোনা বাবা। ও একটা পাগলা ছেলে। মংগলুরে গিয়ে ও যদি সত্যাই জাল দিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে চায়, তখন কী হবে ?' উকিলবাবু এই বলে আশ্বাস দিলেন, 'কোনো চিন্তা নেই, নাগু। আমাদের বাড়ির দাওয়ায় বসে ও যখন রাস্তার উপর দিয়ে মোটর, ঝটকা ইত্যাদি চলাচল দেখবে, আপনা থেকেই সমুদ্র ভুলে যাবে। ছেলেপিলেদের শখ দু'দিনের।'

বাবার এই কথাটা নাগবেণীর কাছে সত্য বলে মনে হল না। সে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না যে শহরের গাড়িঘোড়া দেখলেই রামের সমুদ্রপ্রীতি মিলিয়ে যাবে। কারণ সে তো জানে যে ওই সমুদ্র কেবল রামের নয়, নাগবেণীর নিজের জীবনেরও অনেকখানি জুড়ে আছে।

পরদিন ভোর হতেই রাম বলল, 'মা, সমুদ্র দেখতে যাব না ? এখানে খুব খারাপ লাগছে।' নাগবেণী বলল, 'বিকেলে দেখব বাবা।' সারা সকাল বাড়ির ছেলেপিলেদের সঙ্গে রাম খুব খেলাধুলো করল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে সূর্য হেলে পড়লে রাম জিজ্ঞাসা করল, 'মা, এখানে গোরু বাছুর নেই ?' 'আছে, বাবা।' 'ওরা সমুদ্রের ধারে টিলায় ঘাস খেতে যায় না ?' নাগবেণী বলল, 'সে তো আমাদের গ্রামে।' রাম বলল, 'চলো সেখানেই যাই।' মা বলল, 'সেখানে কী আছে বাবা ? পেটভরে খাওয়াটুকুও তো নেই। এখানে দেখ দুধ আছে, দই আছে—সব আছে। কাল আমরা মংগলুর যাব। সেখানে গিয়ে কত ঝট্‌কা, কত মোটর গাড়ি তুমি দেখতে পাবে।' অতঃপর মা ছেলের কাছে মোটর গাড়ির গল্প শোনাল।

পরদিন ভোরে সকলেই স্নান দান করে রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত। মালপত্র-গুলি আগেই নদীর ওপারে চলে গেছে। বাড়ির সকলে বিদায় জানাতে নদীর তীর পর্যন্ত এল। ওপারে মোটর বাস এসে গেছে। রাম বলল, 'মোটর কোথায়, মা ?' 'নদীর ওপারে ওই যে দেখা যাচ্ছে, ওই হল মোটর।'

নৌকায় করে নদী পার হতে গিয়ে রামের খুব ফুর্তি। মোটর বাসে চড়েও বেশ আনন্দ হল তার। নারায়ণয্য বলল, 'দাদু ভাই, আবার এসো। নাগবেণী বছরে অন্তত একবার করে আসিস।' চোখের জল মুছে ফেলে নাগবেণী বলল, 'আসব কাকা।' নাগবেণী ভাবছে, আবার কি তারা কোডিগ্রামে এসে কোনোদিন পৈতৃক গৃহে প্রবেশ করে এক গেলাস জল পান করারও সুযোগ পাবে ? মনের সংশয় কিছুতেই ঘোচে না।

ঐরোডি থেকে মংগলুর, বড়দের কাছে বড়ই বিরক্তিকর পথ। পরপর কতগুলি নদী পার হতে হয়। গাড়িতে ওঠা, গাড়ি থেকে নামা, নদী পার হওয়া গাড়ি বদল করা, সারাদিন লেগে যায় মংগলুর পৌছতে। রামের কাছে কিন্তু মোটেই খারাপ লাগে না এ পথ। যখনই নদী আসে, তার উৎসাহ উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে। যাত্রা শেষে মংগলুরে এসে যখন বাড়ি পৌছল তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। নাগবেণীর মা মেয়ে ও নাতিকে ঘরে তুলে নেবে বলে পথে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। রামকে বুকে লাগিয়ে আদর করে বললেন, 'এসেছ সোনা?' তারপরে সকলে কৃষ্ণবেণীর ঘরে গিয়ে দাঁড়াল। ছোটবোন ও তার নবজাত শিশুকে দেখিয়ে নাগবেণী বলল, 'রাম, তোমার ভাইটিকে দেখ বাবা।'

রাম জিজ্ঞাসা করল, 'আমার সঙ্গে খেলবে মা?'

মাসী বলল, 'হ্যাঁ খেলবে বৈকি!'

আজ কত বছর হল নাগবেণী তার মা-বোনকে দেখেনি। এই দীর্ঘকাল পরে তাদের সাক্ষাৎ আনন্দময় মিলনে পরিণত হল। মা বললেন, 'নাগু, তোর ছেলের খিদে পেয়েছে বোধ হয়। দুধ দেব?' রাম বলল, 'হ্যাঁ দিদিমা, খুব খিদে পেয়েছে আমার। মায়েরও খিদে পেয়েছে। দাদুরও।' নাগবেণীর মা তাড়াতাড়ি ওদের জন্য জলপানের আয়োজন করতে গেলেন উকিলবাবু রামের হাত পা ধুইয়ে দিয়ে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে দুধ খাওয়ালেন। নাগবেণী কিন্তু কৃষ্ণবেণীর বিছানার কাছ থেকে নড়ল না। দুজনেই বোবার মতো বসে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল।

সেই মুহূর্তে কৃষ্ণবেণীর স্বামী ভিতরে প্রবেশ করেই পুনরায় বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করতে কৃষ্ণি বলল, 'এসো না, আমার দিদি যে!' সে এই অভাগিনীর কথা অনেক শুনেছে, কিন্তু মুখের পরিচয় ছিল না। পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করে বলল, 'কখন এলেন দিদি? সব ভাল ত?' নাগবেণী কি বলবে ভেবে পেল না।

কিছুক্ষণ পরে দরজার বাইরে থেকে কে একজন 'নাগবেণী, নাগবেণী' বলে উচ্চকণ্ঠে ডাকতে ডাকতে ঘরের ভিতরে এসে পা দিল। নাগবেণীর দাদা সদাশিব। দাদার আওয়াজ চিনতে পেরে নাগবেণী উঠে দাঁড়ালে সদাশিব জিজ্ঞাসা করল, 'ছেলে কোথায় রে, বেণী?' নাগবেণী উত্তর দিল, 'ছেলে বোধ করি

তার দাদুর কাছে।' সদাশিব ভিতরে গিয়ে রামকে খুঁজে বার করে তার দু হাত ভরে খেলার জিনিস দিল। কিছুক্ষণ পরে এল ডাক্তার ভাই। সেদিন রাতের মধ্যেই সব আত্মীয় স্বজন এসে সমবেত হল। সকলের স্নেহ ভালবাসা পেয়ে রাম অবাক হয়ে গেল। এই প্রীতির অর্থ সে জানে না, এই আদর যত্ন, উপহার প্রভৃতির তাৎপর্য সে বোঝে না। অবোধ বালকই যদি এতটা অভিভূত হয়ে পড়ে, তবে নাগবেণীর ভাববিহ্বল হয়ে পড়া তো কিছু মাত্র অস্বাভাবিক নয়। এখন সে বুঝতে পারল এতদিন ধরে শ্বশুরের ভিটে আঁকড়ে থেকে স্বাভাবিক স্নেহ প্রীতির ঐশ্বর্য থেকে সে নিজেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল।

একুশ

রামকে নিয়ে নাগবেণীর পিত্রালয়ে আসার প্রথম কয়েকটি দিনকে উৎসবের দিন বললেও ভুল বলা হবে না এতদিন পর্যন্ত যে বাড়িখানা নব প্রসূতি কৃষ্ণবেণীর সেবা শুশ্রূষার বাড়ি হয়ে ছিল, এখন তা পরিণত হল অপ্রত্যাশিত ভাবে আগত নাগবেণীর আদর অভ্যর্থনার বাড়িতে। এতদিন যে আদর বর্ষিত হচ্ছিল কৃষ্ণবেণীর নবজাত কোলের শিশুর উপর, এখন তার অধিকারী হল অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিশু রাম। মংগলুর শহর থেকে সুদূর কোডিগ্রামে নির্বাসিতা নাগবেণী তার নিষ্ঠা ও সহিষ্ণুতার জন্য ইতিপূর্বেই বাড়ির সকলের চোখে আদর্শ রমণীরূপে গণ্য হয়ে উঠেছিল। সে এতদিন যে দুঃখ কষ্ট ভোগ করে এসেছে, তার আত্মীয় স্বজনেরা দূরে বসেও তাতে ব্যথিত না হয়ে পারে নি। আজ যে তাদের প্রীতি ও সহানুভূতি সেই অভাগিনী নারী ও তার পুত্র রামকে কেন্দ্র করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। নাগবেণীর সময় কাটে মায়ের সেবা শুশ্রূষায় এবং ছোট বোন কৃষ্ণবেণীর পরিচর্যায়। মাঝে মাঝে সে ভাইদের বাড়িতে যাতায়াত করে, কখনো কখনো যায় পাড়া-প্রতিবেশীদের বাড়ি। আর তার সময় কাটে এমন কয়েকজন পুরোনো দিনের বান্ধবীদের সাহচর্যে যারা এক সময়ে ইস্কুলে নাগবেণীর সহপাঠিনী ছিল এবং বিবাহের পরেও যাদের মংগলুর ছেড়ে যেতে হয় নি। রামের সময় কাটে খেলাধুলো করে, কখনো মায়ের সঙ্গে, কখনো দাদু-দিদিমার সঙ্গে কখনো বা সদাশিবমামার ছেলেপিলেদের নিয়ে। এই সমস্ত খেলাধুলোর ফাঁকে ফাঁকে তার মনে পড়ে যায় পুরোনো দিনের কথা— সমুদ্রতীরবর্তী এক অখ্যাত পল্লীর পুরোনো দিনের স্মৃতি। রামের মন উতলা হয়ে ওঠে। দাদু বা দিদিমা যদি তাকে নতুন জামা পরাতে চায়, সে অমনি বলে ওঠে, 'ওটা তোলা থাক সালিগ্রামের রথের জন্য', এই বলে সে দিগম্বর হয়ে ঘুরে বেড়ায়। 'তোমার আরও জামা রয়েছে, দাদুভাই। রথের জন্য অন্য জামা কিনে দেব, খালি গায়ে থাকতে নেই ছি!' এরকম কথা শুনে সে বিস্মিত হয়। মংগলুরে এক মাস বাসের পরে খাওয়া দাওয়া ও আদর যত্নে তার চেহারা পাল্‌টে গেছে। শুকনো শরীরের যে হাড়গুলি আগে খুব চোখ পড়ত, এখন আর তা দেখা যায় না। মুখেরও শ্রী ফিরেছে। তার ভরে আসা মুখ-

কান্তির দিকে চেয়ে চেয়ে নাগবেণী হঠাৎ বলে ওঠে, 'খোকা, এতদিন তোকে প্রাপ্য অন্ন থেকে আমি বঞ্চিত করে রেখেছিলাম না রে?'

নাগবেণীরও সুদিন এসেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঝাড়ু দেওয়া, মাজা-ঘষা ও ধোওয়া মোছার শ্রম শেষ হয়েছে। এখানে এ সমস্ত ঝি চাকরের হাতে। নাগবেণী বড় জোর রান্নাঘরের কাজে মাকে সাহায্য করে। কিন্তু মায়ের পছন্দ নয় যে মেয়ে তার কাজ করে। বারবার এই কথাই বলে, 'কয়েকটা দিন যাক তো নাগু। একটু বিশ্রাম কর।' সেই বিশ্রাম ও আহারের ফলে নাগবেণীর চেহারায় প্রথম যৌবনের লাবণ্য ফিরে না এলেও অকাল বার্ধক্যের ছাপও আর নেই। সে যদি ছেলেকে বলে, 'রাম, আমরা যদি এখানেই থাকি কেমন হয়?' রাম উত্তর দেয়, 'এখানে খুব খেতে পাই, মা। আমরা কি এখন এখানেই—এই দাদুর বাড়িতেই থাকব? আমাদের বাড়িতে কে আছে? ওখানে কালী-কপিলাকে কে চরায়?' মাঝে মাঝে তার মন সুদূর এক পল্লীগ্রামের সমুদ্রতীরে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সে বলে, 'এখানে তো সমুদ্র নেই, কোডিগ্রামের মতো খেলার জায়গা নেই। তুমি কেবল বলো—রাস্তায় যেও না খোকা। রাস্তায় যাব না তো কোথায় খেলা করব? দিন রাত কি ঘরের মধ্যে থাকব?' আবার কখনও বলে, 'তোমরা বলেছিলে মংগলুরে সমুদ্র আছে। কৈ সমুদ্র?' নাগবেণী একদিন ছেলের সমুদ্রবাতিক শান্ত করবার জন্য কলেজ টিলার উপরে নিয়ে গিয়ে বলে, 'ওটা কী, বল দেখি।' এই বলে বহুদূরে মসৃণ বিছানার মতো দৃশ্যমান তরঙ্গহীন সমুদ্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। রাম বলে, 'ওটা সমুদ্র বটে, কিন্তু একদম বাজে। আমাদের সমুদ্র কেমন জোরালো। তার কী ঢেউ! এটা দেখি মোষের মতো শুয়ে আছে।' নাগবেণী উত্তর দেয়, 'নারে খোকা। এ সমুদ্রও সেই রকমই। দূরে বলে ঢেউগুলি ঠিক বোঝা যায় না।' কিন্তু মায়ের কথায় রামের তৃপ্তি হয় না। তার মলিন মুখ দেখে নাগবেণী আশ্বাস দিয়ে বলে, 'আচ্ছা, তোর সদাশিবমামাকে বলব যাতে তোকে একদিন সমুদ্র দেখিয়ে নিয়ে আসে।'

'কবে মা?'

'তার তো ফুরসৎ হওয়া চাই।'

'তুমিও যাবে মা, কেমন?'

'আচ্ছা।'

এর পর থেকে রাম সমুদ্র দর্শনের আশায় দিন গুণছে। উকিলমামার ফুরসুৎ হয় না বলে রামের আকাঙ্ক্ষাও অতৃপ্ত থেকে যায়। আর দু'মাস পরেই গরমের ছুটি। তখন হয়ত যাওয়া যাবে।

এদিকে পিত্রালয় থেকে কৃষ্ণবেণীর বিদায় নেওয়ার সময় আসন্ন হল। তার স্বামী মাদ্রাস থেকে ছুটি নিয়ে এসেছে স্ত্রীকে নিয়ে যেতে। কয়েকদিন খুব আমোদ আহ্লাদের পরে যাত্রার দিন কৃষ্ণি বলল, 'দিদি, তুমিও কয়েক দিনের জন্য আমাদের সঙ্গে আসতে পারতে।' নাগবেণী বলল, 'আসব। রাম এখানে একটু ধাতস্থ হয়ে উঠুক। এখনও আমাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। যখন পারবে, আসব। আমার এখন ওখানেই বা কী, এখানেই বা কী ?' কিন্তু মনে মনে নাগবেণী জানে যে বাপের বাড়িই হোক বা বোনের বাড়িই হোক, কোথাও সে প্রকৃত সুখ পেতে পারে না। এখানে তার কোনো অসুবিধাই নেই। তবু, শত হলেও তার পিত্রালয়। রাম যত দিনে বড় হয়ে তার জন্য একখানি বাড়ি তৈরি করে দিতে না পারে, ততদিন সে উৎসবের প্রাণহীন মূর্তির মতো কেবল অর্ঘ্য উপচারই গ্রহণ করবে, তার বেশি কিছু নয়।

নাগবেণীর এখন প্রবল সমস্যা হল সময় কী করে কাটানো যায়। কোডিগ্রামে তার কাজের অন্ত ছিল না। এখানে এসে অফুরন্ত বিশ্রাম। নাগবেণীর কাজ বলতে এখন রামকে স্নান করিয়ে দেওয়া এবং তার সঙ্গে খেলা করা। উকিলবাবু বলেছেন আগামী জুন মাসে পাঁচ বছর পূর্ণ হলেই রামকে ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হবে। নাগবেণীর পক্ষে তখন বাড়ির টালি গোনা ছাড়া অন্য কোনো কাজ থাকবে না।

নাগবেণীর বাবা উকিলবাবুরও সময় কাটে না। কর্মজীবন থেকে অবসর নিলেও মাঝে মাঝে বড় ছেলের বাড়িতে গিয়ে তার মক্কেলদের পরামর্শ দেন। বাকী সময়টা কাটিয়ে দেন বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে। সন্ধ্যার পরে তাঁর গৃহখানি একটি মঠে পরিণত হয়। কর্ম জীবনে যে ব্যক্তি ধর্ম কর্ম ভক্তি উপাসনা ও প্রার্থনা সম্পর্কে ছিলেন সম্পূর্ণ উদাসীন, তিনি যেন এখন পূর্ব জীবনের পূজা অর্চনার শূন্যতা সুদে-আসলে চুকিয়ে দেওয়ার আকাঙ্ক্ষায় অতিরিক্ত উৎসাহে নতুন ভক্তি রাজ্যে ঘুরে বেড়ান। সিদ্ধারূঢ় স্বামীর মতো মহাপুরুষদের ছবি টাঙিয়ে পূজা করেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতা এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনী এখন তার 'হস্তদর্পণ' (নিত্যসঙ্গী)। নাগবেণীর অন্তরে এখনও সেই ধর্মের ডাক

আসেনি, এখন সে জীবনের লৌকিক দিকের অনুরাগিণী। তবে গ্রামের বাড়িতে যেমন ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রদীপ জ্বালাত, এখানেও তেমনি প্রদীপ জ্বেলে প্রণাম করে আসে। সরস্বতী যেমন অবসর সময়ে পা ছড়িয়ে জপের মালা ফেরাতে ফেরাতে 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্র জপ অভ্যাস করেছিল, নাগবেণীর তেমন কোনো অভ্যাস হয় নি।

ইতিমধ্যে রাম তার দাদুর চেয়েও বড় ভক্ত হয়ে উঠেছে। গানের তাল ধরতে পারলে সেও বসে এক-আধ ঘণ্টা ভজন গান করে। আর যেদিন খেলার ঝোঁকে তাল-টাল ভুলে যায় সেদিন তাকে ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। মংগলুরের নতুন পরিবেশে মা ও ছেলে এখনও খাপ খাওয়াতে পারে নি। নাগবেণীর মা সে কথা বুঝতে পারেন। বলেন, 'সময় কাটে না, না রে? চল কদ্রি (মংগলুরের একটি অঞ্চল) গিয়ে মংজুনাথকে (মংজুনাথ দেবতার মন্দির) দেখে আসি।' এই বলে তারা কদ্রির মন্দিরে যায়। রাম যেদিন সঙ্গে যায়, সেদিন মন্দির দর্শনের পরে নাগবেণী মন্দিরের সম্মুখস্থ টিলায় চড়ে দূর থেকে রামকে সমুদ্র দর্শন করিয়ে আনে। ততক্ষণ পর্যন্ত নাগবেণীর মা মন্দিরের কাছে বসে অপেক্ষা করেন। অতঃপর সকলে মিলে বাড়ির দিকে রওনা হয়। উকিল পত্নীর বন্ধু সংখ্যা কম নয়। ফেরার পথে কন্যা ও নাতিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এ বাড়ি সে বাড়ি যাতায়াত করে কালহরণ করেন।

কিন্তু যতই দিন যায়, নাগবেণীর পক্ষে জীবনটা যেন বোঝা হয়ে আসে। অবশেষে স্থির করে সময় কাটাবার জন্য আবার সে লেখা পড়া শুরু করে দেবে। ইংরেজি পড়া সেই কবে ছেড়ে দিয়েছে, আর চর্চা হয়নি। সেদিন একটা ইংরেজি গল্পের বই হাতে নিয়ে দেখে যেটুকু শিখেছিল তাও ভুলে গেছে। সেই গল্পটা সেখানেই ছেড়ে দিতে হল। একদিন বাবার নিত্যপারায়ণ ভাগবদ্‌গীতা-খানি খুলে বসে। ভাষা সংস্কৃত বটে, কিন্তু কন্নড় হরফে ছাপা। পড়তে কোনো কষ্ট হল না, অনেকটা পড়েও ফেলল। এখানকার একটা, ওখানকার একটা এইভাবে কতগুলি কথা মনে গেঁথে রইল। কিন্তু বাবা যেমন প্রতিদিন পারায়ণ করেন, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গুন্ গুন্ করে পাঠ করে যান, তেমন করে পাঠ করবার মতো ধৈর্য বা ভক্তি কোনোটিই নাগবেণীর নেই। সে মনে মনে বলে, 'আমি কেন এত ভক্তিহীনা হলাম? বড় শাশুড়ি, ছোট শাশুড়ি, পিসিমা, কত সাংসারিক দায়িত্বের মধ্যেও তাঁরা ভগবানের নাম স্মরণ করবার

সময় করে নিতেন। আমার এত বিশ্রাম, এত অবকাশ থাকা সত্ত্বেও ভক্তির দিকে মন যায় না।' তার মন যায় গল্প উপন্যাস পড়ার দিকে। বন্ধুদের কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে বই এনে পড়তে শুরু করে। চর্চা ও আগ্রহের ফলে ভুলে যাওয়া ইংরেজিটা আবার রপ্ত আসে। কন্নড় পড়ারও ভারি সুবিধা হয়। রাম যতক্ষণ পর্যন্ত না মায়ের হাত থেকে বই কেড়ে নেয়, ততক্ষণ তার গল্প-উপন্যাস পড়ার বিরাম নেই। এক একখানি বই পড়তে পড়তে বলে ওঠে, 'মানুষ কি এমনও হয়?' আর একখানি পড়ে বলে, 'কী নিদারুণ দারিদ্র্য! কোডিগ্রামে আমরা যে দুরবস্থায় ছিলাম, এরা দেখছি তার চেয়েও গরীব।' আর একটি গল্প পড়ে মন্তব্য করে, 'এটা একেবারেই বানানো, আগাগোড়া মিথ্যা!' এইভাবে নাগবেণী তার পঠিত বইগুলির মূল্য বিচার করে, বিচারের জন্য যে শিক্ষিত ও মার্জিত রুচি ও বুদ্ধির প্রয়োজন তা তার নেই বটে কিন্তু আছে জীবনের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা। রাম যখন গল্প বলার জন্য জিদ ধরে, নাগবেণী তখনই এই পঠিত গ্রন্থের গল্পগুলিই একটু রংচং মাখিয়ে শোনায়। কিন্তু রামের জীবনে একটা মুখ্য আকাঙ্ক্ষা এখনও অতৃপ্ত আছে বলে নাগবেণী প্রত্যেকটি গল্প শেষ করার আগে কৌশলে জুড়ে দিয়ে বলে, 'সেখানে আছে মস্ত সমুদ্র, তার মধ্যে নীল নীল জল, সেই নীল নীল জলে তরঙ্গের আবর্তন, আর সেই তরঙ্গপূর্ণ নীল সমুদ্রের বুকে ডুবে যায় একটি রক্তিম সূর্য।' একথা না বললে রামের কাছে কোনো গল্পই সম্পূর্ণ বলে মনে হয় না।

সময় গড়িয়ে যায়। সুখে হোক, দুঃখে হোক সময় থেমে থাকে না, এগিয়েই চলে। আজ চার মাস হয়ে গেল নাগবেণী পিত্রালয়ে এসেছে। জুন মাস এলে উকিলবাবু একদিন মিষ্টি সুরে নাতিকে বলেন, 'রাম, তুমি স্কুলে যাবে?' রামেরও ভালো লাগে না বাড়িতে বসে থাকতে। সদাশিবমামার ছেলে মেয়ে চিদানন্দ, মালতী, এই সব ছোট ছোট সঙ্গীদের নিয়ে খেলা করার ইচ্ছা কি কম? প্রথম দিন স্কুল থেকে বাড়িতে এসে রাম বলল, 'মা, ইস্কুলটা একেবারেই ভালো নয়। কত ছেলে মেয়ে সেখানে। কিন্তু সকলেই পেঁচার মতো চুপ করে বসে থাকে।' পরদিন চিদানন্দ এসে যখন জিজ্ঞাসা করে, 'রাম, ইস্কুলে যাবিনে?' তখন সে সাথী-সঙ্গী পাওয়ার লোভে নিজে নিজেই জামা পরে বেরিয়ে পড়ে। এইভাবে মাসখানেকের মধ্যেই সে দিনে দু বার করে ইস্কুলে ব্যাগ বহন করে যাতায়াত করার মতো যোগ্যতা অর্জন করে। রামের ইস্কুলে যাওয়ার সময় থেকে

বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে না আসা পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় নাগবেণীর পক্ষে আরও বোঝা হয়ে দাঁড়াল। দুপুরবেলায় রাম কিছুক্ষণের জন্য বাড়িতে আসতে পারে বটে, কিন্তু সদাশিবমামার বাড়িটা ইস্কুলের খুব কাছে বলে দুপুরের খাওয়া সেখানেই সেরে নেয়। অপরাহ্ণে ছুটির পরে যখন বাড়ি ফিরে আসে, তখন নাগবেণী তার হাত পা ধুইয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী হলো খোকা আজ ইস্কুলে ?' রাম তার সেদিনকার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে।

নাগবেণীর অফুরন্ত অবকাশে উপন্যাসের কল্পলোকে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া তার অন্য কোনো কাজ ছিল না। এই অবকাশ ও অধ্যয়নের ফলে তার মনের অনেক সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা মাথা তুলে দাঁড়াল। সে বিবাহিতা নারী, তার স্বামী বেঁচে আছে, আর সেই স্বামীই তাকে আজ এই অবস্থায় এনে দাঁড় করিয়েছে। জীবনে কত লোকই ত সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে দিন কাটাচ্ছে, আর তার জীবনটা মাটি হয়ে গেল এই স্বামীর জন্য! এই তো সবে পঁচিশ বছর বয়স তার। সামনে বাঁচবার মতো বহুদিন পড়ে রয়েছে। সেই দিনগুলি সে কি ভাবে কাটাবে ?—পাতার পর পাতা উল্টে, অন্য মানুষের জীবনকাহিনী পড়ে, আর নিজের জীবনটা বৃথা হল ভেবে ?—এই কি তার বিধিলিপি ? তার একটি ছেলে আছে, সে এখন দাদুর আশ্রয়ে বড় হয়ে উঠছে. ভবিষ্যতে সে কী হবে অনিশ্চিত। তার নিজের কী হবে তাও অনিশ্চিত। এই অনিশ্চিত জীবনসাগরের ঢেউগুলির দিকে চেয়ে চেয়ে সে কতই না ভাবনা চিন্তা করে। রাম একদিন বড় হয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবে, ততদিন পর্যন্ত তাকে বেঁচে থাকতে হবে। ওকে যেন আত্মীয় স্বজনহীন অনাথের মতো বেঁচে থাকতে না হয়। নাগবেণীর মনে হয় তাকে অন্তত এই আশা নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে যাতে সে ছেলেকে অভয় দিয়ে বলতে পারে, 'রাম, এই যে আমি জীবিত আছি, বাবা। তোমার কোনো ভয় নেই।' কিন্তু সে আর কতদিন ? অন্তত পঁচিশ বছর। এই দীর্ঘকাল সে কর্মহীন উপায়হীন হয়ে থাকতে পারবে কি ?

এই বিচিত্র প্রশ্নের মীমাংসার পথ যেন একদিন অপ্রত্যাশিত ভাবেই নাগবেণীর সামনে উন্মুক্ত হয়ে গেল। সেদিন সন্ধ্যায় সদাশিবের এক উকিল বন্ধু মোহন রাওয়ের বাড়িতে গান বাজনার জলসা। বাড়ির লোকজন নিয়ে সদাশিব যাবে সেই জলসার নিমন্ত্রণে। ছোটবোন নাগবেণী মন খারাপ করে বাড়িতে বিরস মুখে বসে না থেকে যদি জলসায় যায় তবে মন্দ কী এই ভেবে

যাওয়ার পথে সে নাগবেণীকে ডাকতে এল। নাগবেণীর যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু দাদার কাছে সব বিবরণ শুনে বলল, 'গান? বেহালা বাজিয়ে? কবে সেই ছোট বেলায় শিখেছিলাম। এখন কার তা মনে আছে? তুমি বলছ— যাব। কিন্তু রাম যে এখনই ইস্কুল থেকে ফিরবে। ও এসে গেলে ভাল হত।' দাদা বলল, 'আমাদের চিদা (ছেলে চিদানন্দ) রামকে নিয়ে যাবে। তুই আমাদের সঙ্গে চল্।'

এরা যখন গিয়ে গানের আসরে পৌঁছল, তখন সংগীতকার বেহালার কান মলে মলে স্বর মেলাচ্ছেন। উকিল উকিলবন্ধুর বাড়িতে গেলে সাধারণত যে গল্পসল্প হয় তার কিছুই না হয়ে গানের জলসাই অব্যাহত রইল। মেয়েরা সব এক জায়গায় বসেছে। নাগবেণী সেখানে গিয়ে রামের জন্য খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে গান শুনতে বসল। শিল্পী যে সুকণ্ঠ তা বলা যায় না। কিন্তু তাঁর আঙুলগুলি বেহালার তারের উপর নেচে নেচে তার হৃদয়ের স্বপ্ন উজাড় করে দিয়ে গৃহখানিকে পরিপূর্ণ করে দিল। একটির পর একটি রাগ ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে। গোড়ার দিকে শিল্পী তাঁর হাতের কলাকৌশল প্রদর্শনের দিকে নজর দিলেও ধীরে ধীরে কৌশলের পরিবর্তে ভাববিস্তার প্রধান হয়ে উঠল। কোনো কোনো শ্রোতা সমজদার রূপে বিবেচিত হওয়ার জন্য 'এটা বিলাবল', 'এটা বেহাগ', মুখে এই-রকম বাহাদুরী দেখিয়ে উরুর উপর তাল দিয়ে দিয়ে হস্ত কণ্ডূয়ন করছিল। শিল্পী প্রথম প্রথম শ্রোতাদের ফরমায়েস মতো গান গাইলেও অবশেষে তিনি তাঁর নিজস্ব প্রেরণার পথ ধরেই অগ্রসর হলেন। ঘণ্টা তিনেক পরে রাত ন'টা নাগাদ যখন গান শেষ হল, তখন আসরের শ্রোতৃবৃন্দ যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে বসে। নাগবেণীর কোলে রাম বসে আছে, কিন্তু তার খেয়াল হয়নি কখন তার ছেলে এসে তার কাছে বসেছিল। এক একটি রাগের স্বর বিস্তার যেন নৌকা হয়ে নাগবেণীকে পার করে নিয়ে যাচ্ছিল—সমুদ্র, মোহানা, ঝড়, বৃষ্টি, মৃত্যু, সংকট, আশা, নৈরাশ্য সব কিছুর উপর দিয়ে কোন্ সুদূর স্বপ্নলোকে। নাগবেণীর চোখ নিমীলিত, মুখ নিস্পন্দ।

সমবেত করতালির শব্দে নাগবেণীর খেয়াল হল জলসা শেষ হয়েছে এখন তাকে উঠতে হবে। কেবল তখনই খেয়াল হল রাম তার কোলের উপর বসে। 'খোকা, তুই কখন এলি?' 'কখন।' পথে নেমে সদাশিব জিজ্ঞাসা করল, 'কেমন হল রে নাগু আজকের গান?' নাগবেণী একটু সঙ্কোচভয়ে

বলল, 'আমি গান বাজনার কী জানি দাদা ? তবে সব মিলিয়ে ভালই হয়েছে মনে হয়।' বস্তুত নাগবেণী সেদিনই প্রথম বুঝতে পারল সংগীতের অনির্বচনীয় গভীরতা এবং সেই তৃপ্তিতেই পূর্ণ অন্তর দিয়ে বলে উঠল, 'উনি সত্য সত্যই মহান।' দাদা সায় দিয়ে বলল, 'আমারও তাই মনে হয়। বেহালা বাজাবার সময়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে আমার বারবার মনে হচ্ছিল উনি যেন কোনো উচ্চতর লোকে বসে রয়েছেন।'

সকলে যখন বাড়ি এসে পৌঁছল, তখনও বৃদ্ধ উকিলবাবু মেয়ের অপেক্ষায় বসেছিলেন। সদাশিব বলল, 'বাবা, তুমিও যেতে পারতে গানের জলসায়। আমি তো এ পর্যন্ত এমন বেহালা, এমন গান শুনিনি।' উকিলবাবু বললেন, 'গান যত ভালোই হোক, এক নাগাড়ে তিন-চার ঘণ্টা শুনলে আমার মাথা ধরে।' ছেলে হাসতে হাসতে বলল, 'তোমাদের ভজনগানগুলি তো তিন চার ঘণ্টার কমে শেষ হয় না। আমরা তখন ভজন শেষ না হওয়া পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকি নাকি ?' উকিলবাবু বললেন, 'তোদের ছেলে ছোকরাদের আর কথা কী ? ভজন গানও যা, অন্য গানও তা, একই ?'

নৈশভোজনের জন্য সদাশিব ওখানেই রয়ে গেল। আহারের সময়ে বলল, 'বাবা, আমার মনে হয় নাগবেণী এখন গান বাজনা শিখতে পারে। সংগীত চর্চায় ওর মনমরা ভাবটা কেটে যেতে পারে।' নাগবেণী পাশেই বসে খাচ্ছিল, দাদার কথায় মুখ তুলে তাকাল। তার মনের কথা দাদা জানল কী করে ?

দাদা বলল, 'ঠিক বলছি না, নাগু ? এই শহরে অবশ্য তেমন ভালো করে শেখাবার মতো লোক নেই। তবু ওই একটা বিদ্যা শিক্ষা হলে তোর মনের কষ্ট অনেকটা দূর হবে।' নাগবেণী দাদার কথায় সম্মতি প্রকাশ করল।

শোবার সময়ে রাম জিজ্ঞাসা করল, 'মা, ওই যে বেহালা বাজালেন উনি কে ?' পুত্রের অদ্ভুত কথায় নাগবেণীর হাসি পেল। বলল, 'কেন রে খোকা ? ভালো হয়নি ? তুই বুঝেছিস ?' রাম বলল, 'মা, আমি তোমার কোলে বসেছিলাম। গান বাজনা কিছুই শুনি নি। তোমার কোলে বসে বসে কী দেখলাম জানো ? আমাদের বাড়ি ছিল না ? সেই গ্রামের বাড়ি, নদী, মোহানা, সমুদ্র, সব যেন দেখছি মনে হল।' মা বলল, 'হ্যাঁ বাবা।' 'তুমিও দেখেছ মা ?' 'হ্যাঁ বাবা।' রাম আর বেশি কথা বলল না। শুধু জিজ্ঞাসা

করল, 'মা কবে আমরা আবার আমাদের গ্রামের বাড়িতে যাব।' 'তুমি বড় হলেই যাব।' 'মা, তুমি কি বেহালা বাজাতে শিখবে?' 'দেখি।'

রাম চুপ করে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। 'খোকা, রাত হল, এখন ঘুমোও। কাল ইস্কুল আছে না?' এই বলে নাগবেণী ছেলেকে ঘুম পাড়িয়ে তার কাছে নিজেও শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়ল বটে কিন্তু সহসা ঘুম এলনা। সেই সন্ধ্যার সুর-লহরী সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো তার সামনে ছড়িয়ে পড়ছিল। যখন ঘুমিয়ে পড়ল, নাগবেণী স্বপ্ন দেখল সে যেন ঢেউখেলানো নৌকায় শুয়ে শুয়ে বেহালার রাগিনীর মধ্যে সমুদ্রের ঘুমপাড়ানি গান শুনতে পাচ্ছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে মনে হয় তার মানসচোখে এক নতুন জগৎ খুলে গেছে—বিশ্রাম, শান্তি ও আনন্দের জগৎ।

সেদিন থেকে নাগবেণী ভাবছে—সেও যদি গান শিখতে পারে ভাল হয়। বিয়ের আগে ছেলেবেলায় যেটুকু ভজনকীর্তন শিখেছিল, এতদিনের ব্যবধানে তা একরকম ভুলেই গেছে। এখন আবার নতুন করে আরম্ভ করা কষ্টকর হলেও সময়টা মনের আনন্দে কাটানো যাবে—এই আশায় বাবার কাছে কথাটা পাড়ল। বাবা ভালো ভাবেই জানেন যে আজ সাত আট মাস হয়ে গেল নাগবেণী এসেছে, অথচ কোনো কিছু নিয়ে নিবিষ্ট থাকার মতো কাজ তার হাতে নেই। বাবা বললেন, 'মা, যদি ভজন গানের সময়ে ঠাকুরের সামনে করতাল নিয়েও বসতে পার, অনেকটা শান্তি পাবে।' পিতার কথামতো নাগবেণী কয়েকদিন ভজনগানে যোগ দেয়। তার চোখের সামনে অবশ্যই ঠাকুরের মূর্তি অধিষ্ঠিত, কিন্তু তার মনের গহনে কেবল মোহানার জলধারা। আর এই দুয়ের মাঝে রামের ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন। অবশেষে একদিন সে উকিলবাবুকে বলে, 'বাবা, মন যার স্থির হয়নি, ভজন গাইলে তার কী লাভ হবে?'

বাবার কাছে এই কথাটা বলার পরে তার মনে আর একটি সন্দেহও না এসে পারল না, 'ভজন গানের সময়ে যার মন স্থির হতে পারে না, সে কি বেহালা বাজাতে গিয়ে স্থৈর্যের পরিচয় দিতে পারবে?'

যাহোক, নাগবেণীর বেহালা শিক্ষা শুরু হল। শিক্ষক তার অচেনা নন। বারো বছর আগে যাঁর কাছে গান শেখার হাতে খড়ি হয়েছিল, সেই বৃদ্ধ সুব্বা রাও এখন আরও বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। ভদ্রলোক শান্ত নিরীহ নিরহঙ্কার, তিনি খুব জানেন বলে কোনো গর্ব নেই, অন্যকে শেখাতে পারেন বলে কোনো দেমাক

নেই। তবে কেউ যদি শিখতে চায়, শেখান। নাগবেণী যখন ছোট ছিল, তখন একদিন বলেছিলেন, 'মা নাগবেণী, সাধনা না করলে গান কি আসে ?' এই বারো বছরের মধ্যে বয়সের ভারে তিনি আরও নরম হয়ে পড়েছেন। কেবল বার্ধক্য নয়, বার্ধক্যের সঙ্গে দারিদ্র্যও এসে মিলেছে। ফলে তাঁর শিক্ষা দানের ব্যাপারেও কিছু শৈথিল্য দেখা দিয়েছে। রাম ইস্কুলে চলে গেলে নাগবেণী তার বেহালা নিয়ে বসে। অপরাহ্নে ছেলের ইস্কুল থেকে না ফেরা পর্যন্ত সংগীত চর্চায় তার প্রচুর অবসর। কিন্তু প্রায়ই নাগবেণী ধৈর্য হারিয়ে ফেলে। এক একবার নিরাশ হয়ে ছেড়ে দেয়, এক একবার মনে হয় যন্ত্রটাকে ভেঙে ফেলে। যখন তারের উপর বেসুরো আওয়াজ ওঠে, তখন তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে দেখে আসে, 'কেউ শুনতে পায়নি তো ?' গুরুর সামনে নাগবেণী যতক্ষণ থাকে, তার অর্ধেক সময় কেটে যায় বিদ্যাশিক্ষায়, বাকী অর্ধেক সময় কাটে গুরুর গার্হস্থ্য জীবনের সুখ দুঃখের গল্প শ্রবণে। তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কথা, তাঁর অসুখ ও দুঃখকষ্টের কথা, আরও কত কী সব শুনে শুনে নাগবেণীর মন করুণার ভার হয়ে ওঠে। গুরু মাঝে মাঝে বলেন, 'বাছা, এই সংসারের চিন্তাভাবনায় এক একবার মনে হয় বেহালা ও ছড় দুটোই ভেঙে ফেলে উনুনে গুঁজে যেখানে হোক কোথাও বেরিয়ে পড়ি।'

কথাটা শোনা অবধি নাগবেণীর চোখে ঘুম নেই। সংসারের চিন্তাভাবনা দুঃখকষ্ট ভুলে থাকবে বলে সে যখন সংগীতের আশ্রয় নিয়েছে, তখন তার গুরু বলছেন কিনা সংসারিক দুঃখকষ্টের জ্বালা ভুলিয়ে দিতে পারে এমন শক্তি গানের মধ্যে নেই! নাগবেণী খুব হতাশ হয়ে পড়ে। কিন্তু আবার তার মনে পড়ে যায় সেদিনকার সেই সান্ধ্য আসরের কথা—যেদিন বেহালার সুর-মূর্ছনা অন্তত কয়েক ঘণ্টার জন্য তাকে সংসারের. কথা ভুলিয়ে রেখেছিল। নাগবেণী আবার আশ্বস্ত হয়।

মোট কথা, সংগীতচর্চায় নাগবেণীর মেজাজ অনেকটা মংগলুরের আবহাওয়ার অনুরূপ। মংগলুরে যখন বৃষ্টি নামে, অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, চার মাস যাবত সে বৃষ্টির আর বিরাম নেই। তার পরে যখন রোদ উঠবে, তখন সাত আট মাস যাবত একটানা রোদে মানুষ সিদ্ধ এবং মাটি রুক্ষ হয়ে যাবে। যখন ঝোঁক আসে, নাগবেণী তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বেহালা নিয়েই পড়ে থাকে। কয়েক দিন এইভাবে চলে তো আবার কয়েকদিন গানের নাম-গন্ধও নেই। দেয়ালে ঠেস

দিয়ে রাখা বেহালার তারগুলিতে জং না ধরা পর্যন্ত সে একবার ছুঁয়েও দেখে না। কী যে ভাবে সেই জানে। ছাত্রীর মতিবুদ্ধি দেখে সুব্বা রাও শঙ্কিত হয়ে ওঠে। উপদেশ দেয়, 'মা, গান ছেড়ে দিও না। সংগীত হল দেবগণের অনুশীলিত বিদ্যা, তার অনাদর করতে নেই।'

* * * *

রামের জগৎ ধীরে ধীরে বিস্তৃত হতে থাকে এক সময়ে তার মনের দিগন্তে মা ছাড়া আর কারও অস্তিত্ব ছিল না। তার পরে এল দাদু ও দিদিমা, তারপরে মামাতো ভাই বোনেরা, ইস্কুলের বন্ধুবান্ধব, খেলাধুলা। স্বভাবতই মায়ের প্রভাব হ্রাস পেয়ে আসে। তা বলে ভালোবাসা কমে না। যখন মায়ের কাছে থাকে, মায়ের সঙ্গে কথা বলে, যখন দূর থেকে ডাক দেয় 'মা' বলে, তখন আগের দিনের সেই রাম দেখা দেয়—যে একদিন কোডিগ্রামের সমুদ্রতীরে মাকে ছাড়া আর কিছু জানত না। আজ বয়োধর্ম, পরিবেশ—এরাও বালকের মনে আসন পাবার জন্য দাবী জানাচ্ছে।

মংগলুর শহর হলে কী হবে? এখানে যারা বড় হয়ে উঠছে, তারাও তো সেই একই রীতিতে বসার সময়ে বসে, খাওয়ার সময়ে খেয়ে গতানুগতিক ধারায় আবর্তিত হচ্ছে। নাগবেণীর একসময়ে মনে হত কোডিগ্রামের জীবন ছিল বড়ই একঘেয়ে। আজ মনে হচ্ছে মংগলুরের জীবনেই বা এমন কী বৈচিত্র্য? তফাৎ যে নেই তা নয়। কোডিগ্রামে তার দিন কাটত ঘর গৃহস্থলির কাজে, মাঠের কৃষিকর্মে; এখানে দিন কাটে তার সংগীতচর্চায়। এমনি করে এক, দুই, তিন বছর কেটে গেল।

এই তিন বছরে রামের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। একদিন ছিল সে মায়ের একা একমাত্র। এখানে সে অনেকের একজন। দাদা চিদানন্দ, দিদি জয়া—এদের সঙ্গে লেখাপড়া শিখে, খেলাধুলো করে—সে বড় হয়ে উঠছে। সে বেশ বুঝতে পারে দাদু ও দিদিমার স্নেহ ভালোবাসার অধিকারী একা সে-ই নয়, আরও অনেকে। এই বোধ ছাড়া রামের মধ্যে একটা নতুন বিদ্যার সঞ্চার হয়েছে নাগবেণী যার নাম দিয়েছে 'গীচু' (হিজিবিজি দাগ টানা)। কাগজ, মেঝে, দেয়াল—হাতের কাছে যখন যেটা পায় তারই উপর দাগ টানে। 'মা, দেখেছ সমুদ্রের ছবি আঁকছি? এটা নৌকো, এই জাল, এই মাছ, এই মেঘ আর দেখ এই চাঁদ · কেমন হয়েছে মা?' নাগবেণী ছেলেকে উৎসাহ না দিয়ে মৃদু

তিরস্কার করে বলে, 'যা পাও তাতেই আঁকতে নেই, খোকা। তোমার স্লেট কোথায়? বারান্দার মেঝে ভর্তি এঁকে, দেয়াল ভর্তি এঁকে নোংরা কোরো না।' রাম বলে, 'মা, বড় সমুদ্র আঁকতে হলে এই স্লেটে কি চলে? বারান্দার মেঝে ও দেয়ালই তো ছোট। ওতে সমুদ্রের কিনারা আঁকলে বাগান আঁকার জায়গা থাকে না, বাগান আঁকলে মোহানা আঁকার জায়গা পাওয়া যায় না।' মা যদি বলে, 'তুমি ছোট স্লেটের উপর ছোট সমুদ্র আঁক।' রাম উত্তর দেয়, সমুদ্র কী করে ছোট হবে মা?' নাগবেণী মুখে বলে, 'পাগলা ছেলে।' কিন্তু মনে মনে বলে, 'এখনও তাহলে সমুদ্রের নেশা ওর কাটেনি। গ্রামে যখন ছিল, সমুদ্রতীরে না গিয়ে ওর দিন কাটত না। মংগলুর এসে সমুদ্রহীন গল্প শুনতে ওর ভাল লাগত না। এখন যে ছবি তাও সমুদ্রের। হাসতে হাসতে বলে, 'গত জন্মে তুই বোধ করি জেলের ঘরে জন্মেছিলি আর জাল দিয়ে খুব মাছ-টাছ ধরতি।' রাম রেগে গিয়ে বলে, 'আমি জাল ধরব না! তুমি ধরো। আমার মাছও চাই না, জালও চাই না।'

মাঝে মাঝে উকিলবাবু ঐরোডি ঘুরে আসেন, কিন্তু নাগবেণী এখানে বলে কোন দিন থাকেন না আজকাল। একবার যখন বাবা যাবেন বলে স্থির হল, নাগবেণীর ইচ্ছা হল সেও না-হয় বাবার সঙ্গে একবার গ্রামটা দেখে আসে। কিন্তু ইচ্ছা মনের মধ্যেই থাকল, মুখে প্রকাশ পেল না। সত্যই তো সে কি আর কোডিগ্রামে গিয়ে থাকতে পারে? মংগলুরে তিন বছর বাসের ফলে ছেলে তার ভালো খায়, ভালো পরে দারিদ্র্য কাকে বলে জানে না। রামকে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বড় হতে দেখে নাগবেণী ভাবে—এখন আর কোডিগ্রামের জন্য আকাঙ্ক্ষা কেন? সেই কষ্টের জীবন আমার জন্যই জমা হয়ে থাক। ওকে আর সেখানে নিয়ে কাজ নেই।' অথচ যখন কোডিগ্রাম থেকে চলে আসে, নাগবেণীর দৃঢ় সংকল্প ছিল কিছুকাল পরে আবার তারা ফিরে যাবে সেই গ্রামের বাড়িতে। কিন্তু আর উপায় নেই, এই নতুন জীবনের আনন্দ থেকে রামকে বঞ্চিত করা চলে না। সংকল্প তার শিথিল হয়ে আসে।

এমনি করে পাঁচ বছর কেটে গেল। রামের বয়স এখন দশ বছর। এই সময়ে উকিলবাবুর বাড়ির সকলের ঐরোডি যাওয়ার একটা সুযোগ এসে গেল। ছোট ভাই নারায়ণের মেয়ের বিয়ে। জ্যেষ্ঠ ভাই হিসাবে তাঁরই উচিত নিজে উপস্থিত থেকে কন্যাকর্তারূপে বিবাহ সম্পন্ন করা। যাতে সকলেই যেতে পারে

সেই ভাবে বিয়ের দিন স্থির করা হল গরমের ছুটিতে। উকিলবাবু তাঁর ছেলে-পিলে নাতিনাতনীর সকলকে নিয়ে একখানি মোটর বাস ভাড়া করে মংগলুর থেকে দেশে উপস্থিত হলেন। বলাই বাহুল্য, নাগবেণী ও রামও এসেছে।

বিয়ের তিন দিন আগেই তারা এসে পৌঁছাল। বাড়ির সকলকে অনেক দিন পরে একসঙ্গে পেয়ে নারায়ণয়্য খুব খুশি। বিবাহের উৎসব শেষ না হওয়া পর্যন্ত কারও আর বিশ্রাম ছিল না।

উৎসব শেষে উকিলবাবু স্থির করলেন এবারে কিছুদিন ঐরোডিতে কাটিয়ে যাবেন। নাগবেণীও যে এই সুযোগে একবার তার ঘরদোর দেখে আসার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু নাগবেণী অবাক হয়ে ভাবল, 'আচ্ছা রাম কি এত বছর মংগলুর থেকে তার পল্লীগ্রামের কথা ভুলে গেল নাকি?'

নাগবেণীর মংগলুর থেকে ঐরোডি এসেছে খবর পেয়ে বচ্চি তার মাঠানকে ও খোকাবাবুকে দেখবার জন্য কোডিগ্রাম থেকে ছুটে এল। বচ্চি এসে নাগবেণীকে বলল, 'মাঠান, বাড়িতে কবে আসবেন? আপনারা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার পরে ও দিকটা যেন শ্মশান বলে মনে হচ্ছে।...মাঠান, আপনি যে কালী গাইটা দিয়ে গিয়েছিলেন, সেটা মারা গেল গত বছরের আগের বছর। তবে আপনার কপিলা গাইর এখন দুটো বাছুর। এবারকার বিয়ানে চার পোয়া দুধ হয়। কে খায় বলুন? আমরা চাষ করে খাই, আমাদের আবার দুধ ঘি কেন? আপনারা এসে কয়েকটা দিন থাকুন, খোকাবাবু ইচ্ছামতো কপিলার দুধ খাবে।'

নাগবেণীর প্রতি বচ্চির যে স্নেহ প্রীতি তা তো এক পুরুষের নয়, পুরুষানুক্রমে চলে এসেছে এই দুই পরিবারের সম্পর্ক। গত পাঁচ বছরের অভাবে অনটনে বচ্চি শুকিয়ে একেবারে কাঠি হয়ে গেছে। নাগবেণীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাঠান, আপনাকে এখন সোন্দর দেখাচ্ছে। আর খোকাবাবুও বেশ মোটাসোটা হয়েছে। আমি তো তাকে চিনতেই পারি নি।' নাগবেণী বলল, 'হ্যাঁ রে বচ্চি, তোকে কেন এমন কাঙালের মতো দেখাচ্ছে? তোর স্বামী কেমন আছে? ছেলেপিলে?' বচ্চি উত্তর দিল, 'কী বলব মাঠান, একটার পর একটা বেপর্যয় লেগেই আছে। খাওয়াপরার ঠিক থাকলে সব ঠিক। আপনার ওই জমিটুকু ছিল বলে কোনোমতে বেঁচে আছি। আপনার কাকাবাবুকে তো ধান চাল

কিছুই দিতে পারিনি। আপনার শ্বশুরমশাই বেঁচে থাকতে কতটা জমির জন্য খাজনা দিতুম মাত্র পাঁচ মুড়ি। এখনকার জমিদার সেই জমির খাজনা করেছেন দশ মুড়ি। কী করব? সে জমি ছেড়ে দিতে হল। ঘরে লোক বেড়েছে। অন্য কোথাও যে টুকরো টাকরা জমি নেব, তা এত ছুটোছুটি করে কে? খাটিয়ে তো আমরা দুজন। ছেলেপুলেরা গোরু চরায়, চাষবাস করার মতো হয়নি ওরা।'

বচ্চির কথাবার্তা শুনে নাগবেণীর খুব ইচ্ছা হল একবার বাড়িঘর দেখে আসে। পরদিন ভোরে উঠে সে রামকে জিজ্ঞাসা করল, 'রাম, সমুদ্র দেখতে যাবি।' রাম নেচে উঠল। চিদানন্দ, জয়া ও রামকে সঙ্গে নিয়ে নাগবেণী নদী পার হতে দূর থেকে দেখতে পেল শ্বশুরমশাই যে দোতলা বাড় বানিয়েছিলেন তার উপরের ঘরখানি। নাগবেণীর কত কথা মনে পড়ে গেল। নদী পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে তারা বচ্চিদের বাড়িতে গিয়ে খবর দিল যে তারা এসেছে। বচ্চি বলল, 'মাঠান, আপনারা বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করুন। আমি এক্ষুনি আসছি।'

নাগবেণী সকলকে নিয়ে তাদের বাড়ির দিকে পা বাড়াল। পুকুর পাড় দিয়ে যেতে যেতে তার মনে হল সে যেন মাটির উপর দিয়ে নয়, ফুলের বিছানার উপর দিয়ে হেঁটে চলেছে। নাগবেণী জিজ্ঞাসা করল, 'রাম এটা কাদের বাড়ি মনে আছে?' রামের মুখে কোন কথা এল না। সে নিঃশব্দে বাড়ির ভিতরে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপরে দৌড়ে গিয়ে সটান বারান্দায় শুয়ে পড়ল। মাঠান আসবে বলে বচ্চি মেঝেতে ঝাঁটপাট দিয়ে লেপে মুছে পরিষ্কার করে রেখেছিল।

সকালবেলাকার কচি রোদ উঠোনে এসে পড়েছে। বাড়িটা যদিও খালি পড়ে রয়েছে তবু নাগবেণীর মনে হল যেন এ বাড়ির টালি, খড়, আড়া, দেয়াল সকলেই যেন মাথা উঁচু করে তাকে বলছে, 'এসো এসো।' বচ্চি একটা পিতলের বাসনে করে টাটকা দুধ দুয়ে এনে বলল, 'মাঠান, আপনার কপিলা গাইয়ের দুধ। ছেলেপুলেদের খাইয়ে দিন এটুকু।' চিদানন্দ, জয়া ও রামকে ডেকে নাগবেণী ঘটি থেকেই একটু একটু কাঁচা দুধ তাদের মুখে ঢেলে দিল। বলল, 'রাম আমাদের বাড়ির গাইয়ের দুধ খেলে।' রাম জিজ্ঞাসা করল, 'মা, এই কি আমাদের বাড়ি? তুমি যে কোডিগ্রামের কথা বলো, এই কি সেই কোডি।' মা বলল, 'ওরে বোকা, এই ক বছরের মধ্যে সব কিছু ভুলে গেলি?'

ইতিমধ্যে বচ্চির স্বামী কালো মাঠানকে দেখাবে বলে কপিলা ও তার বাছুর

দুটোকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির হল। বাছুর দুটোকে উঠোনে এনে বচ্চি বলল, 'মা দেখুন এটা তিন বছরের বাছুর, আর এইটা এবার হয়েছে।' নাগবেণী 'কপিলা' বলে ডাক দিতে সেই ইতর প্রাণটা আহ্বানকারীর গলার স্বর চিনতে পেরে নাগবেণীর দিকে দৌড়ে এল। রাম ভয়ে ভয়ে বলে উঠল, 'মা, গুঁতোবে গুঁতোবে।' নাগবেণী বলল, 'কপিলা গুঁতোবে আমাকে?'

অতঃপর অন্তরের উচ্ছ্বসিত বেদনা রোধ করা তার পক্ষে আর সম্ভব হল না। ছেলেপিলেদের সামনে কান্নার উপক্রম দেখে নাগবেণী বলল, 'রামু, জয়া চিদানন্দকে নিয়ে সমুদ্র দেখে আয়।' 'সমুদ্র আছে নাকি এখানে?' 'তুই সব ভুলে গিয়েছিস, খোকা। কালো, তুমি এই ছেলেগুলোদের সমুদ্র দেখিয়ে আনো গে। ওরা শহরের ছেলে, সমুদ্র দেখবে।' সমুদ্র দেখার উত্তেজনায় ওরা সকলেই চলে গেলে বচ্চি ও নাগবেণী মুখোমুখি বসল। নাগবেণীর চোখের জল আর কোনো বাধা মানল না, 'বচ্চি, এই মাটির ঋণ বোধ করি চিরকালের জন্য কেটে গেছে। আর যে আমরা এই জমি কোনোদিন এসে ভোগ করতে পারব মনে হয় না।' বচ্চিরও চোখে জল এসে গেল, 'মা জলের ঋণ, মাটির ঋণ— ব্রহ্মাঠাকুর কপালে লিখে থাকলে আছে, না লিখে থাকলে নেই।···ওখানে তো আপনি সুখেই রয়েছেন। খোকাবাবুর জন্য একটা জায়গা পাওয়া গেল, ভালই হয়েছে। আপনি এখানে থাকলে কী উপায় হত? আমাদের দেখুন, আমরা এই মাটিতেই জন্মেছি, বড় হয়েছি, তবু আমাদের দিন চলে না। আপনি কেমন করে থাকবেন।'

নাগবেণী ঘরের দরজাটা খুলে অনেকবার ঘর-বার করল। ঠাকুরঘরে গিয়ে দেখল, সেখানে প্রদীপ নেই, ঠাকুর নেই। সেই প্রদীপবিহীন দেবতার মূর্তিবিহীন ঠাকুরঘরের দরজা খুলে ভিতরে উঁকি মেরে দেখে পুনরায় বন্ধ করে দিল। অবশেষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করল, 'বচ্চি, উপাধ্যায়ের বাড়িতে এখন কে থাকে রে।' বচ্চি বলল 'উপাধ্যায় ঠাকুর তো মারা গেছেন। ছেলে ও ছেলের বৌ থাকে কুন্দাপুরে। গিন্নি বলেন আমি এখানেই চোখ বুজব।' এই বলে তিনি একাই বাড়িটা আগলে আছেন। চাষবাস কিছু নেই। ছেলে মাঝে মধ্যে এসে ডালচাল দিয়ে যায়।'

উপাধ্যায় গিন্নিকে দেখার জন্য নাগবেণী বচ্চির সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। সেই বৃদ্ধা রমণী নাগবেণীকে দেখে কেঁদে উঠলেন। কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'মা এই

আমার অবস্থা। তাঁর মৃত্যুর আগে যদি আমি যেতে পারতাম।' নাগবেণী তাঁকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দানের চেষ্টা করল। উপাধ্যায় গিন্নি দুপুরবেলায় তাঁর ওখানে খাওয়ার জন্য নাগবেণীকে খুব পীড়াপীড়ি করে বললেন—'কিছুই নেই, মা। শুধু শাক ভাত। তুমি খেলে আমার প্রাণে শান্তি পাব। তোমার খোকাকে দেখলে খুব ভালো লাগত।' নাগবেণী তাঁকে বুঝিয়ে বলল যে সঙ্গে দলবল থাকায় তার পক্ষে নিমন্ত্রণ রক্ষা করা সম্ভব হবে না। যদি সম্ভব হয় আরেক দিন কেবল রামকে সঙ্গে নিয়ে আসবে।

পথে আসতে আসতে দেখতে পেলে হোন্নে বাগানের গাছের তলায় রাশি রাশি হোন্নে ফল গড়াগড়ি যাচ্ছে। নাগবেণী জিজ্ঞাসা করল, 'এই ফলগুলি কেউ কুড়োয় না কেন রে?' বচ্চি বলল, 'ও মা! এখন তো সকলে কেরোসিনের 'লম্প' জ্বালায়। খালি ঠাকুরঘরের প্রদীপে একটু হোন্নে তেল দেয়।' নাগবেণীর খুব ইচ্ছা হল একবার শীনময়্যর বাড়ির খবর নেয়। কিন্তু সেখানে অযাচিত ভাবে যেতে তার মন সরল না। শুধু জিজ্ঞাসা করল, 'ও বাড়িতে এখন কে কে আছে?' বচ্চি বলল, 'এখন তো অনেক দিন হল বড় ছেলেই বাড়িতে থেকে দেখাশুনা করেন। ছোট ভাইয়ের জন্য তাঁর ব্যবসায়ে নাকি ভারি ক্ষতি হয়েছে। ছোট ভাই ওরটময়্য বাড়ি ঘর সব বেচে দিয়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছে। গেল বছর ও তার আগের বছর আপনার ঘরের লোক এসে ওরটময়্যর বাড়িতে উঠেছিলেন। কয়েক দিন থেকে আমাদের বাড়িতে গিয়ে আমার ঘরের লোককে খুব ভয় দেখিয়ে গেছেন।'

নাগবেণী বাড়ি ফিরে পুনরায় ঘরের দাওয়ার উপর বসল। মনে মনে বলল, 'এখন ছেলেপিলেগুলি এসে পড়লে তাড়াতাড়ি ঐরোডির দিকে রওনা হওয়া যেত। কাল আমি একাই একবার আসব।' বানরের পাল যখন সমুদ্র দেখে ফিরে এল, তখন রোদের তাপে মাটি গরম হয়ে উঠেছে।

বাইশ

ছেলেমেয়েগুলিকে একসঙ্গে করে নাগবেণী যখন ঐরোডি ফিরে এল সূর্য তখন হেলে পড়েছে। দুপুরের রোদে সকলেরই মুখ পাকা বিম্বফলের মতো লাল। পরিশ্রমে ক্লান্তিতে কারও মুখে কোনো কথা নেই। স্নানাহার করে ছেলেপেলেগুলি আবার খেলায় মত্ত হয়ে উঠল। নাগবেণীর মনে কেবল তার বাড়ির ভাবনা। নৈশ ভোজনের পরেই সকলেই যখন নিদ্রায় অভিভূত, নাগবেণীর চোখে ঘুম নেই। সে ভাবছে, 'যে কয়েক দণ্ড বাড়িতে গিয়ে বসেছিল, সেই সময়টা কত সুখে শান্তিতে কেটে গেল, সেখানে কত মাধুর্য! পেটের জ্বালা না থাকলে তার গৃহ স্বর্গের চেয়ে কম কিসে? ছেলেকে ডেকে বলল, 'রাম, বিছানা পেতেছি, শোবে না?' প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে নাগবেণীও ছেলের পাশে শুয়ে পড়ে। খানিক পরে রাম ধীরে ধীরে বলে, 'মা, কালও কোডি-গ্রামে যাবে? আমাদের বাড়িটা কী সুন্দর!' মা বলে, 'এই হাবাটা, তোর বাড়ি কিসের? তোর তো বাড়ির কথা কিছুই মনে নেই!'

'হ্যাঁ মা, যখন ওখানে গেলাম তখন সবটা মনে না পড়লেও যখন সমুদ্র পারে গেলাম তখন এক এক করে মনে পড়তে লাগল। কবে যে আমরা ও বাড়িতে ছিলাম সে কথা মনে না পড়লেও ওই সমস্ত যে আমার এই কথাই মনে হচ্ছিল।'

'সমুদ্রে গিয়ে কী করলি? স্নান করেছিস তোরা?'

'না মা, চিদানন্দদা বলেছিল, আয়, স্নান করি। আমার ভয় হল। আমি সমুদ্রের পারে বসে বসে ছবি আঁকছিলাম। ছবি আঁকা তো নয়, তুমি কী জানি বলো? হ্যাঁ মনে পড়েছে, সমুদ্রের পারে বসে বসে হিজিবিজি দাগ টানছিলাম, আমিও দাগ টানি, সমুদ্রের ঢেউ এসে মুছে ফেলে।'

'আমিও এক সময়ে ওইভাবে পাগলের মতো ওখানে বসে বসে কতবার দাগ টেনেছি! সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়েছি! কিন্তু সমুদ্রের কাছে মানুষের জারিজুরি?'

'ও কথা থাক্ মা। কাল আবার যাবে? ওখানে কয়েকদিন থাকলে কেমন হয়? তুমি তো বল ওটা আমাদের বাড়ি, তবে?'

'দেখি বাবা, ভেবে দেখি।'

পরদিন ভোরে নাগবেণী নারায়ণকাকার সঙ্গে কথা বলে সঙ্গে কিছু চিঁড়া-দইয়ের ব্যবস্থা করে রামকে নিয়ে রওনা হল। অন্য ছেলেপিলেরাও তাদের সঙ্গ নিল। কিন্তু নারায়ণকাকা সকলকে ধমক দিয়ে বলল, 'সেখানে পুকুর আছে, সমুদ্র আছে। তোরা যদি কেউ জলে পড়িস কে রক্ষা করবে রে? রামের হল ওটা নিজেদের বাড়ি।' 'ওরাও আসুক না কাকা', নাগবেণী একথা মুখে বললেও মনে মনে সে শান্তি নির্জন পরিবেশ কামনা করছিল। নাগবেণী ও রাম নদী পেরিয়ে কোডিগ্রামে পৌঁছল। সারাটা পথের আনন্দ কথাবার্তা বলে কেউ নষ্ট করেনি। এমন কি বাড়িতে পৌঁছেও তারা নীরবে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে দেখল।

রামের জন্য টাটকা দোহা দুধ এলে বচ্চি তাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। দুধটা গরম করবার জন্য সঙ্গে কিছু জ্বালানি কাঠও নিয়ে এসেছে। দুধটা গরম করে রাখা হলে ছেলে বলল, 'মা, সমুদ্র।' দুজনকে রওনা হতে দেখে বচ্চি বলল, 'আমার একটু অবসর আছে, মাঠান। আমিও আসি আপনাদের সাথে।' এই বলে সঙ্গ নিল। প্রথমে উপাধ্যায় গিন্নিকে তাদের আগমন বার্তা জানিয়ে নাগবেণী সমুদ্রতীরে গিয়ে সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে মোহানার দিকে অগ্রসর হতে থাকে। একদিন দুপুর রাতে ডুবে মরব বলে নাগবেণী যেখানে এসেছিল, সেই জায়গাটা নিকটবর্তী হতে অনেক পুরোনো স্মৃতি জেগে উঠল। মোহানা সরে গিয়ে এখন সেখানে বিশাল বালিয়াড়ি। কিছুক্ষণের জন্য নাগবেণী সেখানে দাঁড়িয়ে পড়লে বচ্চি জিজ্ঞাসা করল, 'মা এখানে দাঁড়ালে কেন? মোহানা এখনও অনেক দূরে।' নাগবেণী তখন তার সেই পুরানো দিনের কাহিনী শোনাল। মায়ের মুখে গল্প শুনতে শুনতে রামের যেন কী মনে পড়ে যাচ্ছে, সেই বর্ষীয়সী রমণী, যারা রামকে কোলে নিয়ে আদর সোহাগ করত, তাদের অস্পষ্ট মুখচ্ছবি মনের মধ্যে ঝিলিক মেরে মিলিয়ে যায়। সেখান থেকে ফেরার সময়ে পথে পড়ে ঐতু পূজারির নারকেল বাগান, নাগবেণী জিজ্ঞাসা করে, 'এখন বাগানটা কাদের বচ্চি?' বচ্চি বলে, 'কী জানি মা।' নাগবেণী ছেলেকে বলে, 'বুঝলি রামু, তোর ঠাকুর্দা বাগানটা কিনেছিলেন, তোর বাবা বেচে দিল।' নাগবেণী ছেলের কাছে তার বাপের কথা বড় একটা বলে না। এখন বলতে শুনে রাম জিজ্ঞাসা করে, 'বাবা এখন কোথায় থাকেন, মা?' নাগবেণী অনিচ্ছা প্রকাশ করে বলে, 'কেন জিজ্ঞাসা করছ, বাবা?'

ধীরে ধীরে তারা বাড়ির পিছন দিককার হোয়ে বাগানে এসে দেখে সেখানকার শীতল ছায়ায় কপিল গাই শুয়ে আছে। এরা গিয়ে কপিলার কাছে বসতে গোরুটি তার গলাটা বাড়িয়ে নাগবেণীর বাহুতে ঠেকিয়ে ধীরে ধীরে বুলিয়ে নিচ্ছে। কপিলার স্নেহ দেখে নাগবেণী বলল, 'বচ্চি, এই অবোলা প্রাণীদেরও কত প্রীতি, কত স্মৃতিশক্তি দেখলি?' ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন হোয়ে গাছগুলি সুগন্ধি ছড়াচ্ছে, শুকনো ফুল পড়ে গিয়ে মাটি পরিণত হয়েছে ফুলের বিছানায়। সেখানে বসে বচ্চি ও নাগবেণী অনেকক্ষণ ধরে তাদের জীবনের সুখ দুঃখের কথা বলতে লাগল। রাম তাদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে শুনতে এক সময়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, তুমি কি এখানে থাকতে চাও?' নাগবেণী ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চাই বললেই কি থাকার সুবিধা হবে?' বিধাতা যেখানে 'থাকব' বলে লিখে রেখেছেন, সেখানেই থাকতে হবে।' রাম একথার কী উত্তর দেবে? শুধু বলল, 'মংগলুরের চেয়ে এই বাড়ি ভালো না মা?'

বচ্চির মনে পড়ে গেল তার শ্বশুরের মুখে শোনা কথা। বলল, 'মা ঠাট্টা মনে করবেন না। আমার শ্বশুরমশাই বেঁচে থাকতে বলতেন, বুড়ো ঠাকুর মশাই অনেক টাকার মালিক। ছেলের উপর রাগ করে তিনি নাকি সমস্ত টাকা মাটির ভিতর পুঁতে গেছেন, কাউকে কিছু বলে যান নি।' 'তাই নাকি মা?' যদি সত্য হয়, তবে বাড়ির কোথাও না কোথাও টাকা থাকবে। আপনাদের ভাগ্যে থাকলে পেয়ে যাবেন।'

শ্বশুরমশাই যে দেয়ালের ফাঁকে ফাঁকে টাকা লুকিয়ে রাখতেন একথা নাগবেণীও শুনেছিল। কিন্তু বচ্চি যা বলেছে সে কথা তার কাছে নতুন। তাছাড়া স্বপ্নের জাল বোনা, শূন্যে সৌধ নির্মাণ করার মতো মেয়ে নাগবেণী নয়। বলল, 'বচ্চি, শ্বশুরমশাই নিজের হাতে আমাকে যা দিয়ে গিয়েছিলেন, কপাল গুণে তার কিছুই তো আমার নেই। এখন কি না চাইতেই পায়ে এসে টাকার কলসী লাগবে?'

বচ্চি বলল, 'আপনার না হলেও খোকাবাবুর হতে পারে না? তারই তো নাতি?

'তুই একটা পাগল, বচ্চি। যার যার কর্ম তার তার কাছে।' এই বলে নাগবেণী তার কথা শেষ করল।

এদিকে বেলা হতে বাড়ি ফিরে তারা কপিলার দুধ খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ

করল। উপাধ্যায় গিন্নির রান্না কী জানি কতক্ষণে হবে মনে করে চিঁড়াদইও খেয়ে নিল। কিছুক্ষণ পরেই ডাক শোনা গেল, 'নাগবেণী।' উপাধ্যায় গিন্নি রান্নাবান্না শেষ করে নিজেই ডাকতে এসেছেন। 'হ্যাঁ মা, তুমি আমায় ভুলে গেলে না কি, তাই খোঁজ নিতে এলাম।'

সেদিন সেই স্নেহময়ী বৃদ্ধা নাগবেণী ও রামকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যে আদর যত্ন করলেন তার কি তুলনা আছে? পাঁপড়, বড়া, সারু (টক), 'গোজ্জু' (সবজী), ভাত, এইভাবে তিনি নিজে মাস ভরে যা খান সেই সমস্ত একই দিনে ওদের জন্য তৈরি করেছেন। নাগবেণী বলল, 'কেন দিদিমা, এত সব তৈরি করতে গেলেন?' দিদিমা বললেন, 'তুমি কি এখানে নিত্য আসবে? এই খোকা আর কি আসবে এখানে?' নাগবেণী বলল, 'কেন দিদিমা, রাম যদি ভবিষ্যতে 'নিজের বাড়িতে থাকব' বলে মনে করে, তবে কি তাকে কোডিগ্রামে আসতে হবে না?'

'হ্যাঁ, শহর ছেড়ে এখানে আসবে? গ্রামে যারা ছিল, তারা এখন শহরে গিয়ে আর ফিরে আসতে চায় না। এখানে তারা আসবে কেন—'অবডে' পাতার 'তাল্লু' (ডালনা) খেতে? আমাদের গাঁয়ের অবস্থাটা দেখেছ? বেটা ছেলেদের পৈতে হয়ে গেলেই ছোটে বেংগলুর। এখন কোট গ্রাম (যে গ্রামে কোট শ্রেণীর বৈদিক ব্রাহ্মণদের বাস) মানে স্ত্রীলোকের গ্রাম। আমার মতো বুড়ি-বুড়ি, যারা চোখে দেখতে পায় না, যাদের অন্য কোনো উপায় নেই, তারাই থাকে গ্রামে। আমাদের কিট্টুকে বলেছিলাম, 'ঢের হয়েছে হোটেল। যে চারমুড়ি ধানের ক্ষেত আছে, তাই দেখাশুনা কর্, আমাদের কায় ক্লেশে একরকম হয়ে যাবে।' এই কথা শুনে বলে কি জান?—'হোটেল দিয়ে খুব টাকা হচ্ছে, মানমর্যাদা হচ্ছে।' সে কুন্দাপুরেই আছে। মাঝে মধ্যে ভাবি—আমি মরলেও তো একটা খবরও পাবে না।' নাগবেণী জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি গিয়ে কেন সেখানে ছেলের সঙ্গে থাকেন না?' 'বলো কী? সেই নোংরার মধ্যে? কত লোক আসে যায় হোটেলে, বাছবিচার নেই, আচার নিষ্ঠা নেই, আমি কি গিয়ে ওর মধ্যে থাকতে পারি? শেষকালে যেন এই বাড়িতেই 'রাম রাম' বলে মরতে পারি, মা।'

অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা চলল। বেলা পড়ে গেছে বলে নাগবেণী ছেলেকে নিয়ে রওনা হল। রাম বলল, 'মা, আর একবার সমুদ্র দেখে আসি,

চল।' তারা সমুদ্রের দিকে যায়। অপরাহ্নের আকাশ সোনালী হয়ে আসে। নাগবেণী তাড়া দিয়ে বলে, 'খোকা, অন্ধকার হয়ে এল, চল্ যাই।' রাম পিছন ফিরে চাঁদ দেখিয়ে বলল, 'মা, আজ ভয় কিসের? চাঁদ উঠেছে যে।'

'হ্যাঁ বাবা, চাঁদ আরও উপরে উঠলে নদীতে খুব জোয়ারের জল আসবে। নদী পার হওয়া শক্ত হবে।'

'তা হলে মা, এখানেই বাড়িতে শোব। গরমের দিন, বিছানার দরকার নেই। খাওয়ারও দরকার নেই, দিদিমার বাড়ির খাওয়া গলা পর্যন্ত রয়েছে।' সূর্য না ডোবা পর্যন্ত রাম সেখান থেকে নড়ল না। নাগবেণীও সূর্যাস্ত দেখার জন্য সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকল। ফেরার সময়ে পথের উপর জ্যোৎস্না, দুধারে তাল গাছের পাতায় পাতায় সমুদ্রের হাওয়া লেগে সেই পুরোনো পরিচিত শব্দ, তার পরে বালিয়াড়ি, বালিয়াড়ির পরে পুকুর পাড়, পুকুর পাড় দিয়ে এসে সদর দরজায় দাঁড়াল। উঠোনের চারিদিকে জ্যোৎস্নাস্নাত নারকেল গাছগুলি দাঁড়িয়ে থেকে যেন এই কথাই বলছে, 'এখানে থাকবে না? কোথায় যাবে তোমরা?' রাম বলল, 'এসো মা, আজ এখানেই থাকি। কাল সকালে আর একবার সমুদ্র দেখে তার পরে ঐরোডি যাব।' নাগবেণী বচ্চিকে ডেকে বলল, 'আজ তোকে আমাদের বাড়িতেই শুতে হবে। ঐরোডিতে একটা খবর পাঠালে ভাল হয়।' বচ্চি তার স্বামী কালোকে দিয়ে এই খবর পাঠিয়ে দিল, 'আজ রাতে মাঠান কোডিগ্রামেই থাকবেন, ঐরোডি যাবেন না।'

রাত্রিতে বচ্চির এনে দেওয়া একটি টিম্‌টিমে বাতি জ্বালিয়ে ওরা বারান্দায় বসল। খাওয়ার ব্যবস্থা নেই শুনে বচ্চি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বাড়ি থেকে দুধ নিয়ে এল। কেবল তাই নয়, 'মংগলুরে তালশাঁস পাওয়া যায় কি?' এই বলে ঠাট্টা করে, বচ্চি বাড়ি থেকে আনা তালশাঁসের টুকরোগুলি তুলে মা ও ছেলের সামনে রেখে দিল। রাম তৃপ্তি সহকারে খেতে খেতে বলল, 'মা, তালশাঁসে কা স্বাদ।'

টিম্‌টিমে আলোর সামনে দুটি রমণী অনেকক্ষণ বসে থেকে কখন এক সময়ে সেখানেই তারা ঘুমিয়ে পড়ল। সমস্ত রাত্রি ধরে সমুদ্রের সুরে সুরে তালপাতা ও নারকেল পাতার সংগীত গভীর ও প্রশান্ত নিদ্রায় তাদের আচ্ছন্ন করে দিল। শুকতারা দেখা দিতেই বচ্চি উঠে তার বাড়িতে গেল। আগের দিন সন্ধ্যায় সিদ্ধ করে রাখা ধানগুলিকে কুটে চাল করতে হবে। নাগবেণী ও রামের ঘুম

ভাঙল অনেক দেরিতে, বেলা সাতটায়। আগেকার দিনে নাগবেণীর ভোর বেলায় ওঠার যে অভ্যাস ছিল, শহরে গিয়ে আর তা নেই। যখন তারা ঘুম থেকে উঠল, তখন হাওয়া বদলাচ্ছে। পূর্বদিকে সূর্য উঠেছে, কিন্তু পশ্চিম আকাশ ঢেকে গেল মেঘের কালো কম্বলে। বাইরে এসে রাম পশ্চিম আকাশে রামধনু দেখে চিৎকার করে বলল, 'মা, মা, এদিকে দেখ। কী সুন্দর! চল যাই সমুদ্রে।' মা সংশয়ের সুরে বলল, 'যদি বৃষ্টি নামে, খোকা?' 'আরও মজা হবে।' দুজনেই বালিয়াড়ির দিকে অগ্রসর হল। উপরে কালো মেঘের আবরণ, নীচে সমুদ্রের বুকে তার কালো ছায়া, মাঝখানে সপ্তবর্ণের বাঁকা তোরণ রামধনু। বুঝি কোনো দেবতার বিবাহে বরুণদেব চন্দ্রাতপরচনার আয়োজন করেছেন—এমনি সমস্ত দৃশ্য।

মা ও ছেলে সমুদ্রতীরে পৌঁছে দু চোখ ভরে সেই দৃশ্য দেখতে লাগল। দু চার ফোঁটা বৃষ্টি পড়ে যেতে রোদ খুব চড়ে গেল, মেঘ পিঙ্গল হতে ধূসর বর্ণে পরিণত হল। অবশেষে সূর্যের সমস্ত তাপ যেন নিজেই টেনে নিয়ে মেঘ শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিল। নাগবেণী বলল, 'কী জানি কেন, ভোরবেলাতেই রোদটা খুব তেতে উঠেছে। চল্ যাই খোকা।'

আবার তারা বাড়ির পথ ধরে। পথে রাম প্রশ্ন করে, 'মা, এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে আমরা মংগলুরে গেলাম কেন?' 'বাবা, এখানে কে আছে আমাদের? সকলেই তো চলে গেলেন?' এই বলে নাগবেণী একে একে শ্বশুর, শাশুড়ি, পিসিমা সকলের কথাই বলল, কিন্তু স্বামীর উল্লেখ মাত্র করল না। রাম নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা কি আর বাড়িতে আসবেন না? এখন কোথায় আছেন তিনি?' উদাসীনভাবে নাগবেণী বলল, 'বাবা, তিনি ঠিক থাকলে কি আমাদের আজ এখানে-সেখানে পড়ে থাকতে হত?'

নাগবেণীরা ঐরোডিতে ফিরে এলে নারায়ণকাকা জিজ্ঞাসা করল, 'কী মা, দেখে এলে বাড়িটা? লচ্চ নাকি গত বছর দেশে এসেছিল। ওরটময়ার বিত্ত সম্পত্তি নাকি ওর জন্যই সব নষ্ট হয়ে গেছে। কতটা সত্য, কতটা মিথ্যা জানি না। লোকে এই রকম বলাবলি করে। মৈসূর, বেংগলুর শেষ করে এখন নাকি বিজয়নগরে একটা হোটেল দিয়ে বসেছে।'

'ওরটের স্ত্রী ও ছেলেপুলেদের খবর কী, কাকা?'

'স্ত্রীর অবস্থা তোরই মতো হয়েছে। ওরট এখানে কিছুই রাখে নি, সব

বেচে দিয়েছে। বৌ-ছেলেপুলেকে সেখানেও নিয়ে যায় নি। তাই সে বাপের বাড়িতে গিয়ে পড়ে আছে। বাপের বাড়ির অবস্থা এমনিতেই ভালো নয়। তিনটি ছেলেপুলে নিয়ে বৌটি গিয়ে ওঠায় সেখানেও অন্ন জোটে না। মংগলুরে তোর কেমন লাগছে বল। আমাদের এই নোংরা গ্রামগুলির তুলনায় যে কোনো জায়গাই ভালো মনে হয় না? এখানে পরনিন্দা, পরচর্চা, কলহ-বিবাদ, লোকের দুঃখকষ্ট—বলে আর শেষ করা যায় না।'

নাগবেণী : 'আমার কিন্তু মংগলূরে বসে এমন একটা দিনও যায় না যে বাড়ির কথা মনে পড়ে না। কাকা, আমি একা হলে কোডিগ্রামেই পড়ে থাকতাম। কিন্তু রাম সেখানে থেকে কী করবে? ওকি এই বয়সে রোঁয়ার কাজ, ফসল কাটা, বেগুন গাছের পোড়ামাটি দেওয়া—এই করে দিন কাটাতে পারবে?'

নারায়ণ : 'তুমি রামের কথা বলছ। এখন আমাদের গ্রাম অঞ্চলে একটা পোকা পুরুষমানুষও দেখা যায় না। চাষের সময়ে সকলে আসে হয় বেংগলুর থেকে, না হয় হাবেরি থেকে অথবা অন্য কোনো জায়গা থেকে। আগে এসে রোঁয়ার কাজ করে যায়, আবার আসে ফসল কাটার সময়ে। তার পরে আট মাস যাবৎ তাদের আর টিকিটি দেখা যায় না। যদি কোনো বিয়ে-পৈতা থাকে তবেই আসে।'

দিন দুয়েক পরে উকিলবাবু সপরিবারে মংগলূর ফিরে গেলেন। গরমের ছুটি শেষ হলে রাম পুনরায় শুরু করল তার বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন জীবন, নাগবেণীর মনে পড়ল তার বাদ্যযন্ত্রের কথা। তার যত রাগ-দাপ ঝাড়তে শুরু করে দিল ওই বেচারা বেহালাটির উপর। এখন সে আর তার গুরুর বাড়িতে যায় না, নিজে যতটুকু জানে সেই মতো ঘরে বসে বাজায়। বয়স হয়ে পড়াতে বেহালা হাতে নিলে সুব্বারাওয়ের হাত কাঁপে, আঙুলগুলি কেঁপে কেঁপে ওঠে। নাগবেণী মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সামনে বসে বাজিয়ে আসে। গুরু শুনে বলেন, 'মা, আমি খুব খুশি যে তুমি বেহালার চর্চা ছেড়ে দাওনি। আমার যারা এই বিদ্যা শিখেছিল, তারা সকলেই বিয়ে-থা হওয়ার পরে যন্ত্রটাকে মাচায় তুলে রেখেছে—গান্ধীজীর চরখার মতো। তুমিই একা এই বয়সেও চর্চা রেখেছ, আমি খুশি যে তোমার হাতের বাজনা যারা শুনেছে তারা আমার কথা স্মরণ করবে।'

গুরুর মুখে প্রশংসা শুনে স্বভাবতই নাগবেণীর খুব আনন্দ হল। নিজের বাড়িতে তার বেহালা বাজনায় কেউ কর্ণপাত করে না। রাম এক একবার বলে 'মা তুমি খুব সুন্দর বাজাও।' পুত্রের কথা কেবল মমতার বশে বলা, তাই নাগবেণী সে কথায় আমল দেয় না। আজ গুরুর মুখের প্রশংসায় তার শিষ্যার মনে খুব আনন্দ হল।

আর একদিন যখন গুরুর বাড়িতে বাজাতে গেল, সুব্বারাও বললেন, 'মা, তুমি একবার অন্তত দশজনের সামনে বাজাও।' নাগবেণী বলল, 'আমাদের কি এখন বেহালা বাজিয়ে বাহবা কুড়োতে হবে, না টাকা রোজগার করতে হবে?' গুরু বললেন, 'তা নয় মা। আমাদের দেশের লোক আমাদের মূল্য দেয় না। অথচ বাইরে থেকে যদি কোনো 'বাঁঝা পণ্ড'ও আসে, তাকে দেবতা বলে মানে।'

এই কথার দু'বছর পরে সুব্বারাওর আগ্রহ ফলপ্রসূ হল। মোহন রায়ের বেহালাবাদক বন্ধু রাঘবেন্দ্র রায় আর একবার মংগলুরে এলেন। তখন সদাশিবের ভারি ইচ্ছা হল তাঁকে একদিন বাড়িতে অভ্যর্থনা করে নাগবেণীর বিদ্যাটা যাতে দশজনের সামনে প্রচার করা যায় সেই ব্যবস্থা করতে। ব্যবস্থা মতো পাঁচ-সাতজন বন্ধুবান্ধবের একটি ছোটখাটো আসর বসানো হল। এই আসরে কে কে উপস্থিত রয়েছেন নাগবেণী তার কিছুই জানত না। নাগবেণীর পাশে বসে তাল দিচ্ছেন তাম্বুলচর্বণরত বৃদ্ধ সুব্বারাও আর এক পাশে বসে আঙুল দিয়ে তানপুরার শ্রুতি বজায় রাখছে শ্রীমান রামু। মধ্যস্থলে মাথা নীচু করে নাগবেণী একটার পর একটা গান বাজিয়ে চলেছে। ঘণ্টা দুয়েক বাজনার পরে কে একজন সামনে থেকে বলে উঠলেন, 'তোড়ি'। নাগবেণীর অন্তরকে নাড়া দেবার মতো একটি রাগিনী হল তোড়ি। নাগবেণী ধীরে ধীরে তোড়ি বাজাতে শুরু করে। সুব্বারাও পাশে বসে খুব মাথা দোলাচ্ছেন। বেহালার তার থেকে যে মধুর সুরলহরী বেরিয়ে আসছে সুব্বারাও জীবনে এ পর্যন্ত কোথাও তেমন শোনেন নি। বাজাতে বাজাতে নাগবেণী একবার মাথা তুলে তাকাল, কে তোড়ি রাগের ফরমায়েশ করেছেন বোধ করি তাই দেখার জন্য। মাথা তুলে তাকাতেই হঠাৎ তার হাত স্তব্ধ হয়ে গেল, বাজনা বন্ধ হয়ে গেল। সেই যে কয়েক বছর আগে দাদার বন্ধু মোহন উকিলের বাড়িতে বসে 'ও অন্দু' (হায় সেদিন) বলে গানখানি বাজিয়ে নাগবেণীর অন্তরে সংগীতের তৃষ্ণা

জাগিয়ে দিয়েছিলেন যে রাঘবেন্দ্র রায়, তিনি এসে আসরে বসে নাগবেণীর বাজনা শুনছেন !

সুব্বারাও বললেন, 'থামলে কেন মা ?'

নাগবেণী বলল, 'ওঁর সামনে বাজাব আমি ?'

সুব্বারাও আসরের দিকে তাকালেন। সেই আগন্তুকের পরিচয় তাঁর জানা ছিল না। নাগবেণী বলল, 'আমার বাজনা যথেষ্ট হয়েছে। এবারে আমরা ওঁর বাজনা শুনব।'

বন্ধুরা সকলেই অনুরোধ করল রাঘবেন্দ্র রায়কে। তিনি নাগবেণীর বেহালাটি নিয়ে যেখানে বসেছিলেন, সেখান থেকেই তোড়ি রাগের 'আলাপ' করলেন। বাজাতে বাজাতে তিনি হিন্দুস্থানী ভৈরবী রাগের গভীরতায় নেমে গেলেন। সুব্বারাও ধীরে ধীরে বললেন, 'বাঃ, বেশ!' জলসা শেষ হতে নাগবেণীর দাদা সদাশিব উকিল রাঘবেন্দ্র রায়কে বলল, 'এসব আপনার অনুগ্রহ। সেবার আপনার বাজনা শুনে নাগবেণী আবার বেহালা বাজাতে শুরু করে।' পরে সুব্বারাওকে দেখিয়ে বলল, 'ইনিই ওর গুরু।' সুব্বারাও রাঘবেন্দ্র রায়ের মন্তব্য শোনার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন। রাঘবেন্দ্র রায় বললেন, 'মা মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে তুমি একটি জটিল অরণ্য পার হয়ে এসেছ। তুমি ও তোমার গুরু দুজনেই মহান্।' শুনে নাগবেণীর লজ্জা হল। অতঃপর রাঘবেন্দ্র রায় সুব্বারাওর সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন, 'গান বাজনা শেখাটা কিছু শক্ত নয়, অভ্যাসের ফলে বিদ্যা রপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু যে বাজায়, সত্যিকারের বাজনা তার হৃদয় থেকে, তার ভিতর থেকে আসে। এর ছড়ির প্রতিটি টানে হৃদয়ের গভীর বেদনা ফুটে উঠছিল। আপনি যে এত বড় শিল্পী আমি জানতুম না। আপনার হাতের বাজনা কবে শুনব ?' সুব্বারাও বললেন, 'আমি বাজনা ছেড়েছি আজ তিন বছর হল। বেহালা ধরলেই হাত কাঁপতে থাকে। বয়সও তো হল কম নয়, সত্তর পার হয়েছে। আমি এখন বুড়ো হাবড়ার দলে।' ব্যথিতকণ্ঠে রাঘবেন্দ্র রায় বললেন, 'ও কথা বলবেন না।' সুব্বারাও বললেন, 'পেটের দায়ে যে শিল্পচর্চা করে তার গতি আর কী হবে ?' তাঁর কথার পশ্চাতে একটা দারিদ্র্যের সুর।

পরদিন রাঘবেন্দ্র রায় সুব্বারাওর বাড়িতে গেলেন। সেখানে নাগবেণীকে আনিয়ে আরও কয়েকটি সংগীত শুনে অবশেষে বললেন, 'আমি আবার কবে

বেংগলুর আসব জানি না। তবে এবারে যে মধুর সুর শুনে গেলাম তা কখনও ভুলতে পারব না।' প্রস্থানের আগে তিনি সঙ্গে আনা একখানি শাল নাগবেণীর বৃদ্ধ আচার্যকে উপহার দিয়ে তাঁর চরণ ছুঁয়ে প্রণাম করলেন। সুব্বারাওর চোখে জল এসে গেল। তিনি বললেন, 'আমার ছেলেরাও আমাকে এভাবে সম্মান করে নি। আপনি করলেন, আপনার মতো একজন গুণী শিল্পী।'

সেদিন থেকে নাগবেণীর জীবনে সংগীত একটা প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল। এতদিন সে ছাত্রী ছিল, এবার তাকে গুরুগিরি শুরু করতে হল। দাদার ছেলে-মেয়ে, দাদার বন্ধু মোহন রাওর ছেলেপুলে সকলেই বেহালা শেখে। মনে হলে রামও মাঝে মাঝে নাড়াচাড়া করে দেখে।

সংগীতে একরকম আনন্দ আছে সন্দেহ নেই। জীবনের রসহীন মুহূর্তগুলি সংগীতের স্পর্শে সরস হয়ে ওঠে তাও সত্য। কিন্তু হৃদয়ের গভীরে যে বেদনার কাঁটা বিদ্ধ হয়ে আছে সংগীত তাকে তুলে ফেলতে পারে কি? এ প্রশ্নের উত্তর নাগবেণী আজও পায় নি।

এদিকে পর পর দুটো ঘটনা তার জীবনে ঘটে গেল। সেই বছরেই নাগবেণীর গুরু দেহরক্ষা করেছেন। তার মৃত্যুশয্যার পাশে নাগবেণী মেয়ের মতোই সাশ্রু নয়নে দাঁড়িয়ে ছিল। গুরুর শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী, রাঘবেন্দ্র রায় সেদিন যে শালখানি উপহার দিয়েছিলেন, সেখানি তাঁর মরদেহের উপর বিছিয়ে দেওয়া হয়। খ্যাতিহীন গৌরবহীন গুরুর দুঃখপূর্ণ জীবন স্মরণ করে নাগবেণী ভাবল, 'উনিই যখন চলে গেলেন, তখন আর সংগীতে কি প্রয়োজন?' কিন্তু সময় কাটে না বলে নাগবেণীকে পুনরায় সংগীতের স্মরণ নিতে হয়।

পরের বছরের ঘটনাটি নাগবেণীর পায়ের নীচে মাটি যেন সরিয়ে দিল। একদিন উকিলবাবু সান্ধ্য পূজায় বসে 'বুকে ব্যথা' বলে শুয়ে পড়লেন। খবরটা শুনে ছেলেরা ছুটে এল। ডাক্তার ছেলে বাবাকে পরীক্ষা করে একটা ইনজেকশন দিয়ে সদাশিবকে বলল, 'দাদা, ওষুদ দিচ্ছি বটে, কিন্তু মনে হয় অন্তিম মুহূর্তের খুব বেশি বাকী নেই।' এই কথাই সত্য হল, সেই রাতেই রোগীর মৃত্যু ঘটে। মাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নাগবেণী নিজের দুঃখ চেপে রাখল।

মাস খানেক পরে নাগবেণী তার মায়ের সঙ্গে দাদার গৃহে এসে প্রবেশ করে। নতুন পরিবেশ যে সম্পূর্ণ ভিন্ন একথা রাম না বুঝলেও নাগবেণীর কাছে কিন্তু দাদার বাড়ি নিজের বাড়ি বলে বোধ হয় না, বাপের বাড়ি বলেও না। দু'এক

মাস মোটামুটি ভাবে কেটে যাওয়ার পরে স্পষ্টই বোঝা গেল পরিবারে এই লোক-সংখ্যাবৃদ্ধি এ বাড়ির গিন্নি সদাশিবের স্ত্রীর চোখে প্রীতিকর বোধ হয় নি। মাঝে মাঝে তার অসন্তোষ বিদ্রূপাত্মক কথাবার্তার মধ্যে প্রকাশ পেতে থাকে এবং নাগবেণী কিংবা তার মা কারও কাছে সেটা অগোচর থাকে না।

দাদুর মৃত্যুর পরে মায়ের সঙ্গে রামের ছ-সাত বছর কাটল বড় মামা সদাশিবের বাড়িতে। নিশ্চিন্তে পড়াশুনো করে ম্যাট্রিক পরীক্ষাও সে পাশ করে ফেলল। আজ কত সহজে ও সংক্ষেপে কথাটা বলা যায়, কিন্তু সেই দীর্ঘকাল নাগবেণী যে সেখানে কত সঙ্কোচে, মুখ বুজে সকল দুঃখকষ্ট অপমান সহ্য করেছে সেকথা অত সহজে ও সংক্ষেপে বলার নয়। যারা তার বেহালা শোনার সুযোগ পেয়েছে, তারা হয়ত সেই সুরের কান্না থেকে তার অন্তরের পুঞ্জীভূত ব্যথা-বেদনা কিছুটা আঁচ করতে পারে। নাগবেণী মুখে যে কথা বলতে পারে না, বেহালার সুরে তা প্রকাশ হয়ে যায়।

পিতৃ সম্পত্তি থেকে যা আসে, তা ছাড়া সদাশিবের মাসিক আয় শ'দুই টাকার মতো। পাঁচ সন্তানের সংসারে টাকাটা এমন কিছু নয়। বড় ছেলে চিদানন্দ এখন 'ইন্টার' পড়ে, আর একটি ছেলে এবছর স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবে। বাকীরা ইস্কুলে পড়ার বয়সী। ভবিষ্যতে সন্তান সন্ততির সংখ্যা যে দ্বিগুণ হবে এরূপ সম্ভাবনাও যথেষ্ট। এই যখন অবস্থা তখন মা ও বোনের দায়িত্ব; রামের লেখাপড়ার দায়িত্ব সদাশিব কেবল কর্তব্যবোধেই পালন করতে পারে, পালনের সামর্থ্য তার নেই। স্ত্রী ললিতা মাঝে মাঝে স্বামীর কাছে অনুযোগ করে, 'ওরা কি কিছুকাল তোমার ভাইদের বাড়িতে, কিছুকাল ঐরোডিতে গিয়ে থাকতে পারে না? আমরাই বা এই ভার আর কতকাল বইব?'

পরীক্ষার ফি দেবার জন্য রাম যেদিন বারোটি টাকা চেয়েছিল, সেদিন তার বড় মামীর বিরক্তি চরমে উঠে, 'বেশ কথা, আমরা আর কত দেব? এ বছর চিদানন্দও তো পরীক্ষা দিচ্ছে, তার ফি দিতে হবে না?' দুর্দৈববশত পাশের ঘরে বসেছিল নাগবেণী। ভ্রাতৃবধূর কথাটা তার কানে গিয়ে পৌঁছল। সেদিন বিকেলেই নাগবেণী তার ছোড়দার বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'দাদা, রামের পরীক্ষার ফি দিতে হবে, তুমি আমাকে বারোটা টাকা দিতে পার?' টাকা পেয়ে সেদিনকার মতো সমস্যার সমাধান হয়ে গেল বটে, কিন্তু নাগবেণী যে

সদাশিবকে কিছু জিজ্ঞাসা না করে, ছোট ভাইয়ের কাছে টাকা চাইতে গিয়েছে নাগবেণীর এই ব্যবহারে সদাশিব তার উপর বেশ অসন্তুষ্ট হল। এই সমস্ত ব্যাপারের মূল কারণ যে ললিতা নিজেই, সে কথাটা সে গোপন করে গেল, নাগবেণীও কিছু প্রকাশ করল না। এমন কি দাদার অসন্তোষের কথা জেনেও সে বৌদির উপর কোন দোষ চাপাল না। 'ওদের অন্নের ভরসায় পড়ে আছি আমরা। আজ ওদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোনো কলহ-বিবাদ সৃষ্টি করা আমাদের উচিত নয়' এই ভেবে নাগবেণী চুপ করে রইল। 'ছোটবোন আমার সম্মান ক্ষুণ্ণ করেছে' ভেবে সদাশিবও অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করল।

রামের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে নাগবেণীর একবার ইচ্ছা হল দেশের বাড়িটা দেখবার জন্য। একথাও মনে হল, অল্প কয়েক দিনের জন্য হলেও ননদের ঋণের অন্ন থেকে তো দূরে থাকা যাবে। নাগবেণী মাকেও সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইলে সদাশিব ওদের সকলকে দেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিল।

নারায়ণকাকার সংসারও আর ছোট নেই। তবু তার বাড়ির পক্ষ থেকে এই নবাগত অতিথিদের আদর অভ্যর্থনার কোনো ক্রুটি হয় নি। ঐরোড়িতে আসার পরদিনই নাগবেণী বলল, 'মা. চলো একবার কোডিগ্রাম ঘুরে আসি। কতদিন বাড়িটা দেখিনি।' রামের আনন্দ ধরে না। সে এখন ষোল বছরের তরুণ বালক। আগে যে বার এসেছিল, তখন তার বয়স মাত্র দশ। এখন ভ্রমণ করবার ইচ্ছা আরও বেশি হয়েছে। পড়ে পড়ে এক ঘেয়ে লাগার পরে যখন প্রবল আকাঙ্ক্ষা হল কোথাও বেড়িয়ে আসার তখনই এল এই সুযোগ। রাম স্বভাবতই খুশি। কিন্তু শহরেই যাঁর সারাজীবন অতিবাহিত হয়েছে, সেই বর্ষিয়সী রমণী কি পাল্লা দিতে পারেন মেয়ে ও নাতির উৎসাহের সঙ্গে। তবু মেয়ের বাড়ি দেখবেন বলে তিনি কোডিগ্রামে যেতে সম্মত হলেন। নদীতে জল সামান্যই, হাঁটুর উপরে নয়। তবু এই বৃদ্ধার জন্য সকলেই একসঙ্গে নৌকা যোগে নদী পার হল। সেখান থেকে মাঠ পেরিয়ে বাড়ির পথ। যেতে যেতে রাস্তা থেকেই নাগবেণী ডাক দেয়, 'বচ্চি!' বচ্চি বাড়ি নেই বলে সে ডাক কানে পৌঁছয় না। তারা ছেলেপিলেরা গিয়ে মাকে খবর দেয়, 'কারা যেন এসেছে, ঠাকুরমশাইয়ের বাড়ির দিকে গেল।' 'তালাদেওয়া ঠাকুর-বাড়িতে এখন কে আসবে? এলে মাঠাকরুনই হবেন'—এই অনুমানে ভর করে বচ্চিও চটপট নাগবেণীদের ওখানে দৌড়ে আসে। বচ্চি ও নাগবেণী

সমবয়সী। কিন্তু বচ্চি ইতিমধ্যেই দশটি সন্তানের জননী হয়ে পড়ায় নাগবেণীর চেয়ে তাকে কুড়ি বছরের বড় বলে বোধ হচ্ছে। বচ্চির কোলে একটি শিশু— নাতনী, তার মেয়ের মেয়ে। বচ্চির গলার আওয়াজ, চলাফেরা, কথাবার্তা থেকে মনে হয় সংসার যাত্রার শেষ ধাপে এসে সে পা দিয়েছে।

নাগবেণী বলল, 'কেমন আছিস বচ্চি ?'

'কী বলব মাঠান ? কোনো রকমে দিন গুনছি। ঘরের মানুষটা রোগে পড়ে আছে। এদিকে ঘরভরা ছেলেপুলে। কখনও একবেলা, কখনও আধবেলা খেয়ে কোনোমতে বেঁচে আছি। এ কে মা? খোকাবাবু? কত সুন্দর দেখাচ্ছে!'

নাগবেণীর মা বচ্চির পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে নাগবেণী বলল, 'ওরা আমাদের প্রজা। আমাদের খাজনা করা জমি-জায়গা ওর স্বামীকে বর্গা দিয়েছি। নামে মাত্র হলেও এই জমি-জায়গা আমাদের হয়ে থাক্—এই ভেবে খাজনার স্বত্ব বজায় রাখার জন্য এই ব্যবস্থা করেছি।' কিছুক্ষণ পরে বলল, 'মা, এখানে থাকলেই ভাল হত। পরের ফেনাভাতে পড়ে থাকার চেয়ে এখানে মন্দ কী ?'

'হ্যাঁরে নাগু, আমারও ভাল লাগে না ওখানে। ছেলের বাড়ি বলে কী, আমার জন্য কার কী কষ্ট হয় ভেবে আমিও তোদের বচ্চির মতো দিন গুনছি। ছেলের বৌয়ের দানের ভরসায় পড়ে থাকতে হবে ভাবলে মোটেই ভালো লাগে না। তোমার বাবা জেনে শুনেই ছেলেদের জন্য আলাদা আলাদা বাড়ি করে দিয়েছেন। কিন্তু তিনিই তো চলে গেলেন!'

নাগবেণী বচ্চিকে জিজ্ঞসা করল, 'উপাধ্যায় গিন্নি বেঁচে আছেন, রে ?'

বচ্চি জবাব দিল, 'মাঠান, প্রাণটা কি 'শাশ্বত' ? বয়স তো কম হয়েছিল না। গেল বছর বর্ষাকালে চলে গেলেন। যেদিন মারা যান, বাড়িতে কাকপক্ষীটি পর্যন্ত ছিল না। কারা জানি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, সব দেখে কুন্দাপুরে খবর পাঠিয়ে ছেলেকে ডেকে আনল।'

নাগবেণী বলল, 'মা, আমি যখন আগের বার আসি, উপাধ্যায় গিন্নি তখন এই কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন, আমার মৃত্যুকালে বাড়ির খুঁটিই গতি। তাই তা হল মা!'

এইসব কথাবার্তার মধ্যে রাম এসে বলল, 'মা, একবার সমুদ্রতীরে ঘুরে আসব ?' নাগবেণী বলল, 'এসো, বাবা।' রাম একা একা প্রবল

উৎসাহে বালিয়াড়ির উপর দিয়ে টিলা পেরিয়ে সমুদ্রতীরে গেল, এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াল। জলের কিনারে সারি-দিয়ে-বসা সমুদ্রের কাকগুলিকে গুনে গুনে দেখল। কাঁকড়াগুলিকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে গর্তের মধ্যে ঢোকাল। অবশেষে পড়ুকেরে গ্রামের জেলেদের জালের নৌকাগুলিকে দূর থেকে দেখে তাড়াতাড়ি তাদের কাছাকাছি গিয়ে হাজির হল। জেলেরা জাল টানছে। রাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিস্মিত চোখে তাই দেখতে লাগল। জালে-পড়া রাশি রাশি মাছের মধ্য থেকে জেলেরা সমুদ্রের সাপগুলিকে টেনে টেনে ফেলে দিচ্ছে আর বালির মধ্যে পড়ে শ্বাস ফেলতে না পেরে সাপগুলি আছাড়-বিছাড় করছে দেখে রামের খুব কষ্ট হল। কেবল তাই নয়, কোথা থেকে দলে দলে বাজ পাখি এসে ছোঁ দিয়ে সেই সাপগুলি তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তারপরে মাছ নিয়ে সে কী কাড়াকাড়ি! জেলেরা মাছ ধরে ঝুড়িকে-ঝুড়ি বোঝাই করে আর সেই বোঝাই করা মাছের ঝুড়ি থেকে যার যার ভাগ তুলে নেবার জন্য দলে দলে কাক ও বাজপাখিদের তুমুল প্রতিযোগিতা। এ এক বিচিত্র খেলা। আজ আর সমুদ্রের বাহ্য সৌন্দর্য রামের মনকে আকৃষ্ট করল না। আজ তার দৃষ্টি সমুদ্র আশ্রয় করে যারা জীবনসংগ্রামে ব্যাপৃত তাদের দিকে। এই সব দেখতে দেখতে সূর্য এসেছে ঠিক মাথার উপর। শরীর ও মুখ লাল হয়ে গেছে। ক্ষুধায় পেটের মধ্যে চিঁচিঁ করছে! তাড়াতাড়ি সে বাড়ির দিকে রওনা হল। বালি এতই তেতে উঠেছে যে পা ফেলা দুষ্কর। রাম মনে মনে বলল, 'বাপ্‌স্‌, এ পথ কি এতই লম্বা যে আর শেষই হতে চায় না?'

বাড়িতে ফিরে রাম বলল, 'মা, এখন আর পায়ে হেঁটে ঐরোডিতে যাওয়া চলবে না, বাপু। কয়েকটা ডাব আর তালশাঁসের জোগাড় হলে দুপুরবেলাটা এখানেই কাটানো যায়।' এই বলে যখন সে হাঁপাচ্ছিল, নাগবেণী বলল, 'খোকা, পুকুর থেকে চান করে আয় দেখি।' রাম খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। ব্যাপারটা এই—রাম সমুদ্রতীরে বেড়াতে গেলে পরক্ষণেই ঐরোডি থেকে লোক এসে রান্নার জিনিসপত্র এবং দু'একখানা মাদুর দিয়ে গেছে। 'দু দিনের জন্য হলেও এবারে কোডিগ্রামেই থাকব'—নাগবেণী এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করায় নারায়ণকাকা সম্মতি দিয়েছিল। কিন্তু কেবল একটি সতর্কবাণী করে দিয়েছিল। বলেছিল, 'তোমার হনুমান্ নায়কটি যেন সমুদ্রে স্নান করতে না যায়, মোহানার কাছেও যেন স্নান না করে।' বস্তুত সমুদ্র দেখে, তার জল মুখে দিয়ে রাম থু থু করে

ছিটিয়ে দিয়েছিল। সমুদ্রের আছড়ে পড়া ঢেউয়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পা চালাবার ইচ্ছা হলেও সুউচ্চ তরঙ্গ নির্ঘোষে রামের বুক দুরদুর করে উঠল : 'বাপ্‌স্‌' বলে চমকে উঠে সে ফিরে আসে। শৈশবে সমুদ্রের উপরে যে ভরসা ও বিশ্বাস জন্মেছিল, এখন কৈশোরে তা পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে গেছে।

রামের স্নান না হওয়া পর্যন্ত মা ও দিদিমা অপেক্ষা করে বসে রইল। দিদিমা বচ্চির এনে-দেওয়া কলার পাতা বিছিয়ে বললেন, 'রামের ফিরতে আর কত দেরি, বাছা?' খিদের চোটে তাদের পেটে খলবল করছিল। স্নান করে রাম খেতে এলে মা বলল, 'কিছুই নেই, খালি ফেনাভাত ভোজন।' কিন্তু আহারকারীদের ক্ষুধার ফলে সেদিনের সেই লবণ-মরিচের খাওয়া যেন একটা বিশেষ ভোজ বলে মনে হল। নাগবেণীর মনে পড়ছে অতীত জীবনের সুখদুঃখের দিনগুলি। লঙ্কা কামড়ে খেতে খেতে সে বলল, 'মা, কতদিন এরকম খাই নি। ভগবান কেন আমাকে পরের অন্নে ফেলে রেখেছেন?' মা এই বলে সান্ত্বনা দিলেন, 'বাছা, তোমার দাদার অন্নকে পরের অন্ন বোলো না। তোমার বৌদি অবশ্য অন্য কুল গোত্রের মেয়ে। সে কেমন করে তোমার রামকে নিজের ছেলেমেয়ের মতো করে দেখবে?'

তিন দিন ধরে তাদের এই বনভোজনের ব্যবস্থা চলল। রাম বলল, 'ক্যাম্প লাইফ।' কখনো সমুদ্রতীরে, কখনো মোহানার ধারে, কখনো কাজুবাদামের বাগানে সে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ক্ষুধা পেলে কাজুবাদাম রয়েছে। ফলগুলি পেকে উঠেছে। প্রয়োজন মতো বীজ এনে মাকে পুড়িয়ে দিতে বলে। দুপুরের আহারের জন্য আছে ঘোলের জল, 'কেসু'র চাটনি, মিষ্টি আলুর 'বজ্জি', কাঁঠাল বীচির ডালনা। সমস্ত তরকারি বচ্চি জোগাড় করে দেয়। তিন দিন সেই শান্ত পরিবেশে থেকে নাগবেণীর মা বললেন, 'নাগু, রামের ভাবনা না থাকলে তুই এখানেই থাকতে পারতিস। এখানে যা খুশি কর, বলবার কেউ নেই, কেউ কৈফিয়ৎ চাইবে না। কারও ধার ধারতে হয় না। খেতে হয় খাও, পরতে হয় পরো। পেট ভরাবার জন্য কিছু একটা হলেই হল। ফেনাভাত হল তো ফেনাভাতই সই।'

নাগবেণী মায়ের কথায় পুরো সায় দিয়ে বলল, 'আমাদের কপিলার বাছুর রয়েছে। দুধ হয়। বচ্চিকে বললে ও ফিরিয়ে দেবে। আমার ইচ্ছা কারও আশ্রয়ে না থেকে, আর কিছু না জোটে ঘোলের জল দিয়ে দুটো ভাত খাই।

কিন্তু রামের মন কেমন কে জানে? ভবিষ্যতে ও কী-না-কী পড়বে কে বলতে পারে?'

তৃতীয় দিন অপরাহ্ণে নাগবেণীর অনেক দিন পরে সমুদ্রতীরে যাওয়ার সুযোগ হল। রাতের রান্নাটা শেষ করে, 'মা তুমি একটু বসো, আমি আসছি' এই বলে নাগবেণী ছেলের সঙ্গে পা বাড়াল। ওরা যখন সমুদ্রতীরে পৌছল, তখন মেঘশূন্য পরিষ্কার আকাশে রক্তিমাভ সূর্য ঝিলমিল ঝিলমিল করে সমুদ্রের জলে ডুবছে। সূর্যের লাল আলোয় ওদের মুখও রাঙা হয়ে উঠেছে। সমুদ্রসৈকতের উপর দিয়ে জেলেরা জাল নিয়ে যেতে যেতে ভাবছে এখানে এই সমুদ্র কিনারে যাঁরা বসে আছেন, এই নতুন লোক কারা? অনেকক্ষণ তাদের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে জেলেরা অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন সন্ধ্যার আলোও ক্ষীণ হয়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে এল।

ফেরার পথে নাগবেণী ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, 'খোকা, আমাদের গ্রামটা এখন কী রকম লাগছে তোর কাছে?'

রাম প্রশ্ন করল, 'কেন মা?'

নাগবেণী বলল, 'আমার মনে হচ্ছে এখানে থাকাই ভালো। কেন আর পরের অন্নের জন্য পড়ে থাকা?' রাম বলল, 'মা, আমাদের গ্রামখানি যে সুন্দর সন্দেহ নেই। এই বাড়িওতো আমাদের। এখানে থাকতে বাধা কিছু নেই। কিন্তু মা, যদি এখানেই থেকে যাই ভবিষ্যতে অন্নসংস্থানের কী হবে?'

'তাহলে কি তোর মামাবাড়িতেই থাকব বলছিস?'

'তা নয় মা। আমার হয়ত বলা উচিত নয়। আমরা ওখানে থাকলে তাদের কেমন কেমন লাগে। কারও গলগ্রহ হয়ে থাকা ঠিক নয়। তা ছাড়া এর পরে আমি 'ইন্টার' পড়ার জন্য অন্য কোথাও যাব। মংগলুরে যে পড়ব না তা আমি ঠিক করে ফেলেছি।'

'কোথায় পড়বি তাহলে?'

'মংগলুর নয় এটা নিশ্চিত। তবে আর কোথায় তা এখনও ভাবিনি। যেমন করে হোক বি. এ টা পাশ করতে পারলে পরে যাহোক কিছু করতে পারব। এখন কাজে ঢুকলে পনেরো টাকার চাকরিও পাওয়া যাবে না।'

'খোকা, তুই একা কোথাও থাকতে পারলে আমরা এখানে মায়ে-ঝিয়ে কোনো প্রকারে দিন কাটাতে পারব। তোর দিদিমার নামে আমার বাবা কিছু

টাকা রেখে গেছেন। না হয় কেবল ফেনাভাত খেয়েই আমরা দুজনে এখানে থাকব। কারও কোনো কথা শুনতে হবে না। নারায়ণকাকাও বলেছেন বিপদে-আপদে তিনি সাহায্য করবেন। আমার কিন্তু তোর জন্যই বেশি ভয় খোকা। তোর বি. এ সি. এ করতে কত টাকা লাগবে কে জানে? কে দেবে সেই টাকা? বড়দা আর কত সাহায্য করবে?'

তারুণ্যের আশায় উৎসাহিত হয়ে অদৃষ্ট ভবিষ্যৎকে বিশ্বাস করে রাম বলল, 'দেখি মা, যা হোক কিছু একটা হবে।' কথা বলতে বলতে তারা বাড়ি ফিরল। রাত্রে খাবার সময়ে আর একবার সেই সমস্ত কথার পুনরাবৃত্তি হল।

পরদিন সকালে তারা ঐরোডিতে ফিরে যাবে কারণ কাকার প্রেরিত রসদ এই কয় দিনে শেষ হয়ে গেছে। তা ছাড়া কোডিগ্রামেই যদি পাকাপাকিভাবে বাস করতে হয় তাহলে কাকার সঙ্গে পরামর্শ করেই তা করা উচিত। এইসব চিন্তা করে সকলেই পরদিন সকালে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হল। রওনা হওয়ার সময়ে নাগবেণী বচ্চিকে ডেকে বলল, 'বচ্চি, আমরা হয়ত এখানেই থাকতে আসব। এলে পরে একটা বাছুর কিন্তু দিবি।' বচ্চি বলল, 'মাঠান, আপনার জিনিস আপনাকে না দিলে ভগবান দেখবেন না?'

ঐরোডির বাড়িতে ফিরে আসার দু'এক দিন পরে নাগবেণীর মা দেওরকে তাঁর মনের কথাটা বললেন। নারায়ণয্য বিস্মিত হল। বলল, 'বৌদি, আপনিও আপনার মেয়ের পাগলামিতে পড়ে গেলেন?' নাগবেণীর মা বললেন, 'তা নয়, ঠাকুরপো। আপনি জানেন না…। আম'র এখন শেষ সময়। ভাবছি আর ঋণের অন্ন খাব না।' পরে অনেক কথাবার্তা হল। নারায়ণয্য সবটা বুঝতে পারল সাংসারিক জীবনের স্বাভাবিক বিকার নাগবেণী এবং তার মায়ের মনকে বিষিয়ে তুলেছে। বলল, 'বৌদি, আমার কোনো অমত নেই। বছরে আপনাকে একশ টাকা দেওয়া হবে—দাদা এইরকম ব্যবস্থা করে গেছেন। কাজেই আপনার চিন্তার কোনো কারণ দেখছি না। এক শ' টাকা কোডিগ্রামে যথেষ্ট। তেমন টানাটানি পড়লে আমি তো আছি। কিন্তু রামের ভবিষ্যৎ কী? এখনও ছেলেটা বাপের মুখ দেখল না। এখন ও মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকতে পারবে?'

নাগবেণী: 'কাকা, রামের জন্য চিন্তা নেই, ও কোনোরকমে থাকবে। ওর পক্ষেও আর মংগলুর ভাল লাগছে না। তা ছাড়া দাদা তো ছ' বছর পালন করল। আর কত করবে?'

বার বছর আগে ঐতালের বাড়ি থেকে যে সমস্ত বাসনকোসন ঐরোডি গিয়েছিল, সপ্তাহখানেকের মধ্যে সেগুলি সব কোডিগ্রামে এসে পৌঁছল। নারায়ণ-কাকার লোকজন এসে ঐতালের বাড়িখানাকে আবার পরিষ্কার করে দেওয়াল-গুলিকে গোপীচন্দন মাটি দিয়ে লেপে গোয়ালঘর ঠিক করে দিয়ে গেল। কাজকর্ম শেষ হওয়ার পরদিনই নাগবেণী সোৎসাহে মাকে নিয়ে কোডিগ্রামে এসে উপস্থিত হল। ঐরোডি থেকে রওনা হওয়ার সময়ে রাম বলেছিল, 'মা, দেশে আসার পরে তোমার বেহালা যে মাচায় উঠে বসেছে। তুমি বোধ করি ওটা আর স্পর্শই করবে না।' নাগবেণী উত্তর দিয়েছিল, 'না রে খোকা, ওটা না থাকলে আমার সময় কাটবে কী করে?' মায়ের কথায় বেহালার বাক্সটাকে কাঁধে চাপিয়ে রাম মা-দিদিমার অনুসরণ করল।

কোডিতে আসার দু' দিনের মধ্যেই নাগবেণীর বোধ হল যেন এইটেই তার বাড়ি এবং এ বাড়ি থেকে সে কখনও কোথাও নড়ে নি। নারায়ণকাকা খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের নতুন সংসার কেমন চলছে নাগবেণী?' নাগবেণী হেসে বলল, 'এমনিতে তো সবই ভাল, কাকা। কেবল চাষবাসের হাঙ্গামাটা বোধ হয় আর করতে পারব না।' রাম হেসে বলল, 'কে, মা? তুমি করবে চাষবাস?' রামকে লক্ষ্য করে নারায়ণকাকা বলল, 'এই পাগ্‌লা, তোর মা একদিন তোকে কোলে নিয়েই চাষবাসের কাজ করত। তুই কি জানিস বল।'

এদিকে গরমের ছুটি শেষ হয়ে আসে। রাম অত্যন্ত অস্থির হয়ে ঘোরাঘুরি করছে। 'অতঃপর কী?' এই চিন্তায় ভারি 'অস্তব্যস্ত' হয়ে পড়েছে সে। বালিয়াড়ির তালগাছগুলির পাতা যেমন হাওয়ায় চঞ্চল হয়ে ওঠে, রামের মনও আজকাল তেমনি চঞ্চল। মংগলুর ছেড়ে আর কোথায় যাওয়া যায়? মাদ্রাস? স্থান অবশ্য ভালই। কিন্তু সেখানে কত টাকা লাগবে কে জানে?... ইতিমধ্যে সদাশিবের কাছ থেকে নারায়ণকাকার নামে একখানি চিঠি আসে, 'মা কেমন আছেন? নাগবেণী? রাম তার পরে কী করবে?....' নারায়ণকাকা স্পষ্টভাবে সবকথা বিস্তারিত না লিখে শুধু এইটুকু জানায়—'নাগবেণীকে নিয়ে বৌদি এখন কোডিগ্রামেই আছেন। রামও আপাতত সেখানে। এর পরে সে কী করবে কিছু জানি না।...তবে আপাতত মংগলুরে কেউ যাবে বলে মনে হয় না।' চিঠির এই শেষ কথাটি সদাশিবকে খুবই আহত করে। তাহলে

মায়ের পক্ষেও তার বাড়িতে থাকা মনঃপূত নয়? সদাশিব দুঃখের আবেগে স্ত্রীকে এসে বলে, 'তোমার মুখের চুলবুলির জন্য মা পর্যন্ত আমার বাড়িতে থাকতে চায় না।' কিন্তু যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করে সদাশিব তার ছোট ভাইয়ের সঙ্গে পরামর্শ করে নারায়ণকাকাকে আর একখানি পত্র দেয়—'কাকা, নাগবেণী ও মা বোধ করি আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছে বলেই এখানে ফিরতে চায় না। রাম তো এখানে আসতে পারে। এখন লেখাপড়া ছেড়ে দিলে পরে কষ্ট পাবে। খালি স্কুল ফাইন্যালের দিন চলে গেছে। ও অন্তত বি. এ. টা পাশ করুক। দু ভাই মিলে ওকে মাসে দশ টাকা করে দেব। এখন ওর যা ইচ্ছা।'

চিঠির তাৎপর্য রামকে জানানো হলে সে বলল, 'মা, আমাদের দশটা টাকা দরকার হবে না বোধ করি।' দিদিমা বললেন, 'বিনা টাকায় কি লেখাপড়া হবে? দশটা টাকা পেলেও তোমার কষ্ট কম হবে।' রাম কোনো কিছুই স্থির করতে পারল না। টাকাটা প্রত্যাখ্যান করবার মতো অবস্থা নয়, আবার গ্রহণ করবারও ইচ্ছা নেই।

জুনমাসের গোড়াতেই রাম তার মায়ের কাছে বিদায় নিল। বলল, 'মা, আমার জন্য তুমি ভাবনা কোরো না। যেমন করে হোক লেখাপড়া চালিয়ে যাব। কোথাও গিয়ে একটা আস্তানা না পাওয়া পর্যন্ত তোমাকে চিঠিপত্র দেব না। কিন্তু তাই বলে তুমি চিন্তা কোরো না কিন্তু।' বিদায় গ্রহণের আগের দিন রাতে ছেলেকে কাছে বসিয়ে নাগবেণী তার জীবনবৃত্তান্ত শুনিয়ে অবশেষে বলল, 'বাবা, তিনি আমায় ত্যাগ করেছেন, করুন। আমি এখন বেঁচে আছি কেবল তোর জন্য। তুইও যদি আমাকে ত্যাগ করিস ।' কাল থেকে ছেলের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে ভেবে নাগবেণী কান্নায় ভেঙে পড়ল।

কোডিগ্রামের মোহানায় ঝাঁপ দিয়ে মা আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল এই সংবাদ শুনে অদেখা বাপের প্রতি রামের ক্রোধ চড়ে গেল। মায়ের দুঃখে বিগলিত-হৃদয় বালকের মতো অশ্রু বিসর্জন করে রাম বলল, 'মা, আমাকে তুমি বিশ্বাস কর। আর যাই করি, তোমাকে কখনও ত্যাগ করব না।' নাগবেণী ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরল। পরদিন ভোরে রাম মা ও দিদিমাকে প্রণাম করে, বচ্চির কাছে বিদায় নিয়ে নদী পার হয়ে গেল। ঐরোডি গিয়ে ছোটদাদুর সঙ্গে অনেক কথাবার্তা বলল, 'আমার এক সহপাঠীও মাদ্রাসে যাচ্ছে। বলেছে, 'একসঙ্গে যাই চল।' তাছাড়া, আমাদের দেশের লোকও ওখানে অনেক

থাকে বলে শুনেছি।' রামের সাহস ও স্বাবলম্বী ভাব দেখে নারায়ণয়্য প্রসন্ন হয়ে বলল, 'বেশ যাও, কিন্তু একটা কথা, মাকে-দিদিমাকে কখনো ভুলো না।' এই বলে সে আশীর্বাদ করে রামের হাতে পথখরচ বলে তিরিশটি টাকা দিয়ে বলল, 'ওখানে গিয়ে চিঠি দিও। ঠেকাবাধায় যা পারি করব। আগের মতো আর সংসারে আমার হাত নেই জানো তো। যাই হোক, লেখাপড়া কোনো মতেই ছেড়ে দিও না।' এই বলে পুনরায় আশীর্বাদ করে রামকে বিদায় দিল।

মংগলুর থেকে মাদ্রাসের গাড়ি। পরদিন সন্ধ্যায় সে মংগলুর পৌঁছল। মামাদের বাড়িতে না গিয়ে সে একজন শিক্ষকের সঙ্গে দেখা করে ইস্কুল থেকে সার্টিফিকেট নিয়ে এবং দু' একখানা পরিচয়পত্র জোগাড় করে পরদিন মাদ্রাসের গাড়িতে উঠে বসল।

একাকী সহায় সম্বলহীন বালক রেলগাড়ি থেকে মাঝে মাঝে গলা বাড়িয়ে চারিদিকের মাঠ ঘাট দেখে দেখে সময় কাটাল। শূন্য আকাশের মতোই রিক্ত তার মন। সম্মুখে নতুন পরিবেশ, অনিশ্চিতের খেলা। পরদিন ভোরবেলায় মাদ্রাস স্টেশন আসতেই সে তার বিছানাটাকে গোল করে গুটিয়ে বগলদাবা করে নীচে নামল। কুলিরা সেই পুঁটুলিটা নেবার জন্য হাত বাড়ালেও সে কাউকে না দিয়ে নিজের হাতেই বহন করে গেটে টিকিট দিয়ে বাইরে এসে এই চিন্তায় পড়ে গেল, 'কোথায় যাই, কার কাছে যাই?'

যে বন্ধু আগেই মাদ্রাসে পৌঁছবে বলে চিঠি দিয়েছিল সে যদি এসে যায় তো ভালোই। আর যদি না আসে?...সংশয়াকুল বালক মুখের উপর আঙুল রেখে স্টেশনের সামনেকার রাজপথ দিয়ে অজস্র ট্রাম-বাসের চলমান প্রবাহ যে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল সে খেয়াল তার ছিল না।

তেইশ

রাম যে কত সময় পর্যন্ত একইভাবে রেলস্টেশনের ফটক থেকে জনকোলাহল-পূর্ণ রাজপথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে খেয়াল নেই। না পাওয়া গেল কোনো পরিচিত ব্যক্তির দেখা, না পাওয়া গেল কোনো দেশের লোকের সন্ধান। অবশেষে স্টেশনের কাছাকাছি একটি ধর্মশালার খোঁজ পেয়ে সেখানেই গিয়ে ওঠে। সেখানে যত না প্রকৃত যাত্রী, তার চেয়ে ঢের বেশি ভিখারি ও নিষ্কর্মার দল। ভিতর ও বাইরের ঘরগুলি দেখে রামের মনে একটা ঘৃণার ভাব উদ্রেক হলেও নিরুপায় হয়ে একটা ঘরে বিছানাটি রেখে দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়। চলা ফেরার সময়ে টাকার পকেটের উপর সর্বদাই হাত রেখে চলে।

মধ্যাহ্ন গড়িয়ে অপরাহ্ণ হলে যাদের নামে সে পরিচয় পত্র নিয়ে এসেছে তাদের ঠিকানার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। সেই পত্রগুলি দিয়ে তার কলেজে ভর্তির সুবিধা হতে পারে, কিন্তু বাসস্থানের কোনো ব্যবস্থা হবে বলে মনে হয় না।

অবশেষে নিরাশ হয়ে কলেজে যাওয়ার পথটা জেনে নিয়ে তিরুবল্লিকেণির (ট্রিপ্লিকেনের) সমুদ্রতীরে গিয়ে পৌঁছল। এখানেও সমুদ্র বিশাল ও মনোহর। সমুদ্রের পারে বালুকাশয্যা পাতা রয়েছে। সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে রামের মনে তার গ্রামের মধুর স্মৃতি জেগে ওঠে। কিন্তু মাদ্রাসের সমুদ্রতীরে মানুষের ভিড়ভাড়ে, ভিখারিদের উৎপাতে, গাড়িঘোড়ার ছুটোছুটিতে কোনোরকম শান্তি পাওয়া গেল না। ঘুরতে ঘুরতে প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে এসে বালির উপর বসে সেই দিকে সে তাকিয়ে রইল। মনের মধ্যে স্বপ্নের জাল বুনে চলেছে, যদি অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, তবে আগামী কয়েক বছর তো এখানেই তার জীবন কাটবে। চারিদিকের সেই ভিড় কোলাহল অতিক্রম করে সব কিছু ভুলে গিয়ে সে স্বপ্নের মধ্যেই তন্ময় হয়ে গেল।

এমন সময়ে কে যেন তাঁর কাঁধের উপর জোর ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'রামু? কি ব্যাপার? কোথায়?' রাম পিছন ফিরে দেখে, তার ছোট মাসি কৃষ্ণবেণীর স্বামী মাধব তার দুটি শিশুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বোধ করি তারা সমুদ্রতীরে বেড়াতে এসেছে। এরা যে মাদ্রাসে থাকে কথাটা রাম একেবারে ভুলেই

গিয়েছিল। আর থাকলেই বা কি, তার তো দৃঢ় সংকল্প আত্মীয়ের সাহায্য সে নেবে না। কিন্তু সেই মুহূর্তে মাধবের মুখের দিকে তাকিয়ে তার যে আনন্দ হল তার পরিমাণ সামান্য নয়। মাধবের প্রশ্নের উত্তরে রাম তার মাদ্রাস আগমনের কারণ জানিয়ে বলল, 'থাকার জন্য একটা জায়গা খুঁজছি, এখনও পাই নি।' মাধব হেসে বলল, 'বলো কি? তোমার মাসির বাড়িতে তোমার থাকার মতো একটা জায়গা নেই না কি? আমাকে একটা পোস্টকার্ড লিখে দিলে আমি কি স্টেশনে যেতে পারতাম না? ওদিকে সদাশিবদাও জানায়নি যে তুমি মাদ্রাস আসছ।' এই বলে মাধব রামকে মৈলপুর পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে সেখানে তার ছেলেপুলেদের ছেড়ে দিয়ে বলল, 'হুঁ কোথায় তোমার মালপত্র? চলো নিয়ে আসি।' মৈলপুর থেকে তারা ধর্মশালায় এসে দেখে তালা লাগানো ঘরখানি হা করে খোলা এবং সেখানে নিয়ে যাওয়ার মতো পদার্থ আর কিছুই বাকী নেই। রামের বিছানাটি অদৃশ্য হয়ে গেছে। তার বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে মাধব জিজ্ঞাসা করল, 'টাকা পয়সা কিছু ছিল না তো?'

রাম বলল, 'টাকা পয়সা যা কিছু পকেটে আছে। ওর মধ্যে বিছানা আর খানচারেক ধুতি ছিল। ধুতি আর একখানাও নেই, কি করি?

মাধব তার পিঠের উপর হাত রেখে যেন কিছুই হয় নি এমনভাবে বলল, 'ছাখো, আমাকে না জানিয়ে আসার ফলে এই জরিমানা।'

রাম বলল, 'ঠিক বলেছেন মেসোমশাই।'

পথে যেতে যেতে মাধব গত মাসে তার অন্ধ্রদেশ থেকে বদলি হওয়ার কথা জানিয়ে বলল, 'ওখানকার তুলনায় এই জায়গা খুব সুবিধাজনক। এখানে আমাদের দেশের লোক অনেক দেখা যায়।'

কৃষ্ণবেণী রামের খুব আদর যত্ন করল। তাদের নৈশভোজন শেষ হলে কৃষ্ণবেণী জিজ্ঞাসা করল, 'মা ও দিদি কি মংগলুরেই আছে?' রাম সব কথা খুলে বলল। কৃষ্ণবেণী তাতে কিছুমাত্র আশ্চর্য হল না। বলল, 'ছাখো, বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন একরকম। এখন আর কি আছে? দিদিও ভারি শক্ত মেয়ে। মরুভূমিতেও বেঁচে থাকতে পারে। তবে সারা জীবন শহরে কাটিয়ে শেষ বয়সে গ্রামে বন্দী হয়ে থাকতে মার ভালো লাগবে কি না কে জানে?'

পরদিন রামের জামা কাপড়ের ব্যবস্থা করে দেওয়া হল। মাধবের মাসিক রোজগার শ দেড়েক টাকা। পাঁচ-ছটি ছেলেপুলে নিয়ে মাদ্রাস শহরের সংসার

চালিয়ে তার পক্ষে রামকে কতটা সাহায্য করা সম্ভব হবে তা সে জানে না। তবু সে রামকে ভরসা দিয়ে বলল, 'এখানে তোমার খাওয়া-থাকার কোনো অসুবিধা নেই। মাঝে মাঝে মংগলুর থেকে কিছু কিছু সাহায্য করলে তুমি স্বচ্ছন্দে এখানে থেকে বি. এ. পর্যন্ত পড়তে পারবে।' এ সম্পর্কে রাম কোনো কথা বলল না।

যথাসময়ে সে কলেজে ভর্তি হয়ে গেল। এখন ভাবনা কলেজের বেতন, বইপত্র ও অন্যান্য জিনিসের জন্য টাকা সংগ্রহ করা। বাড়িতে সে চাইতে পারে। বস্তুত কারও কাছে সে হাত পাতবে না। মৈলপুরে মংগলুর অঞ্চলের বেশ কিছু লোক বাস করে। সেই রকম দু একটা বাড়িতে গিয়ে রাম ট্যুশন জুটিয়ে নেয়। টুথি্র ছোট ছোট কয়েকটি ছেলেকে পড়াতে হবে, মাসিক দক্ষিণা কুড়ি টাকা। খবরটা শুনে মাধব খুব খুশি হল। বলল, 'একটা কথা রাম, অন্যের পড়া বলে দিতে গিয়ে নিজের পড়ার ক্ষতি না হয় দেখো।'

দু'মাস হয়ে গেল রাম এখনও তার বাড়িতে কোনো চিঠিপত্র দেয়নি। ইতিমধ্যে মাধবের চিঠিতে 'রাম মাদ্রাসে আছে' খবর পেয়ে সদাশিব মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে রামকে একখানি পত্র এবং কুড়িটি টাকা পাঠিয়েছিল। রাম সে চিঠির কোনো উত্তর দিল না। 'এখন আর আত্মীয়ের কাছ থেকে আমার কোনো সাহায্যের প্রয়োজন নেই' এই বলে মাধবের মারফৎ টাকা কুড়িটি ফেরত পাঠিয়ে দেয়। রামের এই আচরণে মাধব প্রথমে একটু আশ্চর্য হয়ে যায়! পরে সে স্ত্রীর কাছ থেকে শুনতে পায় সদাশিবের বাড়িতে নাগবেণীও তার মায়ের অবস্থান কালের নানা কথা। রামকে ডেকে মাধব তাই একটি কথা না বলে পারল না, 'দ্যাখো রামু, যখন তোমার কোনো অসুবিধা হবে, মাসির কাছে জানাতে কুণ্ঠিত হোয়ো না।'

একদিন মাধব জিজ্ঞাসা করল, 'রাম, বাড়িতে চিঠিপত্র দিয়েছ?' 'না, এখনও দিইনি।' মাধব রামকে কিছু না বলে স্ত্রীকে গিয়ে বলল, 'আচ্ছা, বাড়ির লোকের উপরেও ওর রাগ টাগ আছে নাকি? চিঠিপত্র না পেয়ে ওর মা নিশ্চয়ই উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। না হয় তুমি দিদিকে একখানি চিঠি লিখে দাও।'

কৃষ্ণবেণী চিঠি দিলে নাগবেণী উত্তরে জানতে চাইল রাম তার কাছে কেন চিঠিপত্র লেখে না। সেই চিঠিখানা রামের হাতে দিয়ে কৃষ্ণবেণী বার বার একটি কথাই জিজ্ঞাসা করল, মায়ের কাছে রামের চিঠিপত্র না লেখার কারণ কি। রাম

উত্তর দিল, 'তুমি যদি রাগ না কর মাসি, তবে বলতে পারি।' 'রাগ করব না। বল কি ব্যাপার ?' রাম বলল, 'আমার অন্ন আমি রোজগার করতে পারলে তবেই মাকে চিঠি দেব ভেবেছিলাম। এখন তাকে কি বলে লিখব ? লিখব কি যে পরের অন্নের মুখাপেক্ষী হয়ে আছি ? তুমি তো জান মা কেন মংগলুর ছেড়ে এল।' কৃষ্ণবেণীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বলল, 'বাবা, আমি ও ললিতা বৌদি একই রকমের ? এই কথাই বুঝলে তুমি ?' রাম ব্যথিতকণ্ঠে বলল, 'আমি সেকথা ভেবে বলিনি, মাসি। সত্য বলছি, এখানে আমার কোনো অসুবিধাই নেই, কোনো অভাবই নেই। তবে মংগলুরের কথা ভেবেই বোধ করি আমার মুখ থেকে এসব বেরিয়ে থাকবে। আমি বলতে চাই মানুষের পক্ষে কারও গলগ্রহ হয়ে থাকা উচিত নয়।' রামের মনোভাব বুঝতে পেরে কৃষ্ণবেণী আশ্বস্ত হল, মাধবও বিস্মিত হল।

একদিন রাম অযাচিতভাবে কৃষ্ণবেণীর কাছে এসে বলল, 'মাসি, রাগ না কর তো একটা কথা বলি।'

'কি কথা ?'

'মাকে চিঠি লেখা উচিত, তাই না ?'

'কবেই তো লেখা উচিত ছিল। এখানে আসা অবধি চার মাসেও চিঠি লিখে উঠতে পারনি।'

'তা হলে লিখব। এখন লিখতে পারি, সময় হয়েছে। আমার এখন ট্যুশন থেকে তিরিশ টাকা হয়। কাল থেকে তোমাদের এখানে খাব না, একটা হোটেলে গিয়ে উঠব ঠিক করেছি। তিরিশ টাকায় কোনো রকমে আমার খাওয়া চলে যাবে।'

কৃষ্ণবেণীর মনটা খারাপ হয়ে গেল। বলল, 'তুমি কি ঠিক করে ফেলেছ ? বেশ, যাও। কিন্তু এখানে রোজ একবার করে এসো। বিদেশে আপন লোক ছাড়া থাকতে নেই। তোমার অসুবিধা না হলে বিকেলে অন্তত কফিটা আমার এখানে এসে খেয়ো। আনন্দ ছেলেটা দিনরাত তোমার কথা বলে।'

রাম হাসল। হেসে বলল, 'আচ্ছা তাহলে আমি তোমার বাড়িতে থাকব। কিন্তু খাব হোটেলে। মাসি, আমার প্রতি যে স্নেহ তুমি দেখিয়েছ তা আর কোথাও পাইনি। কিন্তু আমার অন্ন আমি নিজেই রোজগার করছি—এই তৃপ্তিটুকু অন্তত আমায় পেতে দাও।'

পরদিন আহারের সময়ে রামকে না দেখে মাধব বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল 'কি ব্যাপার ?' কৃষ্ণবেণী বলল, 'কি করব ? তার জিদ তার কাছে। তবে কোনো খারাপ বুদ্ধি থেকে সে এ রকম করছে না।' সেদিন রাতে রাম যখন বাড়ি ফিরল, কৃষ্ণবেণীর চার বছরের ছেলে আনন্দ খুব হৈচে বাঁধিয়ে দিল। 'রামুদা, আমাদের বাড়িতে খেতে হবে। তা নাহলে আমি খাব না।' এই বলে সে বায়না ধরল।

রাম সেদিন সকালেই তার মাকে দিদিমাকে তার নতুন ব্যবস্থার বিষয়ে সবিস্তারে জানিয়ে চিঠি দিয়েছিল। লিখেছিল—'আমার বিষয়ে কোন চিন্তা কোরো না। আমি ক্রিসমাসে দেশে আসব না। যদি কিছু টাকা বাঁচাতে পারি, তবে মে মাসের ছুটিতে বাড়িতে আসার সুবিধা হবে।' এই কথা লিখে সন্ধ্যার ডাকেই চিঠি ফেলে এসেছে। কিন্তু এখন এই বালকের হৈ চৈ তাকে হতবুদ্ধি করে দিল। রাম তাকে কত বোঝাল, কিন্তু শিশু নাছোড়বান্দা। মাধবও বাড়ি ফিরে ছেলের পক্ষ নিল। অবশেষে সমস্যার সমাধান কি ভাবে হতে পারে তা মাধবই হেসে জানিয়ে দিল। বলল, 'রাম, সঙ্কোচ-ফঙ্কোচ ছেড়ে দিয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করছি, 'তুমি কি নিজের শ্রমের টাকা দিয়ে খাবে বলে ঠিক করেছ ? না, হোটেলের অন্ন খাবে বলে পণ ধরেছ ?'

'এ রকম কেন বলছেন ? আমি তো এটাকে পণ বলে মনে করি না।'

'আচ্ছা, হোটেলে তুমি কত দণ্ড দাও ?'

'দণ্ড কেন ? খাওয়া বাবত বারো টাকা দিচ্ছি।'

'বেশ, আমাকেই সেই টাকাটা দিয়ে এখানেই তুমি খাওনা কেন ?'

সমস্যাটা মিটে গেল। এই কথাগুলি বলতে মাধব খুবই লজ্জাবোধ করল সন্দেহ নেই। তার সম্মানের পক্ষে, মর্যাদার পক্ষে খুবই হানিকর বোধ হল। রামের কাছেও টাকা দিয়ে মাসি বাড়িতে খাওয়ার প্রস্তাবটা খুব সুখকর বোধ হল না। কিন্তু চার বছরের শিশু আনন্দকে এড়াতে না পেরে রামকে কেবল একটি মাত্র দিনের জন্য হোটেলের অন্ন খেয়ে তৃপ্ত হতে হল।

মাসের শেষে মাধব স্ত্রীকে বলল, 'কৃষ্ণি, রাম যদি টাকা দেয়, নিয়ে নিও। ছেলে মানুষ, এখনও বুদ্ধি পাকে নি। টাকাটা নিয়ে তুমি কোডিগ্রামে দিদির ঠিকানায় পাঠিয়ে দিও। কিন্তু খবরদার, রামুর কানে যেন এই খবরটা না যায়।'

কৃষ্ণবেণীর কাছে এই ব্যবস্থাটা মন্দ লাগল না। সে মাকে ও দিদিকে সমস্ত

বৃত্তান্ত সবিস্তারে জানিয়ে পত্র দিল। শেষে লিখল, 'কিন্তু আমার দিব্যি, রামের দেওয়া টাকাই যে এখান থেকে এভাবে যাচ্ছে এই খবর রামকে জানিও না।'

যেদিন এই পত্র গেল, সেদিন নাগবেণীর গর্ব ও আনন্দের শেষ নেই। মায়ের কাছে রামের গুণগান করে চোখের জল ফেলল নাগবেণী। শ্বশুরমশাই যেমন দেয়ালের অন্ধি-সন্ধিতে টাকা পয়সা গুঁজে রাখতেন, নাগবেণীও তেমনি দরজার কপালীর ফাঁকে টাকা ভরে রাখতে শুরু করে।

ছেলেকে নিয়ে নাগবেণীর দিবাস্বপ্ন শুরু হয়। চলতে ফিরতে ছেলে এসে মায়ের চোখের সামনে দাঁড়ায়। নাগবেণী ছেলের আগমনের প্রতীক্ষায় থেকে থেকে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। রাম কিভাবে মাদ্রাসে বড় হয়ে উঠছে, কিভাবে পড়াশুনা করছে এই সমস্ত অনুমান করবার চেষ্টা করে। কৃষ্ণবেণী আগে দিদিকে বেশি চিঠিপত্র লিখত না, কিন্তু রামের আসার পর থেকে সপ্তাহে একখানা করে পত্র দেয়। চিঠি পেয়ে নাগবেণীর মাঝে মাঝে বিস্ময় জাগে রামের মতো ছেলের মা হওয়ার সৌভাগ্য তার হয়েছে। মাধব বাড়িতে থাকে খুব কম সময়। আপিসের চাকরিতেই তার দিন কেটে যায়। কিন্তু যখনই বাড়ি থাকে, দিনে অন্তত একবার স্বামীস্ত্রীতে মিলে রামের গুণগান না করে থাকে না। তাদের সন্তানদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র, তারপরে মেয়ে জয়া, জয়ার পরে পর পর দুটি ছেলে সদানন্দ ও আনন্দ। এরা সকলেই অপেক্ষা করে থাকে দাদা কখন কলেজ থেকে ফিরে বইপত্র টেবিলের উপর রাখবে। রবিবার রামুদার ট্যুশনি থাকে না তারা জানে। সুতরাং রবিবার সকালে তারা বাবাকে ধরে বসে, 'বাবা, রামুদার সঙ্গে আমরা সী বীচে যাব।' রামেরও ভালো লাগে সমুদ্রতীরে সেই ছেলেপুলেদের সঙ্গে খেলাধুলো করতে। অবশ্য কোডিগ্রামের সমুদ্রের যে মহিমা, যে অনন্ত বিস্তার, যে নিবিড় প্রশান্তি, মাদ্রাসের সমুদ্রে তা নেই। তবু তো সমুদ্র। সেই জেলের জাল, সেই নৌকাগুচ্ছ, সেই তরঙ্গভঙ্গ, সেই বালির রাশি। এখানে যদি লোকের ভিড় না থাকত, না থাকত গাড়ি ঘোড়ার জটলা তবে সে কিছুক্ষণ এখানে চুপ করে বসে থাকতে পারত। যদি না থাকত 'সাংবশিক···ভিক্ষা' বলে হাত পাতার লোক (ভিখারি), তবে এই সমুদ্রের সৌন্দর্য না জানি আরও কত বেশি হত। তবু যা আছে তাতেই তৃপ্তি।

মার্চ মাস এল। রামের মাদ্রাসে আসার পরে আট মাস কেটে গেছে। এপ্রিল আসতেই বালখিল্যের দল বুঝল তাদের 'রামুদা' দেশে যাবে। তারা

বলতে শুরু করল, 'রামুদা আসছে মাসে তুমি দেশে যাবে ? যেও না, আমাদের ছেড়ে যেও না। এখানেই থাকো না তুমি।' মাকে দেখবার জন্য রামের মনে প্রবল ইচ্ছা। কিন্তু দেশে যাওয়া মানে অনেক টাকা। অত টাকা কোথায় ? রেল ও মোটর ভাড়ার জন্য বিশ পঁচিশ টাকা দণ্ড দিতে হবে। কাজেই সে মাকে পত্র লিখল, 'মা, আমি যদি দেশে এবার না আসতে পারি, দুঃখ কোরো না। ইণ্টার পরীক্ষা একেবারে শেষ করে এলে হবে না ? রেল কোম্পানিকে কতগুলি টাকা দণ্ড দিয়ে কী লাভ ? এদিকে মাসিমার ছেলেপুলেরাও বলছে, 'যেও না।' ওদিকে টাকাও তো ব্যয় হবে কম নয়।' নাগবেণী উত্তর দিল, 'দিন কয়েকের জন্য আয়। এখানে এসে যদি খারাপ লাগে, তাড়াতাড়ি চলে যাস। আমাদের কি ইচ্ছা যায় না তোকে একবার দেখি ? তোর দিদিমা কি আর তোকে দেখবে না ? আমি বেহালা নিয়ে থাকি। কিন্তু খালি বেহালা বাজিয়ে দিন চলে কি ?'

দেশে যাওয়াই স্থির হল। রওনা হওয়ার উপযুক্ত টাকা ছিল না বলে মাধব এনে টাকা দিল। অনিচ্ছুক রাম সেই টাকা নিয়ে রওনা হয়। মাদ্রাস ছেড়ে পরদিন সন্ধ্যায় মংগলুর পৌঁছে চিন্তা হল, 'কোথায় যাব ? মামাবাড়ি যাব কি ?' মনে মনে বলল, 'না, গিয়ে কাজ নেই।' একটা হোটেলে রাত্রি কাটিয়ে পরদিন ভোরে মোটরে করে সে মংগলুর ত্যাগ করল।

দুপুরবেলায় কোডিগ্রামের বাড়িতে বসে নাগবেণী ও তার মা 'রাম বাড়িতে এলে একটু পাঁপড়ও খাবে না ?' এই ভেবে মাষকলাই চাল বেঁটে কাঁই করে পাঁপড় তৈরির কাজে ব্যাপৃত হল। রাম দুপুরের রোদে বেলা দুটোর সময়ে ঐরোডির বাড়িতে পৌঁছে একটু জলযোগ করে, 'দিদিমা, কোডি চললাম' এই বলে সেখান থেকে রওনা হল।

নিজেদের বাড়ির সামনে এসে রাম কচি বাছুরের মতো শব্দ করল 'অম্বা' (হাম্বা)। 'আরে তুংগে বাছুরটাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম, আর বোধ করি বাঁধিনি, সব দুধ খেয়ে ফেলেছে বুঝি', এই বলে নাগবেণী তাড়াতাড়ি পাঁপড়ের কাজ থেকে উঠে উঠোনে এসে দেখে, ও বাছুরটা কপিলা গাইয়ের নাতনী তুংগে নয়, নিজের ছাওয়াল রাম।

'রাম, এত বেলায় এসেছিস, আগে খেয়ে নে।'

'দরকার নেই মা, ঐরোডিতে দাদুর বাড়িতে ফলাহার হয়েছে।'

দিদিমা বললেন, 'পাগলা ছেলে! নাগু, ও তো কিছুই জানে না। না খেয়ে থাকলে তার ফল কী হয় বয়স হলে পরে বুঝতে পারবে। এখন তো শরীরে জোর আছে, না খেলেও টের পায় না। তুই গিয়ে রান্না চাপা নাগু।'

মায়ের হাত ধরে রাম তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'না মা, তোমাদের দেখেই আমার খাওয়া হয়ে গেছে।' পাঁপড় করবার জন্য নাগবেণী যে কাঁই নিয়েছে তাতে অল্প তেল দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কাঁই খাবি, খোকা?' বাল্যের সেই প্রিয় ভোজ্য দ্রব্যের কথা স্মরণ হতেই রাম সেটুকু এক গ্রাসেই খেয়ে ফেলল।

সেদিন বাড়িময় উৎসব। রামের বাড়ি আসার ফলে গৃহের প্রতিটি কোণে যেন আনন্দের আভা। এই সব গোলমালে তুংগে বাছুরটা যে সকলের চোখ এড়িয়ে তার মা গঙ্গার দুধটুকু খেয়ে ফেলল এবং রামের জন্য যে দুধ আর থাকল না, সে দিকে আর কারও খেয়াল নেই। এদের বাড়িতে খুব জোরে জোরে কথা বলার শব্দ শুনে সুরোর পুত্রবধূ বচ্চি এসে হাজির। 'অম্মা, খোকাবাবু কখন এলেন? আপনাদের মাদ্রাস খুব বড় জায়গা? আমাদের হংগারকট্টের মতো হবে?'

রাম হেসে বলল, 'বচ্চি, মাদ্রাস আমাদের কোডিগ্রামের চেয়ে এমন কি বড়? এত লোকজনও সেখানে নেই। কত আর, এই তিন-চার লাখ লোক হবে।' এই বলে সমুদ্রতীরে যাওয়ার জন্য রাম খুব ব্যস্ত হয়ে উঠল। দিদিমা বললেন, 'বাবা, সমুদ্রটা পালিয়ে যাবে না, সন্ধ্যা পর্যন্ত ওখানেই থাকবে। এখন পা রাখা যায় না বালিয়াড়িতে। রোদ খাঁ খাঁ করছে। রোদটা একটু পড়ুক। তারপরে গেলেই হল। শ্রান্ত হয়ে এসেছ। একটা মাদুর পেতে শুয়ে পড়ো।' রাম হেসে বলল, 'ঠিকই বলেছ দিদিমা। মাটি তেতে উঠেছে। আসার সময়ে ঘাসের উপরেও পা পুড়ে যাচ্ছিল। আমাদের পুকুরপাড়ের বালিও খুব গরম হয়েছে দেখলাম।'

'আর এরই মধ্যে তুই সমুদ্র দেখতে রওনা হবি?'

'দিদিমা তুমি কিছুই জান না দেখছি। পথে আসতে শুনলাম কে যেন বলল, আমাদের কোডির সমুদ্র গরমের ছুটিতে কোডি ছেড়ে কুন্দাপুরে চলে যাবে। যাওয়ার আগেই দেখা দরকার বলে তাড়াতাড়ি করছি।'

দিদিমা বললেন, 'বাবা, আমি কি বচ্চি?'

বচ্চি বারান্দার এক প্রান্তে গালে হাত দিয়ে বসে একমনে খোকাবাবুর কথা শুনছিল। হেসে বলল, 'মাঠান খোকাবাবুর ছেলেমানুষি এখনও গেল না!'

রাম বলল, 'সত্যি বচ্চি, আমার তো প্রায় দাড়ি পাকার বয়স হল। আজকাল কার ছেলেছোকরা—বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই।'

হাস্যমধুর বাক্যালাপে পাঁপড়ের কাজ সেইভাবেই পড়ে রইল। খেয়াল হতে নাগবেণী পুনরায় পাঁপড় তৈরি করতে বসল। রাম বলল, 'মা, আমিও তোমার সঙ্গে পাঁপড় বানাই।'

মা বলল, 'তোদের কলেজে ওটাও শেখায় না কি রে?'

রাম বলল, 'মাদ্রাসের পাঁপড়ের খবর তুমি কি জানবে মা? সেখানে যে পাঁপড় বানায় পাতলা কাগজের মতো ফুর ফুরে। মুখে দেওয়ামাত্রই মিলিয়ে যায়। তোমাদের মতো মোটা মোটা ঘুঁটে বানায় না তারা।'

মা বলল, 'হ্যাঁ বাপু তোর মাদ্রাসই বড়।'

ততক্ষণে পুত্র পাঁপড় বানাতে গিয়ে বেলুন চাকিতে সমস্ত কাই লাগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, দেখো দিকি কেমন পাঁপড়?'

মা হেসে বলল, 'কলেজের পাঁপড় ওই রকমই হয়।'

বচ্চিও রামের উদ্দেশ্যে একটু পরিহাস করে বলল, 'খোকাবাবু তো মাদ্রাস ঘুরে এলেন। একখানা পাঁপড়ও বানাতে পারেন না?'

রাম বলল, 'বচ্চি, ওখানে দোসের কাই দিয়ে পাঁপড় বানায়, ডালের কাই দিয়ে নয়।'

বচ্চি সরলভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'তাই নাকি মাঠান?'

সন্ধ্যার আগে ছেলের জন্য মা আর একবার জলযোগের ব্যবস্থা করে। জলযোগ করে রাম বলল, 'দিদিমা আজ তুমি বসে রান্না কর। মাকে সঙ্গে নিয়ে আমি একবার সমুদ্রটা দেখে আসি। মাদ্রাসে প্রায়ই যেতাম মাসিমার ছেলেপুলেদের নিয়ে। কী যে ভাল ওরা!' মাসির ছেলেমেয়েদের গুণকীর্তন করে রাম মায়ের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। বেরুবার সময়ে বচ্চিকে জিজ্ঞাসা করে, 'বচ্চি, তুইও যাবি নাকি সমুদ্রে হাওয়া খেতে?'

বচ্চি হেসে বলল, 'ছোটবাবু, ঘরে যেদিন খাবার থাকে না, সেদিন আমরা ওই জিনিসই (হাওয়া) তো খাই।'

বচ্চির কথায় রামের মনটা খারাপ হয়ে গেল। পথে যেতে যেতে সে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, বচ্চির বাড়ির লোকজন কেমন আছে গো?'

মা উত্তর দিল, 'ও যেরকম বলেছে, সেই রকমই।'

মায়ের কথায় রামের মুখ থেকে একটা আক্ষেপসূচক শব্দ বেরিয়ে এল।

বালিয়াড়িতে উঠে সম্মুখে নিজেদের সমুদ্র দেখার সঙ্গে সঙ্গেই পাগল হয়ে গেল রাম। বিপরীত দিক থেকে প্রবাহিত হাওয়ায় মুখ খুলে জোরে চেঁচিয়ে উঠল সে।

'তোর কি পাগলামি খোকা! ওখানকার সমুদ্রে রোজই যাস বলছিলি না?'

'রোজ গেলে কী মা, সেই সমুদ্র কি আমাদের সমুদ্রের সমান? এখানে এভাবে পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলাম। এখানে এরকম মুখ খুললে আমাকে ঠিক পাগলা হাসপাতালে নিয়ে যাবে। ওখানকার সমুদ্রসৈকতে এত লোকের ভিড় যে পায়ের নীচে বালিও দেখা যায় না। এমন শান্তি কি ওখানে আছে?'

'আমাদের সমুদ্র ওখানকার সমুদ্রের চেয়ে সুন্দর বলছিস?'

'হ্যাঁ মা, আমাদের জিনিস আমাদের কাছে তো সুন্দরই লাগবে।'

'হুঁ, মাদ্রাসে গিয়ে তুই খুব কথা বলতে শিখেছিস।'

'মাসিমাও তাই বলে। আমি নাকি খুব কথা বলি। তাই নাকি মা?'

'না বাবা। তোর কথাবার্তা একটু বেশি হয়েছে ঠিকই। আগে যখন মংগলুরে ছিলি, তখন তোর মুখে একটা লাগাম পরানো ছিল মনে হত। এখন সেই বাধাটা আর নেই।'

'হ্যাঁ মা, এ বছর আমার মন খুব খুশি। তোমরা এখানে কেমন ছিলে মা?'

'তোর চিন্তা ছাড়া আর সবই ভাল ছিল। মাঝে মাঝে নারায়ণকাকা এসে খোঁজ খবর নিয়ে যান।'

'তোমার সময় কাটে কী করে? বেহালা বাজাও তো?'

'বাজাই বাবা, তবে সময় হয়ে ওঠে না। তোর কথাই বেশি ভাবি। তবে মাঝে মাঝে বাজাই। বচ্চি শুনতে আসে। জিজ্ঞাসা করে, 'মাঠান, ওটা কী, টোং টোং শব্দ করে?' তারপরে খানিকক্ষণ শুনে বলে, 'মাঠান, ওটা বাজিয়ে কী লাভ?' আমি বলি, 'সময় কাটে না বলে বাজাই।' বেহালা বাজানো ছাড়া আমাদের তুংগে বাছুরটাকে চরাই। ছায়ার মতো ও আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকে। এই বোবা প্রাণীগুলিরও কী স্নেহ ভালবাসা!'

'মানুষের মধ্যেও তা নেই মা।'

'সত্যি বাবা।'

কথায় কথায় তারা সমুদ্রের কাছে এসে দাঁড়াল। জলের কিনারে বসে কথা বলতে বলতে তাদের খেয়াল থাকল না, কখন সন্ধ্যা হয়েছে, কখন সারি সারি কাক ওদের মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেছে, কখন একসময়ে দূর সৈকত থেকে শুকনো মাছের গন্ধ এসে বাতাসকে ভারি করে তুলেছে।

অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে দেখে ফেরার জন্য ওরা উঠে দাঁড়াল। 'গরমের দিন, আকাশে জ্যোৎস্নাও নেই. রাস্তা দেখতে দেখতে যাই চল' এই বলে তারা খুব সন্তর্পণে অগ্রসর হল। বলা যায় না. গ্রীষ্মকালের হাওয়ায় রাত্রিতে 'তারা' পথের মাঝে শুয়ে থাকতে পারে। পথের পাশে কেতকীর বন থেকে হঠাৎ পাঁপড়ের গন্ধ ভেসে এল। রাম বলল, 'মা, ওখানে নিশ্চয়ই 'কড়ংবল' সাপ রয়েছে, খুব বিষধর সর্প, না মা ?'

মা বলল. 'তাতে কি ? ওরা তো সব জায়গায় আছে।'

বাড়ির পুকুরে এসে নাগবেণী পা ধুয়ে ঘরে গেল। রাম জলে নেমে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে মুখে জল নিয়ে 'গুলু গুলু' (কুলুকুচু) শব্দ করতে করতে অনেক সময় কাটাল।

মা এসে বলল, 'খোকা, মাদ্রাসে কি স্নান-টান কর না ?' মায়ের কথায় পুকুরে থেকে উঠে এল রাম। নৈশ আহার শেষ হলে দিদিমা জিজ্ঞাসা করলেন, 'রামু, কাজুবাদামের বীজ ফোড়ন দিয়েছিলুম, কেমন হয়েছে খেতে ?'

রাম বলল, 'অ্যাঁ! কাজুবাদামের বীজ ? কে খেয়েছে ?' মা ও দিদিমা দুজনেই হেসে উঠলেন। 'কথার তোড়ে কী খেলে না খেলে খেয়ালই নেই, পাগল! আমি বচ্চিকে বলে কাজুবাদামের বীজ আনিয়ে সিদ্ধ করে তুই খাবি বলে ফোড়ন দিয়ে খেতে দিলাম, বকাসুরের মতো মুখে ভরে দিলি, এখন আর মনেই নেই ?'

রামও হেসে উঠল, বলল, 'ওহো! আমিই খেয়েছি! বেশ, কাল আবার তৈরি করে দিও। আর দেওয়ার আগে একবার মনে করিয়ে দিও, 'এটা কাজুবাদামের বীজ, তখন খেয়ে বলব কেমন হয়েছে।'

আহারান্তে মা ও ছেলে দুজনে আবার কথা নিয়ে বসল। মাতাপুত্রের বার্তালাপে দিদিমা কিছু বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, 'আজই যদি সব কথা বলে ফেলিস, কাল কী বলবি ? নাগবেণী, তোর কি বুদ্ধিসুদ্ধি নেই ? ছেলেটা মাদ্রাস থেকে ক্লান্ত হয়ে এসেছে, একটু ঘুমোবে না ?'

দুজনেই শুয়ে পড়ল। সেখান থেকে দিদিমা না শুনতে পায় এমনভাবে ফিসফিস করে তারা কথা বলতে লাগল। মা জিজ্ঞাসা করল—'রুক্মিণীর বাড়িতে তোর ভালো লাগে তো?' রাম উত্তর দিল—'মাসিমা ও বড় মামীর মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ।'

দুজনেই কথা বলে বলে শ্রান্ত হয়ে চুপ করে রইল। এক ঘণ্টা কেটে গেল রামের তবু ঘুম আসে না। সে বলল—'মা।' উত্তর এল—'উঁ।'

'ঘুম আসে না?'

'না বাবা, আজ আসবে বলে মনে হচ্ছে না।'

'তা হলে চলো মা, বালিয়াড়িতে যাই। চমৎকার ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।'

'না রে খোকা, মা রাগ করবেন।'

'দিদিমার তো নাক ডাকছে। আর তালপাতার শব্দে কিছু শোনা যাবে কি? চলো যাই। তোমার বেহালা শোনার ইচ্ছা হয়েছে আমার।'

দুজনেই চোরের মতো ধীরে ধীরে উঠে বাড়ির পিছন দিককার বালিয়াড়িতে গেল। কৃষ্ণা অষ্টমীর চাঁদ আকাশে দেখা দিয়েছে। তার আবছা জ্যোৎস্না সমুদ্রের জলে হাতীর দাঁতের তলোয়ার খাপের মতো চকচক করছে। নাগবেণীর হাতে বেহালা। কিন্তু তার মন ছিল কোথায় কে জানে? কচি বাছুর যেমন লক্ষ্যহীনভাবে সারা উঠোনে এঁকে বেঁকে লাফ দিয়ে চলে, নাগবেণীর মন আজ তেমনি লক্ষ্যহীন। 'এত বছর হয়ে গেল, এখনও কিন্তু তোমার বেহালায় সুর বাঁধা আসে না'—এই বলে হাসতে হাসতে রাম মায়ের হাত থেকে বেহালাটা টেনে নিয়ে ওতে সুর বেঁধে ছড়িতে টান দিল। তারের উপর মাত্র দুটো টানের ফলে দক্ষিণকোডি থেকে উত্তর কোডি পর্যন্ত সমস্ত ভূমি থরথর করে কেঁপে উঠল। শেয়াল যেমন সমুদ্রের তীরে কাঁকড়া খেতে এসে সংশয়াকুল দৃষ্টিতে তাকায়, নাগবেণীও তেমনি রামের বেহালা শুনে সংশয়ের দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

রামের হাত যেন সমুদ্রের সুরের সঙ্গে সুর মেলাল। সে রাগিণীতে কখনও মৃদু হাওয়ার লঘুতা, কখনও সমুদ্রতরঙ্গের গাম্ভীর্য। আকাশে বাতাসে সর্বত্র ছড়িয়ে গেল সেই সুরলোকের মাধুর্য। আকাশে শুকতারা দেখা দিল। রামের হাত তখনও বাজিয়ে চলেছে। নাগবেণী শুনছে বিস্ময় বিমুগ্ধ হয়ে।

ধান কোটার জন্য অতি প্রত্যুষেই বিছানা ছেড়ে বচ্চি উঠে পড়ল। বেহালার টুং টুং শব্দ শুনে ভাবল—'মাঠানের কী পাগলামি দেখ।'. এই ভেবে সেই

শব্দের পথ ধরে সে বালিয়াড়িতেই এসে উপস্থিত হল। মা ও ছেলে দুজনেই তখন সুরের আবেশে তন্ময়। নাগবেণী পাথরের মতো স্থির, রাম এলোমেলো হাওয়ার মতোই চঞ্চল।

বচ্চি বলল 'মাঠান, খোকাবাবুও দেখছি আপনার মতো এই টুং টুং ভালোবাসে।'

মাতাপুত্রের সুরের স্বর্গ ভেঙে গেল। রাম বলল, 'এ সময়ে তুই কেন এখানে বচ্চি ?'

বচ্চি নাগবেণীর উদ্দেশে হেসে বলল, 'এই টুং টুং শব্দে কেউ কি ঘুমুতে পারে ? একটা কথা নয়, পদ নয়, খালি 'টুংই টুংই' কতক্ষণ করবে ? খোকাবাবুর কি ঘুমও আসে না ?'

নাগবেণীর মায়ের কথা মনে পড়ল। বলল, 'চল্ যাই খোকা।'

রাম যে কবে বেহালায় এত পাকা হয়েছে সে কথা ভেবে নাগবেণী খুব আশ্চর্য হল। বলল, 'মাদ্রাসে গিয়ে তুই তো ঢের শিখেছিস রে। আচ্ছা আমি যে মংগলুরে বাজাতাম, তা তুই শুনতিস কি ?'

'লুকিয়ে লুকিয়ে শুনতাম। এখনও বাজাই লুকিয়ে। লোকের সামনে বাজাতে ভয় করে। আজ এই বচ্চিই আমার গোপন কথা জেনে ফেলেছে।'

'আমি বলেছি বলে কি খোকাবাবু রাগ করলেন ?'

'না রে বচ্চি, তোকে খেপাবার জন্য বলছি।'

মাতা পুত্র দুজনেই বাড়ি ফিরল। বৃদ্ধা তখনও নিদ্রিত। 'আমরাও ঘুমোই' এই বলে দুজনে শুয়ে পড়ল। যখন তাদের ঘুম ভাঙল ততক্ষণে বাড়ির উঠোন রোদে ভরে গেছে।

চব্বিশ

সুখের দিনে সময় দেখতে দেখতে কেটে যায়। রামের ছুটির দিনগুলিও সেই ভাবেই কেটে গেল। জুন মাস দেখা দিতেই জ্যৈষ্ঠ মাসের বৃষ্টি ঝরল, মাতা-পুত্রের সুখ স্বপ্ন ভেঙে গেল। আর এক সপ্তাহের মধ্যে রামকে মাদ্রাস পৌঁছতে হবে। কলেজ খুলতে অবশ্য আরও কিছুদিন বাকী আছে। কিন্তু ট্যুশন আছে না? সেগুলি তো হাতছাড়া করা যায় না। কাজেই যথাসম্ভব সত্বর রওনা হয়ে পড়াই ভাল। মাঝখানে একটি অপ্রত্যাশিত 'যোগ' ঘটে গেল। মংদর্তি বসে সুব্বি খবর পেল যে তার ভাইপো দেশে এসেছে। খবরটা পেয়েই সে কোডিগ্রামে ছুটল। আজ দশ বছর হতে চলল সুব্বি তার বৌদিকে ও তার ছেলেকে দেখে নি। কবে যেন একদিন শুনেছিল কোডির বাড়িতে তালা ঝুলছে। আবার কিছুদিন আগে কে যেন বলেছিল বাড়ি ঘরে লোক এসে গেছে। কিন্তু সুব্বির বিশাল সংসারসাগরে জোয়ার ভাঁটা লেগেই আছে, সে এখন আটটি সন্তানের জননী। বাড়ির কাজকর্ম, ছেলেপুলেদের সামলানো—সারা দিনে আর বিশ্রাম মেলে না তার। তবু মাঝে মাঝে মায়ের বাড়ির স্মৃতি মনে পড়ে। জানতে ইচ্ছা হয় সেখানে আজকাল কারা বাস করে।

অনেক দিন আগে সুব্বি একবার এসেছিল মায়ের শ্রাদ্ধের সময়ে। শীনময়্যার ছেলে ওরটের বাড়িতে শ্রাদ্ধ হওয়ায় সেখানে থাকতে সুব্বির মোটেই ভালো লাগে নি। সে দিনই সে ফিরে গিয়েছিল। পরে যখন লচ্চ দু'একবার এসেছিল, বোনের খোঁজও নেয় নি! এখনও সুব্বির কোডিগ্রামে আসতে দ্বিধা জাগে। বৌদি অনেক কষ্ট ভোগ করেছে দাদার জন্য কাজেই সেই দাদার বোনকে দেখে সে কেমন মূর্তি ধারণ করবে কে জানে? কিন্তু কেউ যদি কথা নাও বলে, বাবার হাতে গড়া বাড়িটা অন্তত চোখে দেখা যাবে ত। তা ছাড়া রাম—পিতৃকুলের ভবিষ্যৎ ভালমন্দ ওই একটি ছেলের উপর নির্ভরশীল। তাকেও একবার দেখা যাবে। সুব্বি তাই কোডির উদ্দেশে রওনা হল, কিন্তু একাই! কোন ছেলে-পুলেকে সঙ্গে আনে নি। কি জানি বৌদি ওরা যদি কেউ না থাকে, বাড়ি যদি খালি থাকে—এইসব ভেবে সে একলাই এসেছে। সুব্বি যখন নদী পেরিয়ে প্রায় কোডির তীরে এসে পৌঁছাল, ঠিক তখনই সামনে একটি ছেলে ওপারে যাওয়ার

জন্য নদীতে নামছে। সুব্বি তাকে জিজ্ঞাসা করল—'বলতে পার খোকা, ঐতালদের বাড়িতে আজকাল কারা আছে?'

'কেন, আমার মা।'

জলের মধ্যে দাঁড়িয়েই সুব্বি বলল, 'তুমি কি রাম? কত বড় হয়েছ বাবা? কোথায় চললে এখন? আমি তো তোমায় দেখতে এলাম বাবা।'

কে ইনি, কী ব্যাপার রাম কিছুই বুঝল না। শৈশবের স্মৃতি এতদিন পরে কী করে আসবে? তবু তার নাম ধরে যে সস্নেহে কথা বলেছে, তাকে তো উপেক্ষা করা চলে না। রাম বলল, 'আমি তো এখন মাদ্রাসে রওনা হয়েছি। ওপারে দাদুর বাড়িতে গিয়ে দুপুরের মোটরে মংগলুরে যাব। কিন্তু আপনি কে?'

'আমার আসাটা বৃথা হল বাবা। আমি যে তোমার পিসিমা। মংদর্তির পিসিকে তুমি চিনতে পারলে না বাবা?'

রামের মুখে চকিতে হাসি ফুটে উঠল—'কে, সুব্বিপিসি? আমি ভুলে গেলেও আপনি ভোলেন নি দেখছি। আসুন বাড়ি যাই।' তাই বলে মাদ্রাস যাত্রা স্থগিত রেখে সে পিসির সঙ্গে বাড়ির দিকে রওনা হল।

'কত দিন আগে আপনাকে দেখেছি, পিসিমা?'

'তখন তুমি এক বিঘৎ লম্বা ছিলে। এখন খুব বড় হয়ে গেছ। আমার মা বেঁচে থাকলে তোমাদের বাড়িতে এসে দেখা করতাম। তোমার বাবা তো সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। আমিও আসা ছেড়ে দিয়েছি। এখানে কে আছে যে আসব? তোমার মা এখানে এসেছে কতদিন হল?'

সারা পথে পুরানো দিনের সমস্ত কথা শোনাতে শোনাতে রাম অগ্রসর হল, রাম এসে উঠানে দাঁড়িয়েছে দেখে নাগবেণী আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কিছু ভুলে গিয়েছিস বুঝি?' রাম হেসে বলল, 'হ্যাঁ মা, সুব্বিপিসিকে।'

রাম সেদিন সুব্বিপিসির মুখে বাড়ির পুরানো দিনের কথা, তার বাবার শৈশবের কথা, ঠাকুরদার কথা বার বার শুনে আনন্দলাভ করল। সুব্বিপিসি রামের জন্য কাঁঠালের পাঁপড় নিয়ে এসেছে, পিসির সামনেই রাম সেই পাঁপড়গুলি ক্ষুধিতের মতো গপগপ করে খেয়ে ফেলল। বলল, 'পিসি, তুমি আর এক মুহূর্ত দেরি করে এলে এই রামের পক্ষে তোমাকে দেখার সৌভাগ্য হত না।'

সুব্বি বার বার বলল রাম যেন একবার তার বাড়িতে আসে। রামের হাতে সময় নেই সত্য, তবু সুব্বিপিসির স্নেহে তার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠল।

পরদিন পিসির সঙ্গে মংদর্তি গিয়ে কয়েক ঘণ্টার জন্য পিসতুতো ভাইবোনদের সঙ্গে মিলে মিশে ফেরার সময়ে বলে এল, 'পিসি, পরের ছুটিতে দেশে এলে তোমার বাড়িতে অবশ্যই এসে কয়েক দিন থেকে যাব।' এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাম সেখান থেকে সোজা মাদ্রাস রওনা হয়ে গেল।

রামের এবারকার রেলযাত্রায় যার কথা সর্বদাই মনে পড়ছিল সে স্বপ্নিপিসি। পিসির স্নেহের কথা সত্যিই ভোলা যায় না। বাবা কি তার বোনের মতো দেখতে? কোথায় আছেন তিনি? কিভাবে আছেন? আগে একবার কানে এসেছিল বাবা বিজয়নগরে। আচ্ছা, বিজয়নগরে গিয়ে সে কেন একবার দেখে আসে না?

রেলের চাকার আবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত চিন্তাও তার মনে আবর্তিত হচ্ছিল। দুদিনের মধ্যেই সে মাদ্রাসে মাসতুতো ভাইবোনদের সঙ্গে মিলিত হল। তৃতীয় দিনেই শুরু হল তার ট্যুশন বাড়িতে যাতায়াত।

* * * *

ইণ্টারমিডিয়েটের দ্বিতীয় বর্ষ। পড়াশুনো ক্রমেই কঠিন হয়ে আসে। ডিসেম্বরে টেস্ট পরীক্ষার মাস তিনেক পরে ফাইনাল। কিন্তু এই তিন মাস সে কিভাবে কাটাবে। বাড়িতে চিঠি লখল, 'মা, কারও কাছে টাকা চাইতে মুখ সরে না। অথচ একসঙ্গে ট্যুশন ও নিজের পড়া দুদিক সামলানো যাচ্ছে না। এই তিনটে মাস ট্যুশন ছেড়ে দেওয়াই ভাল। কিন্তু ছেড়ে দিলে এদিকে খরচ চলবে কী করে?' কথাটা মাধবের কানে যেতে রামকে ডেকে সে বলল, 'মার্চ মাস পর্যন্ত আর ট্যুশন কোরো না। তোমার যা টাকা দরকার আমি দেব। আমার টাকা নিতে তোমার কোনো আপত্তি থাকলে পরে তুমি রোজগার করে না হয় শোধ দিও।'

রাম আর কোন উপায় খুঁজে পেল না। অথচ মেসোমশায়ের কাছ থেকে টাকা ধার নিতেও তার বাধো-বাধো ঠেকল। রাম যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, হঠাৎ পঞ্চাশ টাকার একটা মনিঅর্ডার এল মায়ের কাছ থেকে। এও কি সম্ভব? রাম তো ভাবতেই পারে নি। মা টাকা কোথায় পাবে? নিশ্চয়ই ধার করেছে নারায়ণ দাদুর কাছ থেকে। পরদিন একখানা চিঠিও এল মায়ের কাছ থেকে। লিখেছে—'বাবা রাম, কী সৌভাগ্যক্রমে জানি না, দিন কয়েক আগে ঘরের পিছন দিকের দেয়ালে একটা জানালা লাগাবার জন্য মাটি খোঁড়ার সময়ে একশ

টাকা ভর্তি একটি মাটির হাঁড়ি পাওয়া গেল। নিশ্চয়ই এটি তোমার ঠাকুর্দার কাজ। যেমন করে হোক, টাকাটা খুব সময়মতো পাওয়া গেল, তাই না? হুঁশিয়ার হয়ে খরচ কোরো। আরও টাকা দরকার হলে লিখে জানাবে।' ঠাকুরদার গল্প সে অনেক শুনেছে। যেখানে সেখানে তিনি টাকা লুকিয়ে রাখতেন, তারই একটার সন্ধান পেয়ে রামের বাবা একবার টাকা চুরি করে নেওয়াতে বাড়ি-সুদ্ধ হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল—একথাও তার অজানা নয়। কিন্তু ঠাকুরদার সেই লুকানো টাকা যে সে কোনদিন পাবে একথা সে অনুমানও করে নি।

কৃষ্ণবেণীও সেই চিঠিখানা পড়ল। পড়ে বলল, 'এখন তো নিশ্চিন্ত হলে? এবারে সুস্থ হয়ে পড়াশুনা করো তো।'

কৃষ্ণবেণীর কেমন সন্দেহ হল। এমন করে দেয়াল ভেঙে টাকা পাওয়া কি সম্ভব হয়, তবে গোটা বাড়িটাকে ভেঙে ফেললে রাম তো রীতিমতো বড় লোক।

আসল কথাটা এই যে, রাম তার খাওয়া খরচবাবদ কৃষ্ণবেণীকে যে টাকাটা মাসে মাসে দেয়, তারই একটা অংশ কোডি গিয়ে ফেরত এসেছে। বচ্চি একদিন নাগবেণীকে যে কথাগুলি বলেছিল, তাই মনে পড়াতে সে টাকা পাওয়ার একটা সম্ভাব্য কারণ লিখে দিল আর কি। যতদিন না ছেলে বি. এ. পাশ করে আসল কথাটা নাগবেণী তাকে জানাবে না বলেই স্থির করল।

ইণ্টার পরীক্ষা শেষ হয়ে যেতে রাম পুনরায় ট্যুশন শুরু করতে গিয়ে দেখল, ব্যাপারটা সহজ নয়। নিজের পরীক্ষার জন্য ট্যুশন ছেড়ে দেওয়ার ফল হল এই যে, একদিন যারা সাগ্রহে তাকে ডেকেছিল, আজ তারা অসন্তুষ্ট হয়ে বিদায় দিল। কেবল একটি বাড়িতে অন্য কোনো শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় নি। এবং তারা পুনরায় রামকেই বহাল করল।

'দেশে এসো' বলে বাড়ি থেকে রামের চিঠি এল। যাওয়ার ইচ্ছা কি নেই তার? আছে। কিন্তু টাকার ব্যবস্থা করবে কি ভাবে? আগামী বছর বি. এ পড়ার জন্য তো আরও টাকা চাই। কাজেই ছুটিতে সে আরও কিছু অতিরিক্ত উপার্জনের কথা ভাবল। মাঝখানে এমন খেয়ালও চাপল যে যদি টাকার সংকুলান হয় তবে একবার বাবার খোঁজটা নিতে পারে। এদিকে, মেসোমশাই অনেকদিন দেশে যায় নি, এবারে স্থির করল স্ত্রী পুত্রকন্যাসমেত দেশে যাবে। রাম বলল, 'আমি এখানে বাড়ি পাহারা দেব।' মাধব উত্তর দিল, 'তোমার

এখানে বসে পাহারা দেবার দরকার নেই। তুমিও চল। তোমার একার জন্য আর কী খরচ হবে?' কিন্তু রাম এবারে দেশে যাবে না বলে জিদ ধরল।

মাধবদের বাড়ি উডুপিতে। কৃষ্ণবেণী কিছুদিন মংগলুরে থেকে ছেলেপিলেদের নিয়ে শ্বশুরবাড়ি গেল। সেখান থেকে মাকে ও দিদিকে দেখবার জন্য গেল কোডিগ্রামে। কৃষ্ণবেণীকে পেয়ে তার মা ও দিদি দুজনেই খুশি হল। নাগবেণী মনে মনে ভাবল, 'আহা, রাম যদি আসত!' মা ও দিদির কাছে কৃষ্ণবেণী রামের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। যে কোন প্রসঙ্গে রামের কথা না বলে পারে না। বোনের মুখে রামের সুখ্যাতি শুনে নাগবেণী ভাবল, একদিন সে যত কষ্ট পেয়েছে এবং এখনও যা কষ্ট পাচ্ছে, সব তার সার্থক হল।

কৃষ্ণবেণী একদিন নাগবেণীকে বলল, 'দিদি, তুই যে বেহালা শিখেছিলি, তার কী হল?' সময় কাটাবে বলে নাগবেণী বাজাল খানিকটা। 'কী সুন্দর তুই বাজাস দিদি! আমার জয়ার এই বারো বছর হল। কেউ যদি ওকে বেহালা শেখাত, শিখতে পারত। ওখানে দশ-বারো টাকার কমে কোনো ট্যুটর মেলে না। খালি গানের জন্য অত টাকা খরচ করলে বাড়িভাড়া, খাওয়া, দুধ, ইস্কুলের মাইনে, বইপত্র, এ সমস্ত কী করে চলবে? এই তো একবার দেশে আসার জন্য পাঁচটি বছর হাত গুটিয়ে বসেছিলাম।'

নাগবেণী বলল, 'বেহালা শেখাবে রামই তো আছে। আমার চেয়ে ও দশগুণ ভালো বাজায়।' এই বলে রাম যখন গতবার বাড়ি এসেছিল, তখনকার বেহালা বাজাবার কথা সব খুলে বলল। কৃষ্ণবেণী আশ্চর্যের উপর আশ্চর্য। বলল, 'চোর! এ পর্যন্ত বাড়িতে একটি দিনও বেহালা আনে নি। গানের জন্য একবারও মুখ খোলেনি। ট্যুশনের কথা বলে ও বোধ করি বাজনা শিখতে যায়।' কৃষ্ণবেণীর কাছ থেকে তার ছেলেমেয়েরা রামের বেহালা বাজানোর কথা জেনে বলে উঠল, 'বাব্‌বা! রামুদা কী চালাক! 'রামুদা, তুমি গান জানো' জিজ্ঞেস করলে খালি বলে না, না।'

এদিকে মে মাসের ছুটিটা রাম মাদ্রাসের গরমেই কাটিয়ে দিল। টাকা টাকা করে ট্যুশনের জন্য খুব ছুটোছুটি করতে হয়েছে। এবারে আর লেখাপড়া নয়, গানের ট্যুশন। মাধবের চিঠিতে তাদের ফেরার তারিখ জেনে রাম সেন্ট্রাল স্টেশনে গিয়ে মংগলুরের গাড়ির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকল। রামের মুখ চোখে পড়তে যা দেরি, অমনি ছেলেমেয়েরা সমস্বরে বলে উঠল, 'চোর দাদা!

চোর দাদা! বেহালা!' কী ব্যাপার রাম কিছুই বুঝতে পারল না। পথে আসতে আসতে কৃষ্ণবেণী রামের সমস্ত গুপ্ত কথা ফাঁস করে দিল। আনন্দ জিদ ধরে বসল, 'রামুদা, তুমি বেহালা না বাজালে আমি আজ খাব না।' তখন বালকের তৃপ্তির জন্য বন্ধুর বাড়ি থেকে বেহালাটি নিয়ে এসে রামকে বাজাতে হল। কৃষ্ণবেণী খুব খুশি তার বাজনা শুনে। বলল, 'রাম, তোমার ফুরসৎ কেমন আছে? আর কাউকে নয়, কেবল জয়াকে একটু শেখাবে।' রাম ঠাট্টা করে বলল, 'বেশ, কিন্তু বেহালার ট্যুটরকে কী দেবে? বিনে পয়সায় খাওয়া?' কথাটা ঠাট্টার ছলে বলা, কিন্তু সেদিন থেকেই রামের মাথার এক বোঝা যে নেমে গেল তা সে তখনও বুঝতে পারল না। বুঝতে পারল মাসের শেষে। রাম অন্যান্য বারের মতো কৃষ্ণবেণীর হাতে খোরাকীর টাকা দিতে গেলে সে বলল 'উহুঁ, তুমি কী বলেছিলে মনে নেই?' রাম রাগ করে বলল, 'না মাসি, সে হয় না। টাকা তোমাকে নিতে হবে। আমি তো রোজগার করছি।' তখন কৃষ্ণবেণী বলল, 'বাবা, আমি কি তোমার মায়ের সমান নই।' বিবর্ণ মুখে রাম চুপ করে রইল। তার পোড়ামুখ থেকে সেদিন যে কথাটা পরিহাস ছলে বেরিয়েছিল, তাই সত্য হল? কৃষ্ণবেণী কিন্তু আগের মতোই দিদির নামে প্রতি মাসে বারোটি করে টাকা পাঠাতে থাকল।

বি. এ. ক্লাসে উঠে রামের খরচ বেড়ে গেছে। কলেজের মাসিক বেতন যেমন বেশি, বইপত্রের জন্যও বেশি টাকার প্রয়োজন। কিন্তু কারও কাছে সে টাকা চাইতে পারে না। বাড়িতে যখনই লিখবে তখনই যে দেওয়ালের গর্ত থেকে টাকা বেরুবে না তা সে জানে। এখানে থাকা খাওয়ার কোনো চিন্তা নেই বটে, কিন্তু বইয়ের অভাবে বন্ধুদের বাড়িতে গিয়ে পড়া, কলেজের বেতনের জন্য দু একটা গানের ট্যুশন করা, এসব নিয়মমাফিক চলতে লাগল।

পরের বছরেও গরমের ছুটিতে রাম আসবে বলে অপেক্ষা করে করে নাগবেণী অবশেষে আতঙ্কিত হল, 'সে কী, ছেলেও কি স্বামীর পথ ধরবে না কি?' মনে মনে সে এই সংশয় পোষণ করলেও সেকথা লিখতে তার মন যায় না। রাম যে কারণগুলির কথা লিখেছে সেগুলিই মেনে নিয়ে সে আবার লিখল, 'তবে তাই হোক, বি. এ. পরীক্ষা শেষ করেই তুমি দেশে এসো।'

* * *

মাদ্রাসে রামের এই চতুর্থ বর্ষ চলছে। মাইকেল মাস্-এর ছুটিতে সে খুব

জোর পড়াশুনো শুরু করে দিয়েছে। রামের কাছে যে সমস্ত বই নেই, সেগুলি বন্ধুদের কাছে চেয়ে চিন্তে পড়ে। মাঝে মাঝে দু একজন বন্ধুর বাড়িতে যাতায়াতের প্রয়োজন হয়। এই ছুটিতে সে একদিন গিয়েছিল তার অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজমণি আয়্যরের বাড়িতে। রাজমণি তখন সাণ্ডারল্যাণ্ডের সদ্য প্রকাশিত India in bondage বইখানি পড়ছিল। অত বড় বই দেখে রাম বলল, 'কী বই, রাজমণি? খুব তাড়া দেখছি যে।' রাজমণি বলল, 'মহারাজ, কাল ভোর হওয়ার আগেই এ বই ফেরত দিতে হবে। তাই এত তাড়া।' সারা রাত ধরে রাজমণি সেই বইখানি পড়ল। ক্লাসের পড়া ছেড়ে রাত ভোর করে পড়ে-ফেলা ওই বইখানি কী জানবার জন্য রাম খুব উৎসুক হয়ে ওঠে। ধরে দেখে, বেশ মোটাসোটা বইখানি। আমাদের দেশ সম্পর্কে জনৈক বিদেশীর লেখা। 'হুঁ দেখি, তাড়াহুড়োর কিছু নেই, বাপু। আমিও একদিন রেখে দিলে কী এমন ক্ষতি!' এই বলে রাম বইখানা বগল দাবা করলে রাজমণি একেবারে হকচকিয়ে গেল, 'রামু, অমন কাজটিও কোরো না। ওটি সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ বই। কোথাও কখনও ও বই হাতে দেখলে পুলিশ তোমাকে নির্ঘাৎ অ্যারেস্ট করবে। তারপরে তোমার আমার দুজনেরই বি. এ. পরীক্ষাটা হবে এল্লুর বা কডলুরের শ্রীঘরে।'

রাজমণি খালি 'না' বলে দিলে বইখানা পড়বার জন্য রাম তেমন উদগ্রীব হত না। বইখানি সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ বলে রামের একটা জিদ চেপে গেল, 'যেমন করে হোক, পড়া চাইই।' সারা রাত জেগে বইখানি শেষ করে, রাজমণিকে দিয়ে বলল, 'যার বই, তাকে ফেরত দিও।'

'কেমন লাগল?'

'কেমন লাগল, বলব? একজন বিদেশী আমাদের পরাধীনতার জন্য যতটা বেদনা বোধ করছে, আমাদের সেই বোধ আছে বলে তো মনে হয় না। খাঁচার মধ্যে পালিত বাঘের বাচ্চার মতো আমরাও জেলখানাকেই আমাদের বাড়ি বলে জেনেছি, পরাধীনতাকেই সত্য বলে গ্রহণ করেছি।' সেদিন থেকে রামের মাথায় বি. এ. পরীক্ষার পাঠ্যতালিকার সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার কথাও প্রবেশ করতে থাকে। সে তখন রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগ দেয়, প্রতিদিন নিষ্ঠার সঙ্গে আদ্যন্ত 'হিন্দু' পত্রিকা পাঠ করে। সারা দেশব্যাপী রাষ্ট্রীয় আন্দোলন আর একবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে

সে বালক মাত্র। তখন ইস্কুলের ছেলেদের একত্রিত করে যে 'গান্ধীজী কী জয়' বলানো হয়েছিল, রাম সেকথা কবে ভুলে গেছে! এখন তার যৌবনের উচ্ছ্বাসের সঙ্গে 'রাষ্ট্র ভক্তি'র জোয়ারও এসে গেছে। সে বয়সে তরুণ হয়েও সমগ্র দেশের দুঃখ কষ্টের প্রতি অন্ধ উদাসীন থেকে কেবল নিজের কথাটাই বড় করে ভাবছে। প্রতিদিন ট্রিপ্লিকেনের সমুদ্রতীরে বিশাল জনসমাবেশে মিলিত হয়ে 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ' দিয়ে ইংরাজ সরকারকে দগ্ধ করার সংকল্প নিয়ে সরব হয়ে ওঠার যুগ সেটা। রামও দেশভক্তির উৎসাহে সেখানে গিয়ে সত্যমূর্তি, প্রকাশম্ প্রভৃতি দেশপ্রেমিকদের বক্তৃতা শুনে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

ওদিকে গান্ধীজীর দাণ্ডি যাত্রা শুরু হয়ে গেল। সাবরমতী হল ভারতবর্ষের দিল্লী। দাণ্ডি হল পাণিপথ। গান্ধীজীর নেতৃত্বে সত্যাগ্রহের নতুন আন্দোলনে যোগ দিল শত শত, হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ লোক। সত্য, অহিংসা, চরখা, এই হল তাদের মন্ত্র। সমুদ্রের জল এনে লবণ তৈরি করে তারা সরকারি আইন ভঙ্গ করতে লাগল। রাজমণি আয়্যার্ তর্ক করে বোঝাল—লবণ সত্যাগ্রহ মাত্র সাতদিনের মধ্যে স্বরাজ এনে দেবে। রামের ধারণা অত দ্রুত না হলেও লবণ সত্যাগ্রহ যদি একবার সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে তবে স্বাধীনতা আপনা থেকেই নেমে আসবে আকাশ থেকে। যুক্তির বদলে আবেগ-চালিত হয়ে খুশি হয়ে ওঠে রামের মন।

কলেজের ক্লাস সেরে সেখান থেকে সোজা সে চলে যায় সমুদ্রতীরের জনসভায়। রাজমণি আসে সন্ধ্যার পরে অন্ধকারে লুকিয়ে। রাজমণির এই ভীরুতায় ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে রাম। একদিন তার বাড়িতে গিয়ে বলে 'এসব কী রাজমণি? যে সব দেশভক্ত নেতা বলেন, আমাদের মাতৃভূমিকে স্বাধীন করতে হবে, তাঁদের বক্তৃতা কি লুকিয়ে লুকিয়ে শুনব? সাণ্ডারল্যাণ্ডের মতো বিদেশীর মুখে যে কথা বেরিয়েছে, তা কি আমাদের—এই দেশের মানুষের মুখে আসবে না?' রাজমণি হেসে বলে, 'রামু, তুমি স্বাধীন। তোমার মায়ের উপর তোমার কর্তৃত্ব চলে। কিন্তু আমার পরীক্ষার টাকা চাইতে হবে বাবার কাছে। তাছাড়া দেখ, বিয়ে করেছি, স্ত্রীপুত্র আছে। তাদের দিকেও তো তাকাতে হবে।'

পরদিন কলেজের প্রিন্সিপাল ছাত্রদের ডেকে সাবধান করে দিলেন—'রাজনৈতিক হৈ চৈ ছাত্রাবস্থা শেষ হওয়ার পরে, এখন নয়। তোমাদের পায়ের

উপরে দাঁড়াতে শেখো, তার পরে। তোমাদের অভিভাবকরা তোমাদের লেখাপড়ার জন্য অর্থব্যয় করেন, এই কি তাঁরা আশা করেন? এর পরে যদি বীচ্-এর সভায় কোনো ছাত্রকে দেখা যায়, তবে তারা নির্বাচনী পরীক্ষা দিতে পারবে না।' এইভাবে একটু শাসিয়েও দিলেন। সেদিন থেকে রাজমণি 'হিন্দু' পত্রিকা ছেড়ে দিল।

রাম কিন্তু এই হুঁশিয়ারিতে ভয় পেল না। প্রিন্সিপাল ও প্রোফেসরদের বক্তৃতা উপদেশ তাকে আরও বেশি খেপিয়ে দিল। রাম বলে বেড়াল, 'কলেজের বাইরে আমরা কী করি না করি, তাতে প্রিন্সিপালের কী? আমরা কি আমাদের আত্মা বেচে দিয়েছি ওদের কাছে?' তিন দিন পরে রামের প্রিয় প্রোফেসর তাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তোমার মতো বুদ্ধিমান ছাত্র এই রাজনীতির বিভ্রান্তিতে পা দেবে এটা আমার কাছে খুব আশ্চর্য লাগছে। লবণ তৈরি করে কি কখনও স্বরাজ পাওয়া যায়? নিজেদের লবণ নিজেরাই তৈরি করে এমন কত দেশ এখনও পরাধীন! তুমি পাগলের মতো তোমার এই বয়স, এই সুযোগ-সুবিধা নষ্ট কোরো না। পরে যখন বড় হবে, তখন তোমার বিবেক যা করণীয় বলে মনে করবে তাই কোরো। এখন যা করছ সবই ভাবলুতা।'

এই অধ্যাপকের উপর রামের খুব শ্রদ্ধা বলে তাঁর কথায় 'না' বলার সাহস ছিল না। কিন্তু 'তাই হবে' একথা বলার মতো মনও ছিল না। রাম শুধু বলল, 'আমি ভেবে দেখব স্যর্'—এই বলে বাড়ি এল। যথাকালে টেস্ট পরীক্ষা হল। রাম নির্বাচিত ছাত্রদের তালিকায় স্থান পেয়েছে। রাজমণিও। পলিটিকসের দিকে আর সে ফিরে তাকাবে না বলে স্থির করে ফেলল।

ক্রিসমাস ছুটির সময়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা আরও ঘোরালো হয়ে ওঠে। সত্যাগ্রহ আর কেবল জেলে সুখযাত্রা নয়। এখন মাথায় লাঠির বাড়িও পড়ে। লবণ আন্দোলন দেখতে গিয়ে রাম ভয় পেয়ে বাড়ি ফিরে আসে। সে রাতে আর ঘুম আসে না তার। মনে মনে ভাবে, 'আমিও কি ভীরু হয়ে গেলাম? মেয়েরাও যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে চলেছে, তখন কি না আমি পুলিশের মারকে ডরালাম? রাজমণি ও আমার মধ্যে তাহলে তফাৎ কিসে?' পরদিন সে মনে মনে বলে, 'যা থাকে কপালে আমিও সত্যাগ্রহ করব।' এই বলে ইংরেজ সরকারেরর উপর বিদ্বেষটাকে মনের মধ্যে উস্কে দিয়ে সে লবণ তৈরির স্থানে এগিয়ে চলে।

সেদিনকার দলনেতা জানিয়ে দিলেন, 'আগে যারা নাম দাওনি, তারা আজ সঙ্গে এসো না।' রামের আর একটা দিন নষ্ট হল। পরদিন যখন তার ক্লাসে বসে লেকচার শোনার কথা, তখন কিনা সে শত শত লোকের সঙ্গে চিৎকার করে উঠল, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ!' বলল, 'মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়!' যখন তার হুঁস হল, তখন সে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা মাথা নিয়ে একটা হাসপাতালে শয্যাগত!

দু'তিন দিন পরে রাম বাড়ি ফিরছে না দেখে কৃষ্ণবেণী, মাধব ও তার ছেলে-পুলেরা খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে। তখনকার দিনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও সত্যাগ্রহের প্রবল উদ্দীপনায় পুলিশের টুপি দেখলেই চিৎকার করে ওঠে, 'মহাত্মা গান্ধীজী কী জয়।' এই ব্যাপারে মাধবের ছেলেপিলেরাও পিছিয়ে নেই। তারাও সত্যাগ্রহের কথাবার্তা বলছে শুনে কৃষ্ণবেণী বলে, 'আচ্ছা, আমাদের রামও তো সত্যাগ্রহে গিয়ে থাকতে পারে।' মাধব অবজ্ঞাভরে জবাব দেয়, 'কী যে বলো? রাম? সে কখনও সত্যাগ্রহে যেতে পারে না। আজ পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো কথা শুনেছ তার মুখে?'

মাধব তবুও একবার রামের টেবিলের উপর চোখ বুলিয়ে নেয়। দেখে, সেখানে তার নামে লেখা একখানি চিঠি পড়ে আছে, 'আপনাকে কিছু না জানিয়ে আমি যে অপরাধ করেছি, আশা করি ক্ষমা করবেন। আমার মনকে টানছে আমার মাতৃভূমি। সামনে বি. এ. পরীক্ষা বলে আমি মাতৃভূমির বন্ধনদশা দেখেও চুপ করে থাকতে পারলুম না। আজ বেরিয়ে পড়ছি সত্যাগ্রহের জন্য। আমার জন্য কোনো চিন্তাভাবনা করবেন না।' চিঠিখানি পড়ে মাধব খুব বিচলিত বোধ করে। 'ছেলেটা মিছিমিছি পাগলের মতো কাজ করে বসল। সত্যাগ্রহ তাদেরই জন্য যাদের ঘরে খাবার আছে। যাদের ঘরে খাবার নেই, তাদের জন্য নয়।' পরদিন আপিস থেকে ছুটি নিয়ে রামের সন্ধানে হাসপাতালে খোঁজ নিতে থাকে। কারণ সত্যাগ্রহ পুরাদমে শুরু হওয়ার পর হাসপাতালের মধ্য দিয়ে ছাড়া জেলের দিকে কোনো সোজা রাস্তা ছিল না। সত্যাগ্রহীরা প্রথমে আহত হয়ে হাসপাতাল, সেখান থেকে জেলে স্থানান্তরিত হতে লাগল।

কাজটা মাধবের পক্ষে বিপজ্জনক। সে নিজে কোনো সত্যাগ্রহীর আত্মীয় একথা প্রকাশ করতে তার ভয়। কখন তার নিজের উপরেই বিপদ এসে পড়ে বলা যায় না। ঘরের দেয়াল, খুঁটি, চৌকাঠ সকলেই সি. আই. ডির কাজ

করছে। কাজেই মাধব যদি যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিতে না পারে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তবু এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে সারি দিয়ে শোয়ানো অনেকগুলি লোক একসঙ্গে দেখতে পেয়ে, খুঁজে পেতে রামের কাছে পৌঁছন গেল। রাম ধীরে ধীরে উঠে বসল। মারের চোটে সমস্ত গা-গতর ফুলে উঠেছে। কিন্তু তখন তার মন আরও বেশি উত্তপ্ত ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। মাধব জিজ্ঞাসা করল, 'রামু, আমাদের কাছে কিছু না বলেই চলে এলে ?'

'বললে কি আপনারা আমাকে আসতে দিতেন ?'

'না, এইভাবে তোমার প্রাণ বিপন্ন হবে জেনে তাতে রাজী হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।' রাম চুপ করে রইল।

'দেশে এই খবর গেলে তোমার মায়ের প্রাণ কেমন করবে সেকথা একবার ভেবে দেখেছ ?'

রাম কোনো উত্তর দিল না। তার স্বদেশভক্তির ভাবাবেগের কাছে মায়ের তুচ্ছ দৈন্যদুর্দশার ভাবনা তার কাছে আসবে কি ? মায়ের কথা অবশ্যই মনে পড়েছে, কিন্তু মায়ের চিন্তা দেশভক্তির উৎসাহকে ক্ষীণ করে দিতে পারে নি। এখন এই হাসপাতালের যন্ত্রণার মধ্যে মায়ের কথা খুব বেশি করেই মনে আসছে। রাম তবু চুপ করে রইল।

'রামু, এখান থেকে ছেড়ে দিলেও কি তুমি বাড়ি আসবে না ?'

'দেখা যাক কী হয়।'

'তুমি ক্ষমা চাইলে তোমার অবশ্যই মুক্তি হবে। বি. এ. পরীক্ষাটা কি এবার শেষ করা উচিত নয় ? পরীক্ষাটা ভালো করে দাও। এই দু'এক মাসের মধ্যে স্বরাজ তোমার একার জন্য আটকে থাকবে না।'

রাম বলল, 'দেশের প্রতি যে অবিচার হচ্ছে, আমার মতো শতশত মানুষের প্রতি প্রত্যহ যে অন্যায় হয়ে আসছে, আপনারা তা বুঝতে পারছেন না। মানুষ তো কেবল তার পেট ভরাবার জন্যই বেঁচে থাকে না।'

মাধব বুঝল যে রামের সঙ্গে এখন কথা বলে কোনো ফল হবে না। কয়েক দিন কেটে গেলে, মনের উত্তপ্ত আবেগ ঠাণ্ডা হয়ে এলে আপনা থেকেই ও ঠিক পথে আসবে—এই ভেবেই মাধব বাড়ি ফিরে এল। দিনকয়েক পরে মাধব আর একবার রামের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে শুনল যে তাকে হাসপাতাল থেকে

জেলখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছ'মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ নিয়ে রাম এখন বেল্লুর জেলে।

খবরটা শুনে ভয় পেয়ে গেল কৃষ্ণবেণী। রামের মা জানে যে ছেলে তার বোনের বাড়িতে বসে পড়াশুনো করছে। এখন তাকে কী লিখবে সে ? 'তোমার কাছে থেকেও ওকে যেতে দিলে ?' নাগবেণী এভাবে লিখলে কী উত্তর দেবে সে ? এখনও কি তাকে খবরটা জানানো সংগত নয় ? এই চিন্তা করে করে কৃষ্ণবেণী রামের সমস্ত কথাটা সবিস্তারে জানিয়ে দিদিকে পত্র দিল।

নাগবেণীর মাথায় সেদিন আর দ্বিতীয় বজ্রাঘাতের প্রয়োজন ছিল না। বোনের চিঠিখানি পড়েছে সে। স্বদেশী আন্দোলনের কথা সে জানে, গান্ধীজীর নাম তার অজানা নয়। কারণ ওই একই সময়ে আন্দোলনের ঢেউ কোডিগ্রামেও এসে পৌঁছেছে এবং পুলিশকে অগ্রাহ্য করে সেখানকার জেলেরাও লবণ তৈরি করতে শুরু করে। কিন্তু এ সমস্ত ঘটনার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত কোন যোগ ছিল না। আজ পুত্রের কারাবাসের খবর এসে তাকে বিকল করে দিল। রাম পুলিসের হাতে প্রহার খেয়ে গ্রেপ্তার হয়েছে, বি এ পরীক্ষা নষ্ট করে তার ভবিষ্যৎ জীবনের পথে নিজের হাতেই কাঁটা বসিয়েছে। পরদিনও নাগবেণী বেহুঁসের মতো পড়ে থাকল। ছেলে যদি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আবার তার কাছ থেকে দূরে চলে যায় তবে নাগবেণী মা হয়ে সত্যাগ্রহ করবে কার বিরুদ্ধে ? অবশেষে মনে মনে বলল, 'হায়, আমার কপালের লেখা অনুযায়ী কারও কাছ থেকে আমি সুখ পাব না। পাপ করে এসেছি, তাই এই দুর্গতি। রাম আমাকে আর কী সুখ দেবে ?'

এদিকে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে দেশভক্ত রাম দেশাভিমানে টগবগ করে ফুটছে। বেল্লুরের জেলখানা খদ্দরপরিহিত স্বদেশীওয়ালাদের হাটে পরিণত হয়েছে এবং হাটের মতোই সেখানে কোলাহল ও বিশৃঙ্খলা। কোলাহল চিৎকার করেই যদি স্বরাজ পাওয়া সম্ভব হত, তবে প্রতিদিন তারা যে চিৎকার করে বলছে, 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ,' 'গান্ধীজী কী জয়' তা দিয়ে অন্তত দশবার স্বাধীনতা তাদের মুঠোর মধ্যে এসে ধরা দিত। জেলের মধ্যে নানা জায়গার লোক এসে জড়ো হয়েছে। এইভাবে যদি সমস্ত জেলে ভর্তি হতে থাকে তবে আগামী বছরের মধ্যেই বৃটেন ধ্বংস হয়ে যাবে বলে তাদের বিশ্বাস জন্মাল। রামেরও অবিশ্বাসের কোনো কারণ নেই।

এদিকে রাজবন্দীদের আন্দোলনে জেল ভেঙে পড়ার উপক্রম হল। তাদের যে খাদ্য দেওয়া হয়, তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর বলে বেল্লুরের বন্দীরা অনশন ধর্মঘট শুরে করে দেয়। অফিসারবৃন্দ ছুটে এসে খানিকটা ভালো খাদ্যের আশ্বাস দিয়ে এবং জনৈক সত্যাগ্রহীকে রসুইখানার দায়িত্ব দিয়ে বন্দী দেশপ্রেমিকদের উত্তেজনা প্রশমিত করে।

একজন তরুণ বন্দী জেলের মধ্যেই কার্ল মার্কস্, লেনিন ও ট্রট্স্কির তত্ত্বকথা প্রচার করে দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করে দিল যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের একমাত্র উপায় হল ধর্মঘট। রামও দারিদ্র্যের মধ্যে কষ্টে স্বষ্টে বড় হয়ে আসছে বলে তার কাছে গান্ধীবাদের তুলনায় এই নতুন প্রচারিত তত্ত্বই বড় মনে হল। অনেক রাজবন্দীর ধারণা হল 'সত্যাগ্রহ পলিসি স্বরাজ না পাওয়া পর্যন্ত। স্বাধীনতা পেয়ে গেলে কম্যুনিজ্‌ম্, সাম্যবাদ।' তরুণ রাজবন্দীরা আদর্শবাদ ও ভাবপ্রবণতার বশবর্তী হয়ে দিনের পর দিন বিচার বির্তক করে। এই পরিবেশের মধ্যে রাজনৈতিক চিন্তাধারায় রাম যে একটা যথাসম্ভব নিরপেক্ষ ও যুক্তিপূর্ণ পন্থা অনুসরণ করবে এমন প্রত্যাশা করা চলে না।

অকস্মাৎ একদিন গান্ধী-আরুইনের চুক্তির ফলে জেলের দরজা খুলে গেল। বন্দীদের বলা হল, তোমাদের যেদিকে খুশি চলে যাও। রাম জেল থেকে বেরিয়ে বেল্লুরের পথে এসে দাঁড়াল। সঙ্গে পয়সা নেই, পরিধানের জন্য দ্বিতীয় বস্ত্র নেই। যেখান থেকে আনা হয়েছে বন্দীদের সেখানে পৌঁছে দেওয়ার কোনো ব্যবস্থাও করা হয়নি। অবশেষে জেলখানার কয়েকজন নতুন বন্ধুর সঙ্গে মিলেমিশে রাম সত্যাগ্রহী টিকিটের জোরে বেলুর থেকে কাট্পাডি পর্যন্ত এল। অতঃপর কোন দিকে যাবে? মাদ্রাসে না মংগলুরে? উভয় দিকেই বিনা টিকেটের যাত্রা। পরীক্ষা যে ফস্‌কে গেল তা সে জানে। তাহলে আর মাদ্রাসে গিয়ে কী করবে? যখন জেলে ছিল, মায়ের কথা খুব মনে পড়ত। 'মা কী না জানি বলবে' এই ভয় তার মনের মধ্যে খচ খচ করত। তবু তিন বছর হল সে মাকে দেখেনি এখনও কি একবার দেখবে না?—এই ভেবে মংগলুরের পথ ধরল।

মংগলুরে পৌঁছে ললিতামামীর ওখানে না গিয়ে হস্টেলে উঠল। কিন্তু হস্টেলে গিয়ে এক বিপদ হল এই যে সে এখন জেল-ফেরত সত্যাগ্রহী বলে ছাত্রদের সামনে তাকে বক্তৃতা দিতে হবে। রাম 'না' বললেও সে কথা শোনে কে? নিরুপায় হয়ে তাকে বক্তৃতা দিতে হল, আবেগ ও আদর্শবাদ মিশিয়ে দেশাত্ম-

বোধের কথা। এই বলে উপসংহার করল, 'দরিদ্রনারায়ণের সেবাই আমাদের লক্ষ্য, আর আমাদের লক্ষ্য ভারতের স্বাধীনতা।' সমবেত ছাত্রবৃন্দ ধ্বনি দিল, 'শ্রীরাম ঐতাল কী জয়।' কেবল এই একটি নয়, আরও দুটো বক্তৃতা দিতে গিয়ে সারাটা দিন মংগলুরেই কেটে গেল। এই সমস্ত ব্যাপারে তরুণ রামের পক্ষে মাথা ঠিক রাখা শক্ত। কেমন তার মনে হল রাতারাতি সে একটা নেতা হয়ে উঠেছে।

সদাশিবের কানে গেল যে তার ভাগ্নে রাম মংগলুরে এসেছে। খবর পেয়ে সে রামের সঙ্গে দেখা করতে এল। বলল, 'রাম, আমাদের বাড়িতে কি আসতে নেই?' এই বলে তাকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেল। রামের বৃত্তান্ত সদাশিব আগেই জানত। বাড়িতে ললিতা প্রভৃতি সকলেই তার আদর যত্ন করল। ললিতা জিজ্ঞাসা করল, 'এখান থেকে কি গ্রামে না অন্য কোথাও?' ললিতার প্রশ্নে আবার মায়ের কথা মনে পড়ে গেল।

মংগলুরের বাস থেকে নেমে লজ্জা ও সঙ্কোচের ফলে রাম আর ছোট দাদুর বাড়িতে গেল না। সোজা কোডিগ্রামের দিকেই রওনা হল। গ্রামের দৃশ্য চোখে পড়তেই রাম কেমন উন্মনা হয়ে গেল, তার পদক্ষেপ মন্থর হয়ে এল। নদী পার হতে গিয়ে পা আর চলছে না। ধীরে ধীরে নদী পার হয়ে নিজের বিচিত্র পোশাকের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মাথার গান্ধী টুপিটা পকেটে গুঁজে রাখল। হারানো জিনিস খুঁজতে খুঁজতে পথচারী যেমন এগিয়ে চলে, রামও তেমনি ধীরে ধীরে মাঠের আলের উপর দিয়ে বাড়ির দিকে অগ্রসর হল। আকাশ থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছিল। খদ্দরের শাদা পোশাকে রাম ভিজতে ভিজতে চলেছে। কাছাকাছি একটা ক্ষেতের মধ্যে বচ্চি তার ছেলেপুলেদের নিয়ে ঘাস নিড়োবার কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ ঘাড় তুলে রামের দিকে চেয়ে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে, খোকাবাবু?' রাম উত্তর দিল, 'হ্যাঁরে বচ্চি।'

'খোকাবাবু, আজ দু বছর হল মাকে ছেড়ে গেছ। তুমিও কি তেনার মতো করবে?' এই বলে এই কিসানরমণী তার মনের দুঃখ প্রকাশ করল।

বচ্চির কথায় রামের বুকে যেন বাণ বিদ্ধ হল। তার একে একে মনে পড়ে গেল—প্রথমবার যখন বাড়ি ছেড়ে সে মাদ্রাসে যায়, তার মা যে সমস্ত কথা বলেছিল সেই কথাগুলি, মায়ের সেই কথা উপেক্ষা করে রাম যা যা করেছে সেই সমস্ত ঘটনা, সর্বশেষে তার বি. এ. পড়ার শেষ ফল—কিছুই বাদ গেল না।

বচ্চিকে কোনো উত্তর দেবার মতো কথা তার মুখে এল না। শুধু জিজ্ঞাসা করল, 'মা আছে বাড়িতে ?'

বচ্চি বলল, 'হ্যাঁ খোকাবাবু, মাঠান বাড়িতেই আছেন। তবে তোমার দিদিমার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না! বয়স তো হল।'

রাম এবার দ্রুতপদে চলতে লাগল। উঠোন পেরিয়ে সোজা বারান্দায় উঠে এসে দেখে রোগগ্রস্ত দিদিমা একটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে আছেন। পা তাঁর ফুলে উঠেছে। 'রামু, এসেছ বাবা ? ওরে নাগু, তোর ছেলে এয়েছে! আমি বলি নি ?' রান্নাঘরে বসে বর্ষাকালের ভেজা জ্বালানি কাঠ ফুঁ দিয়ে জ্বালাতে গিয়ে চোখ ডলতে ডলতে নাগবেণী বলল, 'কী বললে, মা ?' এই বলে বাইরে এসেই দেখে—সামনে দাঁড়িয়ে রাম। মাকে আর কিছু বলতে হল না।

নাগবেণী বলল, 'রাম, এসেছ বাবা ? আমাদের কথা মনে পড়ল ? আমরা যে তোর চিন্তা করে মরে যাই, সে কথা বোধ করিমনে থাকে না। তুই যে এমন কাজ করবি বাবা, বুঝতে পারি নি।' মায়ের অনুযোগে রামের চোখে জল এসে গেল।

'বাবা, আমাদের আর কে আছে যে তুই এইভাবে ছেড়ে গেলি ?'

রাম আর নিজেকে সামলাতে পারল না। কত বছর হয়ে গেল কে জানে—রাম সেভাবে আর কাঁদেনি। সেই মুহূর্তে সে নিজেকে মহা অপরাধী বলে বুঝতে পারল। নাগবেণী নিজেই এগিয়ে এসে বলল, 'বলেছি বলে দুঃখ পেলি বুঝি ? কাঁদিসনে, চুপ কর। তোর খাওয়া ?' 'হয় নি' শুধু এইটুকুই উত্তর এল। মায়ের বাকী প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই।

নাগবেণী রান্নাঘরে গিয়ে মায়ের পাচন জ্বাল দেবার জন্য যে উনুন ধরিয়েছিল, সেই উনুনের আগুনেই ছেলের জন্য ভাত চাপিয়ে দিল। দিদিমা রামকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, 'বাবা, আমার দিন তো শেষ হয়ে এসেছে।'

রাম বলল, 'একথা কেন বলছ দিদিমা ? আমি গিয়ে ওষুধ আনছি তোমার জন্য। তুমি শীগ্‌গিরই ভালো হয়ে উঠবে।'

দিদিমার কথামতো রাম পুকুরে ডুব দিয়ে ভিজে কাপড়েই ঘরে এল। কিছুক্ষণ পরে দিদিমা বললেন, 'রামু, ভিজে কাপড় পরে আছিস কেন ? অন্য বস্ত্র আনিস নি ?' রাম বলল, 'কাপড়চোপড় সব মাদ্রাসেই পড়ে আছে দিদিমা।' রাম আগে একবার বাড়িতে এসে যে দু'একখানা পুরোনো ধুতি রেখে গিয়েছিল, নাগবেণী তাই এনে দিল। খাওয়া দাওয়া নিঃশব্দেই সমাধা হল।

নাগবেণী বিশেষ কথাবার্তা বলে নি। কী আর বলবে? সে জানে যে কিছু বলতে গেলে ছেলে মনে ব্যথা পাবে। কী জানি কোন্ গ্রহের ফেরে ভুল কাজ করে ফেলেছে, এই কথাটা বলে ওকে কাঁদিয়ে কার কী লাভ হবে? তাছাড়া, মা-দিদিমার কথা ভেবেই তো দেশে ফিরে এসেছে, এটাই কি যথেষ্ট শাস্তির কথা নয়?

রাতের খাওয়া সেরে মা ও ছেলে এসে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলল। রাম বলল, 'মা, যা হবার হয়েছে। আগামী বছর বি. এ. পরীক্ষাটা দিয়ে যে কোনো একটা চাকরিতে লেগে যাব। এক মুহূর্তের জন্য তোমাদের সকলকে ভুলে গিয়েছিলাম।' নাগবেণী সত্যাগ্রহের কথা জিজ্ঞাসা করলে রাম লাঠিচার্জ থেকে আরম্ভ করে জেলের খাওয়া দাওয়া পর্যন্ত বর্ণনা করে মায়ের মনে রোমাঞ্চ সৃষ্টি করল। নাগবেণীর একথা কখনও মনে হল না যে তার ছেলের কাজ কোনো অংশে অনুচিত বা লজ্জাকর। তবে ছেলেকে সে এই ভাবে উপদেশ দিল, 'বাবা, তুমি যে কাজ করেছ, ভালই। কিন্তু এ কাজ গরীবদের নয়। আজ গেলে কাল কী খাবে সে ব্যবস্থা যাদের ঘরে নেই, এই কাজ কি তাদের পোষায়?' মায়ের এই কথায় রাম বলল, 'মাসিমা ও মেসোমশাই আমাকে এই কথাই বলেছিল মা। কিন্তু আমি সে কথা কানে তুলি নি।'

পরদিন রামের অনেক কাজ। প্রথমে যেতে হবে ঐরোডিতে নারায়ণদাদুর বাড়িতে। দিদিমার অসুখ নিয়ে তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার। বাড়ি থেকে বেরোবার সময়ে 'দেয়ালের গর্তে রাখা টাকা' বলে নাগবেণী রামের হাতে কিছু টাকা দেওয়াতে কোথাও আর টাকা ধার করবার প্রয়োজন হবে না। ঐরোডি গিয়ে রামকে পুনরায় ভর্ৎসনার সম্মুখীন হতে হল। নারায়ণদাদু বলল, 'দ্যাখো, যারা তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে, যারা তোমাদের জন্য চোখের জল না ফেলে পারে না, তোমরা ছেলেপিলেরা সেই সব অভিভাবকদের কথা কত সহজে ভুলে যাও।' সেখানে রামকে আর একবার চোখের জল ফেলতে হল, অনুশোচনা করতে হল। নাতির আন্তরিক দুঃখপ্রকাশ দেখে নারায়ণদাদু তাকে অনেক সান্ত্বনা দিল।

সেখান থেকে রাম মোটরে করে উডুপি পৌঁছে একজন ডাক্তারের কাছ থেকে দিদিমার জন্য ওষুধপত্র জোগাড় করল। ওষুধ কেনার পরে মাত্র চার আনা পয়সা বেঁচেছিল বলে রাম মোটরের পথ ছেড়ে সমুদ্রের তীরে তীরে গ্রামের দিকে

রওনা হল। পথে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। তিনিও একই পথের যাত্রী। সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে গল্প করতে করতে নানা জায়গার সত্যাগ্রহের বর্ণনা দিতে দিতে রাম তোন্‌সে-কোডিগ্রামের রাস্তায় এসে পড়ল। ভদ্রলোক রামের সঙ্গে একমত হয়ে সত্যাগ্রহের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে বললেন, 'এই পোড়া শান্‌ভোগগিরি (তশীলদারি) আর পেটের ধান্দা—এই দুটো জ্বালা না থাকলে আমিও সত্যাগ্রহী দলে নাম লিখিয়ে লবণ তৈরিতে লেগে যেতাম।' পরে তাঁদের গ্রামে ঢোকার সময় এসে গেলে বিদায় নিয়ে বললেন, 'আসি ভাই, তাহলে?' পরে হঠাৎ খেয়াল হতে আবার বললেন, 'হ্যাঁ ভাই, এতসব কথাবার্তা হল। তোমার বাড়ি কোথায় এই কথাটাই জিজ্ঞাসা করা হয় নি।'

'আমার বাড়ি কোডিগ্রাম।'

'কোডিগ্রামে? কোডিগ্রামে কোন্ বাড়ি?'

'রাম ঐতালের পৌত্র আমি।'

শান্‌ভোগ (তশীলদার) মশাই রামকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে হঠাৎ হেসে ফেলে বললেন, 'সত্যভামার নাতি তুমি? আমি কে চিনতে পারলে? তোমার ঠাকুরমা সত্যভামা ছিল আমার ছোট বোন।' এই বলে মাধপ্পয়্যের পুত্র জনার্দনয়্য রামকে পড়ুমুন্নুরু গ্রামের দিকে টেনে নিয়ে গেলেন। রাম তার দিদিমার কথা বললেও ভদ্রলোক সেকথা শুনলেন না। অবশেষে রাম বলল, 'আপনি যদি এখন আমাদের বাড়িতে যেতে রাজী থাকেন, তবে আমি আপনাদের বাড়িতে আসব।' ভদ্রলোক সম্মতি দিলেন।

পথে যেতে যেতে বললেন, 'বিয়ের পরে তোমার বাবা মা সেই যে একবার আমাদের বাড়িতে এসেছিল, তখন আমার বাবা বেঁচে ছিলেন—তারপরে আর এদিকে আসে নি। তোমার বাবার দুর্বুদ্ধির জন্য আমাদের আর যোগাযোগ রইল না।' সেদিন পড়ুমুন্নুরু গ্রামে রামের কত আদর-যত্ন! কত গল্প গুজব! তশীলদারমশাই খুশির সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর কাছে বললেন, 'দেখ, এই আমার নাতি—সত্যভামার পৌত্র।' এত আদরযত্ন সত্ত্বেও দিদিমার জন্য রামের মনটা উদ্বিগ্ন দেখে আহারাদির পরেই তশীলদারমশাই বললেন, 'বুঝলে রাম, তোমার বাবা আমাদের সকলকে ত্যাগ করার পরে আর বোধ করি তোমাদের বাড়িতে যাইনি। গিয়ে কী কাজ বলো? যখন শুনলাম লচ্চ তার মায়ের শ্রাদ্ধটা কার-না-কার

বাড়িতে করবে, আর গেলাম না সেখানে। তোমার কল্যাণে আবার এতদিন পরে কোড়ি দর্শন হবে।' এই বলে রামের হাত ধরে রওনা হলেন।

রাম ভেবেছিল তোন্‌সে থেকে বাকী পথটা পদব্রজেই যাবে। কিন্তু জনার্দন দাদু নৌকাঘাটে একজন মাঝিকে ডেকে বললেন, 'বেল্ল, কোড়িগ্রামে একটা খেপ দিয়ে এসো দেখি।' বেল্ল মাঝি যে কেবল কোড়িগ্রামে যেতেই রাজী হল নয়, তশীলদারমশাই 'না' বললেও তাঁদের সেবার জন্য নারকেল গাছ থেকে দুটো ডাব পেড়ে আনল। মন্দ হল না, ভরা পেটে দুজনেই ডাবের জল পান করে নিল। জনার্দনদাদু রামের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কোড়িগ্রামের ঘাটে এসে নামলেন।

দুজন মানুষকে বাড়ির দিকে আসতে দেখে উঠোনে দাঁড়িয়ে কপালে হাত রেখে নাগবেণী তাদের দেখতে থাকল, একটু দূর থেকেই রাম চেঁচিয়ে বলল, 'মা, কাকে ধরে এনেছি ছ্যাখো। কে ইনি বলতে পার?' নাগবেণীর মনে পড়ল তার প্রথম বয়সে নৌকায় করে পড়ুমুন্নুরু যাত্রার কথা। কিছুটা ইতস্তত করে বলল, 'উনি কি তিনি নন?'

'কে নন?'

'তোমার পড়ুমুন্নুরুর দাদু?'

সকলেই খুব খুশি। বৃদ্ধা দিদিমার ওষুধ ও পথ্যের কথা সবিস্তারে বলা হল। ডাক্তার যে বলেছেন, 'ভয়ের কোনো কারণ নেই' সে কথাও জানানো হল। জনার্দন দাদু বললেন, 'ওষুধ আনবার জন্য দরকার হলে আমাদের খাজাঞ্চিকে একদিন অন্তর এক দিন পাঠানো যাবে।'

সেই রাত্রিতে আহারাদির পরে তশীলদার জনার্দনয্য তাঁর ভগিনীপতি রাম ঐতালের বিবাহ থেকে শুরু করে লচ্চর দেশান্তরী হওয়া পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করে শোনালেন।

পঁচিশ

রামের এক বছর কাল বনবাস। এ বছর আর বি. এ. পড়াশুনো এগোবে বলে মনে হয় না। এই তো আগস্ট মাস চলছে। আবার কলেজে ভর্তির সময় আগামী বছর জুন-জুলাই মাসে। আবার গিয়ে খাটুনির পালা। গত বছরও খেটে ছিল কম নয়, টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হয়েছিল, কিন্তু সে সবই ব্যর্থ হয়ে গেল। এখন এই বছরখানেক সময় সে কোনো মতে বাড়িতেই কাটিয়ে দেবে। একে তো বৃদ্ধা দিদিমার সেবা-শুশ্রূষা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, তাকে যদি বেকার হয়েই থাকতে হয় তবে মায়ের কাছ থেকে দূরে থাকা অর্থহীন। ইতিমধ্যে যাকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল, পুনরায় সেই বেহালার সেবা বাড়িতে বসেই শুরু করা যাবে। কিন্তু এই সমস্ত কাজও যথেষ্ট নয় বলে সে রোজ একবার হংগারকট্টে বন্দরে যাতায়াতের অভ্যাস করে ফেলল। সেখানে কোনো এক মহাজনের গদিতে 'হিন্দু' পত্রিকা আসে বলে কাগজখানি নিয়ে রাম গোগ্রাসে খবর গিলতে শুরু করে।

প্রতিদিনই খবরের কাগজ পড়ার পরে দেশের দারিদ্র্য, হরিজনসমস্যা, সুতো কাটার আবশ্যকতা, দেশোদ্ধার প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে তর্ক জমে ওঠে। এই তর্কসভার সদস্যদের মধ্যে একজন হল রামের সমবয়সী একজন ইস্কুল মাস্টার, আর একজন মাঝপথে লেখাপড়া ছেড়ে দেওয়া একজন বেকার যুবক এবং আরও কয়েকজন। বলাই বাহুল্য, রাম এই সভার মধ্যমণি। মাথার উপর রোদ না চড়া পর্যন্ত রোজই তাদের তর্ক চলে। অবশেষে একদিন কে-একজন বলে ওঠে, 'হ্যাঁ মশাই, গান্ধীজী তো লেকচার দিতে বলেন নি। তিনি বলেছেন, মদ্যপান বন্ধ করুন, সুতো কাটুন, পল্লীগুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। কিন্তু আমরা কেউ কোনো কাজ করি না, খালি মুখেই বলি 'গান্ধীজী কী জয়', এতেই তো গান্ধীজীর আন্দোলন ঢিলে পড়ে গেছে।' রাম এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল। কথাটা তাকে খুবই আঘাত করল। কিন্তু ভদ্রলোকের যুক্তিকে স্বীকার না করে উপায় নেই। অবশেষে রাম মুখ খুলল, 'আপনি যা বলেছেন অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমরা কথা বলি 'অস্তি' কাজ করি 'নাস্তি'। আমার এখন মাস দশেক সময় আছে। কী করতে হবে বলুন।'

তিনি বললেন, 'যদি বলেন কী করতে হবে, তবে প্রথমে একটা কংগ্রেস অফিস করুন। তারপরে চরখাসংঘ, তকলিসভা, খাদিপ্রচার ইত্যাদি।'

আর কথা নেই, সেদিন সেখানে তখনই কংগ্রেস কমিটি গঠিত হয়ে চরখা-সংঘ স্থাপিত হল। পরদিন একটা খালি 'বংডশালা'র উপরে বোর্ডও ঝুলিয়ে দেওয়া হল। উড়ুপি থেকে চার ডজন তকলি আনিয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিতরণ করে দিতেও বিলম্ব হল না।

একদিন অপরাহ্ণে গ্রামে ফেরার সময়ে রাম তকলি দিয়ে সুতো কাটতে কাটতে মাঠের উপর দিয়ে আসছে দেখে বচ্চি বলল, 'এ কী খোকাবাবু, আপনি জাল বুনছেন?' এই বলে হেসে ফেলল। 'কী বললে?' অর্ধেকশোনা কথাটা পুরো শুনবে বলে রাম বচ্চিকে জিজ্ঞাসা করল। বচ্চি উত্তর দিল, 'বলছিলাম কি, তোমার মতো করে আমাদের জেলেদের ছেলেপুলেরা শনের সুতো পাকায় জাল বোনার জন্য।' রাম হেসে বলল, 'বোকা তুই, আমি যা করছি তার মর্ম তুই কী বুঝবি?' এই বলে রাম বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

নতুন তকলি কিনা, কাজেই তার বিরাম নেই। সকালে বিকালে, দুপুরে রাতে সর্বদাই চলে। রাত্রিতে টিম্‌টিম্ করে জ্বলা কেরোসিন 'লম্প'-এর সামনেও ঘুরতে থাকে। নাগবেণী দেখে বলে, 'এ সব কী রাম?' 'কেন, সুতো কাটছি।' এখন আমাদের বাড়ির প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদির জন্য আমিই 'গ্যারান্টি'।' মা হেসে বলল, 'বাবা রাবণের উদরে এক পয়সার ঘোল। সুতো কেটে আমাদের লজ্জানিবারণ করলেই অভাব মিটবে?' নাগবেণীকে রাম তকলিতত্ত্ব বোঝাতে চেষ্টা করল। শেষে বলল, 'গান্ধীজী বলেন তকলি থেকেই স্বাধীনতা আসবে।' মা বলল, 'বাবা, কী গান্ধীজী, কী স্বাধীনতা কিছুই জানি না। তোর ঠাকুর্দা পৈতার জন্য সুতো কেটে কেটে ছেলে থাকতেও মুক্তি না পেয়ে মারা যান। তিনি যে চরখা দিয়ে পৈতার সুতো কাটতেন আমি সেটা ছোট থাকতে তোকে 'গির্গিটী' খেলার জন্য দিয়েছিলাম। এখন তুই সুতো কেটে দেশোদ্ধার করবি।' প্রত্যুত্তরে রাম ঘণ্টাদেড়েক ধরে মাকে অনেক উপদেশ দিল। অবশেষে বলল, 'মা, যখন খারাপ লাগে এই তকলি নিয়ে সময় কাটানো চলে।' 'তার জন্য তো বেহালাই আছে।'

দিন কাটছে। সমানে চলেছে রামের সোৎসাহে সুতোকাটা। দশ দিন ধরে সঙ্ঘের সব সদস্য মিলে দুই 'রাত্‌লু' (পাউণ্ড) সুতো কাটল এবং সেই

সুতো উডুপিতে দিয়ে এল একখানি ধুতি বোনার জন্য। সকলেই খুশিতে ডগমগ হয়ে বলল—'Takli is a success'. অতঃপর কী কার্যক্রম, সেই নিয়ে কংগ্রেস কমিটির পরবর্তী বৈঠকে অনেক বিচার বিবেচনা হল। সিদ্ধান্ত হল, হরিজন সেবা, খাদিবিক্রয়, মদ্যপান নিষেধ...সব কিছুই একসঙ্গে করা দরকার। ও অঞ্চলের নাগন্ন মাস্টার খুব গর্বভরে বলল, 'রামবাবু, এই পোড়া ইস্কুল মাস্টারিটা না থাকলে আমিও কংগ্রেসের মেম্বার হয়ে যেতাম।'

'এখন কেন মেম্বার হতে পারেন না?'

'ওরে বাবা, আমাদের বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বেটা আগে থেকেই আমার উপর দৃষ্টি রেখেছে। যদি শোনে কংগ্রেসের খাতায় আমার নাম উঠেছে, ব্যস্ আর দেখতে হবে না, ট্রান্স্ফার করে দেবে একেবারে হেব্রি বা মুদ্রাডিতে...।'

'আর কী কাজে পেতে পারি আপনাকে?'

'দরকার হলে মদের দোকানে পিকেটিংএর জন্য আপনাদের সঙ্গে যেতে পারি।'

আগামী শুক্রবার বারকূরুর হাট। সোমবারে হল কোটের হাট। স্থির হল এই দুটো দিনে কম পক্ষে পাঁচশ জনকে কংগ্রেসের মেম্বার বানাতে হবে। হাটে দাঁড়িয়ে রাম ও তার বন্ধুরা জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করল। বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে তক্‌লিতে সুতো কাটাও চলছিল। 'সকলেই কংগ্রেসের মেম্বার হয়ে যান' বলে মেম্বারের খাতা বের করতেই সই করবার জন্য বা টিপছাপ দেবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। রাম বলল, 'যাঁরা যাঁরা সই দেবেন বা টিপছাপ দেবেন বছরে তাদের মাত্র চার আনা করে চাঁদা দিতে হবে।' একজন বলে উঠল, 'চার আনা! চার আনায় যে দু'খানা 'পানিপঞ্চে' (গামছাজাতীয় ছোট ধুতি) মেলে।' আর একজন বলল, 'আমি তো শুনতে পেইছিলুম কংগ্রেস আমাদিগে চার আনা করে দেবেন।'

অন্যরা বলে উঠল, 'চার আনা দিলে দুই পোয়া নারকেল তেল, দুই বোতল কেরাসিন তেল মেলে।' পাঁচশ জনের পরিবর্তে মাত্র ছ'জনকে কংগ্রেস সদস্যের তালিকাভুক্ত করে বিরসমুখে রাম সেদিনকার মতো বাড়ি ফিরে এল।

পরের সপ্তাহে খাদি নিয়ে সে হাটে গেল বিক্রি করতে। পাড়াগাঁয়ের লোকেরা খাদির দরদাম শুনে বলল, 'হুঁ, গান্ধী কাপড়ের দাম সস্তা হবে ভেবেছিলাম।' এদের মন্তব্যাদি শুনে রাম খুব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। একটু

বক্তৃতার ভঙ্গীতে বলল, 'ভাইসব, তোমরা যদি বিদেশী বস্ত্র ক্রয় কর, তবে তার প্রতিটি পয়সা চলে যাবে দেশের বাইরে। এমনি করে এমন একদিন আসবে যখন আমাদের দেশের সকল লোককে না খেয়ে থাকতে হবে। তার বদলে যদি এই খাদি ক্রয় কর, তবে তার প্রতিটি পয়সা দিয়ে আমাদের দেশের এই গরীবী হটানো যাবে।'

উত্তর শোনা গেল : 'হুঁ, তা হতে পারে, কিন্তু আমাদের কী বাপ দাদার সম্পত্তি আছে? দু' আনায় একখানি 'পানিপঞ্চে' পাওয়া যায়, আর বারো আনা পয়সা দিতে হবে চার হাতে 'জড্ডু পঞ্চে'র জন্য?'

আর একজন বলল, 'হ্যাঁ বাবুমশাই, এই খাদি নিয়ে আমরা যদি ফতুর হয়ে যাই, তবে?'

যাই হোক, জোরজবরদস্তি করে দু'একজন বন্ধুবান্ধবের গলায় খাদি বস্ত্র বেঁধে দেওয়া হল। নাগর মাস্টার ভাবল, 'আর কিছু না হোক, অন্তত ঘরে বসেও পরা যাবে', এই ভেবে দু'খানা খাদিধুতি কিনে নিল, নগদে নয়, বাকীতে। পরবর্তী এক বছর ধরে দু'পয়সা, এক আনা করে তার সেই ধারের টাকা উশুল হল।

তিন মাসের মধ্যেই কংগ্রেস আপিসের হাজিরা ক্ষীণ হয়ে এল, তকলিগুলি উধাও হয়ে গেল। রাম দৃঢ় সংকল্প করল, 'আর যে-কেউ ছাড়ুক না কেন, আমি ছাড়ব না।' কিন্তু কিছুকাল পরে তাকে সেক্রেটারির পদে ইস্তফা দিতে হল। এখন কী করা যায় এই চিন্তায় অনেক দিন ডুবে থাকল। অবশেষে অনেক ভেবে চিন্তে স্থির করল, স্বগ্রামে 'প্রহবিশন' (Prohibitio) ইত্যাদি কাজগুলি আরম্ভ করে দেবে। যতদিন ছুটি আছে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে সংগঠন কার্যে মনোযোগ দেবে। তার এই নতুন কর্মপন্থার প্রথম লক্ষ্য হল বচ্চিদের বাড়ি। বচ্চির স্বামী কালো জিজ্ঞাসা করল, 'কী ব্যাপার, খোকাবাবু কেন এয়েছেন?' রাম খুব গম্ভীর হয়ে বলল, 'দ্যাখো, তোমাদের জেলেদেরকে একটা কথা বলব বলে ভেবেছি। তুমি ওদের সকলকে একটা মজলিসে জড়ো কর। জানো কি, আজকাল তোমাদের জেলেদের কাছ থেকে তাড়ি, শরাব এইসবে সরকারের ঘরে কত পয়সা চলে যায়?'

কালো বলল, 'অয়্যো! যেদিন জালে বেশি মাছ পড়ে, সেদিন একইদিনে পঞ্চাশ টাকা তাড়ি খেয়েই সাবাড়।' রাম মদ্যপানের অর্থশাস্ত্র কালোর সামনে

সবিস্তারে বর্ণনা করে বলল, 'তোমরা সকলে শপথ কর ভবিষ্যতে কেউ আর তাড়ি শরাব খাবে না।' কথাটা কালোর কাছেও 'নেয্য' বলে মনে হল। বচ্চিও প্রবল উৎসাহে বলল, 'খোকাবাবু, এই একটা 'নেয্য' কথা বলেছেন। একবার নয়, একশবার বলুন।' কালো বলল, 'বাবু, আপনি যে কথা বললেন সে কথা বলে জেলেদের ডাকলে ওরা আসবে না। আগামী সোমবার অরম দেবতার মন্দিরের সামনে কোডির জেলেদের যাত্রাগান আছে। সেখানে আপনি এসে একটা 'এচ্চর্' (lecture) দিন, তখন আপনার কথাটা 'নেয্য' বলে মনে ধরবে। ঠাকুরের মন্দিরের সামনেই সকলকে দিয়ে দিব্যি করিয়ে নেবেন।' এই বলে কালো তার বাবুকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বিদায় দিল।

পরবর্তী সপ্তাহে অরম দেবতার মন্দিরের সামনে তিন তিনটি দলের পালাগান। কোডি-মংদর্তি, পড়ুকরে আর মনূরু গ্রামের জেলেরা, তিন দলই তিনটি দশাবতারের পালা করবে বলে সাব্যস্ত হয়েছে। শেষের দিনটিতে নাকি জবর খেলা জমবে। মারমকট্টে ও মংদর্তি গ্রামের মধ্যে পালা গানের লড়াই। রাম ছেলেবেলায় যে সব পালা দেখেছিল, সে সব প্রায় ভুলেই গিয়েছে। এখন পুনরায় সেই পালাগান শোনার নেশা জেগে উঠল। সেইদিনই সে হংগার কট্টের বন্ধুগণকে একত্র করে এই বিষয় নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করল। রাম তাদের নেতা নির্বাচিত হল। পালাগানের রঙ্গস্থলে টাঙাবার জন্য প্রচারকার্যের বোর্ডগুলি এইভাবে তৈরি করা হল, 'মদ্যরূপী কংসাসুরকে হত্যা করুন।' 'মদ্যকে বধ্য করুন।'…এই জাতীয় সব চলতি কথার প্রাচীরপত্র দিয়ে পালাগানের রঙ্গস্থলকে সাজানো হল।

প্রথমদিনের পালা ছিল মংদর্তি দলের। মংদর্তির অভিনেতাদের মধ্যে নামকরা হাস্যরসিক (কৌতুক অভিনেতা) হল বেংকপ্পা। সুব্বিপিসিদের প্রজা সে। সুব্বিঠাকরুনের বাবা রাম ঐতালের পৌত্রের লেকচারের জন্য বেংকপ্পার খুব উৎসাহ। বন্ধুবান্ধবসহ রাম বেশ খুশি মনে পালাগান শুনছে, এমন সময়ে রঙ্গস্থলে হনুমান সেজে এসে বেংকপ্পা আসর জমাল। বলল, 'এখন দেখুন মহাশয়গণ, এই যাদবকুলের লোকেরা তাড়ি খেয়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অতএব হে কৃষ্ণ, তুমি এই যাদবকুলের উদ্ধারের জন্য কোনো সজ্জনকে পাঠিয়ে দাও,' এই পর্যন্ত বলে কৌতুকরসের ভূমিকা করে, রামের স্বদেশী বক্তৃতার সুবিধা করে দিল। তখন তিনজন দেশভক্ত একে একে বক্তৃতা করলেন। এক ঘন্টা

পর্যন্ত তাঁদের আবেগ, কথার ঠাট-বাট গ্রামবাসীদের মুগ্ধ করে রাখল। রামের বক্তৃতা শেষ হতে কৌতুকাভিনেতা বেংকপ্পা তার গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে করতালির ঘটা আর তারস্বরে চিৎকার, 'গান্ধীজী কী জয়।' বালিয়াড়িতে সেই প্রথমবার এই ধ্বনি ঝড়ের মতো গর্জন করে উঠল।

বচ্চির স্বামী কালো উঠে পান চিবোতে চিবোতে বলল, 'বেশ 'এচ্চার' শুনে তোমরা যে জয় বলেছ, খুব ভালো। কিন্তু বাবুমশাই যা বলেছেন, সে বিষয়ে তোমরা কি বলো? জেলের ছেলেরা কি তাড়ি, শরাব, মদ ছাড়বে?' প্রশ্নটা করে সেই আবার তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, 'আমি এখনই এই পণ করলাম, আজ থেকে উ সব আর ছোঁব নি।' এই বলে সে শপথ করল। জেলেদের মধ্যে সে মোড়ল, সব দেখে শুনে তাদেরও খুব উৎসাহ হল। বলল, 'হুঁ, আমরা কি 'মুর্দা' (মরামানুষ) নাকি? গান্ধী মহারাজ যখন বলেছেন, তখন আমরা নিশ্চয়ই বড়।' সেদিন শ-দুই শ লোক মদ খাওয়া ছেড়ে দেবে বলে সভায় প্রতিজ্ঞা করল।

পরদিন পডুকরে গ্রামের ছেলেদের পালা। তারাও প্রতিজ্ঞা করতে পিছিয়ে রইল না। তৃতীয় দিন মদ্যপায়ীদের আসল ঘাঁটি মনূরু গ্রামের লোকেরা উঠে দাঁড়াল। সেদিন জোর খেলা। একে তো অভিনয়ের আবেশ তার উপর পাল্লা দিয়ে সকলের মধ্যেই মদ্যপান বর্জনের জোর আওয়াজ উঠল।

পালার শেষে বাড়ি ফেরার সময়ে কালো, গৌড, গৌলি, গোবিন্দ, প্রভৃতি যেন তাদের মদ ছেড়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা সার্থক করবার জন্যই সমুদ্র কিনারে সিদ্দ পূজারির গাছের সঙ্গে বাঁধা তাড়ির সমস্ত মটকা পাথর মেরে ভেঙে দিল। সেদিন সন্ধ্যায় সিদ্দু পূজারি যেমদের মটকাগুলি দোকানে বয়ে নিয়ে এসেছিল, সেগুলিতে নদীর নোনা জল ওরা ঢেলে দিয়েছে। দেখে শুনে সিদ্দু পূজারি একেবারে হতভম্ব। সেই রাতেই সে ব্রহ্মাবর থানায় গিয়ে এজাহার দিয়ে এল।

পরদিনই লাল পাগড়ির দল কোডি এবং আশেপাশের গ্রামগুলিতে টহল দিতে থাকে, গ্রামের যেদিকেই তাকানো যায়, সর্বত্রই গুজু গুজু ফুসু ফুসু চলছে। হংগারকট্টের কংগ্রেস কমিটি খুব প্রাণবন্ত হয়ে দিনে চারটে করে সভার ব্যবস্থা আরম্ভ করে দিয়েছে। এই সময়ে যে এ অঞ্চলের নাগন্ন মাস্টার খাদি পরিহিত কোনো লোকের ছায়াও মাড়াবেন না সে কথা বলাই বাহুল্য। রামের নিজের মনে এই ভেবে খুব একটা গর্ববোধ হল যে সে একটা মহৎ কার্য করে ফেলেছে পশ্চিমসমুদ্র-তীরবর্তী অঞ্চল থেকে মদ্যপায়ী রাক্ষস সম্পূর্ণ নির্মূল হয়েছে।

পুলিশের দল রামের গ্রামে কয়েকবার ঘুরে যায়। সামনে যাকেই পায় তাকেই ধমকায়, সিদ্দু পূজারি ভালো করেই জানে কে কে তার ব্যবসায়ে লোকসান ঘটিয়েছে, কিন্তু ভবিষ্যতের ভয়ে পুলিশের কাছে তাদের নামোচ্চারণ করতেও সাহস পায় না। অবশেষে তার মন্দা ব্যবসা তেজী না হলেও খদ্দেরবিহীন মদের কিছু গ্রাহক জুটল। লালপাগড়িওয়ালাদের মদ দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়ে সিদ্দ পূজারি মুখ বুজে রইল।

দেশের তরুণদল নিশ্চিতভাবে ভেবেছিল, প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে স্বাধীনতা অবশ্যই ছিনিয়ে আনবেন। রামও তাই স্থির করে ফেলল, 'এবার যদি স্বাধীনতা পাওয়া যায় পরদিনই আমাদের লক্ষ্য হবে সিদ্দু পূজারির ওই মাটির ঘড়া ও কাঠের গামলাগুলি।' গোলটেবিলের ফলে জাতীয় আন্দোলনও গোলে পড়ে গেল। যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন দেশের মধ্যে মহাপ্রলয়রূপে আবির্ভূত হয়েছিল, এখন তা স্তিমিত। কেবল এখানে সেখানে দু এক জনের হাতে তকলি দেখা যায়। প্রভাতফেরীর গানগুলি লোকে প্রায় ভুলতে বসেছে।

এমন সময়ে গ্রামের একটা ঘটনায় রামের দৃষ্টি ঘুরে গেল। গরীব দুঃখীদের দুঃখ দুর্দশা মোচন করতে হবে এই ছিল রামের সংকল্প। হংগারকট্টের কংগ্রেস আপিসে একদিন খবর পৌঁছল কে নাকি বেআইনীভাবে লবণ তৈরি করে বিক্রি করছে বলে তার নামে মামলা করা হয়েছে। প্রথম শোনা গেল সঙ্কর কথা। পর দিন জানা গেল সঙ্কু নয়, তোনসে গ্রামের পুট্টু জেলে। পুট্টু জেলে লবণ তৈরি করেছিল সে কথা সত্য, কিন্তু কারও কাছে সে যে লবণ বিক্রি করেছে একথা আদৌ সত্য নয়। পুলিশ নাকি দু'এক জন জাল সাক্ষী তৈরি করে পুট্টু জেলের নামে কেস করে দিয়েছে।

সেই খবর শুনে রাম অভিমন্যুর মতো 'মা, এক্ষুনি একবার তোন্‌সে না গেলে তো চলছে না' এই বলে আহারের জন্য সাজানো পাতা ত্যাগ করে পুট্টু জেলের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল। পুট্টু খুব কান্নাকাটি করে যে সমস্ত ঘটনার কথা বলল তার মর্মার্থ এই যে পুলিশ তাকে মারধোর করে অনেক অত্যাচার করেছে তার উপর। সহায় সম্বলহীন পুট্টুকে রক্ষা করতে হবে বলে রাম দৃঢ়সংকল্প।

হংগারকট্টের কংগ্রেস কার্যালয়ে গুপ্তভাবে একটি কংগ্রেসের বৈঠক হল। তারা সেখানে কী কী সব কর্মপন্থা স্থির করে ফেলল। কেউ বলল, কালেক্টরের কাছে

আর্জি পেশ করব।' কেউ বলল, 'গান্ধীর কাছে চিঠি লেখা দরকার।' কিন্তু কে কী করল কিছুই দেখা গেল না। মে মাসের শেষ ভাগে রাম যখন কলেজে পুনরায় ভর্তি হওয়ার জন্য মাদ্রাস যাওয়ার কথা চিন্তা করছে, এমনি সময়ে একদিন পুট্রকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ এসে রামের বাড়িতে হাজির। কী ব্যাপার? পুট্র রামের দিকে হাত বাড়িয়ে পুলিশের কাছে বলল, 'হুজুর এই বাবুর কাছে আমি এক 'কলসে' (১৪ সের) লবণ বিক্রি করেছি।' রাম শুনে কাঠ হয়ে গেল। সে দুপুর বেলায় বাড়ির বাড়া ভাত ফেলে গিয়েছিল পুট্রকে বাঁচাবার জন্য, আর সেই পুট্রই কিনা প্রকাশ্যে বলছে রাম ওর কাছ থেকে বেআইনী লবণ কিনেছে। পুলিশের লোক রামকে ভয় দেখিয়ে বলল, 'আপনার নামে কেস করব।' রাম উত্তরে বলল, 'জেলখানা আমি দেখেছি। আর তোমাদের সরকার তো দাঁড়িয়ে আছে মিথ্যা ও ধাপ্পাবাজির উপর।' রাজদ্রোহী এবং আবগারী একসঙ্গে এই দুটো মামলাই দায়ের করা হল রামের বিরুদ্ধে। এই খবর গিয়ে পৌঁছল পডুমুন্নুরু গ্রামের তশীলদার জনার্দনয্যার কাছে। তিনি এসে মাঝখানে পড়ে গোলমাল মিটিয়ে না দিলে রামের বি. এ. পরীক্ষা সেবারেও বানচাল হয়ে যেত।

জনার্দনদাদু বাড়িতে এসে বললেন, 'রাম, তুমি আমাদের গাঁয়ের লোকের কপালের লেখন জান না। তুমি গিয়েছিলে পুট্র জেলেটার সাহায্য করতে, আর সেই কিনা তোমাকে মামলায় জড়াল। তুমি এখনও ছেলেমানুষ, সাংসারিক অভিজ্ঞতা এখনও তোমার হয়নি। পরোপকার বস্তুটি এই কলিযুগের জন্য নয়।' এইভাবে উপদেশ দিয়ে চলে গেলেন।

রামের পবিত্র শুভ্র সমুজ্জ্বল দেশভক্তির উপর পুট্রর দুষ্টনীতি গভীর ছাপ এঁকে দিল। মনে মনে ভাবল রাম, 'ছিঃ! এই জনসাধারণকে সাহায্য করার চেয়ে মোহানায় ঝাঁপ দিয়ে পড়া অনেক শ্রেয়ঃ।'

রাম আর হংগারকট্টের দিকে মুখ ফেরায় নি। উল্টে, একদিন নাগবেণীকে বলল, 'মা, মাদ্রাসে গিয়ে বি. এ. পরীক্ষাটা শেষ করে আমি একটা চাকরির খোঁজ করব।' রামের দেশসেবার পাগলামি দূর হয়েছে দেখে নাগবেণী খুব খুশি হল। বলল, 'বাবা, মাদ্রাস রওনা হওয়ার আগে একদিন সুব্বি ঠাকুরঝির সঙ্গে দেখা করে আয়। কেমন আছে সে কে জানে? গেল বার তো সে-ই যেচে এসেছিল। এবছর তুমি বাড়িতে এসে ন'মাস কাটালেও সে কিন্তু আসে নি।

একবার দেখে এসো তাকে।' রাম একাই মংদর্তি গিয়ে সেখানে দিন তিনেক থেকে সুব্বিপিসিকে খুব খুশি করে বাড়িতে এসে দেখল, দুটি বিপদ অপেক্ষা করে আছে। একটি বাড়ির, দ্বিতীয়টি গ্রামের।

রামের দিদিমা আর একবার শয্যাগত হলেন। নারায়ণয়্য এসে দেখে শুনে এই বলে সংশয় প্রকাশ করলেন, 'এবারে বৌদিকে রাখা যায় কিনা সন্দেহ।'

গ্রামের ঘটনা এই যে, কোড়িগ্রামের জেলেরা মদ খেয়ে মারামারি করে পুলিশ হাজতে গিয়েছে। রাম যে একদিন এই অঞ্চল থেকে 'সুরা-রাক্ষসীকে তাড়িয়েছি' বলে আত্মপ্রসাদ অনুভব করেছিল, আজ মাত্র ছমাসের মধ্যেই কিনা এই কেলেঙ্কারি! এই সমস্ত ভাবতে গিয়ে রাম কেমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

ওদিকে দিদিমা অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন। মাদ্রাসে মংগলুরে টেলিগ্রাম করা হল। মংগলুর থেকে মামারা এলে নদীর ওপারে গিয়ে ওষুধপত্র আনা কষ্টসাধ্য বলে রোগিনীকে কোড়িগ্রাম থেকে ঐরোড়ির বাড়িতে স্থানান্তরিত করা হল। রাম দিবারাত্রি দিদিমার শিয়রে। কখনো ওষুধপত্র নিয়ে আসার জন্য ঐরোড়ি উডুপির পথে। কিন্তু নাগবেণী যে বলেছিল, 'মৃত্যুর কি ওষুধ আছে?' সেই কথাই সত্য হল। মায়ের জ্ঞান আর ফিরে এল না।

দিদিমার মৃত্যু অশৌচ অতিক্রান্ত হলে রাম একদিন নাগবেণীকে বলল, 'মা, তুমি এখন কী করবে? আমি. ধর, মাদ্রাসে চলে গেলাম। তুমি কি কোড়িতে একলা পড়ে থাকবে? তাছাড়া, দিদিমা থাকতে যে টাকাটা পাওয়া যেত, এখন আর তার সম্ভাবনা নেই। কী ভাবে আমাদের দিন চলবে?' নারায়ণকাকা বললেন, 'নাগবেণী আমার এখানেই থাক্ না।' তবু নাগবেণী কোড়িতেই থাকবে বলে জানাল। রাম বলল, 'মা, বি.এ-টা অবশ্যই পাশ করতে হবে। তারপরে কোথাও একটা চাকরি জুটিয়ে তোমাকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।' কৃষ্ণবেণী দিদিকে মাদ্রাসে যেতে নিমন্ত্রণ জানালেও সে তা গ্রহণ করল না। অবশেষে কৃষ্ণবেণীর সঙ্গে একা রাম এসে মাদ্রাসে পৌঁছল।

জুলাই মাসের প্রখর রোদে রাম আবার ফিরে এল ট্রিপ্লিকেনের সমুদ্রতীরে। আবার শুরু হল তার ছেড়ে দেওয়া অধ্যয়ন। এবারে কিছু পাঠ্যপুস্তকের অদল-বদল হয়েছে। কয়েকখানা বই কিনতে হবে। পরীক্ষার ফি এখন থেকেই জমিয়ে রাখতে না পারলে পরে গিয়ে অসুবিধা হবে। মাদ্রাসে এসেই তাই ট্যুশনের সন্ধানে ঘুরতে থাকে। কিন্তু কোথাও সুযোগ মেলে না। গায়ের

ট্যুশনেও তার আপত্তি নেই। কিন্তু পরিচিত মহলে খোঁজ নিয়ে দেখা গেল ইতিপূর্বেই সেখানে অন্যলোক নিযুক্ত হয়েছে। এমন কি বাড়ির ট্যুশনটিও তার হাতছাড়া। সে যখন সত্যাগ্রহ করে জেলখানায়, মাধবের তখন অন্য শিক্ষক না রেখে উপায় ছিল না। 'শোনো রামু, এবছর যে তুমি জয়াকে পড়াতে বা গান শেখাতে পারবে মনে হয় না। সামনে তোমার বি. এ. পরীক্ষা। একটা বছর নষ্ট হয়েছে, তোমার লেখাপড়ার ক্ষতি করে ওকে শেখাবার দরকার নেই।' মাধব নিজে থেকেই এত কথা বলল বটে, কিন্তু রামেরও ভাববার দিক আছে। সে কি কেবল নিজের স্বার্থ দেখেই এ বাড়িতে থাকবে ? বাইরে যখন উপার্জনের কোনো পথই পেল না, তখন মাসির আশ্রয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। বিনিময়ে তাদের হাতে যে আগের মতো টাকা দেবে তাও সম্ভব নয়। সুতরাং জয়াকে পড়াতে পারলে রামের মনে অন্তত এই সান্ত্বনাটুকু থাকত যে মাসির অন্নের প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষ মূল্য সে কিছু দিতে পেরেছে। বাড়ির ছেলেমেয়েরা রামকে আবার ফিরে পেয়ে খুশি। আনন্দ বলল, 'রামুদা তুমি বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার পরে বাড়িটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগত।' জয়া বলল, 'রামুদা, তুমি যেমন করে শেখাও, তেমন আর কেউ শেখাতে পারে না। কেবলই কী মনে হত জানো ? বসে বসে তোমার বাজনাই শুনি আর শুনি। উনি শেখালে মনে হত পাঠ কখন শেষ হবে।'

জয়ার এখন এই চৌদ্দ বছর। সুন্দরভাবে বেড়ে উঠেছে। সর্বদাই ওর কচি মুখে যেন মৃদু হাসি চুয়োচ্ছে। কথাগুলিও ভারি মিষ্টি। রামুদা ওকে সংগীত শেখাবার সঙ্গে সঙ্গে জিওমেট্রি ও অ্যালজেব্রার কঠিন সূত্রগুলি বুঝিয়ে দেয়।

দেশ থেকে আসার সময়ে মা পঞ্চাশ টাকা হাতে দিয়েছিল। তাই দিয়ে মাস দুই কোনোমতে চলেছে। আর যে সে কলেজের খরচপত্র চালাতে পারবে মনে হয় না। ঐরোডির দাদুকে একবার লিখবে নাকি ? অথবা বড়মামাকে ? বার বার চিন্তা করেও সে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে না পেরে চুপ করে রইল। স্পষ্টই বুঝতে পারল, এবারে কারও-না-কারও সাহায্যে না নিয়ে বি. এ. পরীক্ষা শেষ করবার কোনো পথই খোলা নেই তার। অবশেষে একদিন অত্যন্ত দ্বিধাগ্রস্তভাবে কৃষ্ণবেণীকে বলল, 'মাসিমা, এ বছরটা খুব কষ্ট হবে দেখা যাচ্ছে। অন্তত বি. এ. পরীক্ষাটা পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থা করতে পারবে কি ?' কৃষ্ণবেণী

বলল, 'দেখি বাবা, চিন্তা কোরো না।' সেই রাতেই মেসোমশায়ের কাছ থেকে কথা পাওয়া গেল, 'তুমি টাকার জন্য ভেবো না রাম। যেদিন পার, শোধ দিও, না পার দিও না। কিন্তু বাবা, গত বারের মতো না করে পরীক্ষাটা যদি শেষ করতে পার তবেই আমরা খুশি।'

রাম নিশ্চিন্ত হল। জয়াকে যে গান শেখাচ্ছে তাই দিয়ে সে তার আহারের ঋণ মিটিয়ে দিচ্ছে। বাকী টাকা পরে কোনো কাজ কর্মে ঢুকে মিটিয়ে দেবে। এখন টাকার জন্য মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই এই ভেবে সে অধ্যয়নে মনোযোগ দিল।

ভগবান তাকে যে বুদ্ধিশক্তি দিয়েছে বি. এ পরীক্ষার পক্ষে তা যথেষ্ট। এপ্রিল এলে পরীক্ষা দিয়ে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এখন আবার দেশে যাবার পালা। সে কি সোজা দেশে চলে যাবে, না মাদ্রাসেই কোনো কাজকর্মের চেষ্টা করবে? যা-হোক কিছু করে, মায়ের দীন নিঃসঙ্গ জীবনকে সুখী করতে হবে এই তার সংকল্প।

রওনা হওয়ার আগে দরখাস্ত হাতে নিয়ে মাদ্রাসের কড়কড়ে রোদে অফিসগুলির দরজায় ঢুঁ মেরে দেখল। সারা দুনিয়ায় যে অর্থনৈতিক মন্দা, মাদ্রাস কি তার থেকে মুক্ত? সর্বত্রই একটি নোটিস তার চোখে পড়ে 'নো ভেকান্সি'। অবশেষে এক জায়গা থেকে জবাব পাওয়া গেল, মাসিক পনেরো টাকা বেতনের এক চাকরি সে পেতে পারে। মনে মনে বলল, 'কী! এত পড়াশুনো করে শেষে কিনা ওই সামান্য কটা টাকার জন্য হাত পাতব? দু'একটি ট্যুশন করেই তো ওটাকা রোজগার করা যায়।...যা হোক, বি. এ. পরীক্ষার ফলটা বেরিয়ে যাক। সেই সঙ্গে বুককিপিং ইত্যাদি শিখে নিয়ে মুংবই (বোম্বাই) যেতে হবে। শুনেছি, আমাদের দক্ষিণ কন্নড (কানাড়া) জেলার লোক ওখানে প্রচুর।'

সেদিন অপরাহ্নে আনন্দ ও জয়াকে সঙ্গে নিয়ে সমুদ্রতীরে বেড়াতে বেড়াতে অন্য কথার ফাঁকে রাম বলল, 'আমি কাল সন্ধ্যার গাড়িতে দেশে চলে যাচ্ছি।'

আনন্দ বলল, 'কালই?'

'হ্যাঁ'

জয়া বলল, 'আমার যে সেই গানখানা শেষই হল না।'

'সেটা শেষ হতে মাসখানেক লাগবে।'

'তুমি আবার কবে আসবে?'

'মাদ্রাসেই আমাকে আসতে হবে কেন? এখানকার পালা শেষ হল। এখন ভগবান যদি করেন, কোনো কিছু কাজকর্ম ছাড়া খালি খালি আসা আর হবে না।'

আনন্দ বলল, 'রামুদা, তোমার এখানেই কাজ হবে।'

জয়া কোনো কথা না বলে কেবল রামের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে রইল।

রাম বলল, 'কী মন খারাপ?'

জয়া উত্তর দিল, 'না, মন আমার ভালোই আছে।'

সেদিন সন্ধ্যায় কথা বলতে বলতে যখন তারা বাড়ি ফিরল, মনে হচ্ছিল আনন্দ একাই যেন কথা বলার একচেটিয়া অধিকার পেয়েছে। জয়ার মুখে একটিও কথা নেই। বাড়ি পৌঁছে আনন্দ রামুদার দেশে যাওয়ার খবরটা মায়ের কাছে পৌঁছে দিল। কৃষ্ণবেণী এসে বলল, 'রামু এত তাড়া কিসের?'

'মা ওখানে আমার কথা কত ভাবছে মাসিমা।'

দিদির কথা মনে হতেই কৃষ্ণবেণী চুপ করে গেল। 'হ্যাঁ বাবা, তার কষ্ট সবার আগে।' রামের দেশে যাওয়ার ব্যাপারে কৃষ্ণবেণী আর বাধা দিল না। পরদিনের গাড়িতেই সে চলে গেল। মংগলুরে এসে দু'একদিন থাকার ইচ্ছা হল। আগেকার হস্টেলের বন্ধুরা তার মুখে সাম্যবাদের বক্তৃতা শোনার জন্য উদ্‌গ্রীব হলেও রাম কিন্তু কোনো কথা বলতে কিছুমাত্র উৎসাহ বোধ করল না যখন তার নিজের ভবিষ্যৎ ত্রিশঙ্কুর স্বর্গে ঝুলে আছে, তখন সে আর দেশভক্তি ও জগৎ উদ্ধারের ব্যাপারে হাত দিতে চায় না।

এবারে সে নিজে থেকেই সদাশিবমামার বাড়িতে দেখা করতে গেল। দিদিমার মৃত্যুকালে সদাশিব যখন ঐরোডির বাড়িতে ছিল, তখন সে নাগবেণীর কাছে বলেছিল, 'ললিতা যাই বলে থাক না কেন, তুই কিছু মনে করিসনে নাগু। ললিতার কথার জ্বালায় মাকে মংগলুরে ছেড়ে এখানে এসে মরতে হল। কয়েকটা দিন যে তাঁর সেবা করব তারও সুযোগ রইল না।' রামকে ডেকে বলেছিল, 'রামু, তোমরা আমাকে পর বলে মনে কোরো না।' সেইজন্য রাম এবার যেচেই তার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হল। ললিতামামী আগের চেয়ে অনেক কোমল ও মধুর ব্যবহার করেছে। গ্রামে ফেরার আগে রাম মামার বাড়িতে থেকে মংগলুরে দুটো দিন ঘুরে ফিরে দেখল কোথাও মাস্টারি অথবা

অন্য কোনো চাকরি পাওয়া সম্ভব কিনা। বুঝতে পারল, তার মতো নগর-অরণ্য সঞ্চারী অনেক মানুষ মংগলুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোনো মতে একটা চাকরি জুটিয়ে নেবে বলে যে আশা এতদিন পোষণ করে আসছিল সেই আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে সে গ্রামের দিকে রওনা হল।

নাগবেণী যেমন ভাবে তার ছেলে রামের আসার জন্য অপেক্ষা করে আছে, রামায়ণকথার শবরীও অরণ্যে বসে এতটা আশা ও আকুলতা নিয়ে ভগবান শ্রীরামের অপেক্ষা করে নি। রামের পরীক্ষা শেষ হয়েছে জানার পর থেকেই 'রাম কেন এল না ? এখনও কেন এল না ?' এইভাবে আকুল হয়ে উঠেছিল নাগবেণী।

সে বছর নাগবেণী যে কীভাবে দিন কাটিয়েছে একমাত্র ভগবান জানেন। নারায়ণকাকার কাছ থেকে বিশেষ সাহায্য সে পায় নি, কারণ তাঁর বাড়িতে এখন তাঁর ছেলেরাই কর্তা। একটা পাই-পয়সা দান করতে হলেও তিনি তাঁর ছেলেদের কথার বিরুদ্ধে কিছু করতে পারেন না। নাগবেণীর মায়ের মৃত্যুর পরে যেদিন নারায়ণকাকা নাগবেণীকে বলেছিলেন 'এখানেই থাক তুই', সেদিন তাঁকে ছেলেদের কাছ থেকে অনেক ভর্ৎসনা শুনতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে নাগবেণী নিজেই আলগা হয়ে গিয়েছিল। এখন তিনি কেবল খোঁজখবর নেওয়ার জন্য কোডিতে যাতায়াত করেন। ছেলেরা বাড়িতে না থাকলে কোডিতে যাওয়ার সময়ে দু'একসের চাল বেঁধে এনে নাগবেণীকে দিয়ে যান। এদিকে বচ্চিদের বর্গার জায়গায় ধানের পরিমাণ প্রায় তিন মুডির মতো বাড়িয়ে দিয়ে নাগবেণীর অন্নসংস্থানের কিছুটা সুযোগ সুবিধা তিনি করে দিয়েছেন। নাগবেণীর প্রায়ই মনে হত, 'বচ্চির ভাগের অন্ন আমি জোর করে খেয়ে নিচ্ছি।' তবু নাগবেণীর পেটভরা খাওয়া জোটে নি। আধপেটা খেয়ে খেয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। ছেলে যেদিন বাড়িতে, সেদিন তাকে নরসিংহময়্যর বাড়িতে দৌড়ে গিয়ে চাল ধার আনতে হল, অবশ্য রাম সেকথা জানতে পেল না।

এই সমস্ত দিনগুলিতে নাগবেণী কেবল একটি আশার উপর ভর করেই ছিল 'অতঃপর তার ছেলে রাম চাকরি করে রোজগার করবে।' আহারের পর সেই রাত্রিতে মা ও ছেলে দুজনে বাড়ির উঠোনে নারকেল পাতার চাটাইয়ের উপর বসে কথাবার্তা বলছিল। রাম বলল, 'মা, তুমি কেমন ছিলে বল। পরীক্ষার ভূত তো ঘাড় থেকে নামল। কোথায় কাজ, কোথায় কাজ, বলে 'ভিক্ষাং

ভবতি দেহি' করলাম, করেও মাদ্রাস শহরে একখানি পয়সাও রোজগার করা সম্ভব হল না। উল্টে, মেসোমশায়ের কাছ থেকে দেড়শ টাকা ধার করেছি।'

অতঃপর নাগবেণীরও কোনো কথা গোপন করার প্রয়োজন রইল না। বলল, 'বাবা, হল কি জানিস? ঐরোডি থেকে তো সব বন্ধ হয়ে গেল। ছেলেদের বয়স হয়েছে, এখন আর নারায়ণকাকা কে? তারাই সংসারের কর্তা। এখানে বেঁচে থাকতে হবে বলে বাধ্য হয়ে কালোকে বর্গা দেওয়া ক্ষেতের খাজনা এক বছরের জন্য বাড়াতে হল। ওরা রাজী হয়েছে কেবল আমাদের কথা ভেবে। এখন তো বলছে আগের খাজনা না হলে জমি ওরা বর্গা নেবে না। ওদের আমি দোষ দিচ্ছি না। এদিকে বীজ বোনার সময় হয়ে এল। আমরা কি নিজেদের হাতে কৃষিকাজ করতে পারব?' এইরূপে নাগবেণী তাদের সাংসারিক দারিদ্র্যের সব কথা ছেলের সামনে খুলে বলল। রাম বুঝতে পারল তারা কোথায় দাঁড়িয়ে। একথাও বুঝল যে সে নিজে তাড়াতাড়ি রোজগারের চেষ্টা বেরিয়ে না পড়লে মাকে বাঁচানোর আর কোনো উপায় নেই। বচ্চিদের খাজনা বাড়াবার কথায় লজ্জায় অপমানে রামের মাথা নীচু হয়ে এসেছে। তার সাম্যবাদ, পুঁজিবাদের বিরোধিতা আজ কোথায়?

আগে আগে মায়ে ছেলে দেখা হলে যেমন কথাবার্তা হত, এবারে আর হলনা। যেটুকু বা হল, তাতে আগেকার মতো সেই হাসিখুশি ভাব নেই, রইল শুধু বেদনা ও নৈরাশ্য।

পরদিন ভোরে নাগবেণী বলল, 'বাবা, ভবিষ্যতের চিন্তা ভবিষ্যতের জন্যই থাক। আজকের চিন্তা তো আজ কর। কালো খাজনার বিনিময়ে জমি চাষ করবে কিনা এই কথাটা গিয়ে জিজ্ঞেস করে এস। আমি তো বচ্চিকে জিজ্ঞেস করে করে হয়রান। আর সে বেচারীই বা কী করবে? পুরুষমানুষই তো বাড়ির কর্তা, না কি?'

রাম একটা কাজ পেয়ে গেল। তারা নিজেরা যে জমির জন্য পরিশ্রম করে না, সেই জমির খাজনা বাবদ আগের চেয়ে তিনমুড়ি চাল বাড়িয়ে দিতে হবে, কারণ তা না করলে তার মাকে এবং যদি সে বাড়িতে থাকে তবে সেও দুজনকে উপোস করতে হবে। এত সমস্ত কেন? না তিনমুড়ি চাল অর্থাৎ মাত্র বারোটি টাকার জন্য। মাদ্রাসে থাকতে আগে সে কেবল ট্যুশন করেই এর ডবল টাকা মাসে আয় করেছে। আর এখন কিনা সামান্য কটা টাকার জন্য

একজন গরীব চাষীর উপর অন্যায় করতে হবে? রামের বিবেকে খুব লাগল। আবার ধর, কালোর কাছে বেশি খাজনা দাবি করলে সে জমি চাষ না করে ছেড়ে দিল, তখন কী হবে? তারা নিজেরাও চাষ করতে পারবে না, জমি পড়ে থাকবে, ওদিকে উড়ুপির মহাজনকে দেয় টাকা ঠিকমতো বুঝিয়ে দিতে হবে। এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে সে বচ্চিদের বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন আছ, কালো?'

বাতব্যাধির রোগী কালো সেখানে পা ছড়িয়ে বসে আছে, আর তার তেরো বছরের ছেলে বাপের পা মালিশ করে দিচ্ছে। বাবুর প্রশ্নে কালো জবাব দিল, 'এই আছি, বাবু কবে ডাক আসবে সেই অপেক্ষা করছি।' এই বলে কালো অনেকক্ষণ ধরে তার সংসারের দুঃখ কষ্টের কথা রামের কাছে বর্ণনা করতে থাকলে রামের আর খাজনার প্রসঙ্গ তোলার মতো মন রইল না।

এমন সময়ে বচ্চি তার স্বামীকে মৃদু ভৎর্সনা করে বলল, 'তুমি বাবুমশাইকে যা হোক একটা কিছু ঠিক করে বলে দাও। এ বছর ওনাদের জমি চাষ করবে, না ছেড়ে দেবে—সেই কথাটা বলে দাও। বাবুমশাই কথাটা শুনতে এয়েছেন। মিছিমিছি সুখদুঃখের কথা কেন বলছ?'

রাম ধীরে ধীরে বলল, 'আমি এইজন্য এলাম, কালো, জমি যদি চাষ না করে পতিত ফেলে রাখি, তবে তো ঘর থেকেই মালিককে মিছিমিছি খাজনা দিতে হবে।'

'ঠাকুরমশাই, আপনারা আমাদের অনেক উপকার করেছেন। আপনাদের বাড়ির হালের অবস্থাও আমি জানি। আমার এই অবস্থায় আমি যে নিজে চাষ করতে পারব এমন ভরসা নেই। দেখুন, ঘরে থাকার মধ্যে আছে এই বিষৎ-সমান ছেলেপুলেগুলি। এখন যদি আমাকে তিনমুডি চাল বেশি দিতে হয় তবে ধার করেই দিতে হবে বাবু।'

রাম বাড়ি ফিরে এসে বলল, 'মা, খাজনা তিনমুডি বাড়ালে ওরা আর জমি চাষ করতে পারবে না। আবার আমরা যে এ বছরই চাষবাস আরম্ভ করব, সাজ সরঞ্জাম তো কিছুই নেই! ঐরোডি থেকে যে কিছু চেয়ে আনব, তা তোমার কথা শুনে আর চাওয়ার ইচ্ছা নেই। বচ্চিকে বলে দিই পুরোনো হিসেবেই যেন খাজনা দেয়।' নাগবেণীর মনও সেই কথা বলছিল।

রাম বাড়ি আসবে ভেবে নাগবেণী নরসিংহমাইয়ার বাড়ি থেকে এক 'কলসে'

(১৪ সের) পরিমাণ চাল ধার হিসেবে এনেছিল। রাম না আসা পর্যন্ত সে নিজের জন্য আধাপোয়া করেও নিত না। আজকাল একপোয়া মতো চালের ফেনাভাত করে। ঘরে লঙ্কা আছে, লবণ আছে। বচ্চিকে দিয়ে পূবপরগণা থেকে লাড্ডু তেঁতুল আনিয়েছিল নাগবেণী। আজ ছ'মাসেরও বেশি হল তাদের বাড়িতে গুড় আসেনি।

মাদ্রাসে মাসিবাড়িতে রাম যে সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে খাওয়া দাওয়া করেছে, তারপরে নিজের বাড়ির এই 'সুধাম ভোজন'এর স্বাদ নেওয়া কষ্টকর হলেও বেল্লুর জেলখানায় যে আহার পরীক্ষায় সে পাশ করে এসেছে, এখন বাড়িতে খেতে বসে সেই অভিজ্ঞতাটা খুব কাজে লাগল। কিন্তু রামের সবচেয়ে খারাপ লাগে, তার মা পুরানো ছেঁড়া কাপড় দিয়ে কোনোমতে শরীর ঢেকে কাজকর্ম করে চলেছে। মাদ্রাস থেকে মায়ের বেহালার জন্য যে তারগুলি সে নিয়ে এসেছে, দিনকয়েক পরে সেই তার মায়ের কাছে দিতে গেলে নাগবেণী বলল, 'এর চেয়ে যদি যেমন-তেমন একখানা শাড়ি নিয়ে আসতে, কত উপকার হত। যাদের পেটে অন্ন নেই, পরনে বস্ত্র নেই, তাদের আবার সংগীত কিসের ?' নাগবেণীর কথায় রামের মন খুব আলোড়িত হয়ে উঠল, সত্যিই কি সে কোনোদিন মায়ের দুঃখ অসম্মান ঘোচাতে পারবে ?

রাম এবার গ্রামে আসার পরে বাড়ি থেকে বড় একটা বেরোয় না। রাত্রে বেহালার 'কুংয়ি কুংয়ি' আওয়াজ শুনতে পেয়ে বচ্চি একদিন এসে বলছিল 'খোকাবাবু তাহলে গাঁয়েতেই রয়েছেন।' রামের প্রবল ইচ্ছা আর কোথাও নাহোক, সমুদ্রতীরে যায় এবং একা নয়, মাকেও সঙ্গে নিয়ে যায়। কিন্তু দিনের আলোয় বাড়ির বাইরে যাওয়ার মতো কাপড় মায়ের নেই বলে রাম নিজেও বাড়িতেই বসে থাকে। অন্ধকার হলে মাকে নিয়ে সমুদ্রতীর ঘুরে আসে। বৈশাখ মাসের দারুণ গ্রীষ্ম, অস্বাভাবিক রকমে শান্ত সমুদ্র, মেঘের লেশমাত্রহীন আকাশ, এই সমস্ত দেখে রাম যদি বলে, 'মা আমাদের সমুদ্র তো কোনোদিনই এরকম নিষ্প্রাণ ছিল না।' মা জবাব দেয়, 'এ বছর বর্ষাটা আগেই নামবে মনে হয়।' এর বেশি কথা বলার আগ্রহ দুজনের কারও নেই। কখনও যদি রাম বলে, 'মা, বাবা এখন কোথায় কিছু জানো কি ? একবার চোখের দেখা দেখতে ইচ্ছে করে।' নাগবেণী জবাব দেয়, 'দেখে লাভ কী হবে, বাবা ?' কথাটা এখানেই চাপা পড়ে যায় দুজনেই অনেকক্ষণ নিঃশব্দে বসে থেকে অবশেষে শ্রান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

রাম ছায়ার মতো মায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, রান্নাঘরে, দাওয়ায়, গোয়ালঘরে সর্বত্র। জানতে পারে, ঘরে চাল বাড়ন্ত। যে ক'টি চাল আছে, তা শেষ হওয়ার আগেই ভবিষ্যতের একটা উপায় খুঁজে বের করা যায় কিনা ভাবছে। একদিন কী মনে হতে রাম বলল, 'মা, একসময়ে তুমি দেয়ালের ফাঁকে টাকা পাওয়ার কথা লিখেছিলে, মনে আছে? কোন্ দেয়ালের ফাঁকে মা? সুব্বিপিসিও বলেছিল যে ঠাকুর্দা নাকি দেয়ালের ফাঁকেই টাকা পয়সা রাখতেন। আমি ভাবছি, আর কোথাও এরকম কিছু পাওয়া যায় কি না। যে টানাটানি চলছে!' মা হাসল, হেসে বলল, 'রাম, তুই তোর মাসির হাতে যে টাকা দিতি, সেই টাকা ও এখানে পাঠিয়ে দিত। ও লিখেছিল কথাটা যেন তোকে জানানো না হয়। তাই তোকে ওইসব লিখেছিলাম।'

গভীর নৈরাশ্যের মধ্যেও মায়ের কথায় রাম হেসে উঠল। পরক্ষণে বলল, 'মা, বড় মামী আর মাসিমার মধ্যে কত প্রভেদ, না? আমাকে সে কখনও নিজের ছেলেপুলে থেকে আলাদা করে দেখে নি। আমি যখন চলে আসি, বার বার মাসি আমাকে বলে দিয়েছিল, 'রামু, দিদিকে একবার নিয়ে এসো।'

'বাবা, ললিতাকে ভগবানই এমন বুদ্ধি দিয়েছেন। সকলেই কি আর তার মতো? তাহলে সংসার আর এরকম হত না।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর রাম বলল, 'মা আমার চাকরি খোঁজার কাজ সহজ হবে বলে মনে হয় না। গানের ট্যুশন করলেও দশ-পনেরো টাকা আসবে। কিন্তু একটা কিছু না হওয়া পর্যন্ত তুমি এখানে এইভাবে থাকতে পারবে? এই গ্রামে আমার পক্ষে কী রোজগার হতে পারে?'

'এখানে তো কিছুই নেই, বাবা।'

'তাহলে মাসির বাড়িতে গিয়ে তুমি অল্প কিছুদিন থাকতে পারবে না? সেও খুব খুশি হবে তোমাকে পেলে। আমিও নিশ্চিন্তে কাজ খোঁজার দিকে মন দিতে পারব।'

'বাবা, রুক্মি ভালো মেয়ে। কিন্তু তুমি যেদিন উপার্জন করে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে, সেদিন না আসা পর্যন্ত আমি এই মাটি ছাড়ার কথা ভাবতে পারি না।'

রাম পুনরায় চুপ করে গেল। পরদিন ঘরে আর বসে থাকতে না পেরে রাম

ঘুরতে ঘুরতে নরসিংহয়্যর বাড়িতে এসে উপস্থিত। রামের চেয়ে বয়সে সে অনেক বড়। নরসিংহর ছোট ভাই ওরট রামের বাবা লচ্চর সমবয়সী। নরসিংহ এখন অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাড়ি ঘর, বিষয় সম্পত্তি, জমি থেকে আয়, বেংগলুরের হোটেল থেকে আয়, মোট কথা টাকা পয়সার কোনো অভাব নেই। রামকে দেখে সে আদর করে ভিতরে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কবে এলে বাবা ?' কোথায় ছিলে ? কী খবর-টবর বল।' একথা সেকথার পরে নরসিংহ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাকি বেহালায় খুব ভালো হাত। আমরা গাঁয়ের লোকেরা কি শুনতে পারি না ?'

রাম সবিনয়ে বলল, 'শুনতে পারবেন না কেন ? কিন্তু আমার বাজনায় শোনার মতো যে বিশেষ কিছু আছে তা বলতে পারি না।'

নরসিংহ আরও জিজ্ঞাসা করল, 'এখন দেশে কতদিন আছ ? ভবিষ্যতে কী করবে ঠিক করেছ ?' রামের কিছু লুকো-ছাপা নেই, সে শুধু দু'হাত দিয়ে তার সামনের শূন্য আকাশ দেখিয়ে দিল।

'দ্যাখো রাম তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, আমার কথাটা কী ভাবে নেবে জানি না। আমার ভাই জনার্দন আমাদের বেংগলুর হোটেল দেখাশুনা করছে। খুব বড় বড় লোক ওখানে আসা-যাওয়া করে। জনার্দন লিখেছে, একজন ইংরেজি জানা ম্যানেজার থাকলে ভাল হয়। তুমি তো একরকম আমাদের ঘরের লোক। মানে খাওয়াসমেত কুড়ি টাকার মতো বেতন। অবশ্য তুমি যদি এ কাজে মর্যাদা নেই বলে মনে কর, তাহলে আমি বলব না।'

রাম খুব চিন্তায় পড়ে গেল। চাকরি তাকে করতেই হবে, না করে উপায় নেই। তবে হোটেলের ম্যানেজারি...এই চিন্তাটুকু তার মনে না এসে পারল না।

সেদিন রাতে নরসিংহের বাড়িতে রামের নিমন্ত্রণ। আহারাদির পরে অধিক রাতে রামের বেহালা বাজনাও হল। নরসিংহ দু'চার জায়গা ঘুরেছে, গানবাজনা শুনেছে। রামের বেহালা শুনে বলল, 'পরোয়া নেই, রাম। তোমার হাত পেকে এসেছে।....তুমি যদি দেশেই থাক তবে আমার মেয়ে লক্ষ্মীকে একটু গানবাজনা শিখিয়ে দাও না। আমি যা-হোক কিছু দেব। তোমার মায়ের অবস্থাও তো আমার অজানা নেই। কী করবে ভেবে দেখো।'

নরসিংহের কথাবার্তায় বেশ একটু বড়লোকী ভাব পরিস্ফুট হলেও রাম

ঐতালর পৌত্রের উপর খানিকটা মমতাও প্রকাশ পেয়ে থাকবে। এই দুই পরিবারের মধ্যে একসময়ে যে মনোমালিন্যের ভাব ছিল, এখনও যদি তা থাকত তবে নাগবেণী নিশ্চয়ই তাদের বাড়ি থেকে ধারে চাল পেত না।

তাছাড়া বি. এ. পরীক্ষায় ফল প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত রামকে গ্রামেই থাকতে হবে। ততদিন যদি সংগীতবিদ্যা কিছু 'বিক্রি' করা যায় মন্দ কী। এই ভেবে নরসিংহময়্যর মেয়ে লক্ষ্মীকে সে গান শেখাতে আরম্ভ করে, মায়েরও মন কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়।

ছাব্বিশ

নরসিংহের মেয়ে লক্ষ্মীর সংগীত চর্চা শুরু হল। বি. এ. পরীক্ষার ফলটা না বেরোনো পর্যন্ত রামের একটা কিছু কাজের দরকার ছিল বলে সে রাজী হয়ে গেল। কিন্তু তার ছাত্রী যে 'কলকণ্ঠী' না হয়ে 'খিলকণ্ঠী' (কর্কশ গলা), গান-টান শেখায় তার না আছে ইচ্ছা, না আছে অভিরুচি - এই কথাটা তার বাপের কাছে বলার মতো সাহস রামের নেই। কারণ, বলে দেওয়ার ফলে যদি ছাত্রীর সংগীত শিক্ষার অবসান ঘটে, তবে রামের কয়েকটা টাকা পাওয়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে তার গতি কী হবে ?

মাসখানেক পরেই মাদ্রাস থেকে মাধব মেসোমশাই চিঠি দিল যে বি. এ. পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে এবং রামের প্রত্যাশামতো সে প্রথম শ্রেণীতেই পাশ করেছে। মাধব একথাও জানিয়েছে যে রামের জন্য সে ওখানে চাকরির চেষ্টা করছে। রামের লেখাপড়া শেষ হওয়ার ফলে একদিন সে নাগবেণীকে বলল, 'মা, বি. এ. পাশ করলাম বটে, কিন্তু সে বিদ্যায় দেশে কোনো উপযুক্ত চাকরি পাওয়া যাবে না। বাইরে কোথাও একটা কাজ হলে তুমি-আমি মিলে একসঙ্গে থাকতে পারি।' 'অতঃপর কী ?' এই হল রামের দিবারাত্রির চিন্তা। এমনি সময়ে একদিন নরসিংহ রামের হাতে সংগীত শিক্ষাদানের মূল্যস্বরূপ চারটি টাকা দিল। সেই টাকা কটি পেয়েই রামের অপার আনন্দ। সেই দিনই সে মায়ের জন্য একখানা শাড়ি কিনে নিয়ে এসে বলল, 'মা, কাল বিকেলে আমরা সমুদ্রতীরে বেড়াতে যাব।'

নরসিংহ যে কথাগুলি বলেছিল নাগবেণী রামের কাছে তারই পুনরাবৃত্তি করল, 'খোকা, উনি বলেছেন, রাম যেন কাজের জন্য আমাদের কাছে আসে, বেংগলুরে ওকে চাকরি দিয়ে দেব।' শুনে রামের মুখখানি ছোট হয়ে গেল। কী করবে সে ? চাকরি তো কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। মাদ্রাস ও মংগলুরে সে যে কাজের জন্য এত ছুটোছুটি করল, সেই অভিজ্ঞতা আদৌ উৎসাহব্যঞ্জক নয়। এদিকে মাকে এই দারিদ্র্যের মধ্যে রাখতে তার মন সরছে না। তা বলে হোটেলের চাকরির জন্য হাত বাড়াবে ? সুব্বিপিসির মুখে সে শুনেছিল তার দাদু রাম ঐতালের সঙ্গে নরসিংহের বাবা শীনময়্যের অসদ্ভাব ও মনোমালিন্যের কথা।

হোটেলের পয়সার উপর তার দাতুর কিরূপ ঘৃণা ছিল তাও সে শুনেছে। ব্যক্তিগতভাবে রামের কাছে সেই চাকরি হীন মনে না হলেও তার দাতুর সঙ্গে যাদের সদ্ভাব ছিল না সেই বংশের গোমস্তা হওয়া তার সাজে না।

তাছাড়া, ওই হোটেলের চাকরিতে তার এমন কী লাভ হবে? মাসিক বেতন তো মাত্র কুড়ি টাকা। ভবিষ্যতেও কোনো উন্নতির আশা নেই। তবে বর্তমানে যখন আর কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না, তখন কুড়িটা টাকাই বা কম কী? আর এককথা, বেংগলুরে থাকা মানে মাদ্রাস শহরের কাছাকাছি থাকা। বেংগলুরও বড় শহর। কুড়ি টাকার চাকরি করতে করতে কালক্রমে এই দুটো বড় শহরের যে কোনো একটায় কি একটা ভাল চাকরি পাওয়া যাবে না? সারা রাত ধরে রাম সাত-পাঁচ ভাবল।

পরদিন বিকেল হতেই রাম বলল, 'মা, কতদিন হল তুমি সমুদ্রে যাওনি। চল, আজ যাই।' মাতাপুত্র ধীরে ধীরে বালির উপর দিয়ে চলতে চলতে বালিয়াড়ির উপরে এল। কারও মুখে কথা নেই। সারা পথ রাম পা দিয়ে বালি ওড়াতে ওড়াতে অগ্রসর হচ্ছিল। নাগবেণী তখন ভাবছিল ছেলের সমস্যার কথা। রাম এখন কী করবে, কেমন লাগছে তার মনে, কবে তাদের এই দুঃখ-কষ্টের অবসান হবে, এইসব প্রশ্ন নাগবেণীর চোখের সামনে দূরে দৃশ্যমান সমুদ্র তরঙ্গের মতো আবর্তিত হচ্ছিল।

ওরা সমুদ্রের কাছাকাছি এল। সেদিন সূর্য পাতলা মেঘের আড়ালে বিবর্ণ হয়ে অস্ত যাচ্ছিল। আকাশও কেমন যেন বর্ণহীন। মেঘে ও সমুদ্রে কোথাও সূর্যাস্তের সেই স্বাভাবিক সমারোহ নেই। লাল আকাশ প্রথমে কমলালেবুর মতো রঙ ধরে, পরে ঘোর বেগুনী রঙ নিয়ে, অবশেষে ধোঁয়ার মতো কেমন একটা আবছা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। রাম পা ছড়িয়ে বসে হাতে একটা ঝিনুক নিয়ে বালির উপর কী সব আকিবুকি দিচ্ছে। বুঝি তার শৈশবের ছবি আঁকার ঝোঁক আবার ফিরে এসেছে। ওদিকে নাগবেণী বিরস বিষণ্ণ মুখে তাকিয়ে আছে দূরবর্তী একটা পালতোলা নৌকার দিকে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে থেকে নাগবেণী প্রথমে মৌন ভঙ্গ করল। বলল, 'এবারে বন্দরে পালতোলা নৌকা বেশি আসে নি। মনে হয় আর পাঁচ-ছদিনের মধ্যেই বর্ষা শুরু হয়ে যাবে। রোঁয়ার মাঠেও জল-হওয়ার মতো বৃষ্টি হয় নি এবার। এখনও যদি বৃষ্টি নামে তবে ভালো হয়, না রে?'

'হুঁ…'

'কিরে, এবছর ব্যবসা বাণিজ্যই কম নাকি ? যতই দিন যাচ্ছে, আমাদের হংগারকট্টে বন্দরের ব্যবসা যেন ততই মন্দা পড়ে যাচ্ছে। মোহানা পেরিয়ে যাওয়া পালের নৌকা আজকাল কম, খুবই কম।'

দু'এক মুহূর্ত পরে নিজের ভাবাবেশ থেকে জেগে উঠে রাম হঠাৎ বলে উঠল, 'কী বললে মা ?'

মা সেই কথাটা পুনরাবৃত্তি করতে রাম বলল, 'হতে পারে, আমারও তাই মনে হয়। আজকাল বন্দরে গেলে দেখা যায় খোলা গুদামের চেয়ে বন্ধ গুদামের সংখ্যাই বেশি। আমার ঠাকুর্দার আমলে নাকি খুব মস্ত ব্যবসা ছিল এই বন্দরে। অতদূর কেন, আমি যখন খুব ছোট ছিলাম, মংগলুর থেকে দেশে বেড়াতে এলে হংগারকট্টের নৌঘাটায় দাঁড়িয়ে বন্দরে আসা পালের নৌকাগুলি এক এক করে গুনতাম। এখন আর অত পালের নৌকা আসতে দেখা যায় না। বড় জোর চার-পাঁচখানা আসে।'

'আচ্ছা রাম, ওকথা এখন থাক। নরসিংহময়্যকে আমাদের তো কিছু একটা বলা উচিত।'

'আপাতত যখন অন্য কোনো উপায় দেখছি না, তখন নিতেই হবে। কিন্তু মা, কুড়ি টাকার কী জীবন! তুমি যদি আমার সঙ্গে যাও, কোনো রকমে চালিয়ে নিতে পারব।'

'তুই আগে গিয়ে কিছু দিন একা থেকে দেখে নে ওখানে সব ঠিক আছে কিনা। যদি অদৃষ্টে থাকে, অন্য একটা কাজ জুটলেও জুটতে পারে। তারপরে দরকার হলে আমি আসব।'

'দরকার হলে মানে ? তোমাকে আমার দরকার নেই বলতে চাও ?'

'তা নয় রামু, তুই যখন এখানে থাকিস না, তখন যে কীভাবে আমার দিন কাটে একমাত্র ভগবানই জানেন। কিন্তু বেংগলুরের মতো অচেনা অজানা জায়গায়, ধর্ দুজনেই একসঙ্গে গেলাম, তারপরে তোর সেই কাজ ভালো লাগল না, তখন খুব সংকট হবে না কি ?'

'তা ঠিক, কিন্তু তুমি যে বললে, 'আসা দরকার হলে আসব' এর মানে কী ?'

'শোন খোকা, এখানে অনেক কষ্ট আছে জানি, কিন্তু তোর দাদু এই বাড়ি তৈরি করে গেছেন। মরবার সময়ে আমি তাঁর কাছে ছিলাম। তাঁর মনের ইচ্ছা

কী ছিল সে তো ভালো ভাবেই জানি। সেই বাড়ি ছেড়ে যাব ভাবলে মনে হয় কী দুরদৃষ্ট আমাদের! তবে ভগবানের ইচ্ছাই যদি তাই হয়, তবে আমাদের সাধ্য কতটুকু ?'

'মা এই সবের জন্য ভগবান কী করবে ?'

'তা ঠিকই। ভগবানকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। কিন্তু সমস্তটা আমাদের হাতের মধ্যেও নেই।'

নাগবেণী বা রাম খেয়াল করেনি, তাদের কথাবার্তার মধ্যেই ঝড়ের সংকেত দেখা দিল। প্রবল হাওয়া বইতে শুরু করেছে, বালি উড়ে আসছে মুখে চোখে। থরে থরে মেঘ জমতে শুরু করেছে আকাশে। নাগবেণী বলল, 'ভীষণ ঝড় বৃষ্টি আসছে। চল্ খোকা তাড়াতাড়ি বাড়ি যাই। আজই বুঝি বর্ষাকাল আরম্ভ হয়ে গেল।'

দুজনেই তাড়াহুড়ো করে বাড়ির পথ ধরল। রাত বেশি না হলেও অন্ধকার বেশ ঘন হয়ে এসেছে। ঝড়ের হাওয়ায় নারকেলগাছগুলি ক্রুদ্ধ সর্পের ফণার মতো খালি মাথা দোলাচ্ছে। চোখ খুলে বালিয়াড়ির উপর চলা অসাধ্য। কোনোক্রমে তারা দৌড়ে এসে বাড়িতে পৌঁছল। হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের আলো, বজ্রের আঘাত! অকস্মাৎ বাতাস, বৃষ্টি, মেঘ গর্জন অন্ধকারকে কাঁপিয়ে তুলল। ঘরের মধ্যে পা দিয়ে নাগবেণী বলল, 'আহা, তখন যে পালের নৌকাখানি দেখেছিলাম, মাঝসমুদ্রে ওরা না জানি কী করছে! এইজন্যই তো কড়া গরম পড়লে কেউ নৌকা ছাড়ে না। ওটা কোন্ অঞ্চলের নৌকা, কোথায় যাবে কে জানে? যদি আমাদের হংগারকট্টে বন্দরেও পৌঁছে গিয়ে থাকে—' এইভাবে নাগবেণী নিজেদের ভাবনা ছেড়ে পরের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করতে লাগল। এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে, মোহানার কাছে নৌকা ডোবা, অন্যান্য দুর্ঘটনা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অনেকক্ষণ যাবৎ মাতাপুত্রের কথাবার্তা হল।

রাত্রিতে নাগবেণীর বার বার মনে আসে সেই নিঃসঙ্গ পালতোলা নৌকাখানির কথা। সারা রাতে বৃষ্টি আর থামেনি, হাওয়াও কমে নি! শুয়ে শুয়ে তাদের আর নিদ্রা আসে না। মাঝরাতে নাগবেণী বলে ওঠে, 'রামু, গোয়ালঘরটা একবার দেখে আসি। গঙ্গা-তুঙ্গা শুয়ে আছে কিনা কে জানে? গত বছর চালে একদম খড় দেওয়া হয় নি, এবছর সমস্ত চাল দিয়ে বোধ হয় জল পড়ছে।' এই বলে উঠে পড়ে। হাতে প্রদীপ নিয়ে গেলে হাওয়ায় নিবে যাবে বলে সে

অন্ধকারেই বেরিয়ে পড়ে। বাইরে বিদ্যুতের আলো আছে। 'আমিও আসছি মা' এই বলে মায়ের পিছনে রামও বেরিয়ে আসে। উঠোন পেরিয়ে গোয়ালঘরে পৌঁছবার মধ্যেই দুজনে ভিজে গেছে। সেখানে বিদ্যুতের ক্ষণিক আলোয় কতটুকুই বা দেখা যায়। বোঝা গেল গোয়ালঘরের গোটা চালটাই ফুটো ফুটো হয়ে গেছে। বৃষ্টির জল ঝর্‌ঝর্‌ করে ভিতরেই ঝরে পড়ছে। গোরু-বাছুর ভিজে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভয়ে কাঁপছে। গঙ্গাতুঙ্গা করুণ দৃষ্টিতে নাগবেণীর দিকে তাকিয়ে 'অম্বা' (হাম্বা) বলে ডাক দিল। নাগবেণী গলার দড়ি খুলে দিলে রাম বাছুরটাকে এবং নাগবেণী গোরুটাকে নিয়ে এসে বারান্দার কোণে বেঁধে রাখল। তারপরে নিজেদের সিক্তদেহ মুছে নিয়ে জামাকাপড় বদলে ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে মা ও ছেলে আবার শুয়ে পড়ল। গায়ে জড়াবার মতো উপযুক্ত কাপড়ও ছিল না।

নাগবেণীর চিন্তা কেবল গোয়ালঘর নিয়ে। 'খোকা, এবছর চালে খড় না বিছোলে গোয়ালঘরটা পড়ে যাবে। কিন্তু ছাওয়াবার জন্য খড় কোত্থেকে আসবে? চাষবাস করলে তবে তো খড়।'

'সুরোর ছেলে কালোর কাছে নেই, মা? চাইলে ধার দেবে না?'

'এবছর তো খাজনা বাড়াই নি, হয়ত দিতে পারে। কিন্তু শুরুতেই যদি এই বৃষ্টি, তবে ছাওয়াতে ভারি কষ্ট হবে।'

বাকী রাতটা কোনো রকমে কেটে গেল। মা ও ছেলে ঘুম থেকে উঠলেও গঙ্গাতুঙ্গা এখনও ওঠেনি। ওদের যে ওখান থেকে সরিয়ে আবার গোশালায় নিয়ে বাঁধবে তারও উপায় নেই। একরাত্রির মুষলধার বর্ষণে সমস্ত গ্রাম জলে জলময়। কোলাব্যাঙের আওয়াজে পুকুরগুলি মুখরিত। যে বৃষ্টি শুরু হয়েছে তার আর বিরাম নেই। বর্ষাকাল শুরু হয়ে গেল।

নাগবেণী ব্যাকুল হয়ে পড়েছে গোয়ালঘরের জন্য। যেমন করে হোক চালাটা মেরামত করতে হবে। এইভাবে বৃষ্টি পড়তে থাকলে গোয়ালঘরের মাটির দেয়াল ভিজে গিয়ে দু'এক দিনের মধ্যেই ভেঙে পড়বে। এদিকে কাজের জন্যই বা কে আসবে? সুরোর ছেলে কালো বিছানায় পড়ে আছে। তার ছেলেপুলেরা এতক্ষণে চাষবাসের কাজে বেরিয়ে পড়েছে। বচ্চির এনে দেওয়া খড় ইতিমধ্যেই ভিজে গেছে, আর দু'একদিন পড়ে থাকলে হয়ত অকেজো হয়ে যাবে। আর দেরি নয়। রামই চালের উপর উঠে যায়। নাগবেণী নীচ থেকে আঁটি আঁটি

খড় উপরে ছুঁড়ে দেয়। বৃষ্টির মধ্যেই রাম যেমন যেমন বুঝেছে চালের এখানে সেখানে খড় লাগিয়ে দিয়ে চাল ছাওয়ার কাজ মোটামুটি শেষ হল। এই চালের চেহারা দেখার মতো ছিল না বটে, তবে একটা বর্ষা কাটাতে পারলেই যথেষ্ট।

চাল ছাওয়ার কাজ শেষ হলে নাগবেণী এক সময়ে নরসিংহময়্যর বাড়িতে গেল রামের কথাটা জানাবার জন্য। নরসিংহ রামের পথখরচের জন্য কিছু অগ্রিম টাকা নাগবেণীর হাতে দিয়ে বেংগলুরে জনার্দনকে এই নতুন ব্যবস্থার কথা জানিয়ে দিল। পাঁচ-সাতদিন পরে আবার মাতা-পুত্রে বিচ্ছেদ। নাগবেণীকে জড়িয়ে ধরে রাম কেঁদে ফেলল, 'মা প্রতিমাসে তোমার প্রয়োজনমতো টাকা তুমি এখান থেকে নিয়ে নিও। আমার মাইনে থেকে ওটা কাটা যাবে। তুমি যদি আধপেটা খেয়ে থাক তবে আমার দিব্যি রইল।' এই বলে রাম রওনা হয়ে গেল। বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতেই রওনা হল। ছাতা দিয়ে বিছানার পোঁটলাটাকে পর্যন্ত রক্ষা করা গেল না।

কোডিগ্রামের বাড়িতে নাগবেণী একা। প্রতিদিন সে ছেলের চিঠির অপেক্ষা করে। বেংগলুরে পৌঁছেই রাম চিঠি দেয়, 'এসে পৌঁছেছি। নিরাপদেই আছি।' রামের চিঠিগুলি বড়ো সংক্ষিপ্ত, 'আমি ভাল আছি' গোছের ছোট ছোট চিঠি। নিজের কথা কিছুই না লিখে কেবল মায়ের কুশল প্রশ্নে ভরে দেয়। প্রথম একখানি পত্রে সে লিখেছিল, 'মা, তোমাকে যথাসম্ভব শীঘ্র নিয়ে আসার সুযোগ হয়ত পাব' এই বলে চিঠিতে দেবতার কাছে প্রার্থনাও জানিয়েছিল। 'মা তুমি নরসিংহময়্যর কাছ থেকে এমাসে এক 'মুডি' চাল নিয়েছ শুনে খুব খুশি হলাম। কিন্তু নগদ টাকা কিছু নিলে না কেন? আমার এখানে খাওয়া দাওয়া হোটেলে। কেবল চিঠিপত্র লেখার জন্য অল্প কিছু টাকা দরকার। অন্য কোনো খরচ নেই। মাদ্রাসে থাকতে মাধব মেসোমশায়ের কাছ থেকে যে টাকা ধার করেছিলাম, সেইটেই প্রথমে শোধ করব স্থির করেছি। মেসোর এই ধারটা শোধ হলেই আমি নিজস্ব বাসস্থানের ব্যবস্থা করে তোমাকে নিয়ে আসব।'

কিন্তু বেংগলুরে যতই দিন যেতে লাগল, সেখানে বাসা করে মাকে নিয়ে আসার আশা ততই ক্ষীণ হতে থাকে। চিঠিতে কিন্তু রাম এই নৈরাশ্যের কথা মাকে জানায় না। অথচ তার মনে সংশয় প্রবল হতে থাকে—কোথাও একটা নোংরা গলির মধ্যে ঘর ভাড়া নিয়ে মাত্র কুড়িটি টাকায় জীবন যাপন করা কি সম্ভব? সম্ভব হলেও তাতে সুখ কোথায়? তাছাড়া ওই টাকার মধ্যেই তাদের

দেশের বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্যও কিছু খরচ করা দরকার হবে। নাগবেণীও তার প্রত্যেক চিঠিতে 'তুমি কেমন আছ? কবে আসবে'? এই সব প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করত, কিন্তু সে যে বেংগলুরে ছেলের বাসায় আসার জন্য অপেক্ষা করে আছে সেই আকাঙ্ক্ষার কথা কোনো চিঠিতেই প্রকাশ করে নি। বেংগলুরে যাওয়ার ছ'মাস পরে রামের কাছ থেকে চিঠি এল, 'মা, এখানে একটা বাসা করে তোমাকে একদিন নিয়ে আসব বলে আশা করেছিলাম। সেদিন আসবে কিনা জানি না। আর যদি বা আসে, এখানে এক প্রকার নরকযন্ত্রণার মধ্যে তোমায় দিন কাটাতে হবে। দারিদ্র্য যেমন করে হোক পিছনে লেগেই থাকবে। ঘরে আমি থাকতে পারব কতক্ষণ? ভোর পাঁচটায় উঠে হোটেলে গিয়ে বসলে দুপুর বারোটা পর্যন্ত সেখানেই। খাওয়া সেরে নিয়ে আধ ঘণ্টার মতো বিশ্রাম। তারপরে বাতি নেবার সময় অর্থাৎ রাত এগারোটা পর্যন্ত পুনরায় সেখানে। যখন শুতে যাই, সারাদিনের ক্লান্তিতে দেহটা মড়ার মতো পড়ে থাকে। তুমি আমার কাছে এসে থাকলেও তোমার সঙ্গে কথা বলার জন্য সারাদিনে দেড় দণ্ড সময়ও পাব না। আমাদের দেশের বাড়িতে আর কিছু না থাক, আলো-হাওয়ার কোনো অভাব নেই। সেই বাড়ি ছেড়ে এখানে শহরের এক অন্ধ গলির কোণে এসে পড়ে থাকা নিরর্থক। আমিই বরং বছরে একবার করে এসে তোমার সঙ্গে কয়েক দিন কাটাতে পারব।'

আর একবার রাম লিখল তার চাকরি সন্ধানের নানা খবর দিয়ে—'মা, এখানে আসার পর থেকে ধীরে ধীরে অনেকের সঙ্গে পরিচয় হচ্ছে। হোটেলে যেসব বড় বড় লোক আসে তাদের অনেকের সঙ্গে জানাশোনা হয়েছে। দু'একজনের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠতা হলে আমি তাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম কোথাও কোনো চাকরি খালি আছে কিনা, মুখে সকলেই খুব ভরসা দেয়, তাদের প্রভাব প্রতিপত্তির কথা বলে। কিন্তু কাজ কিছুই হবে বলে মনে হয় না। এদিকে আমিও তো কম চেষ্টা করি নি। যেখানে যেখানে কর্মখালির সন্ধান পাই, সেখানেই চিঠি লিখি। কিন্তু দেখলাম ওতে ডাকখরচাটাও বৃথা গেল। আজকাল সর্বত্র এক কথা—চাকরি পেতে হলে 'ব্যাকিং' চাই। মেসোমশায়ের ওখান থেকেও চাকরির ব্যাপারে কোনো আশাজনক চিঠি পাচ্ছি না। এই বছরের শেষাশেষি মেসোর দেনাটা পুরো শোধ হয়ে যাবে। ভাবছি—দেনাটা শোধ হলেই আমি বেংগলুর থেকে বোম্বাই যাব। বোম্বাই বেশ বড় শহর,

ওখানে নাকি আমাদের দেশের লোকও অনেক আছে। ওখানে শুনেছি মাইনে পত্রও এখানকার চেয়ে অনেক বেশি।'

আর একবারের চিঠিতে ছিল রামের দৈনন্দিন দুরবস্থার কথা—'ভোরবেলায় উঠে চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসি। বিলের (bill) হিসাব, টাকাপয়সা গণনা—এই হল আমার কাজ। দু'ঘণ্টা পর পর জনার্দনময়্য এসে সমস্ত টাকা পয়সা নিয়ে আর একটি বাক্সে ভরে রাখে। ছ'মাস হয়ে গেল আমি এখানে এসেছি, তবু তার ধরণ-ধারণ দেখলে মনে হয় টাকা পয়সার ব্যাপারে সে এখনও আমাকে সন্দেহের চোখে দেখে। মাঝে মাঝে ভাবি 'এতই যদি তোমাদের সন্দেহ বাপু, তবে কেন আমাকে এনে বসিয়েছ?' কারণটা বোধ করি এই—ওরা কেউ ইংরেজি জানে না, হোটেলের ঠিক উল্টো দিকে একজন বি. এ. পাশ ভদ্রলোক হোটেল খোলাতে ছাত্ররা এবং তাদের বন্ধু বান্ধবেরা প্রায় সকলেই সেই হোটেলে খেতে থাকে। সেই হোটেলের মালিক তাদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথাবার্তা বলে। ময়্যদের ধারণা ওই ইংরেজির জন্যই ওই হোটেলের গৌরব বেড়ে গেছে এবং তাদের কারো ইংরেজি জানা নেই বলে আমাকে এনেছে। কিন্তু আমার উপর বিশ্বাস কী করে হবে? টাকা-পয়সা যে!

'এই সব চিন্তা করলে এক একবার মনে হয় মাত্র কুড়িটি টাকার জন্য আমি কি এখানে চিরকাল চোরের মতো বসে থাকব? আরও একটা মজার ব্যাপার আছে। মজার হলেও আমার পক্ষে ক্ষতিকর। আমাদের এখানেও খদ্দের সংখ্যা কিছু কম নয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা টাকা-পয়সা গুনতে গুনতে মাথা ঝিম ঝিম করে। কোনো এক ফাঁকে কোনো খদ্দের অচল আনি-দুআনি-সিকি ইত্যাদি গুঁজে দেয়, দশটা চোখ দিয়ে দেখলেও তা ধরা যায় না। সন্ধ্যাবেলায় যখন খুব ভিড় হয়, তখন আর ঠিকমতো দেখেশুনে নেওয়ার সময়ও থাকে না। এইভাবে প্রতিদিন আমার চোখ এড়িয়ে যে 'খোটা' মুদ্রাগুলি আসে, সেগুলি আমার পাওনা থেকে কেটে নেয় বলে কোনো মাসেই কুড়িটাকা আর পাই না। আরও মজা কী জান, ওই অচল সিকি দুয়ানিগুলি জনার্দনময়্য তার পকেটস্থ করে।

'মাঝে মাঝে ভাবি যদি গান শেখাবার সুযোগ পাই, তবে এ চাকরি ছেড়ে দেব। কিন্তু সেদিকেও আশা কম। কারণ, এখানে সংগীতশিক্ষার্থীর চেয়ে সংগীত শিক্ষকের সংখ্যাই বেশি দেখা যাচ্ছে।'

এত দুঃখের মধ্যেও রামের এইটুকু সান্ত্বনা যে তার মায়ের এখন আর অন্ন-বস্ত্রের অভাব নেই। নববর্ষ শুরু হওয়ার আগেই, বছরের শেষ দিকে, মেসো-মশাইকে সে একশ টাকা পাঠিয়েছিল। টাকাটা পেয়ে মাধব চিঠি দিল, 'তুমি এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে কেন? তোমার এই কষ্টের মধ্যে টাকা পাঠাবার দরকার ছিল কী? আমরা কি চেয়ে'ছলাম তোমার কাছে? আমাদের কী মনে করো তুমি—সুদখোর মাড়োয়ারি? কে-না-কে তোমাকে অবিশ্বাস করেছে বলে আমাদেরও কি সেই দলেই ফেলবে?' মাধবের তিরস্কারে রামের মনে একটু কষ্ট হলেও তাদের স্নেহের কথা ভেবে সে খুশি না হয়ে পারল না। ক্ষমা প্রার্থনা করে মেসোর কাছে লিখল, 'আগামীতে যখন দেশে যাব তখন মাদ্রাসে আপনাদের সঙ্গে দেখা করে তবে যাব ভাবছি।' মাধবের চিঠির সঙ্গে এবার আনন্দও লিখল, 'রামুদা, আমাদের কি ভুলে গেলে তুমি?'

গরমের দিন এসে গেল। রামের এখন একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। এই এক বছর খুব চলেছে ময়্যদের হোটেলে। আর পেরে উঠছে না। মাকে এখানে নিয়ে আসার কোনোই ইচ্ছা নেই, কিন্তু মন চায় মাকে একবার দেখতে। দেশে গিয়ে একমাস থাকলে সে মাসের বেতনটি কাটা যাবে। উপরন্তু যাতায়াতেও অনেকগুলি টাকা ব্যয় হয়ে যাবে। আর একটি বছর এখানে থেকে কিছু টাকা জমিয়ে যদি মাস দুই গিয়ে বোম্বাই শহরে থাকা যায় তবে সেখানে চাকরির চেষ্টা করা যেতে পারে।

নাগবেণীর কি একবার ইচ্ছা হয় না ছেলেকে দেখবার? ছেলেকে সে চিঠি লিখে জানাল, 'খোকা, ছুটি নিয়ে গরমের সময়ে একবার বাড়িতে আয়। টাকার চিন্তা করে করেই দেখছি তোর চুল পেকে যাবে। অদৃষ্টে থাকলে দিন কোনোরকমে চলে যাবে।'

এক সপ্তাহ পরে আবার চিঠি এল, 'নরসিংহময়্য আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার ছেলে গরমের সময়ে কি একবার দেশে আসতে চায়? আসতে চায় তো আসুক। আমার কোনো আপত্তি নেই।' ওদিকে তাঁর ছোট ভাইকে নাকি জানিয়ে দিয়েছেন—'আমাদের খরচেই রামুকে দেশে পাঠিয়ে দাও।' খবরটা পেয়ে রাম বিস্মিত না হয়ে পারল না। ভাবল—'বোধ করি আমার সততা ও ভালো কাজকর্ম দেখে ওরা আমার প্রতি খুশি হয়ে থাকবে।' মালিকদের খুশির কথা ভেবে রামও খুব খুশি হল। মাসিক বেতন কুড়ি টাকা

থেকে এবারে পঁচিশ টাকা হতে পারে। রামের অবশ্য মনের কথাটা এই যে, দিনে ষোলো ঘণ্টা খাটুনি কমিয়ে যদি বারো ঘণ্টা করে, তবে পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধির চেয়ে তাই ভাল। হোটেলমালিক জনার্দনময়্য দেশে যাওয়ার খরচ বাবদ গুনে গুনে বারোটি টাকা দিয়ে বলল—'যদি আরও টাকা দরকার হয়, তোমার হিসাবের টাকা থেকে অগ্রিম দিতে পার।' রামের কোনো অগ্রিমের প্রয়োজন নেই, কারণ সে মাসের বেতন সে নিজেও খরচ করেনি, বাড়িতেও পাঠায়নি, জমিয়েছে। খুশিমনে রাম রওনা হয়ে গেল।

রাম রওনা হয়ে যাওয়ার পরে জনার্দনময়্য তার দাদার কাছে চিঠি দিলে নরসিংহময়্য নাগবেণীকে খবর দিয়ে আনিয়ে বলল, 'কী ব্যাপার আমাদের জনার্দনের চিঠি এসে গেছে। অথচ রাম এখনও বাড়ি এল না?' আসলে রাম বেংগলুর থেকে সোজা দেশে না গিয়ে মাদ্রাস চলে গেছে। তার আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় ও ভালোবাসায় মাসির গৃহ আবার আলোকিত হয়ে ওঠে। কয়েক দিন কাজের চেষ্টায় নানা অপিসের সামনে আর একবার ঘোরাঘুরি করে দেখে। বেংগলুর থেকে রওনা হওয়ার সপ্তাহখানেক পরে কোডিগ্রামে পৌঁছে বাড়ির সীমানায় পা দিয়েই রাম প্রাণভরে উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল—'মা..'।

সেই রাতে রাম মাকে এঁটো বাসন-কোসন ধুতে দিল না। বাধা দিয়ে বলল, 'দেখ মা, বাসন ধোওয়া মোছার কাজ কাল। বাইরে চেয়ে দেখ কী চমৎকার জ্যোৎস্না! আমি বাড়ি এসেছি কিনা, তাই চাঁদও এসেছে। চল যাই বালিয়াড়িতে। সেখানে বসে খুব কথা বলা যাবে। বেহালাটা সঙ্গে নেব কি?' রাম একেবারে ব্যাকুল হয়ে উঠল।

মা ও ছেলে দুজনেই খুশিমনে বালিয়াড়ির উপর এসে দাঁড়াল। হাওয়া তেমন না থাকলেও রাতটা বেশ ঠাণ্ডা ছিল। নাগবেণী বলল, 'এখানেই বসি আয়। সমুদ্রতীরে গিয়ে আর কাজ নেই।' 'তাই হোক', বলে ছেলে সেখানেই দাঁড়াল। মাকে বসতে দেখে নিজেও বসল। জিজ্ঞাসা করল, 'আজ কি তুমি ক্লান্ত বা কোনো কষ্ট বোধ করছ মা?' 'না, তবে যেতে ইচ্ছে করে না।'

অতঃপর নাগবেণী ছেলের কাছে একটা নতুন ও গুরুত্বপূর্ণ কথা উল্লেখ করল, 'খোকা, আমি ভালো-মন্দ কিছুই বুঝি না। তুই কেমন বুঝবি কী মনে করবি জানি না। নরসিংহময়্য যে কথা বলেছেন তোকে বলছি।' এই বলে

নরসিংহময়্য যে কারণে নাগবেণীকে বাড়িতে ডাকিয়ে নিয়েছিল, সেই কারণটা নাগবেণী রামকে জানাল, 'ওঁরা লক্ষ্মীকে তোর কাছে দিতে চান। বললেন, কাছাকাছি সম্বন্ধ। পরস্পরের পরিচিত। আরও বলেছেন, 'আমাদের তো তিন-চারটে হোটেল আছে। একটা হোটেলের দেখাশুনা রামই করুক, লাভের অর্ধাংশ সে পাবে। একথা আর রামকে বুঝতে হবে না যে সে কারও চাকরি করছে।' একথাও বলেছেন যে তোকে যেন আমি চিঠি লিখি। কিন্তু তুই এলে পরে মুখোমুখি কথা বলাই ভালো হবে ভেবে আমি চুপ করে ছিলাম।'

রাম হাসল। হেসে বলল, 'মা, তুমি কি তাকে কোনো কথা দিয়েছ ?'

'না, বাবা। কথা আমি দিইনি কিছু।'

'এবিষয়ে তোমার কী মনে হয়।'

'মেয়ে তোর পছন্দ হলে হতে পারে বলে মনে হয়। গ্রামের পাঠশালায় একটু লেখাপড়াও শিখেছে। আজ হোক, কাল হোক, তুই তো বিয়ে করবি। আমাদের মতো গরীবের ঘরে কে মেয়ে দিতে আসবে ? তবে বিয়ে করবি তুই। তোর মতামত না বুঝে আমি তাঁদের কোনো কথা দিই নি।'

'মা, মেয়ের কথা ছেড়ে দাও। ওদের হোটেলের ভাগ-টাগের মধ্যে ফেঁসে গিয়ে আমাকে বিয়ে করতে বল ? ওরা তখন বলে বেড়াবে—'আমাদের মেয়ে বিয়ে করেই তো ও বড় লোক হয়েছে।' এসব কথা কিন্তু শুনতে হবে, সহ্য করতে হবে, তাছাড়া হোটেলের কথা যা বলছ, অর্ধেক ভাগ আমার তা বুঝলাম। অদৃষ্ট ভাল হলে ওর থেকে টাকাও আসবে ঠিক। কিন্তু একটি মিনিট ছুটি নেই, এই কাজ দেখেই আমার বিতৃষ্ণা এসে গেছে। আমি ওখানে যাওয়ার পর সবসুদ্ধ দুবার কি তিনবার বেহালাটা হাতে নিয়েছি।'

'যাক সে কথা। মেয়েটাকে তো তুই একমাস গান শিখিয়েছিলি। তোর কী ধারণা, মেয়েটি কেমন ? রূপের কথা বলছি না, চেহারা মোটামুটি।'

'বিশেষ জ্ঞান গুণ বা বুদ্ধি শুদ্ধি ওর আছে বলে আমার মনে হয় না। ওর বাবা-মায়ের সঙ্গে ওকে কথাবার্তা বলতে শুনেছি। সর্বদাই এই গয়না চাই, ওই গয়না চাই—এই ধরনের মেয়ে। বাপমাও তেমনি সোনা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে মেয়েকে। আমাদের পক্ষে ওই ধরনের আবদার মেনে-চলা সম্ভব হবে না। কেবল তাই নয়, ওর যদি মনের মধ্যে এই ধারণা থেকে যায় যে ওরা বড়লোক, আমরা গরীব, তবে আমার উপর ওর কোনোদিনই শ্রদ্ধা হবে না।'

'সে কথা সত্য, বাবা। কিন্তু তুই কি বলতে চাস এখন তুই বিয়েই করবি নে? ধর, এর পর যদি কোথাও ভালো সম্বন্ধ পাওয়া যায়, তবে?'

'মা, তোমারও মতিভ্রম? আমরা দুজনের ভাত-কাপড়ের জোগাড় করতে পারছি না, আর তুমি বলছ কি না আর একটি প্রাণীকে বাড়িতে এনে তার বোঝা বইতে? বিয়ে করলেই সংসারের আরো কত দায়িত্ব বহন করতে হবে। মাসে কেবল কুড়িটি টাকা মাইনের জন্য প্রতিদিন যাকে ষোল ঘণ্টার খাটুনি খাটতে হয়, তার আবার সংসার কেন মা? তাতে কার কী সুখ হবে বল।'

অনেকক্ষণ তারা চুপ করে রইল। অবশেষে রাম বলল, 'মা, একটা কিছু বাজাও।' নাগবেণী ধীরে ধীরে বেহালাটি হাতে নিয়ে গৎ বাজাল। নাগবেণী যতই চেষ্টা করুক না কেন, তার বেহালার সুরে আপন অন্তরের গভীর ব্যথা প্রতিফলিত না হয়ে পারে না। প্রতিটি গানের শেষে একটা সুরের দীর্ঘশ্বাস। অশ্বত্থবৃক্ষের মতো নাগবেণীর জীবনে গভীর বেদনা সর্বত্র দৃঢ় হয়ে বসেছে।

দুজনেই অনেকক্ষণ বেহালা বাজিয়ে, কথাবার্তা বলে, শ্রান্ত হয়ে যখন ঝিমোতে শুরু করল, তখন তারা বাড়ি ফিরল। পরদিনই রাম জিজ্ঞাসা করল, 'মা, গত বর্ষাকালে গোয়ালঘরের চালটা টিকেছিল?' মা বলল, 'তোর হাতের ছাউনি! কোনোরকমে টিকেছিল। কিন্তু এবার চালের জন্য খড় জোগাড় করতে হবে। খড়, নারকেল পাতা, বাঁশ সবই নতুন চাই। দশ-পনেরো টাকা খরচা হবে। কিন্তু না করে উপায় কী? যেমন করে হোক করা দরকার।' রাম জিজ্ঞাসা করল, 'আজকাল আমাদের গঙ্গা কতটা দুধ দেয়?' নাগবেণী বলল, গঙ্গা তুঙ্গা দুটোই গাভিন। এখন দুধ নেই বটে, তবে আর মাসদুয়েকের পর দুটোই দুধ দেবে। কিন্তু তখন তুই তো বাড়িতে থাকবি নে। ভাবছি একটা গাই বেচে দেব।'

সেদিন দুপুরবেলায় নাগবেণী ময়্যদের বাড়িতে গেল। লক্ষ্মীর বিবাহ সম্পর্কে স্পষ্টভাবে 'না' এই কথাটা না বলতে পেরে অন্য উপায় বের করল, 'দেখুন, রামকে তো জিজ্ঞেস করেছিলাম। তা, সে বলছে এখন নাকি বিয়ে করার কথা চিন্তাই করছে না।' ময়্য নাগবেণীকে অনেক হিতোপদেশ দিয়ে বলল, 'লচ্চ কেন উচ্ছন্নে গেল জান? সময়মতো বিয়ে না দেওয়াতে, সেইরকমই শুনেছি আমরা। এখনও কি রামের বিয়ের বয়স হয়নি? বাইশ-তেইশ হয়েছে বলে মনে হয়। এর পরে আর কবে বিয়ে করবে? আজকালকার ছেলে-

ছোকরারা বোঝে না। পরে বয়স হয়ে ঢোস্‌কা হয়ে গেলে তখন আর কেউ মেয়ে দেবে না। আমার কী বলো। আমাদের লক্ষ্মীর এমন কিছু বয়স হয় নি। তার গা-ভর্তি সোনা গয়না। ভগবানের দয়ায় আমাদের বংশের একটা নামডাকও রয়েছে। যেকোনো জায়গায় ওর সম্বন্ধ হয়ে যাবে। আমি কেবল তোমার ছেলের ভালোর জন্যই বলেছিলাম।'

উদাসীনভাবে বাড়ি ফিরে নাগবেণী ছেলেকে সমস্ত ব্যাপার খুলে বলল। তারপর রাম বারতিনেক ময়্যদের বাড়িতে গেলেও গয়নাগাটি পরে লক্ষ্মী তার সামনে দিয়ে নিঃশব্দে চলাফেরা করেছে ছাড়া আর কোনো ঘটনা ঘটেনি।

রাম বাড়িতে এসেছে আজ পনেরো দিন হয়ে গেল। আর তিন-চারদিন পরে তাকে বেংগলুর ফিরে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি করে গোয়ালঘরের চাল নতুন করে ছাওয়া হয়েছে। মায়ের জন্য কিছু কাপড়চোপড়ও কিনে আনল। হুট্ করে একদিন সুব্বিপিসির বাড়িতে গিয়ে সকলের সঙ্গে দেখা করে এল। তশীলদার দাদুর সঙ্গে দেখা করার জন্য একদিন গেল পড়ুমুনূরুতে। দাদু রামের চাকরি সম্পর্কে প্রশ্ন করার পরিবর্তে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হে রামু, তোমার বিয়ের পায়েসটা কবে খেতে পাব?' রাম হাসতে হাসতে বলল, 'পায়েস তো রোজই হচ্ছে দাদু। কেবল যে মেয়েটি এসে পায়েস খাবে তারই দেখা নেই।'

'তোমার বাড়িতে রোজই পায়েস হচ্ছে? মানে?'

'চোখের জলের পায়েস, দাদু।'

দাদু হাসলেন। বললেন, 'নিশ্চয়ই তুমি একটা ভাল চাকরি পেয়ে যাবে। এত পড়াশুনা করেছ, তোমার মতো ছেলে থাকবে ময়্যদের হোটেলে গোমস্তা হয়ে?'

বেংগলুরে থাকতে রাম মায়ের চিঠিতে একবার ঐরোডির নারায়ণদাদুর মৃত্যু খবরটা পায়। দাদুর পরে সেখানে স্নেহ করবার মতো আর কেউ নেই। কাজেই এবারে আর সেখানে যাওয়ার ইচ্ছা হল না। সে বেগংলুর রওনা হয়ে গেল।

আবার সেই পুরোনো জায়গায় বসে দৈনন্দিন খাটুনির জীবন। দ্বিতীয় বছরের একটি দিন যায়, দুটি দিন যায়, তৃতীয় দিনটিও গেল। চতুর্থ দিনটিও যাবে। একেবারে ছকে ফেলা জীবন। মাঝে মাঝে মায়ের কাছে পত্র লেখে। কিন্তু

বিশেষ কোনো সমাচার থাকে না তাতে। কেমন সংক্ষিপ্ত ও নিরুৎসাহের চিঠি। কিন্তু নাগবেণী চিঠির পর চিঠিতে ছেলেকে খুব আশা-ভরসা দিয়ে চিঠি দেয়, নিরাশ ও নিরুৎসাহ হতে নিষেধ করে। ইতিমধ্যে একটিমাত্র ঘটনায় রামের এই একঘেয়ে জীবনে একটু বৈচিত্র্যের স্বাদ দেখা দিল।

নবরাত্রির মাসখানেক আগে মাদ্রাস থেকে মাধবের একখানি চিঠি পায় রাম। তার মেয়ের বিয়ের জন্য তারা সকলে দেশের দিকে যাচ্ছে। মেয়ের আগ্রহ যাওয়ার পথে বেগংলুর-মৈসুর শহর দুটো দেখে, মৈসুরের দসরা-উৎসবে উপস্থিত থেকে কয়েকদিন আনন্দ করে যায়। খবরটি সুখবর সন্দেহ নেই। রামের একমাত্র চিন্তা তার নিজের জন্য। ওরা যখন আসবে তখন যদি ছুটি না পাওয়া যায়, তাহলে? প্রতি বছর দসরার সময়ে এ অঞ্চলে যাত্রীসমাগম হয় প্রচুর, হোটেলগুলিও বেশ ফুলে-ফেঁপে ওঠে। যারা মৈসুরের দড়রা-উৎসবে আসে, বেগংলুর তারা কেউ না দেখে যায় না। সেই অগণ্য যাত্রীর কিছু অংশ নিশ্চয়ই তাদের হোটেলে এসে আশ্রয় নেবে।

পরে কোনো বাধার সৃষ্টি না হয়, এইজন্য রাম তার মালিকের কাছে অনেক-দিন আগেই কথাটা পেড়ে রাখল। 'মাদ্রাস থেকে আমার মেসোমশাই আসছেন সপরিবারে মৈসুর উৎসবে। ভাবছিলাম ওদের সঙ্গে যদি দসরাটা দেখে নিতে পারি···।' মালিক আপত্তি করল না, বলল, 'বেশ তাই হবে। তুমি যদি কয়েকদিন আগেই গিয়ে মৈসুরে থাকতে চাও, ভালো কথা। ওখানে আমাদের হোটেল আছে। ভিড়টা বেংগলুর থেকে মৈসুরেই বেশি হয়। তোমার যদি ফুরসৎ হয়, মাঝে মাঝে আমাদের হোটেলে গিয়ে বসবে। আমি তো ভাবছি মৈসুর রেসকোর্সের কাছে এবারে একটা টেম্পোরারি শপ খুলে দেব।' সেই দোকান-ফোকানের কথা রামের আদৌ পছন্দ না হলেও মৈসুর যাওয়ার যে একটা সুযোগ পাওয়া গেছে, এতেই সে খুশি।

সে স্থির করে ফেলল মাসিমাদের বেংগলুরে পা দেবার মুহূর্ত থেকে মৈসুর ছেড়ে যাওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত সে তাদের সঙ্গে সর্বত্র ঘুরে বেড়াবে। সেই শুভ দিনটিও এল। রাম তাদের জন্য আগেই যে বাসার ব্যবস্থা করে রেখেছে, সকলকে নিয়ে সেখানেই উপস্থিত হল। পরে বেরিয়ে পড়ে বেংগলুর শহর পরিদর্শনে। আনন্দের সঙ্গে সে যে মাথামুণ্ডহীন কত কথাই বলল তার হিসাব নেই। কিন্তু আশ্চর্য, তার ছাত্রী জয়ার সঙ্গে কোনো কথাই হল না। জয়া

একটু বড়-সড় হয়েছে, লজ্জার ভারে একেবারে চুপচাপ। মাধবের বড় ছেলে পড়াশুনার চাপ বলে, মাদ্রাসেই রয়ে গেছে। মাধব খুব দুঃখ করে বলল, 'কী বলব রামু, তোমাকে একটা কাজ খুঁজে দিতে পারলুম না। কুড়িটাকা দিতে চাইলে গণ্ডায় গণ্ডায় বি. এ. পাশ এসে হাজির হয়। মালিক বেটারাও হয়েছে এমন যে পনেরোটাকায় লোক পাওয়া মাত্রই কুড়িটাকার লোক ছাড়িয়ে দেয়। এখানে তো তুমি খাওয়া বাদে পঁচিশ টাকা করে পাও। তবে এই চাকরির পরিবেশটা তোমার পছন্দ নয় এই যা।' রাম মাধবকে তার অন্তরের কথা খুলে বলল, 'মেসোমশাই আমি অপেক্ষা করছি বোম্বে যাব বলে।'

বেংগলুর থেকে ওরা সকলে মৈসূর গেল একসঙ্গে। মাধব কখনও মৈসূর দেখেনি। মৈসূরের প্রশস্ত রাজপথ, সবুজ বনোদ্যান, বিশাল অট্টালিকা তত অপূর্ব মনে না হলেও বেংগলুরের হৈ-হুল্লোড় থেকে আসার ফলে মৈসূর তাদের চোখ জুড়িয়ে দিল। আর কিছু নয়, শুধু মাসি ও তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সারা শহরে ঘুরে বেড়ানোতেই রামের আনন্দ। মাঝখানে একবার সে তার মালিকের হোটেলে গিয়ে দর্শন মাত্র দিয়ে এল। নবরাত্রির উৎসব শেষ হয়ে গেলে মাধব সপরিবারে মৈসূর ত্যাগ করে বেংগলুরের দিকে রওনা হয়ে যায়। সকলকে বিদায় দিয়ে রাম ভাবে, 'বিশ্রামের জন্য একটা দিন মৈসূরেই থেকে যাই। যদি সম্ভব হয়, রাজপ্রাসাদে অনুষ্ঠিত সংগীতের আসরেও একবার যাওয়া যেতে পারে।'

দসরা উপলক্ষ্যে যে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে, তার একটা অংশ 'চিত্রকলা বিভাগ'। প্রদর্শনীটা মোটামুটি পরিক্রমা করে সে আবার গেল চিত্র প্রদর্শনী-শালায়। তাড়াহুড়ো করে ছবিগুলি ভালোভাবে দেখা হয় নি। সেদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাম বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়ে চিত্রশালায় ঘুরে বেড়াল। দু'একখানি ছবি দেখে তার এমন কথাও পর্যন্ত মনে হল, 'আচ্ছা, আমি কেন ছবি আঁকার চর্চা করি না!' শৈশবের কথা মনে এল—ঘরের মেঝে ও দেয়াল থেকে শুরু করে সমুদ্রসৈকত পর্যন্ত সর্বত্র হাতে আঁকা শত শত ছবি। আশ্চর্য, সারা প্রদর্শনীতে একখানাও সমুদ্রের ছবি নেই। রাম যদি কখনও চিত্রকলার সাধনা করে, তবে সে কেবল সমুদ্রই আঁকবে—সমুদ্রের নানা রূপ। কোডিগ্রামের অমন সমুদ্র কাকে না খুশি করবে ?

সেদিন সারারাত সে কেবল চিত্ররাজ্যের স্বপ্নেই কাটিয়ে দিল। পরদিন

হোটেল ম্যানেজারের সঙ্গে সে আবার ঘুরতে বেরোল। হোটেল ম্যানেজার কেশব আবার রেসখেলায় আসক্ত সেই গরজ করে রামকে এই বলে সঙ্গে নিয়ে গেল, 'চলো যাই, রেসকোর্সটা দেখে আসি।' রাম ভাবল, 'আমি এ পর্যন্ত ঘোড়দৌড় কখনও দেখিনি, ঘোড়দৌড় দেখা মন্দ কী?' এই ভেবে রাম তার সঙ্গ নিয়েছে। কিন্তু তাই বলে সেখানকার টিকিট কিনে ঘোড়দৌড়ের 'আসক্ত প্রেক্ষক' হতে সে রাজী হল না। বাইরে সবুজ ঘাসের টিলার উপর দাঁড়িয়ে দূর থেকে সে ঘোড়ার দৌড় দেখল। ঘোড়দৌড়ের ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ জন্মাল না, কিন্তু তার কৌতুক ও কৌতূহল হল সেখানে অগণ্য লোকের জমায়েত দেখে, তাদের উৎসাহ-উদ্দীপনা, গাড়িঘোড়ার ছুটোছুটি দেখে।

ঘোড়দৌড় শেষ হলে রাম যখন কেশবের জন্য অপেক্ষা করছিল, তখন দেখে কেশব বিরসমুখে আর একজন বৃদ্ধের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসছে। কাছাকাছি এসেই কেশব হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করল, 'একে চেনেন?' রাম আর কি করবে? দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মাত্র। বৃদ্ধের সঙ্গে রামের পরিচয় ছিল না। বৃদ্ধও রামকে চেনে না। কেশব বলল, 'রাম, ইনি আমাদের দেশের লোক, জান না?'

বৃদ্ধ বলল, 'দেশের সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় নেই, দেশের বাইরেই বরাবর কাটিয়েছি কিনা।'

কেশব বলল, 'কেবল দেশের লোক নন, ইনি আমাদের কোডিগ্রামের লোক।'

রাম তখনও নীরব, বুঝতে পারল না লোকটি কে।

কেশব বলল, 'আপনিও একে চেনেন না? আপনি প্রবীণ লোক, একে আপনি দেখে থাকবেন।'

'দেখে থাকতে পারি হয়ত, কিন্তু এতদিন পরে...' এই বলে বৃদ্ধলোকটি কী যেন একটা গোপন করবার চেষ্টা করছিল। কেশব বলল, 'রাম, ইনি 'গ্রেট দরবার রেস্টুরান্ট' নামে একটা জমকালো হোটেল খুলেছিলেন। এখন সেটা নেই। আমি এক সময়ে ওই হোটেলেই কাজ করতাম।'

রামের এতক্ষণে মনে পড়ে ছেলেবেলায় সে বড়দের মুখে এই রেস্টুরান্টের কথা শুনেছে। মুখ চোখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'ইনি কি আমাদের মালিকের নরসিংহময্যর ছোট ভাই ওরটময্য?'

'হুঁ, ঠিক ধরেছ।'

বৃদ্ধ কিছু কি না জিজ্ঞাসা করে পারে ? 'ইনি কে? চিনলাম না তো।' তার এই প্রশ্নের উত্তরে কেশব বলল, 'এ হল আপনার বন্ধুর পুত্র, রাম ঐতালের প্রপৌত্র।'

কথাটা শুনে বৃদ্ধ ওরট বিস্মিত হল। বলল, 'আমাদের লচ্চ বোধকরি বড় হওয়ার পরে আর দেখে নি একে।'

কেশব রামের উদ্দেশে বলল, 'এঁর কাছেই তোমার বাবা রয়েছেন। এখন আর তেমন চলাফেরা করতে পারেন না। মাসে আঠারো দিন বাতের রোগে শুয়ে থাকেন। তুমি কি একবার দেখবে তাঁকে ?'

রাম এই প্রথম জানতে পেল তার পিতৃদেবের অজ্ঞাতবাস এই মৈসুর শহরে। সে কখনও তাকে দেখেছে বলে মনে পড়ে না। অবশ্যই একবার দেখতে চায়। কিন্তু আবেগের বশবর্তী হয়ে হঠাৎ 'যাব, চলুন' এই কথা না বলে শান্তকণ্ঠে বলল, 'আজ রাতে, না হয় কাল সকালে যাব।'

কেশব জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি এখন শহরের দিকে আসবে না ?' 'না, আমি এখন কিছু সময় এখানেই কাটাব'—রাম এই কথা বলতে কেশব ও ওরট একসঙ্গে মিলে সেখান থেকে প্রস্থান করল।

রাম বহু দূর পর্যন্ত ওরটকে তাকিয়ে দেখল। সুব্বিপিসির কাছে, মায়ের কাছে ওরটের ইতিহাস সে সবিস্তারে শুনেছে। ওরটের সঙ্গে তার বাবার বন্ধুত্বের কথাও অজানা নেই। কিন্তু সে কি বাপকে দেখতে যাবে অথবা যাবে না ? মা যদি জানতে পারে যে আমি তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তাহলে সে কী মনে করবে ? কঠিন সমস্যা। অনেকক্ষণ যাবৎ বসে বসে সে কচি ঘাসের ডগাগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে দাঁত দিয়ে কেটে কেটে ফেলছিল। অনেক চিন্তার পরে স্থির হল, 'যাই হোক না, নিজের বাপকে কেন দেখতে যাব না ? শৈশবে নাকি একবার দেখেছিলাম। সে কথা আমার কিছুমাত্র মনে নেই। এখন আর একবার দেখা যায় না ?'

সন্ধ্যায় অনেক দেরি করে সে হোটেলে এল। দশটার আগে কেশব হোটেল ছেড়ে উঠতে পারবে না তা সে জানে। রামকে দেখেই কেশব বলে উঠল, 'দোকান বন্ধ হলে যাব।' 'তখন তিনি ঘুমিয়ে পড়বেন না ?'

'ওদের দুজনের কারও কাছেই দিবারাত্রির কোনো প্রভেদ নেই।'

কথাটা শুনে রাম আর একবার চিন্তায় ডুবে গেল। হোটেলে আর বসে থাকতে ইচ্ছে করছে না, আবার চলে যে যাবে তারও উপায় নেই।

সাতাশ

মৈসুরের শ্রীরামপেট থেকে যে সমস্ত নোংরা গলি বেরিয়ে গেছে তারই একটা গলিতে নীচু চালের একটা ঘর। ঘরের মধ্যে টিমটিম করে একটি মোমবাতি জ্বলছে। এ অঞ্চলে বিদ্যুৎ এসে গেলেও এ বাড়ির বাসিন্দারা সেই বিদ্যুতের আলোকে বাইরেই রেখে দিয়েছে, ভিতরে আসতে দেয়নি। ঘরের মধ্যে লোক বলতে মাত্র দু'জন। দেয়ালে ঠেস দিয়ে, একটা বাতগ্রস্ত পা টান করে, মুখে বিড়ির টুকরো কামড়ে ধরে হাতের তাসগুচ্ছ থেকে এক একখানি করে তাস ফেলছিল যে লোকটি, তারই নাম লচ্চ। তার উল্টো দিকে উপবিষ্ট ব্যক্তি হলেন ওরট। দুজনেরই বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। কিন্তু সত্তর বছরের বৃদ্ধের মতো পাকা চুল, কোটরগত চোখ, চোখের সামনে উঁচু হয়ে থাকা চোয়ালের হাড়। ঘরে তিন-চার দিন ঝাঁট না দেওয়ায় আবর্জনা, বিড়ি ও পান সুপুরির টুকরো চতুর্দিকে ছড়ানো। দুই বন্ধুই তাস খেলায় খুব মগ্ন। দুজনেই যখন পা নাড়তে নাড়তে, চক্রাকারে বিড়ির ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে, 'হুঁ হাঁ' এইরকম 'স্বরোৎপত্তি' করতে করতে খেলায় বিষম ব্যস্ত ছিল, এমন সময়ে বাইরের দরজায় করাঘাতের শব্দ। লচ্চ বলল, 'হুঁ, কোন্ মহারাজ এসেছেন।' ওরট বসে বসেই আগন্তুকের উদ্দেশে বলল, 'কে? ভেতরে এস।'

কেশব এবং তার পশ্চাতে দ্বিধাগ্রস্ত রাম ভিতরে পদার্পণ করলে 'হুঁ' বলে তারা কেশবকে অভ্যর্থনা জানিয়ে পুনরায় খেলায় মগ্ন হয়ে গেল। খেলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত দুজনের কারো মনে এই কথাটা উঠবে না যে সমাগত ব্যক্তিগণকে গ্রাহ্য করা প্রয়োজন। নিজেদের মধ্যেও কথাবার্তা নেই। কেবল এক বাজি খেলা হয়ে গেলে তাসে পিঠ মিলিয়ে তাস ভাঁজার সময়ে খেলা সম্পর্কে দু'একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করে মাত্র। ইতিমধ্যে ভূমিকম্প হয়ে গেলেও তারা সেখান থেকে নড়বে না। কেশব সেকথা জানত বলেই সঙ্গীকে বলল, 'রাম, তুমি এখানেই একটু অপেক্ষা কর। আমি এক্ষুণি আসছি ওদিকে একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে।' এই বলে কেশব বেরিয়ে গেল। রাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে, নিষ্পলক চোখে দেখছে। এক বাজি খেলা শেষ হলে 'আর এক হাত হয়ে যাক' বলে তাস বাটল। খেলা সমানেই চলছে, কিন্তু কারো সঙ্গে কোনো বাক্যালাপ নেই, এমন কি নিজেদের মধ্যেও না।

ইতিমধ্যে ওরট একবার এদিকে ফিরে বলল, 'কী ব্যাপার, কেশবটা তাহলে চলে গেল।' ব্যস্‌ ওইটুকুই। আবার খেলা এগিয়ে চলল। রামের আর বসতে মন হল না ওখানে। আবার 'কেমন দেখায় ?' ভেবে তক্ষুনি চলে যেতেও পারল না। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে যে সে 'তপস্যা' করল খেয়াল নেই। কেশব আর এল না। আসবে বলেও মনে হল না। রাম পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থেকে, বিরক্ত হয়ে, অবশেষে ওরটময্যর কাছে জিজ্ঞাসা করল, 'ময্যমশায়, আমার বাবা কখন ফিরবেন ?' ওরট হাসল। হেসে বলল, 'এই যে আর একজন খেলছেন। কে ইনি বুঝতে পারলে না ?' রামের বুকটা ধক করে উঠল। সামনে অবস্থিত ওই বিকট মূর্তি তার বাবা, রাম ঐতালের পুত্র, এখানে এসে দেখার পর থেকে তিলেকের জন্যও একথা বিশ্বাস করতে তার প্রবৃত্তি হয়নি। সুব্বিপিসির মুখকান্তির কিছুমাত্র আভাস এই লোকটার মধ্যে রাম দেখতে পেল না।

'বাপ' বলে জানার পরে তার সঙ্গে কোনো কথা না বলে যাওয়া উচিত নয় ভেবে রাম দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শ্রান্ত হয়ে সেখানেই একটু বসল। একসময়ে তাদের খেলা শেষ হয়ে গেলে লচ্চ ওরটের মারফত কথাবার্তা শুরু করল, 'কবে এসেছে এখানে ? আছে কোথায় ?' পিতৃদেবের এমনি মর্যাদা যে ছেলের সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলা যায় না ? অসহিষ্ণু হয়ে রাম বলল, 'এক সপ্তাহ হল আমি এসেছি, বেংগলুরে আছি। এখন চললাম।' এই বলে সে সেখান থেকে বেরিয়ে এল, কেশবের জন্য আর অপেক্ষা করল না। তার সমস্ত অন্তরাত্মা ক্রোধে জ্বলে যাচ্ছে। 'এই রকম একটা লোকের ছেলে আমি।' রাম আর চোখের জল চেপে রাখতে পারল না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেশবের জন্য অপেক্ষা করে লাভ নেই ভেবে সোজা সে হোটেলে গেল। সকাল না হওয়া পর্যন্ত আর কেশবের সঙ্গে দেখা হল না। ভোর হলে কেশব এসে পৌঁছতেই রাম গত রাত্রির সমস্ত সমাচার তাকে জানাল। কেশব বলল, 'ওরা এত বখাটে হয়ে গেছে যে আর বলার নয়। সমস্ত বদ অভ্যাসের শিরোমণি। আজ এখানে আছে তো কাল মাদ্রাসে বা পুণায় বা অন্য কোথাও···। টাকা পয়সার ব্যবস্থা কী ভাবে করে, কী ভাবে যে ওদের দিন চলে কেউ জানে না।' বেশ ভারিক্কি চালে কেশব কথাগুলি বলে গেল।

রামের ইচ্ছা ছিল মৈসুরে আরও দু'একদিন থেকে ওখানকার গানের জলসা

শুনে যায়। কিন্তু গত রাত্রির ঘটনার পরে মৈসূরে আর এক মুহূর্ত নয় ভেবে সেদিনই রাম বেংগলুরে ফিরে গেল।

জনার্দনময়্য মৈসূরফেরত রামকে প্রথমে 'কেমন হল ভ্রমণ, কী কী দেখলে ?' ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করার পরে অবশেষে প্রশ্ন করল, 'আমাদের হোটেলে গিয়েছিলে তো ? ওখানে কেশব কেমন আছে ? দোকানেই থাকে তো, না কি কেবল ঘুরে বেড়ায়।'

'আমি যখন গেলাম, দোকানেই ছিল।'

'কেউ কেউ আমাকে বলেছে যে ওকে তারা রেসকোর্সে দেখেছে। ওর যদি রেসখেলার নেশা ধরে, তবে ওকে বিশ্বাস করা কঠিন। ওর উপর চোখ না রেখে উপায় নেই।' রাম চুপ করে রইল। কিন্তু জনার্দন চুপ করে রইল না। বলল, 'কথা বলছ না কেন। তুমি কি কিছু জান না ? আমার ছোট ভাই ওরট আর তোমার বাবা লচ্চ তো এই পথেই গোল্লায় গেছে। শুনেছি ওরা নাকি মৈসূরেই আছে। কেশব প্রথম প্রথম ওদের সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গ হয়ে মেলামেশা করত। এখনও ওদের মধ্যে যোগাযোগ আছে বলে শুনেছি। আমি এখন কেশবের জন্য মৈসূরের হোটেল নিয়ে চিন্তায় পড়েছি।'

কেশব সম্পর্কে রামও সন্দেহ পোষণ করে। তার চোখের সামনেই তো সে রেসখেলায় গেল, ফিরে এল ওরটের সঙ্গে, এ সব কি সে দেখেনি ? তৎসত্ত্বেও কেশবের বিষয়ে যে সব কথা জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, তার উত্তর দেওয়া উচিত নয় ভেবে বাপের সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনাগুলি সে জনার্দনকে জানিয়ে দিল।

এদিকে রাম তার দৈনন্দিন কাজে লেগে গেছে। মৈসূর ভ্রমণের কথা জানিয়ে মাকে সে চিঠি দিয়েছে বটে, কিন্তু পিতৃদেবের ঘটনাগুলি লিখতে তার মনে সংকোচ হল।

নরসিংহময়্য জনার্দনের চিঠি পেয়ে এক সপ্তাহের মধ্যে উত্তর দিয়ে জানাল, 'রামকে বেংগলুর থেকে মৈসূরের হোটেলে পাঠিয়ে কেশবকে ওখান থেকে সরিয়ে তোমার কাছে এনে রেখে দাও। এতেও যদি ওর রেসখেলার নেশা না কমে, তবে আর দরকার নেই ওকে।' তারপর দিন মায়ের কাছ থেকে রামের চিঠি এল, 'নরসিংহময়্য বললেন তুমি নাকি তোমার বাবাকে দেখতে গিয়েছিলে। কী হল, কেন গিয়েছিলে, আমাকে এবিষয়ে কিছুই জানাওনি কেন ?' রামের ভারি সংকোচ ছিল, মা যদি এবিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করে। এখন আর মায়ের

কাছ থেকে গোপন করা ঠিক হবে না ভেবে রাম সব কথা তাকে সবিস্তারে জানিয়ে দিল।

মৈসুরে গিয়ে সেখানকার হোটেলের দায়িত্ব গ্রহণের প্রস্তাবে রাম সম্মত হল না। বলল, 'আমি ওখানকার দায়িত্ব নিতে চাই না। এখানে টাকাপয়সা কমবেশি হলে আপনি রয়েছেন দেখাশোনার জন্য। ওখানে আমার একার উপরেই দায়িত্ব। তা আমি পারব না। পরে অনেক কথা উঠবে এ নিয়ে। তাছাড়া দেখুন কেশবের সঙ্গে আমার দু'দিনের পরিচয়। কাজেই আমার এই অপবাদও হবে যে আমিই তাকে সরিয়ে দিয়েছি।' জনার্দন আর পীড়াপীড়ি না করে বলল, 'ঠিক আছে, আমিই ওখানে গিয়ে এক সপ্তাহ থেকে সমস্ত ব্যাপার জেনে আসি।' এই বলে সে মৈসুর চলে গেল। গিয়ে হোটেল থেকে কেশবকে সরিয়ে দিয়ে সেই খালি জায়গায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে রামকে বসিয়ে দেওয়া হল।

এই দ্বিতীয় চাকরিতে রামের তিলমাত্র আগ্রহ নেই। তবু তাকে যেতে হল। তার কারণ আছে। জনার্দনময়্য যখন মৈসুরে, তখন রামের একটা ভালো সুযোগ এসেছিল। জনার্দনের হোটেলের কাছাকাছি এক শিক্ষিত ব্যক্তির একটি হোটেল ছিল। সেই হোটেলের মালিক অনেকের কাছেই রামের সততা, বিনয় ইত্যাদি গুণের কথা খুব শুনেছিল। তার উপরে রাম লেখাপড়া জানা ছেলে বলে সেই হোটেলমালিক রামের কাছে বলে পাঠিয়েছিল, 'তুমি জনার্দনের হোটেল ছেড়ে আমাদের হোটেলে চলে এস। আমরা তোমাকে মাসিক তিরিশ টাকা দেব।' কিন্তু সেই বেশি টাকার লোভে রাম আকৃষ্ট হল না, কারণ আজ যদি সে সামান্য গোটাকয়েক টাকার জন্য অন্য হোটেলে গিয়ে যোগ দেয়, তবে তার মায়ের পক্ষে একা গ্রামের বাড়িতে বাস করার অসুবিধা দেখা দিতে পারে। সেই ভয়ে সে বেশি মাইনের চাকরিতে গেল না। আবার ঠিক সেই কারণেই মৈসুরে যেতে তার আগ্রহ না থাকলেও শেষ পর্যন্ত তাকে সেখানকার হোটেলের দায়িত্ব নিয়ে যেতে হয়।

মৈসুর হোটেলের কাজ নতুন কিছুই নয়। গতকাল পর্যন্ত বেংগলুরে যা করে এসেছে, এখানকার 'শুচিভবন রেস্টুরেন্টে'র কাজও ঠিক তাই। এখানকার কাজ বরং হাল্কা, কারণ, দসরা প্রভৃতি উপলক্ষে যা কিছু যাত্রী সমাগম হয়। সেই সময়টা পার হয়ে গেলে এখানে বেশি কিছু ব্যবসা হয় না। ব্যবসা হোক-না-

হোক, দোকানে এসে বসলে চেয়ার ছেড়ে নড়বার অবকাশ থাকে না। বেংগলুরে কাজকর্ম তদারকের জন্য স্বয়ং হোটেলমালিক উপস্থিত ছিল। এখানে সে নিতান্তই একা। এই ভয়।

এখানে এসে কাজে যোগ দেওয়ার প্রথম দিনেই রামের জন্য অপর একটি সংকট অপেক্ষা করছিল। অপরাহ্ণে ঠিক কাঁটায় কাঁটায় পাঁচটার সময়ে লচ্ছ মহাশয় কাশতে কাশতে এসে হোটেলে প্রবেশ করলেন। রাম যে তাকে দেখে নি তা নয়। কিন্তু সেদিনকার কথা মনে হতে তাকে আদর যত্ন করা দূরে থাক তার সঙ্গে কথা বলারই প্রবৃত্তি হল না। কিছুক্ষণের মধ্যে লচ্ছ রায়ের জলযোগটি শেষ হলে তিনি বেরিয়ে এলেন। হোটেল-বয় হাল আমলের ফ্যাশান অনুযায়ী 'ছে আনা' বলে চিৎকার করে মুখে মুখে বিল বানাল। লচ্ছ খাওয়া শেষ করে বাইরে এসে পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে, রাম যেখানে বসে আছে সেই টেবিলের কাছে একটা ল্যাম্পে সিগারেটটা ধরিয়ে নিজের আগমনটুকু রামের দৃষ্টিগোচর করে যেন কিছুই হয় নি এমনিভাবে নিঃশব্দে চলে গেল। রামের ভারি হাসি পেয়ে গেল। নিজের হিসাবের মধ্যে 'ছে আনা' জুড়ে দিয়ে সে ভাবতে লাগল—পিতৃদেব যে পয়সাটি না দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেলেন ব্যাপারটা অদ্ভুত সন্দেহ নেই, কিন্তু আরও অদ্ভুত ব্যাপার এই যে, নরসিংহময়্যর যে হোটেলকে ডোবাবার জন্য সে ও ওরট মিলে 'ডিল্লি দরবার রেস্টোরেন্ট' খুলেছিল, নিজেদের হোটেল উঠে যাওয়ার ফলে এখন আবার সেইখানেই খেতে আসে।

পরদিন সকালে এসে লচ্ছ রায় পুনরায় 'ছে আনা' করে গেল। দু তিন দিন এইভাবেই কেটে গেলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে এখন এটা নিত্য পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত এবং তার মাসিক পঁচিশ টাকা মাইনে থেকে যদি 'ছে-ছে আনা'র বিল পরিশোধ করতে হয় তবে মাসের শেষে দশ-বারো টাকার বেশি হাতে আসবে না। তা না আসুক এবং পিতৃদেব যাই হোক না কেন, তার প্রতি পুত্রের আদরযত্ন ও কর্তব্য বলে কি কিছু নেই? মাকে এই ব্যাপারটা লিখে জানাতে নাগবেণী উত্তর দিল, 'যতক্ষণ রস থাকে, ততক্ষণ নিংড়োবার যন্ত্রের কী বা দয়া, কী বা করুণা!' এই উত্তর পাওয়ার মধ্যেই একদিন একটা বড় রকমের সংকট দেখা দিল। একদিন অপরাহ্ণে বৈকালিক জলযোগের জন্য লচ্ছ রায়, ওরট এবং আরও পাঁচ-ছ জন 'মহানুভব' ব্যক্তি দল বেঁধে এসে হোটেলে ঢুকে পড়ে। ওরট

আবশ্যক মতো অর্ডার দিয়ে বন্ধুগণকে আদর-আপ্যায়ন করে। জলপান শেষ হতেই হাঁক দেয়, 'সীজর্স'। হোটেলবয় যথারীতি সিগারেট নিয়ে আসে। সিগারেটগুলি অর্ধদগ্ধ না হওয়া পর্যন্ত হোটেলে বসেই আড্ডা মেরে একে একে উঠে পড়ে। মুখের বিলে ঘোষণা হয়, 'সওয়া রুপিয়া।' পালের গোদা ওরট দলের দিকে আঙুল দেখিয়ে সিঁড়িতে গিয়ে পা দিল। পিছনের লোকগুলি নির্বিকার দৃষ্টিতে রামের দিকে তাকাতে তাকাতে দিব্যি বেরিয়ে গেল! কয়েকদিনের মধ্যে 'ছে-আনা' গুলি এবং 'সওয়া রুপিয়া' মিলে আট-দশটাকার বেশিই হয়ে গেল। সেই সন্ধ্যার বেদনা রামের পক্ষে খুব মর্মান্তিক হয়ে উঠল। দুঃখী মায়ের জন্য সে এখানে দাসত্ব বৃত্তি করে যে সামান্য কটি টাকা উপার্জন করে, সেই টাকা কটিকে মায়ের মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে ক্রুর ব্যাঘ্রের মুখে দিতে হবে নাকি? বাবা যদি একা আসে এবং একটা ন্যায়সংগত সীমার মধ্যে তার বিল ওঠে, তবে রাম তা পরিশোধ করতে প্রস্তুত। তা না হলে তাকে শক্ত হতে হবে। এই একসপ্তাহের অভিজ্ঞতায় বাবার মুখখানি দেখবার আকাঙ্ক্ষা ও কৌতূহল ভস্মীভূত হয়ে রামের মনে একটা নিদারুণ ঘৃণার ভাব জেগে উঠল।

পরদিন সকালবেলা লচ্চ ও ওরট একসঙ্গে এসে উপস্থিত। যথারীতি খাওয়া শেষ করে সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে, 'ছে আনা'র বিল করে বেরিয়ে যাচ্ছিল। কাউন্টারের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে রাম মুখ নীচু করে বলল, 'ছে আনে'। এই মৃদু আওয়াজে কেউ থামল না। যেন শুনতে পায়নি এইভাবেই দুজনে বাইরের দিকে পা বাড়ালে রাম রেগে গিয়ে হোটেলবয়দের ডেকে বলে উঠল, 'ডাক তো ওদের দুজনকে, কাউন্টারে পয়সা দিয়ে যায়নি।' এই প্রথমবার রামের চোখ গরম হল, গলা রুক্ষ ও কঠিন শোনাল। হোটেলের কর্মচারীরা গিয়ে তাদের পথ আটকাতেই ওরট অপমানিতের মতো বলে উঠল, 'দেখুন মশাইরা, আজকালকার ছেলে-ছোকরাদের দেখুন। এই লোকটি এর বাবা। বাপকে এক ফোঁটা কফি দিয়ে চাকর দিয়ে আটকে রেখে টাকা আদায়ের যুগ এটা!' এই বলে ব্যঙ্গভরে অট্টহাস্য করে উঠল ওরট। এদের কোলাহলে হোটেলের বাকী খদ্দেররা বিস্মিত হয়ে রামের মুখের দিকে তাকাল এই অবস্থায় আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই বলে রাম কর্মচারীদের বলে দিল, 'কাল থেকে এদের দুজনকেই বলে দিও—এখানে কফি-টফি মিলবে না, বুঝলে?' ওরট আরও খানিকটা উত্তপ্ত হয়ে রামকে ভৎর্সনা করে বেরিয়ে যেতে

যেতে বলল, 'তোমার জন্ম সার্থক হল বাবা, তোমার জন্মই সার্থক।' উপস্থিত সকলের মধ্যে এইরূপ একটা গুজু গুজু আলোচনা চলছিল, লচ্চ তবে এই নতুন হোটেল ম্যানেজার রামবাবুর বাবা। লজ্জায় অপমানে রামের আর মুখ লুকোবার জায়গা রইল না।

সেদিন সারারাত রাম আর চোখের পাতা এক করতে পারল না। সমস্ত মান-মর্যাদা খোয়ানো এই বীরপুরুষ ড়ুটি কাল সকালে আবার কী কাণ্ড ঘটাবে, সেই আতঙ্কে রাম কাঠ হয়ে গেল। পরদিন সকালে সাত, আট, সাড়ে আট, নয়•••রাম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। অপরাহ্লে মাকে চিঠি দিয়ে সকল কথা জানিয়ে শেষে লিখল, 'মা, টাকা পয়সার জন্য আমার দুঃখ নেই। কিন্তু সকলের সামনে এই কথাটা জানিয়ে দেবার দরকার ছিল কী যে আমি সেই পুণ্যাত্মার পুত্র ? হয়ত জন্মদাতা পিতার সেটা স্বাভাবিক অধিকার।'

হোটেলের চোরা-চোখ দিয়ে হোটেলের এই নতুন বৃত্তান্ত বেংগলুরে মালিকের কানে পৌঁছে গেল। খবর পেয়েই মালিক এসে হাজির। কিন্তু জনার্দনময়্য যখন দেখল যে রাম তার বাপ ও দলবলের খরচের পয়সাটা মালিকের হিসাবে না ঢুকিয়ে তার নিজের হিসাবেই লিখে রেখেছে তখন খুশি হয়ে মনে মনে বলল, 'যাই হোক. ছেলেটা মোটেই তার বাপের মতো নয়। খুব সৎ, খুব বিশ্বাসের পাত্র।' মালিক তৃপ্তিলাভ করে ফিরে গেল বটে, কিন্তু রামের মনে অতৃপ্তির শেষ নেই। এই চাকরি মানে বিশ্রামবিহীন দাসত্ব. নিরানন্দ খাটুনি। তাছাড়া, আর কতকাল সে মায়ের কাছ থেকে এমনিভাবে দূরে পড়ে থাকবে ? এমন সময়ে মায়ের পত্র এল, 'বাবা, কোডিগ্রামের এই আশ্রয় আমার কাছে স্বর্গতুল্য। শ্বশুরমশাই শেষ জীবনে আমার জন্যই এই বাড়ি তৈরি করেছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর ছেলেকে অবিশ্বাস করলেও একমাত্র আমার মুখের দিকে তাকিয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। এই জীবনে তাঁর আর কোনো আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবার ক্ষমতা আমার নেই, কিন্তু তাঁর স্নেহের ঋণ কি ভুলে যাওয়া উচিত ? যতদিন তাঁর স্মৃতিচিহ্ন—তাঁর হাতের তৈরি এই বাড়ি এখানে থাকবে, ততদিন আমার পক্ষে কোডিগ্রাম ছেড়ে বাইরে গিয়ে থাকা সম্ভব নয়।'

মায়ের চিঠি পেয়ে রামের বেংগলুর ছেড়ে বোম্বাই যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হল। এই তো নভেম্বর মাস এসে গেছে। ডিসেম্বর মাসেই সে বোম্বে গিয়ে পৌঁছবে।

হাতে একশ টাকার মতো সঞ্চয় থাকা প্রয়োজন। নতুন জায়গায় গিয়ে চেষ্টাচরিত্র করতে হবে। কপালে যদি চাকরি যোগ থাকে, তবে সে ওখানেই থাকবে। যেমন করে হোক, মাকে সুখে রাখা দরকার।

ডিসেম্বর এল বটে, কিন্তু একশ টাকা জমা হল না। অল্প করে হলেও মাকেও কিছু পাঠাতে হচ্ছে। কিন্তু বোম্বাই যাত্রা আর কোনোক্রমেই পিছিয়ে দেওয়া চলে না। এখন সবচেয়ে বড় অসুবিধা হল মালিক জনার্দনময়্যাকে ব্যাপারটা জানিয়ে দেওয়া। রাম সোজাসুজি না জানিয়ে মাকে চিঠি লিখল যে সে শীগ্‌গিরই মৈসুর থেকে চলে যাবে। নাগবেণীর কাছে সেই খবর শুনে নরসিংহ লিখল জনার্দনের কাছে। দাদার চিঠি পেয়ে জনার্দন মৈসুরে এসে বলল, 'ব্যাপার কী রাম? কী কারণে তুমি চলে যেতে চাইছ? খাওয়া দাওয়া ছাড়া পঁচিশ টাকা কি তোমার পক্ষে যথেষ্ট নয়? তোমার জায়গায় চট্‌ করে আর একটা লোক খুঁজে পাওয়া কি সম্ভব? তুমি থাকবে বলেই তো কেশবকে পর্যন্ত তাড়িয়ে দিলুম।' রাম জানাল যে তার পক্ষে আর এই বিশ্রামহীন উদয়াস্ত খাটুনি সম্ভব নয় এবং এভাবে চাকরি করে, কোনোদিনই সে তার নিজের বাসা তৈরি করতে পারবে না। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই সে বোম্বে যাচ্ছে যদি মাকে সঙ্গে নিয়ে থাকার মতো একটা আশ্রয় জুটে যায়। রাম একথাও জানিয়ে দিল যে মালিকের সঙ্গে তার কোনো অসদ্‌ভাব নেই, তাদের আচার ব্যবহারের জন্য বরং সে কৃতজ্ঞ।

ক্রিসমাসের ছুটিতে বোম্বাইগামী রেলগাড়িতে বেজায় ভিড়। ভিড়ের মধ্যে রাম একা। গাড়িতে তিলার্ধ জায়গা নেই, একটু চোখের পাতা এক করবারও সুযোগ নেই। রওনা হওয়ার বেশ কিছু আগেই সে মাদ্রাস চিঠি দিয়ে মেসোমশাইকে দিয়ে বোম্বাইর কয়েকজন বন্ধুকে পত্র লিখিয়েছিল। বোম্বে পৌঁছে এই শহরের বাড়িঘর, পথঘাট, মঠমন্দির, জনস্রোত প্রভৃতি দেখে তার মনে হল মাদ্রাসের তুলনায় বোম্বাই সত্যই মহানগরী। এই নাগরিক জীবনে এসে যোগ দিয়ে সে নিজেকে বোধ করল তার দেশের সমুদ্রসৈকতে বিস্তৃত অসংখ্য বালুকণার একটি কণারূপে। তা বলে নিরাশ হওয়া চলবে না। এত লক্ষ লক্ষ লোকের মুখে অন্ন জোগাচ্ছে যে নগরী সে কি আর তার মতো একজন সামান্য অন্নপ্রার্থীকে পথ দেখাতে পারবে না? আশার কথা এই যে এখানে তার দেশের লোকের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়।

মৈসূর থেকে আসা রামের জন্য 'দাদরু' (দাদ্‌রা) রেলস্টেশনে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়েছিল মারুতি রায়। পরস্পরকে চেনে না তারা। মাদ্রাসে মাধব মেসোমশাই যে রঙের কোম্পানিতে কাজ করে সেই কোম্পানিরই বোম্বাই অফিসের কর্মচারী মারুতি রায়। তাছাড়া মারুতি রায়ও মাধব ও রামের মতো কন্নড জেলার লোক। রামকে দেখে ভারি খুশি হল সে।

মারুতি রামকে সঙ্গে নিয়ে একটি কুলির মাথায় রামের বিছানা ও ছোট বাক্সটা চাপিয়ে দিয়ে তাদের মাতুঙ্গার আস্তানায় হেঁটে এল। দালানের সিঁড়ি ভেঙে দোতলায় এসে দরজা খুলতে রামের চোখে পড়ল তাদের কোডিগ্রামের বাড়ির বারান্দার মতো একটা জায়গা। তারই মধ্যে রান্নাঘর, বাথরুম, বৈঠকখানা ও শোবার ঘর। 'আপাতত আমার স্ত্রী এখানে নেই। পোয়াতি কিনা, ছোট ছেলেকে সঙ্গে দিয়ে দেশের বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছি। বড় ছেলেটি আমার সঙ্গে থাকে। রান্না বান্নার পাট নেই। ডাব্বায় করে খাবার আনাই। কোনরূপ সংকোচ না করে আমরা যেমন আছি তেমনি থাকুন।' এইরূপ সাদা মাটা কথায় মারুতি রামকে অভ্যর্থনা জানাল।

মারুতির স্ত্রী যতদিন না আসে, ততদিন রাম তার সঙ্গেই থাকতে পারবে। ছোট্ট হলেও সুন্দর পরিচ্ছন্ন ঘরখানিতে মারুতি যেমন মিতব্যয়ী হয়ে জীবনযাপন করে, রামও সেইভাবে শুরু করে দেয়। রামের জন্য মারুতি অফিস থেকে একদিনের ছুটি নিয়েছিল। পরদিন থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত মারুতিকে পাওয়া যায়, আর দেখা হয় সন্ধ্যাবেলায়। মারুতির বড় ছেলে রামের মাসতুতো ভাই আনন্দের বয়সী। ইস্কুলে পড়ে। কাজেই পিতাপুত্র দুজনেই বেরিয়ে গেলে রামই বাড়ির একমাত্র পাহারাদার।

মারুতি রামের বোম্বাই আসার উদ্দেশ্য মাধবের চিঠিতে আগেই জানতে পেরেছিল। তাই রাম যেদিন এসে বোম্বাই পৌঁছয়, সেদিন আহারাদির পরে, মারুতি রামকে বলেছিল, 'এখানে আমার চেনা পরিচিত লোক বেশি নেই। আমাদের জীবন এই কুঠুরির মতোই ছোট্ট জীবন। দৌড়োদৌড়ি যা কিছু বাড়ি আর আপিস, আপিস আর বাড়ি। রবিবার এলে দু' একজন বন্ধুবান্ধবের মুখ দেখা যায়। বাকী দিনগুলিতে মনে হয় এই বিশাল জনসমুদ্রের মধ্যে আমিও রয়েছি—এই ভেবেই আনন্দ। আপনি একটা কাজ করবেন। উপরতলায় একটা ঘরে আমাদের দেশের কয়েকজন বন্ধু থাকে। তাদের অনেকেই কিছু-না-

কিছু কাজ করছে। আবার বেকারও আছে। কোথায় কোথায় ঘুরলে আপনার সুবিধা হতে পারে একথা ভাল ওরাই বলতে পারবে।'

রাম চুপ করে শুনছিল। তার তো শোনাই কাজ। নতুন জায়গা, কিছুই জানা নেই। ভাগ্যপরীক্ষার জন্য এসেছে, একবার ভাগ্য পরীক্ষা করে দেখবে।

সেই রাত্রিতেই উপরতলার Friends' Room নামে সাম্যবাদীদের মতো বোর্ডলাগানো একটি ঘরে মারুতি রামকে ডেকে নিয়ে গেল। সংসারী মারুতির কোঠা এবং সংসারবিহীন এই বন্ধুদের কোঠার পার্থক্য সুস্পষ্ট। চারদিকে চারটে দেয়াল আছে বলে এই কোঠার নাম হয়েছে Room, আসলে একটি একটি চিড়িয়াখানা। রাম ও মারুতি যখন গিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকল, তখন ছ-সাত জন লোকের মধ্যে তিনজন বিছানা পেতে শুয়ে আছে, দু'জন রাজনৈতিক তর্কে নিমগ্ন, একজনের কণ্ঠে স্বরের খেলা, আর একজন জানালা দিয়ে নীচে রাস্তার দিকে তাকিয়ে বোধকরি ধাবমান মোটরগাড়িগুলির হিসাব নিচ্ছে। মারুতিকে দেখেই একজন বলে উঠল, 'হেল্লো!' মারুতি বলল, 'ইনি আমাদের জেলার লোক। আমাদের মতোই বোম্বাই এসেছেন ভাগ্যান্বেষণে। এঁর মেসো আমার বিশেষ বন্ধু. সেই সূত্রেই পরিচয়।' এই বলে মারুতি একজনকে নাম ধরে ডেকে বলল. 'দেখো ভাই শঙ্কর, ইনি তোমার স্পেশাল চার্জে থাকবেন।'

শঙ্কর রায় নামধারী ব্যক্তিটি শুয়ে ছিল। চার্জ বুঝে নেবার জন্য আধখানা উঠে ঠেস দিয়ে, ওইভাবেই সিগারেট ধরিয়ে, আগন্তুক রামকে একটি সিগারেট অফার্ করে, তাকে বসতে বলল। মারুতি তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা শঙ্কর, তোমাদের পদ্মনাথের কাজ জুটেছে? মিত্‌সুইদের ওখানে গিয়েছিল তো?'

শঙ্কর বলল, 'তাকে ওরা চল্লিশের বেশি বেতন দেবে না।'

'ও গ্রাজুয়েট নয়?'

'গ্রাজুয়েট কেন, গ্রাজুয়েটের বাপেদেরও ওই বেতন। বোম্বাই এখন মাদ্রাস হয়ে গেছে।'

মারুতি শঙ্করের আরও কাছে এগিয়ে বলল, 'দেখো বাবা, বড় গরীবঘরের ছেলে। কী সব ভেবেচিন্তে এখানে এসেছে। আমি বেশি কোনো আশা দিইনি। তবে আমরা যথাসম্ভব চেষ্টা করব।' সেদিনকার আলাপ পরিচয়

সেখানেই শেষ হল। রাম যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল, শঙ্কর উঠে জিজ্ঞাসা করল, আপনার নাম?'

'রাম।'

'রাম হোয়াট্?'

'রাম রাও, রাম ঐতাল, যে ভাবে খুশি বলতে পারেন।'

'ঠিক আছে, রাম রাও। আপনার যখনই সময় হবে, আসবেন এখানে।'

সেদিন থেকে রাম Friends' Room-এর সদস্য। মারুতি রায়ের স্ত্রী দেশ থেকে ফিরে এলে রাম নিজেও এই দলের একজন হবে। এরা সব দিলখোলা সদানন্দ ইয়ার বন্ধু। সকলেই শিক্ষিত যুবক। লেখাপড়া শেষ করে বোম্বাই শহরে চাকরি খুঁজে বেড়াচ্ছে। কেউ কেউ বা তিন-চার মাসের জন্য টেম্পোরারি কাজ পেয়েছে, কেউবা পনেরো দিন অন্তর এক অফিস ছেড়ে আর এক অফিসে ঢুকে পড়ে। যে যাই করুক না-করুক, তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল এই যে, ক্যাপিটালিজম্ দূর না হলে হিন্দুস্থানের মঙ্গল নেই। এই একটি মাত্র লক্ষ্যই সকলকে এক সূত্রে গেঁথে রেখেছে।

প্রত্যহ রাতে তাদের কাজ হল, বিড়লা-বাজাজ, বালচন্দর হারুনকে এক নাগাড়ে গালিগালাজ দেওয়া। পরদিন সকালেই দরখাস্ত হাতে নিয়ে সারা বোম্বাই শহর টহল দিয়ে বেড়ায়, করিমভাই ফার্মে কাজ আছে? মিত্সুইতে হবে? কিলিক নিকসন? আর্মি এ্যাণ্ড নেভি স্টোর্স? এইভাবে একটার পর একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে, ব্যাঙ্কে, ইন্সিওরেন্স কোম্পানিতে চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। কয়েকদিনের জন্য কারও চাকরি হয় তো ভালই, তারজন্য চেষ্টা করবে সকলেই। আটজন লোকের খাওয়া চলে তিনটে ডাব্বার অন্ন দিয়ে। তাই দেখতেও তারা প্রত্যেকে একটি পুরো মানুষের তিন-আট অংশ। অন্নের চেয়ে তাদের প্রধান খাদ্য চা ও কফি। তাও তৈরি হয় মস্কো পদ্ধতিতে ফ্রেণ্ড্স্ রুম পরিচালিত 'সামুদায়িক' রন্ধনশালায়। তাদের একমাত্র 'লাক্সারি' সিগারেট। অবশ্য তাদের বৈঠকে অনেক আগেই এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে বোম্বাইয়ের আবহাওয়ার পক্ষে সিগারেট আর 'লাক্সারি' নয়, জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ।

পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারে তাদের অদ্ভুত সাধর্ম্য। অপরাহ্ণে অফিস থেকে ফিরে এলেই সকলের পরনে খাদি কুরতা আর পাঠানদের মতো পায়জামা।

ভোর বেলায় আপিসে যাওয়ার সময় হলে কড়া ইস্তিরির প্যান্টশার্ট আর বুরুশ করা চকচকে বুট। আবার সমস্ত রাত ধরে জেলের কয়েদীর মতো অতি সামান্য পরিচ্ছদ। তবু যে তারা সকলেই সুখী তা কিন্তু অন্নের জন্য নয়, কেবল কথার জন্য। কী রকম কথা? না, সারা পৃথিবী থেকে ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌ দূর হয়ে গেলে পরবর্তী স্বর্ণযুগের বিচার বিবেচনার কথা। তারা এই মধুর স্বপ্নলোকের অধিবাসী। এহেন বন্ধুদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকা রামের পক্ষে কষ্টকর নয়। বোম্বাইতে কোনো বেকার যুবকের 'লাল' হয়ে যেতে তিন সপ্তাহের বেশি সময় লাগে না। রাম তো এখানে আসার আগেই 'লাল' হয়ে গেছে।

দু'এক সপ্তাহের মধ্যে শঙ্করের নেতৃত্বে রাম অনেকগুলি আপিসের সুলুক-সন্ধান পেয়ে গেল। শঙ্কর বলল, 'রাম রাও, এই বোম্বাইতে ট্রাম ও ট্রেন এই দুটির খরচ যদি না থাকত, তবে একমাসের খরচে দিব্যি তিন মাস চলে যেত। 'নো ভেকান্সি', 'সার প্লিজ' কেবল এই সুশ্রাব্য সংগীতটুকু শোনার জন্য ট্রাম কোম্পানিকে ট্যাক্‌সো দিতে হবে। মাসে অন্তত আটটি টাকা এই অলক্ষুণে ব্যাপারের জন্য দরকার। আমার এখানে মাসে কেবল কুড়িটি টাকার গ্যারান্টি থাকলে আমি শাশ্বতকাল এইভাবেই থাকতে পারি। কিন্তু এই কুড়িটির মধ্যে আটটি টাকা যদি ট্রাম ও ট্রেন খেয়ে ফেলে, তবে চলবে কী করে?'

দলের মধ্যে শঙ্করই বয়স্ক। সে বোম্বাই এসেছে আজ সাত বছর। এই দীর্ঘ-কালের মধ্যে অর্ধেককাল তাব বেকার দশায় কেটেছে। যখন চাকরি পায়, তখনকার টাকা দিয়ে বেকার হয়ে থাকার দিনগুলি চালিয়ে নেয়। ওদের ফ্রেণ্ড্‌স্‌ রুমের সদস্যদের মধ্যে শঙ্করের মতো অভিজ্ঞতা কারো নেই।

শঙ্কর মাঝে মাঝে রামকে নিয়ে নানা অফিসে যাতায়াত করে, যেখান থেকে শঙ্কর বরখাস্ত হয়েছে সেখানেও, অথবা যেখানে ঝগড়া করে চাকরি ছেড়ে দিয়েছে সেখানেও। আপিসে যাওয়ার মতো পোশাক রামের ছিল না বলে বাধ্য হয়ে তাকে বুট, প্যান্ট কিনতে হয়। পূর্ণ বিশ্বাসে সে নানাস্থানে ইন্টারভ্যু দিয়ে আসে।

অনেক ঘাটের জল খেয়ে শঙ্করের এখন একটি মাত্র আশা—সিনেমা। সিনেমার জন্য সিনেরিও লেখে। লিখে লিখে বিভিন্ন সিনেমা কোম্পানির ঠিকানায় পাঠিয়ে দেয়। পাঠাবার কিছুকাল পরেই ফেরত পায়। দু একবার তারই লেখা

গল্প চুরি করে ওরা যে ছবি করেছে তাই দেখে ক্রুদ্ধ হয়। এই হল তার মুখ্য কাজ। তার কাছে বোম্বাই ও কলকাতার যাবতীয় চিত্রতারকাদের চিঠিপত্র মজুত আছে। বিনিময়ে তাদের কাছে সে তার নানা ভঙ্গীর ফোটো পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু শঙ্করের দুঃখ এই যে, একটা ডাইরেকটারেরও বুদ্ধি জোগাল না তার প্রতিভার পরিচয় নিতে। স্বাধীনতা লাভের পরে ফ্রেণ্ড্‌স্ রুমের বন্ধুদের হাতে ক্ষমতা এলে প্রথমেই যাদের শূলে চড়ানো হবে তাদের তালিকায় সমস্ত ক্যাপিটালিসট্‌দের সঙ্গে সিনেমা পরিচালকদেরও যোগ করা হবে বলে একটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পাচ হাজার টাকা মাসিক বেতনধারিণী সিনেমা-রানীদের সম্পর্কে কী করা হবে এ সম্পর্কে তরুণ বীরপুরুষের দল বিমূঢ়। অত বেশি বেতন পেয়ে ধীরে ধীরে তারা ক্যাপিটালিস্‌ট হয়ে উঠবে ঠিকই, কিন্তু নারীজাতির উপর হাত না তোলার অজুহাতে এখনও কোনো সিদ্ধান্তে আসা যায় নি। তাছাড়া, নটীরা সকলেই অবিবাহিতা থাকার ফলে বন্ধুদের বিচার-বুদ্ধিতে আরও বেশি জট পাকিয়ে গেল।

রামের কাছে এই ফ্রেণ্ড্‌স্ রুমটি যেন মানব জীবনের একটি ক্যারিকেচার মাত্র। রামের বুঝতে বাকী রইল না যে বন্ধুদের এই যে আবেগ-উচ্ছ্বাস, উগ্রপন্থার প্রতি অনুরাগ—এ সব আর কিছুই নয়, তারুণ্যের শক্তিক্ষয়কারী নৈরাশ্যপূর্ণ বেকারীর ফল।

বোম্বাই এসে প্রথম দিনটিতে সামান্য পোশাকেই রাম বন্ধুদের মন্দিরে পা দিয়েছিল। চাকরির ইণ্টারভিউর জন্য যা অপরিহার্য, সেই বুট-প্যাণ্ট-কোট তৈরি করতে তিন দিন সময় লেগে গেল। নানা অফিসের দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে একদিন সন্ধ্যাবেলায় স্যুট পরিহিত রাম যখন শঙ্করকে খুঁজতে এসে অত্যন্ত সলজ্জভাবে বন্ধুদের কামরায় প্রবেশ করল, তখন সেখানে একটা হৈ হৈ রব উঠল। 'রামু, মাপ করবেন, রাম রাও, এই পোশাকে আপনাকে ঠিক সিনেমা-স্টারের মতো লাগছে! হী-স্টার্! ওখানেই আপনার চান্স হবে, নিশ্চয়ই হবে। এমন সুন্দর পার্সোনালিটি যদি আমাদের থাকত, তবে কবেই মিস্ সুবর্ণাদেবীর গললগ্ন হতে পারতাম! কিন্তু রাম রাও, চেহারার সঙ্গে আপনার আর একটি যোগ্যতা থাকা চাই যে!...চিঁহি চিঁহি...'

'চিঁহি চিঁহি?' কথার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করল, 'এর মানে কী?'

দলের মধ্যে অতি সিনেমানুরাগী গঙ্গাধর বলে উঠল, 'ম্যুজিক! রাম রাও প্লাস্ ম্যুজিক ইজ্ ইকোয়াল্ টু এ ওয়ান্ সিনেমাস্টার্।' এখন সংগীতবিদ্যা প্রদর্শনের সময় নয় বলে রাম চুপ করে গেল।

সেদিন থেকে দিনে অন্তত একবার করে গঙ্গাধর রামকে উপদেশ দিয়ে বলত, 'আজ আঁধেরী যাও, আজ আর একটা স্টুডিও ছাখো।' যেদিন গঙ্গাধরের উদ্দীপনা বেড়ে যায় সেদিন সে সিগারেট টানতে টানতে গান ধরে দেয়, 'তুমনে মুজকো প্রেম শিখায়া।' আর মাঝে মাঝে সিনেমাজগতের খবর দিয়ে বন্ধুমণ্ডলীকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। বলে, 'মিস্টার, আজ একটা নতুন খবর আছে। সেই ব্লাডি মিস্ চন্দ্রকান্তা সত্যি নাকি চার সন্তানের মা! আর মজা দেখ, আমার চিঠিগুলির সে জবাব পর্যন্ত দিল না। কেবল কী তাই? আমার ফোটো পাঠানোর প্রতিদানস্বরূপ মর্যাদা ও সৌজন্যের খাতিরে তার কি উচিত ছিল না একখানি ফোটো পাঠিয়ে দেওয়া?' তার দুর্দশায় সকলেই হেসে ওঠে, তার নিরাশায় সহানুভূতি প্রকাশ করে।

আর একদিন এসে গঙ্গাধর বলে, 'শঙ্কর, গুড নিউস্ টু-ডে! তোমার সিনেরিও নিয়ে যার কাছে ছ বার গিয়েছিলে আঁধেরীতে, সেই ডার্টি ডাইরেক্টর নাথোরাম—মানে, তার কোম্পানি 'সেন্ট্রাল আর্ট প্রোডাকশন' নাকি লিকুইডেশনে গেছে। আমার শোনা কথা যদি সত্য হয়, তবে সারা বোম্বায়ের প্রড্যুসিং কোম্পানিগুলি দেউলে হতে হতে আর কুড়ি বছর পরে একটি ক্যাপিটালিস্ট্ ব্যাঘ্রও বাকি থাকবে না!'

এই মুখরোচক কথাবার্তা, রাজনৈতিক আলোচনা, ফাঁকে ফাঁকে সিগারেটের ধোঁয়া সবই হাল্কা হয়ে উড়ে যায়। মাঝে মাঝে গঙ্গাধরের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে গানের কলি—'বাজাও প্রেমকী বান্সুরী।

একদিন কথা বলতে বলতে গঙ্গাধর ও শঙ্কর দুজনের মাথায় একটা ফন্দি এসে গেল। গঙ্গাধর সুকণ্ঠ, কিন্তু সুরূপ নয়। একটা ক্যাপিটালিস্ট সিনেমা ডাইরেক্টর তাইতো বলে। যদিও গঙ্গাধর তার সঙ্গে একমত হতে পারেনি। কথার মাঝখানে শঙ্কর বলে উঠল, 'এই গঙ্গাধরের গলার উপর যদি রামের মুণ্ডটি বসিয়ে দেওয়া যেত, তাহলে আমাদের ফ্রেণ্ডস্রুমের মাসিক আয় হত কম-সে কম দুটি হাজার টাকা। তার থেকে আমাদের প্রত্যেকেরই গড় উপার্জন হত আড়াইশো টাকার মতো নয় কি?'

কথাটার তাৎপর্য বুঝতে না পেরে রাম জিজ্ঞাসা করল, 'কী বললেন আপনি ?'

'বলছিলাম কী, গঙ্গাধরের আছে গলা, তোমার আছে চেহারা। এই দুটি যুক্ত হলে একটা সিনেমা স্টার হতে পারত।'

রাম বলল, 'কেন, আমার কি গলা নেই ?'

শঙ্কর বলল, 'তোমার গলা নিয়ে কী করবে ? তাতে কী দড়ি দিতে হবে ? সিনেমায় চিৎকার করার মতো কণ্ঠ থাকা চাই, খালি কণ্ঠ নয়। আমাদের গঙ্গাধর যেমন বলে চিঁহি চিঁহি করবার কণ্ঠ চাই। তোমার কী গানের চিঁহি চিঁহি আসে না কি ? 'তুমনে মুজকো প্রেম শিখায়া' আসা চাই—তবে গিয়ে সিনেমা।'

সকলেই হো হো করে হেসে উঠল। রামের মুখেও মৃদু হাসি দেখা দিল। সে বলল, 'সিনেমায় ঘোড়ার প্রেমের জন্য আবার চিঁহি চিঁহি চাই নাকি ? তা আমি পারি না। তবে গাইতে আমি জানি।'

শঙ্কর আশ্চর্য হয়ে গেল ! 'কী ব্যাপার ? রামু গাইতে জানে ! কোন্ জাতের গান ? তামিলদের তা-রে-না-না ? ভিখারিদের 'অংভিপংভার' ? না কি, কালোয়াতদের রে-নে-না-না-না ?'

গঙ্গাধর আরও আশ্চর্য কণ্ঠে বলল, 'রামু গাইবে গান ? কী গায়ন তোমার বলো। রিডমাশয়রে য়্যে-য়্যে-য়্যে...য়্যো-য়্যো...তাই না কি ?'

'না, তা নয়। আমার গান অন্য ধরনের। গানের চেয়ে বেহালা বাজনাতেই আমার ঝোঁক বেশি। কিন্তু 'তুমনে মুজকো প্রেম দিখায়া' না কি—ওসব পারব না।'

সিনেমাসংগীতের দিকে রাম কখনো কান দেয়নি। আবার সংগীত-শাস্ত্রের ডলাই-মলাই যাকে বলে কালোয়াতি গান—তাও তাকে তৃপ্তি দিতে পারে না। এই যার রুচি, তাকে কি তৃপ্তি দেবে প্রেমের নাকি সুর ?

সেদিন সন্ধ্যায় রামকে দিয়ে গান না গাইয়ে ছাড়ল না। শঙ্কর খুব উৎসাহিত। রাম যখন গাইতে পারে, তখন এখানেই খোলা হোক 'কম্যুনিস্ট্ স্কুল অফ ম্যুজিক'। রাত দশটা হলেও সারা মাতুঙ্গা এলাকা তোলপাড় করে রামের জন্য একটা বেহালার ব্যবস্থা করা হল। বেহালা না আসা পর্যন্ত গঙ্গাধরের ফতোয়া শোনা গেল—'এই যে বেহালা, বীণা ইত্যাদি প্যানপেনে বাদ্য—খাঁটি অর্কেস্ট্রায় ওগুলোর স্থান নেই। স্থান যদি দিতেই হয় তবে পিছনের সারিতে,

সামনের সারিতে নয়।' ওখানে গঙ্গাধরই শ্রেষ্ঠ আর্ট ক্রিটিক। সে স্থির জানে তার ঘরখানি হল প্যারিস নগরী এবং সে স্বয়ং কলা রসিক-চূড়ামণি। তার মতামত প্রকাশে কোনো দ্বিধার ভাব নেই। সে যখন বলে, একেবারে চূড়ান্ত কথা বলে। গঙ্গাধরের ফতোয়া জারীর মিনিট খানেকের মধ্যেই বেহালা এসে হাজির। রাম তখনও মৃদু মৃদু হাসছে। গঙ্গাধরের মতামত, কথাবার্তা সবই তার কাছে কৌতুকপ্রদ। সেই কথাবার্তায় সারপদার্থ কিছু থাক বা নাই থাক, পাগলামি পুরা মাত্রায় থাকে।

হাসিমুখে বেহালাটা তুলে নিয়ে রাম তারের উপর বেহালার ছড়টা দু' একবার বুলিয়ে নিল। রামের হস্ত সঞ্চালন দেখে মনে হচ্ছিল ওটা বেহালা নয়, সেতার, সেতার নয় জলতরঙ্গ, তার কোনোটাই নয়, বোধকরি অন্য কোনো যন্ত্র। বন্ধুরা সকৌতুক সন্দেহে রামের চাল চলন লক্ষ্য করছে।

ক্রমে ক্রমে বেহালার তার থেকে মধুর স্বর যেন বিন্দু বিন্দু ঝরে পড়ল, তারপরে ধীরে ধীরে সেই সুর-মাধুরী শিলাখণ্ডের উপর ঝরেপড়া ঝরনার হাসির মতো চারিদিকে গড়িয়ে ছিটিয়ে ছড়িয়ে গেল। আবার সেই হাস্যময় সুর-নির্ঝর আপনখাতে নিরুদ্ধ না থেকে উচ্ছ্রিত, উদ্বেল হয়ে প্রবহমানা তরঙ্গিনীর মতো উচ্ছুসিত হয়ে উঠল। এতক্ষণের মাধুর্য, হাস্য, উচ্ছ্বাস, বিস্তার ও প্রবাহের পরে হঠাৎ গভীর প্রশান্তির সুর। যে সুরলহরীর সূচনা চঞ্চল হাস্যোচ্ছ্বাসে, তার অবসান নিবিড় বেদনার গাম্ভীর্যে। অর্ধনিমীলিত চোখে রাম বেহালার চলমান ছড়ের দিকেই তাকিয়েছিল। মুহূর্ত মধ্যে গানের মেজাজ বদলে গেল। তারের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছে ধিক্কারের ধ্বনি। অন্তরের বন্দীবেদনাগুলি যেন অগ্নিশিখার লেলিহান জিহ্বার মতো মুক্তি পেয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। চরম অভিব্যক্তির পরে, মৃত্যু যেমন জীবনকে নির্গলন করে, তেমনিভাবে বেহালার একটিমাত্র সুদীর্ঘ তান গানের উপর অন্তিম ছেদ টেনে দিল।

ধীরে ধীরে বেহালাটি রেখে রাম সেখান থেকে উঠে সোজা তার ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। বন্ধুরা বহুক্ষণ পর্যন্ত তার অপেক্ষায় নিঃশব্দে বসে রইল। দু'একজন তাকে খুঁজতে গিয়ে দেখল মারুতি তার ঘরে বসে এখনও পড়াশুনোয় ব্যস্ত এবং রাম ততক্ষণে গভীর নিদ্রায় অভিভূত।

এবারে শ্রোতারা সকলেই নিঃশব্দ। খানিক পরে কেবল শঙ্কর বলে উঠল,

'এমন গান জীবনে শুনিনি ভাই। ওর এই গানের পরে আমাদের এই জীবন-যাপন যেন মিথ্যা অভিনয় বলে মনে হচ্ছে।' এই ঘটনার পরে অনেকদিন পর্যন্ত রামের সামনে গঙ্গাধরের মুখে 'তুমনে মুঝকো' গানখানি আর শোনা গেল না।

বন্ধুরা প্রায় প্রত্যহই জিজ্ঞাসা করে, 'রামু, আবার কবে শুনব তোমার গান?' রাম জবাব দেয়, 'আবার যেদিন মন হবে।' ওরাও জানে এমন গান ফরমাইশ দিয়ে শোনা যাবে না। আগে আগে রামের প্রতি বন্ধুদের মনে যে একটু স্নেহপূর্ণ করুণার ভাব ছিল, এখন তা পরিপূর্ণ শ্রদ্ধায় পরিণত হয়েছে।

কিন্তু তাতে কী হল? তাদের সকলের প্রীতি ও শ্রদ্ধা পেয়েও রাম এখনও তার বেকার সমস্যার কোনো সমাধান পেল না। বোম্বাই এসেছে আজ দু'মাস হয়ে গেল। সঙ্গের টাকা পয়সা অর্ধেকের মতো খরচ হয়ে গেছে। এভাবে তো আর বেশি দিন চলবে না। শঙ্কর পরামর্শ দিল, 'আচ্ছা তুমি গান শেখাও না কেন?' রাম হেসে বলল, 'তুমনে মুঝকোর যুগে আমার গান কার ভাল লাগবে? ওদিকে আবার কালোয়াতি গানও আমার জানা নেই।'

আটাশ

তিন মাস হতে চলল। রামের পকেট খালি হতে আর বেশি বাকি নেই। এতদিন চেষ্টা করেও কোথাও একটা চাকরি পাওয়া গেল না। এখন তো তাকে কর্মহীন, অন্নহীন দারিদ্র্যের মতো চরম দুর্দশার সম্মুখীন হতে হবে। একদিন এই ভাবনাতেই শহরে ঘুরতে বেরুল। হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত হয়ে সে এসে চৌপাট্টির সমুদ্রতীরে বসে পড়ল। এ কেমন সমুদ্র! কেমন তার বালুকণা! দুই-ই নোংরা। এ তো সমুদ্র নয়, এ যেন বৃষ্টির পঙ্কিল জলে পরিপূর্ণ বদ্ধ জলাশয় মাত্র। অথচ এই সমুদ্রের তীরে বসেই বিশাল 'জনসমুদ্র' আলাপে-সংলাপে আনন্দে-উচ্ছ্বাসে নৃত্য করছে। একের পর এক কত লোক আসছে, যাচ্ছে, খাচ্ছে, ঢেকুর তুলছে—বোম্বাই শহরের সব শ্রেণীর মানুষ সেখানে এসে জড়ো হয়েছে। অত লোকের মধ্যে কারও সঙ্গেই তো তার পরিচয় নেই। এখানে সে নিতান্ত একলা। এইসব ভাবতে ভাবতে সে নিস্তেজ সমুদ্রের ঢেউগুলির দিকে চেয়ে রইল। চাকরির কোনো ব্যবস্থা না হলে এই শহরে সে আর দিন কাটাতে পারবে না। কোথাও কোনো বাড়িতে গানের ট্যুশনি করেও যদি অল্প কিছু উপার্জন করা যেত। এক মাসের উপর হয়ে গেল মাকে সে পত্র লেখেনি! কী বলে লিখবে তাকে? মায়ের মনকে আশান্বিত করার মতো কিছুই যে নেই। এদিকে তার ফ্রেণ্ড্স্ রুমের বন্ধুরা একবছর-দুবছর হল এসেও বোম্বাই শহরে চাকরির খোঁজে বৃথাই ঘুরে মরছে। রামকে মনমরা দেখে তারা উপদেশ দেয়, 'আসার দু'এক মাসের মধ্যেই কি কাজ জুটে যায়? আমাদের দিকে চেয়ে দেখ। তুমি কি শেষপর্যন্ত একটা বছরও এখানে থাকবে না?' বন্ধুদের উপদেশ সত্ত্বেও রাম না ভেবে পারল না—সে যদি এখান থেকে সোজা জাহাজে চড়ে দেশে চলে যায়! পথ খরচের টাকাটা এখনও তার হাতে আছে। পরে যদি তা-ও না থাকে, তাহলে?

অনেকক্ষণ ভেবে ভেবে বাসায় ফিরবে বলে উঠে পড়ে। পথে একটা বিজ্ঞাপনের দিকে নজর পড়ে। আগামী সপ্তাহে বোম্বাই শহরে একটা চিত্র-প্রদর্শনী হবে তারই বিজ্ঞাপন। মৈসূরের দসরার চিত্র প্রদর্শনী অনেকদিন পর্যন্ত তাকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছিল। বোম্বাইয়ের চিত্র প্রদর্শনীটা দেখেই সে দেশের

দিকে রওনা হবে বলে স্থির করে ফেলল। এখন কেবল ধৈর্য ধরে অপেক্ষা—কবে আসবে এপ্রিল মাসের প্রথম তারিখ—প্রদর্শনী খোলার প্রথম দিনটি। দিন কি না এসে থাকতে পারে? টাউনহলে দেশের সেরা চিত্রশিল্পীদের ছবিগুলি এনে সাজানো হয়েছে। বেলা বারোটায় প্রদর্শন মণ্ডপে এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত সে সেখানেই ছিল। সঙ্গে যে টাকা রয়েছে তা অত্যন্ত পরিমিত জেনেও রাম পর পর তিন দিন সেই চিত্রশালায় না গিয়ে পারল না। শেষ দিন ফেরার পথে মনে মনে নিজেকেই দোষ দিতে লাগল—কেন সে তার শৈশবের চিত্রকলার নেশা ত্যাগ করেছে? আবার সে শুরু করবে? কোনো আর্ট ইস্কুলে ভর্তি হয়ে দু'একবছর শিখবে নাকি চিত্রবিদ্যা? কিন্তু তার সে সুযোগ-সুবিধা কোথায়? কোথায় টাকা-পয়সা? বোধ করি অতটা সহিষ্ণুতাও তার মধ্যে অবশিষ্ট নেই।

চাকরি খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছে। এবারে সে অন্য পথ ধরল। মাতুঙ্গার সব গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বাড়িতে গিয়ে দরজায় কড়া নাড়ে। দরজা খুলে গেলে জিজ্ঞাসা করে, 'আপনাদের কি গানের শিক্ষকের প্রয়োজন আছে?' এই তার এখন একমাত্র কাজ। তার মতো এই কাজ আগে আর কেউ করেছে কিনা তা সে জানে না। এক সপ্তাহের চেষ্টার পরে একটু আশার আলো দেখা গেল। এক বাড়ির মালিক বললেন, 'আগামী রবিবার সকালে আসবেন। আপনার গান বাজনা শুনে তারপরে বলব।' সে এসে তার বন্ধুদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাল যে আগামী রবিবার সকালের জন্য তাকে যেন একটি বেহালা ধার দেওয়া হয়।

রবিবার উপস্থিত। যথাসময়ে হাজির হওয়ার জন্য রাম সকালবেলায় পেটে কিছু না দিয়েই ভদ্রলোকের বাড়ির দিকে রওনা হয়। গিয়ে দেখে, রামের অশেষ সৌভাগ্য, তখনও তাঁরা প্রাতরাশ করেন নি। রাম যেতেই তাকেও 'চহা' ভোজে নিমন্ত্রণ জানানো হল। জলযোগ শেষ হলে গানের পরীক্ষা, অথবা বলা উচিত গানের শিক্ষকের পরীক্ষা। গৃহস্থ ভদ্রলোকের নাম উডুপি রায়। দেশ ধারওয়াড়। ধারওয়াড়ের উডুপি রায় বোম্বাইয়ের এক ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে বড় চাকরি জুটিয়ে বেশ সুখেই আছেন। তাঁর ঘরভর্তি ছেলেমেয়ে। আয়-উপার্জন যে ভালো তাতে আর সন্দেহ কী? তাঁর ইচ্ছা ছোট মেয়ে তুটিকে গান শেখাবেন। বাড়ির ছেলেমেয়েরা সকলেই দিবারাত্রি 'তুমনে মুঝকো' বলে গুন্ গুন্ করতে থাকে। ভদ্রলোকের ভালো লাগে না। তিনি চান ওদের

যাতে ভালো গানে প্রকৃত অভিরুচি জন্মে সেইভাবে শিখুক। রাম বেহালাটা তুলে প্রথমে একখানি পুরানো ধাঁচের গান বাজাল মংগলুরের সুব্বারাও নাগবেণীকে যে সব গান শিখিয়েছিল তারই একখানি। তারপরে দু'একখানি নতুন গানের সুরও শোনাল। বাড়ির লোকেরা খুশি! শান্তা ও সীতা দুজনেই এই গুরুর কাছে শিখতে রাজী হয়ে গেল। স্থির হল—সপ্তাহে দু'দিন এসে শেখাবে, বেতন আপাতত মাসিক বারো টাকা। 'আচ্ছা' বলে রাম সেখান থেকে বেরিয়ে এক মাইল দূরবর্তী আর এক বাড়িতে এসে হাজির হল। খুব অবস্থাপন্ন লোকের বাড়ি বলে বোধ হচ্ছে। বাড়ির সামনে মোটরগাড়ি দাঁড়িয়ে। মালিকের নাম রাও বাহাদুর শিবানন্দ রাও। ভৃত্য এসে রামের নাম জিজ্ঞেস করে ভিতরে গিয়ে জানাবার পরে ওয়েটিং রুমে নিয়ে তাকে বসানো হল। রামের মনে হল, ভাগ্য অনুকূল হলে এখানে অনেক টাকা পাওয়া যেতে পারে। শিবানন্দ রাও যথাসময়ে তাঁর চতুর্দশবর্ষীয়া কন্যার সঙ্গে বৈঠকখনায় এসে আসন পরিগ্রহ করলেন। রাম বেহালাটি হাতে নিতেই মেয়েটি চট্ করে বলে উঠল, 'বাবা, ওটা যে আমাদের বেহালা, কাল রাতে শঙ্কর রায় এসে নিয়ে গেল।' রাম খুব লজ্জা পেল—আর কিছুর জন্য নয়, বেহালাহীন বেহালাদার বলে। তার নিজের বেহালা পড়ে আছে দেশের বাড়িতে। একযুগ হয়ে গেল সেই বেহালায় হাত দেয় নি।

শিবানন্দ রায় শঙ্কর রায়ের বন্ধুর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে বললেন, 'বাজান তো শুনি।' রাগ-রাগিণীর সঙ্গে রামের পরিচয় ভালোই ছিল। সকালবেলায় মনটাও খুশি, পরিবেশটিও সুন্দর। কাজেই বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে বেহালার তারে ও ছড়ে সুর যোজনা করল। শিবানন্দ রায় বললেন, 'আপনি কত চান? ও ইংরেজি শিখছে। ইস্কুলের কাজও আছে। গান মোটামুটি জানা আছে। আপনি কয়েকটি রাগ-রাগিণী শিখিয়ে দেবেন। সপ্তাহে দু'দিনই যথেষ্ট। আগের জনকে দশ টাকা করে দিতুম, কিন্তু তার আসার কোন ঠিক-ঠিকানা ছিল না বলে ছাড়িয়ে দিয়েছি।' রাম উত্তর দিল, 'বেশ তাই হবে।'

সেদিন থেকে রাম ট্যুশনের বাড়ি দু'খানি ছাড়া অন্য ছাত্র-ছাত্রীর সন্ধানেও ঘুরে বেড়াতে লাগল। ইতিমধ্যে হাতে যে টাকা ছিল তাই দিয়ে নিজের জন্য একটা বেহালা কেনা একান্ত দরকার হয়ে পড়ল। তবে কি সে সংগীতশিক্ষক রূপেই বোম্বাইতে বসবাস করবে? ওদিকে তার শিল্পী মন প্রবলভাবে ঝুঁকে

পড়ল চিত্রকলার দিকে। চাকরি খোঁজার কয়েক মাস সে চিত্রকলা অধ্যয়ন করবে এবং আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেও যদি একটা মনমতো চাকরি না পায় তবে সে সোজা তার দেশে চলে যাবে। মায়ের কাছেও সেইভাবে চিঠি দিল। নাগবেণী লিখল, 'তুমি চিত্রকলা শিখবে না—একথা বলছি না। তোমার শৈশবের পাগলামো এত বছর যে কোথায় লুকিয়ে ছিল আশ্চর্য! কিন্তু চিত্রকলাই বল, আর গানই বল, ও দিয়ে তোমার অন্নের ব্যবস্থা হবে না। সত্বর বোম্বাইয়ের পাট তুলে দিয়ে বাড়িতে আয় বাবা। আমি কতকাল আর তোর জন্য অপেক্ষা করে থাকব? এখানে দুঃখদুর্দশা যা আছে, একসঙ্গেই ভোগ করব। মিছিমিছি বোম্বাইয়ের স্বপ্নের জন্য আমাদের মতো গরীব লোকের বিলাপ করলে কী হবে?'

মায়ের চিঠি পেয়েও রাম দমল না। চিত্রকলা সে শিখবেই, কিন্তু কার কাছে শিক্ষা নেওয়া উচিত এই চিন্তা তাকে উদ্‌বেলিত করে তুলছিল। এপ্রিলের চিত্র প্রদর্শনীতে একখানি ছবির প্রতি তার মন বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়। সেই ছবির শিল্পী মাডাম নোভার কাছে শিখতে পারলে খুব ভাল হত। কথাটা একদিন সে শঙ্কর রায়ের কাছে পাড়ল। শঙ্করকে বলা যায় বোম্বাইয়ের রাস্তা-ঘাটের ডাইরেক্টারি। সে বলল 'মাডাম নোভা? তার স্টুডিওটি যেন দেখেছি বলে মনে পড়ে। হর্নবি রোডের বাইলেনগুলির মধ্যে কোথাও হবে নিশ্চয়। সে তো জাতে ইহুদী। ওর মতো লোকের 'ফী' জুগিয়ে শেখা কি সম্ভব হবে তোমার পক্ষে?'

শঙ্করের কথায় রাম নিরাশ হল না। দুটো দিন হর্নবি রোড ও তার বাইলেনগুলিতে ঘুরে ঘুরে অবশেষে নোভা স্টুডিওর সন্ধান পেল। উপর তলায় উঠে তার দরজায় মৃদু টোকা দিতেই ভিতর থেকে সাড়া এল, 'Yes', দশ সেকেণ্ড পরে একজন মধ্যবয়সী মহিলা এসে দরজা খুলে দিল। 'কেন এসেছেন' জিজ্ঞাসা করাতে রাম তার আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করে বলল, 'টাউন হলে আপনার 'দারিদ্র্য-সঙ্গীত' নামাঙ্কিত ছবিখানি দেখে আমি চমৎকৃত হয়েছি।'

ভদ্রমহিলা রামকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, 'আমি তো সাধারণত ছাত্রছাত্রী নিই না। নিলেও আমার ফী খুব বেশি। বোম্বে প্রতিযোগিতার শহর। অন্য কেউ আপনাকে অল্প টাকায় শেখাতে পারে।'

রাম চুপ করে রইল।

'আচ্ছা, আসুন তাহলে।'

'আমার একটা কথা শুনবেন আপনি ?'

ভদ্রমহিলা হেসে বলল, 'কী কথা ?'

রাম নিরুৎসাহ কণ্ঠে বলল, 'আমি একজন কলানুরাগী, বেহালা বাজাতে জানি। আমার সেবায় আপনি যদি খুশি হন, তাহলে...'

'ভারতীয় সংগীত ?'

'আজ্ঞে।'

'কোন্ পদ্ধতি ? আপনাদের দেশের সংগীতে আমার খুব প্রীতি আছে। শুনব।'

'আপনি রাজী হলে আর একদিন এসে শোনাব। আর্ট ইস্কুলের ছবি আমার ভালো লাগে না। কিন্তু আপনার সেই একখানি ছবি আমার মনে গাঁথা আছে বলে আপনার এখানে এলাম।'

ভদ্রমহিলা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সোজা ভিতরে গিয়ে তার ভায়োলিনটি নিয়ে এসে বলল, 'চর্চা আমিও এক আধটু করি। সম্ভব হলে এটা আপনি বাজিয়ে দেখতে পারেন।'

রাম বেহালাটা তুলে নিল বটে, কিন্তু ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকিয়েই কেমন জানি তাঁর হাত কেঁপে গেল। কিন্তু আবার পরক্ষণেই মনে হাল্কা ভাব এনে মাথা নীচু করে সে বাজাতে থাকলে স্টুডিওর কোণে কোণে তার রাগালাপটা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। নোভা তার হাত ও মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। মিনিট দশেক পরে গান শেষ করে বেহালাটি রেখে দিয়ে রাম জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আজ আসি তাহলে ?'

নোভা সবিনয়ে বলল, 'আপনি মহান শিল্পী। যখন আপনার মনে হবে, এখানে আসবেন। যা দরকার জিজ্ঞেস করে জেনে নেবেন। আমি যেটুকু জানি, বলব। পরিবর্তে আমি আপনার গান শোনার সুযোগ পাব।'

সেদিন থেকে রাম নোভার ভক্ত, আর নোভা রামের জননী। নোভা রামের কাছ থেকে কোনো গান শেখে না বটে, কিন্তু রাম যখন বাজায়, সে একাগ্র চিত্তে কান পেতে শোনে। রাম চলে যাওয়ার পরে নোভা নিজে নিজেই বেহালার উপর সেই সুরের লহরী তোলার চেষ্টা করে। প্রাচ্যের স্বরলহরী একজন পাশ্চাত্যবাসীর হাতে ঠিক-ঠিক রূপায়িত হয়ে উঠবে কি না এই নিয়ে নোভার খুব ভয়। তার নিজের সংশয় নিয়ে রামের সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক কথাবার্তাও হয়।

রামের চিত্রকলা খুব বিচিত্র পথে চলে। সে পালিত বিড়ালের মতো মৃদু পদক্ষেপে স্টুডিওতে আসে। নোভা যতক্ষণ না তাকে অভ্যর্থনা করে, ততক্ষণ সে একটি কোণে গিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। নোভার যা বাড়ি, তা-ই স্টুডিও। সেখানে আরেকজন দেবতুল্য ব্যক্তি থাকেন, তিনি হলেন নোভার পিতৃদেব। হিটলারের জাতিবৈষম্যের শিকার হয়ে তাঁরা বোম্বাই শহরে এসে অতিথিরূপে বাস করছিলেন। নোভা যখন ছবি আঁকে, রাম চেয়ে চেয়ে দেখে। তার ছবি, ছবির উপাদান, পুঁথিপত্র—সমস্তই উল্টে পাল্টে দেখে। নোভা বলে, 'আপনার যেমন মনে আসে, সেইভাবেই আঁকুন।' রাম নিজের মন মতো ছবি-আঁকা শুরু করে দেয়। নোভা মাঝে মাঝে বলে দেয়, 'ওভাবে নয়, এইভাবে। ওই রঙ নয়, ওইটে' নোভা বুঝতে পেরেছে চিত্রসৃষ্টির অন্তঃপ্রেরণা রামের মধ্যে আছে।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে নোভা রামের বাড়ির জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। রাম প্রথমে মায়ের কথা বলে তাকে 'বীরমাতা' রূপে প্রদর্শনের চেষ্টা করে। পরে বাড়ির কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই বলে, 'আমাদের বাড়িখানি সমুদ্রতীরে অবস্থিত। ওদিকে সমুদ্র, এদিকে নদী।' যখনই সমুদ্রের কথা ওঠে, রাম না বলে পারে না যে বোম্বাই শহরের অপরিচ্ছন্ন সমুদ্রতীর তাকে বড় কষ্ট দেয়। কথা বলতে বলতে সামনে রাখা বেহালাটি রাম ধীরে ধীরে তুলে নেয়। তার মনে পড়ে যায়, সমুদ্রতীরের তাদের সেই বাড়িতে একদিন রাত্রিতে মাকে সঙ্গে নিয়ে বালিয়াড়ির উপর বসে সে কী-জানি-কী গান বাজিয়েছিল। সেই কথা মনে হতে এখনও কী কী সব বাজাতে থাকে। এই ভাবে যে, কতক্ষণ বাজিয়ে চলেছে তা সে জানে না। এমন সময়ে নোভার বাবা এসে রামের কাছে বসতে তার খেয়াল হয় এবং সে গানের শেষ সুরটি টেনে দেয়। নোভা কেবল এইটুকু বলে বিস্ময় প্রকাশ করে, 'আপনাদের গ্রামের সমুদ্র এত সুন্দর।' সেদিন নোভা সত্যিই আনন্দ স্বর্গের আস্বাদন করল, বলল, 'রামু, একদিন আমার বন্ধু বান্ধবকে তোমার গান শুনতে ডাকব কি? 'না' বোলো না।' রাম বলল, 'সমাজদারের সামনে শোনাবার মতো আমি তো কিছুই জানি না। আমি কোনো ইস্কুলে গিয়ে শিখিনি, কোনো দল বা পথের অনুবর্তীও হতে পারি নি। আমার ছবির মতোই আমার গান কিণ্ডারগার্টেনের প্রদর্শনী।' নোভা হাসল।

পরের রবিবার নোভা তার মতো অতিথিরূপে বোম্বাই শহরে আগত কয়েকজন ইয়োরোপীয় বন্ধু বান্ধবকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে তাদের সকলের

সঙ্গে রামের পরিচয় করিয়ে দিল। আর একবার সকলের সামনে রামকে বেহালা নিয়ে বসতে হল। সেদিন সেখানে সমবেত ইহুদীগণকে দেখে রামের মনে অন্য লহরীর সুর। এই বিদেশী নিরাশ্রয়দের দুঃখবেদনা যেন সাগর হয়ে তার মনকে কল্লোলিত করে তুলছিল। সেই প্রেরণার বশেই রাম সেদিন যে সুরের ঢেউ সৃষ্টি করল, তার ধাক্কা গিয়ে পৌঁছল এই দেশদেশান্তরের যাবাবর শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় দুয়ারে। তাদের মনে হল তাদের সমগ্র জীবন যেন এই গানের মধ্যেই প্রতিফলিত। সকলের মুখে একটি মাত্র শব্দ 'অদ্ভুত!' নোভা সেদিন তার নতুন আবিষ্কারের আনন্দে খুব উৎফুল্ল।

কয়েক মাস এমনি ভাবেই কেটে গেল। প্রথমকার সেই দুই বাড়ি ছাড়া আর কোথাও গানের ট্যুশনের সুযোগ হল না। যা আছে তা নিয়ে রাম আদৌ সুখী নয়। উডুপি রায় ও শিবানন্দ রায় দুজনেই তাঁদের পছন্দমতো গান শেখাতে বলেন। উডুপি রায় আবার বৈষ্ণব ভক্ত। তিনি বলেন, 'কয়েকটি ভক্তি-সংগীত ভালো করে শেখান তো।' ভাগ্যক্রমে নাগবেণী যখন গান শিখত, তখন রাম সুব্বারাওর মুখ থেকে শুনে কয়েকটি ভক্তিসংগীত শিখে নিয়েছিল। কিন্তু রামের মনে হল—সপ্তাহে একবার করেও ঠাকুরের নামকীর্তন শেখাতে গেলে, তার গানের ঝুলি শূন্য হতে আর বেশি দিন লাগবে না।

শিবানন্দ রায় আবার অন্য প্রকৃতির। তিনি যে গানবাজনা কিছু বোঝেন, তা মনে হয় না। তবে কতকগুলি রাগ-রাগিণীর নাম তাঁর মুখস্থ করা ছিল। সপ্তাহের দুটি দিনই তিনি এসে নির্দেশ দেন—'মেয়েকে এই-এই রাগ শেখাবেন।' এর মধ্যে কতকগুলি রাগ আবার এতই অপ্রচলিত যে সেগুলির নাম ছাড়া আর কিছুই জানে না রাম! তাছাড়া, আরও অসুবিধা দেখা দিয়েছে। রাম বাজায় তার সৃষ্টির প্রেরণায়, রাগ-রাগিণীর ধরা বাঁধা ঠাট বজায় রাখা সম্ভব নয় তার পক্ষে। সে কাল যা বাজিয়েছে, আজ আর তা বাজাতে পারবে না। এমন লোককে দিয়ে আর যাই হোক শিক্ষাদানের কাজ চলে না। বাড়িতে সুর করে করে এক-একটা রাগের মূল কাঠামোকে স্বরলিপির মধ্যে আবদ্ধ করে ছাত্রীদের কাছে উপস্থিত করতে সে অপারগ। সংগীত শিক্ষাদানের এই পদ্ধতিকে সে মানে না, তার উপর বিশ্বাসও নেই। কিন্তু মাসে মাসে যে বাইশটি টাকা হাতে আসে তাকে তো না মেনে উপায় নেই। সুতরাং গানের ট্যুশন ভালো না লাগলেও তা ছাড়া চলে না।

তার সেই বাইশ টাকার উপার্জন থেকে মাকে কত টাকা পাঠাতে পারে? মাত্র পাঁচ টাকা। কী করবে রাম? তার নিজের খাওয়া-পরা, ছবি আঁকার তুলি, কাগজ, রঙ এগুলি তো আর এমনি এমনি আসে না। সে এখন ফ্রেণ্ড্‌স্ রুমের পূর্ণ সদস্য। মারুতি রায়ের পরিবার দেশ থেকে এসে গেছে। কিন্তু রামের ফ্রেণ্ড্‌স্ রুমে চলে আসাতে সবচেয়ে বেকায়দায় পড়েছে গঙ্গাধর, কারণ এখন তার প্রিয় সংগীত 'তুমনে মুজকো...' আর তেমন করে শোনা যাবে না।

গঙ্গাধর কী একটা স্নো-কোম্পানির এজেন্সি পেয়ে দু'একমাস ধরে সারা বোম্বাই রাজ্যটা ঘুরে এল। মাসে মাসে পঞ্চাশটা টাকা হাতে পেয়ে বেশ ঠাটবাটের সঙ্গেই সে থাকতে আরম্ভ করে। কিন্তু অদৃষ্টের পরিহাসে চাকরিটি থাকে না। যাবতীয় গ্রাহকের নামধাম ইত্যাদি পাওয়ার পরদিনই সেই স্নো-কোম্পানির মালিক তাকে ছাড়িয়ে দেয়। ফিরে এসে গঙ্গাধর ফতোয়া দিল, টয়লেট শিল্প অতি জঘন্য শিল্প, সাম্যবাদী জগতে এই শিল্পের কোনো স্থান হতে পারে না।

দিন যায়। বোম্বাইর মাটি উত্তপ্ত হয়ে বর্ষাকে অভ্যর্থনা করে। এ পর্যন্ত রামের কোনো ছাতার দরকার ছিল না। কিন্তু জুন মাস পড়তেই তার উপার্জনের স্বল্পভাগ অর্ঘ্যস্বরূপ বৃষ্টিদেবতাকে দিতে হল—রাম একটি ছাতা কিনল। ছাতা কিনল বটে, কিন্তু পেটকে ফাঁকি দিয়ে। এক মাসের জন্য তাকে চা-খাওয়া ছেড়ে দিতে হয়। এইভাবে তার এক একটি প্রয়োজনীয় দ্রব্য তার কাছ থেকে এক এক প্রকারের ত্যাগ প্রার্থনা করে। কিন্তু এখন সে বন্ধুদের মজলিসে আরামবোধ করে, তাদের সঙ্গে বক্ বক্ করে বিশ্বসংসারকে ভুলে যায়। বন্ধুদের ভার্জিনিয়া সিগারেটের পরিবেশে এখন আর আগের মতো মাথা ধরে না। ওটা ধাতস্থ হয়ে গেছে।

গঙ্গাধর তাকে পরিহাস করে বলে, 'রামু, সিগারেট সেবন করে না এমন আর্টিস্ট্ পৃথিবীতে আছে কি?' রামেরও সিগারেটের তৃষ্ণা জাগে বৈ কি। কিন্তু সিগারেট যদি তার পকেটে ভাগ বসায়, তবে তার কী গতি হবে? এই ভয়ে ভীত হয়ে রাম সিগারেটের প্রচণ্ড আকর্ষণকে দূরে রেখে দিয়েছে।

সিগারেটের প্রলোভন সামলে নিলেও রাম তার মাসিক উপার্জনে আর সামলাতে পারল না। হঠাৎ উডুপি রায়ের কন্যার বিবাহ স্থির হয়ে গেছে এবং সে বিবাহে উপস্থিত থাকার জন্য গানের মাস্টার হিসাবে তাকেও আমন্ত্রণ করা

হয়। উড়ুপি রায়ের বাড়িতে সেই তার শেষ যাওয়া। সেদিন রামকে বড় বিষণ্ণ মুখে ফিরতে দেখে শঙ্কর প্রশ্ন করল, 'আজ স্টুডিওতে যাওনি?' রাম একটা খাপছাড়া কথা বলে উত্তর দিল, 'বিবাহ মানে সংগীতের মৃত্যু।' আর কিছু বলতে হল না। সমস্ত ব্যাপার বুঝে নিয়ে শঙ্কর বলল, 'আর কোথাও একটা ট্যুশান দেখে নাও।'

'হ্যাঁ। না দেখলে আমার রথ তো চলবে না। যাক্ সে কথা, আমি বোধ করি এই বছরের শেষ—ডিসেম্বর পর্যন্ত আছি। বোম্বে আমার পক্ষে ঢের হয়েছে, আর নয়।'

'সে কী! ইতিমধ্যেই তোমার ঘেন্না ধরে গেল? ছবি আঁকা ছেড়ে দেবে? ভাই, এটা আজব শহর। যদি কোনো মিল-মালিকের ছবি এঁকে দিতে পার, পাঁচ শ টাকা নির্ঘাৎ আসবে। আমাদের মতো দশটা-পাঁচটাকে কে পোঁছে?'

'আমি তো সে আশায় শিখছি না। গানও আমি সেজন্য শিখিনি। এই শহরে চিত্রকলা দিয়ে খাওয়া জুটবে না। আমার স্টুডিওর মালিক যিনি, তিনিও অনেক কষ্টে-সৃষ্টে চালাচ্ছেন। অথচ, সত্যি সত্যিই তিনি একজন যোগ্য, উঁচুদরের শিল্পী। আসলে এই শহরে চাই সস্তা আর্ট। ফোটোতে রংচং লাগিয়ে দিলেই আট দশ টাকার মতো পাওয়া যায়। আর্ট-ফার্ট এখানে বাজে কথা। একটা চিত্র প্রদর্শনীতে কে একজন মহারাজ পাঁচশ টাকা দিয়ে একখানি ছবি কিনলেন, কিন্তু কী হল তাতে? বাকী শিল্পীদের, বাকী ছবি-গুলির গতি কী হবে?'

গঙ্গাধর রসিক পুরুষ। একটু রস লাগিয়ে বলল, 'ভাই, রাজা-মহারাজাদের জন্য ছবি করতে হয় তো ন্যাংটা ছবি চাই। তা হলেই তারা কলানুরাগী হয়ে উঠবে।'

'হুঁ, কথাটা ঠিকই। কিন্তু আমার পক্ষে আর বোম্বাই নয়। উপবাসই যদি করতে হয় তবে এখানে করার চেয়ে বাড়িতে বসেই করব। বুট-প্যাণ্ট পরে উপোস করে থাকার মধ্যে বেশি গৌরবটা কী?'

শঙ্কর বলল, 'রামু, তুমি জান না। আমরা পঁচিশ বছর দেরি করে জন্মেছি বলে আমাদের এই দুর্দশা। আগের জেনারেশনে এখানে যারা ম্যাট্রিকুলেট হয়ে এসেছিল, এখন তারা সাত-আটশ এমন কি হাজার টাকা পর্যন্ত রোজগার করে। এখনকার ম্যাট্রিকুলেটদের কথা আলাদা।'

গঙ্গাধর বলল, 'এখনও যার বাজার দর আছে, তা হলে সিনেমা। আর মাত্র পাঁচ-সাত বছর। তার পরেই এদেশে বলশেভিজম্‌-প্রতিষ্ঠিত হবে। তখন এই ডাইরেক্টরগুলি, এই স্টারগুলি ধুলোয় গড়াগড়ি যাবে।·· শঙ্কর, আমি ঠিক করেছি জার্নলিজ্‌ম্‌ করব। একটা সিনেমা জার্নাল বের করে এই বোম্বাইর তারাগুলোকে তুলো ধুনে দেব।'

রাম বলল, 'তার জন্য যে আপনাকেই পত্রিকা বের করতে হবে তার কী কথা আছে? বোম্বাই শহরে অজস্র পত্রিকা। ভালো করে লিখতে পারলে, সমালোচনা যুক্তিপূর্ণ হলে ওরাই তো লেখা ছাপাবে।'

'ওহে রামু, তুমি এখনও একটি বেবী (শিশু)। আমি এই লাইনে রয়েছি আজ কতদিন হলো জান? সমস্ত পেপারে আমি লেখা দিয়েছি। ফল কী পেলাম—আবর্জনার ঝুড়ি। ওরা যদি প্রকৃত সমালোচনা ছাপে, তবে কি আর সিনেমা হাউসগুলির বিজ্ঞাপন পাবে?'

সভ্যজগতের অভিজ্ঞতা রামেরও কম হল না। গঙ্গাধরের কথায় সেও হাসতে থাকে। সে কোনোমতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে তাদের জীবৎ-কালেই সোস্যালিজ্‌মের স্বর্ণযুগ দেখা দেবে। তার নিজের সোস্যালিজ্‌ম্‌ একদিন ভুঁই ফুড়ে উঠেছিল তাদের হংগারকট্রে বন্দরের কংগ্রেস ক্লাবে, এখন তা বেঁচে আছে মাতুঙ্গার ফ্রেণ্ডস্‌ রুমে। তার বাইরে কোনদিন প্রচার হবে কিনা সন্দেহ।

বর্ষাকালে উপর্যুপরি মায়ের চিঠি এল। সব চিঠিতে একই সুর, 'বাবা, তুই দেশে চলে আয়। এখানে কাছাকাছি কোথাও কি গাঁয়ের ইস্কুলেও একটা মাস্টারি পাওয়া যাবে না? বি. এ. পাশ করা লোক কি পনেরোটা টাকাও পাবে না? তাই দিয়ে এখানেই আমরা সুখে থাকব। ওখানে বিদেশে ধনীদের মধ্যে উপবাস-যন্ত্রণায় কষ্ট পাওয়া ছাড়া আর কী শান্তি আছে? এখানে আমরা দারিদ্র্যের মধ্যেই সুখে থাকব।'

রামের হাত থেকে একটি ট্যুশন চলে গেছে। তার বদলে যে আর একটি পাওয়া যাবে এমন কোনো আশা নেই। একদিন তো শিবানন্দ রায়ের মেয়েদেরও বিয়ে হয়ে যাবে। এই বারোটি টাকাও হাত ছাড়া হয়ে গেলে তখন উপায়? না, ক্রিসমাসের ছুটিতেই তার বোম্বাই জীবন শেষ হয়ে যাবে। এর মধ্যে যথাসাধ্য সে চিত্রশিল্পের চর্চা করবে। আবার দেশে ফেরার টাকারও জোগাড় করা চাই। আর যদি সম্ভব হয়, দেশে গিয়ে যাতে মায়ের সঙ্গে

প্রথম কিছুদিন নির্ভাবনায় থাকা যায় তারজন্য আরও কিছু রোজগার করা দরকার। কিন্তু সে জানে, তার এই শেষের আশাটি ব্যর্থ আশা মাত্র।

এই কঠোর জীবন সংগ্রামের মধ্যে মায়ের লেখা একখানি চিঠি এসে হঠাৎ তাকে উৎফুল্ল করে দেয়। মায়ের কাছ থেকে পর পর দু'খানি চিঠি আসে। প্রথম চিঠিতে প্রবল বর্ষার ধ্বংসলীলার কথা—কীভাবে চাল দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে জল পড়ে পড়ে ঠাকুরঘরের ভিজে দেয়ালসমেত বারান্দাটা ভেঙে পড়ে গেছে, সেই সব কথা। পরদিন ভোরে আর একখানি চিঠি! রাম একটু বিস্মিত হল। যে পনের দিনে একখানা চিঠি দেয়, পর পর দু'দিনে তার কাছ থেকে দু'খানি চিঠি কেন? এই দ্বিতীয় পত্রেই শুভ সংবাদ—রামের পক্ষে অপ্রত্যাশিত শুভ সংবাদ। মা লিখেছে যে, ভেঙে পড়া দেওয়ালগুলির মাটি নিজেই কোদাল দিয়ে টেনে সরিয়ে রাখতে গিয়ে ওই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ছোট একটা ঘড়া পাওয়া গেছে। কী জানি বচ্চির কথাই যদি সত্য হয় এই ভেবে সাবধানে ঘড়াটি তুলে দেখে তার মধ্যে মহারানীর আমলের তিরিশখানি মোহর। শেষে লিখেছে আর কে রাখবে, শ্বশুরমশাই আমাদের জন্য রেখে দিয়েছিলেন। এখন আর কেন বাইরে ঘুরে বেড়াবে? অল্প কিছু জমি নিয়ে বাড়িতেই চাষবাস করে, আয় আমরা জীবন কাটাই।'

রাম সেদিন সারারাত কেমন স্বপ্নই দেখল। এমন স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ আর কোনো দিনই হয়নি। কেবল ঠাকুরঘরই নয়, বাড়ির সমস্ত ঘরের দেয়াল ভেঙে ভেঙে শত শত ঘড়া তার হাতে এসেছে। এখন সে লক্ষপতি, বোম্বাইর 'মেরিনা'তে মোটর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে! হঠাৎ কে যেন মোটরগাড়ির সামনে এসে পড়াতে গাড়িটা খট্ করে থেমে গেল। তখন ভোর হয়েছে। গঙ্গাধর বিছানায় শুয়ে শুয়ে গান গাইছে, 'জাদু হ্যায়...জাদু হ্যায়...।'

রামের খুব লজ্জা হল। সন্দেহ হল, আগের দিনে পাওয়া মায়ের পত্রখানি কি সত্য না স্বপ্ন? পকেটে হাত দিয়ে আবার সেই চিঠিখানি পড়ে সে আশ্বস্ত হল, চিঠিখানি স্বপ্ন নয়, সত্য। আগামী রবিবার ক্রেণ্ডসরুমের সঙ্গীগণকে সে একটা পার্টি দিতে সম্মত হল। ধার করে হলেও কম্যুনিস্ট বন্ধুদের জলযোগে আপ্যায়িত না করে পারল না।

পরদিন থেকে রামের এক পা টানছে স্টুডিওর দিকে, আর এক পা টেনে নিয়ে যাচ্ছে কোডিগ্রামের দিকে। তার একটি চোখ দেখতে চায় নোভা

মাতাকে তো আর একটি চোখ আকুল হয়ে উঠেছে গৃহমাতাকে দেখবার জন্য। একদিন সে অনেক কষ্টে নোভার কাছে বলল, 'আর মাত্র একমাস আছি এখানে। আগামী মাসে আমার মায়ের কাছে যাব। কতদিন হল তাকে দেখিনি।' 'বোম্বাইতে আর আসবে না? চিত্রকলায় তোমার এত ঝোঁক। এতে অবশ্য টাকা পাওয়া যায় না, তবে মনের তৃপ্তি পাওয়া যায়।'

রাম বলল, 'সেইজন্যই তো আমি আমার গ্রামে ফিরে যাচ্ছি। আমার মা, আমার সমুদ্র, উভয়ের কাছ থেকে আমি শান্তি পাব। দেশে গিয়ে আপনার শেখানো চিত্রকলা নিয়ে চর্চা করব ভেবেছি।'

বস্তুত ক্রিসমাস আসা পর্যন্ত রাম নোভার কাছে যতবার যাওয়া সাধ্য ছিল, ততবারই গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে বসে ছবি আঁকল। তার চেয়েও বড় কথা, নোভা ছবি আঁকছে, তুলি বুলোচ্ছে, ছবির বিষয়বস্তু খুঁজছে, তাই দেখে রাম সময় কাটাল। রওনা হওয়ার দিনকয়েক আগে জিজ্ঞাসা করল, 'সমুদ্রে আপনার নেশা নেই? আপনাকে কখনো সমুদ্র আঁকতে দেখিনি।'

'আমরা হলাম পাহাড়িয়া। জন্মেছি, বড় হয়েছি পাহাড়ের উপত্যকায়। এখানে না হয় সমুদ্র কাছে রয়েছে। সেখানে কোথা থেকে আসবে?'

'এখানকার সমুদ্র আর আমার দেশের সমুদ্র এক নয়। শৈশব থেকে ওই সমুদ্রই গেয়েছে আমার ঘুমপাড়ানি গান। তার সমস্ত রাগ-রাগিণী আমাদের ঘর থেকে শুনতে পাই। এখানকার সমুদ্র যেন নির্জীব, নিষ্প্রাণ।

'ওখান থেকে আমাকে একটা সমুদ্রের ছবি মনে করে এঁকে পাঠিও।'

'আমারও সেই ইচ্ছা।'

* * *

ক্রিসমাসের যাত্রীপরিপূর্ণ 'নেত্রাবতী' স্টিমার প্রিন্সেস্ ডকের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। রামকে বিদায় দিতে এসেছে তার ফ্রেণ্ডস্রুমের সঙ্গীরা। শঙ্কর রামের হাত ধরে বলল, 'তুমি নিরাশ হোয়ো না, ভাই। ভবিষ্যতে চাকরির একটা চান্স্ হলেই তোমাকে চিঠি লিখব।'

গঙ্গাধর বলল, 'রামু, তুমি সিনেমা স্টুডিওতে চেষ্টা না করে নোভার স্টুডিওতে গিয়েই ভুল করেছিলে।'

এমন সময়ে নোভা এসে উপস্থিত। হাতে একটি ছোট ছবি গোল করে

মোড়ানো। সেটি রামের হাতে দিয়ে বলল, 'এটা আমার দেশের বাড়ির পিছন দিকের টিলা।'

স্টিমারে ফুঁ দিতে নোভার দিকে চেয়ে চেয়ে রামের চোখ সজল হয়ে এল। নোভা শেষবারের মতো স্মরণ করিয়ে দিল, 'তুমি বলেছিলে…তোমার সমুদ্র…'

'তাই হবে।'

ঊনচল্লিশ

তিন বছর পরে। ভোরবেলাকার পাতলা কুয়াসা সমুদ্রতীরের টিলার উপর ছড়িয়ে আছে। হু হু করে হাওয়া বইছে, মকর সংক্রান্তির ঠোঁট কাঁপানো ঠাণ্ডা হাওয়া। পূর্বাকাশে একই সঙ্গে উদিত হয়েছে শুকতারা ও চাঁদ। ঐতাল বাড়ির চতুর্দিকের বেড়ার উপর পাখিগুলি 'চিলিপিলি' শব্দ করতে করতে জেগে উঠেছে। পাখির শব্দ শুনে গৃহের বারান্দায় পাতলা একখানি চাদর জড়িয়ে নিদ্রিত নাগবেণী জেগে উঠল। ছেলেকে ডাক দিয়ে বলল, 'রাম শুকতারা উঠেছে বাবা। আমাকে ক্ষেতে জল দিতে হবে না?' আগের দিন রাতে অনেকক্ষণ গল্পগুজব করে, বেহালা বাজিয়ে তবে তারা ঘুমোতে যায়। ঠিক সময় মতো ঘুম কি ভাঙে সহজে? মা পুরোনো দিনের অভ্যাসমতো জেগে উঠে পুত্রকে ডাক দিতে সে নিদ্রাজড়িত কণ্ঠে বলে উঠল, 'আঁ, কী হয়েছে মা?' মাতাপুত্র দুজনেই বাড়ির পশ্চিম দিককার বালিয়াড়িতে গিয়ে দেখে চারিদিকে কুয়াসায় ঢাকা। সমুদ্রকে দেখা যায় না, কেবল তার গর্জনটাই শোনা যায়। বালিয়াড়ি থেকে তারা যে নতুন কৃষিক্ষেত বানিয়েছে সেদিকে এগিয়ে গেল। বেড়া দেওয়া তামাক পাতার বাগান। সেখানেই খোঁড়া হয়েছে জলের কুয়া। দুজনে মিলে কলসী ভরে এক এক করে এনে তামাক পাতার চারায় জল ঢালতে থাকে। কিছুক্ষণ পরেই হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা ছেড়ে যায়। শরীর বেশ গরম বোধ হয়। রাম তার গায়ের চাদরখানি খুলে নিয়ে দাদুর মতো মাথায় বাঁধে। জলের কাজ শেষ হতে মেঘের আবরণ ভেদ করে সূর্য দেখা দেয়। তামাক গাছের পাতা থেকে শিশিরবিন্দু ঝরে ঝরে পড়ে। বাগানের অন্য কোণে জল ঢালার কাজ শেষ করে নাগবেণী বলল, 'বাবা, দুটো 'হরিবে' শাক আঁচলে তুলে নেব?'

'আজ কি ওই-ই সেবা হবে নাকি?'

'আর কী আছে বাবা? দরকার হলে কচি কচি শশা আছে, তাই কেটে না-হয় 'সাসিরে' বানানো যাবে। কী বল?'

'থাক মা, কচি শশা কেন তুলবে?'

নাগবেণী 'হরিবে' শাকের ঝাড় তুলে নিয়ে বলল, 'আমি ঘরে যাই, খোকা, তুই এসে চান করে, খেয়ে নিয়ে...'

'মা, আজ রবিবার না? ইস্কুল নেই। আমি একবার সমুদ্রতীর থেকে আসি। আমার ছবিটা এখনও শেষ হল না। কবে যে শেষ হবে? কবেই বা বোম্বাই পাঠাব? আজ তিন বছর হল বোম্বাই ছেড়ে দেশে ফিরেছি।' এই বলে রাম বালির উপর দিয়ে ছুটে গিয়ে সমুদ্রতীরে ধপ করে বসে পড়ল। সূর্য কিরণ কুয়াসাকে ছিন্নভিন্ন করে, ঢেউগুলিকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে সমুদ্রের ফেনরাশিকে নানা রঙে রঞ্জিত করতে লাগল, কখনো হলুদ সোনালী কমলালেবুর রঙ, কখনো বা সবুজ সোনালী। প্রতিটি রঙ রামের উপর দাগ কেটে দিচ্ছে।

সূর্য আরও উপরে এল। তখনও রাম একই ভাবে জলের কিনারে বসে। এমন সময় সাবান হাতে নিয়ে ওখান দিয়ে যাচ্ছিল চেন্ন জেলে। 'কে, মাস্ট্র (মাস্টার)? আজ 'ইস্কুলু' নেই?' এই বলে সে রামকে কুশল প্রশ্ন করল।

'চেন্ন, আজ আমার ছুটি। আজ কেবল মাছ ধরব?'

'মাস্ট্রে, আজ এক মাস হল মাছ ধরা বন্ধ আছে। এবারে 'বৈগু' মাছ আর আসেই নি ইদিকে। এক এক বছর এক এক নমুনা দেখেন কেনে।'

'চেন্ন, 'বৈগু' মাছ না এল তো না এল। 'হংদি' মাছের তো অভাব নেই।,

'হংদি মাছ খেলে আমরা জেলেরা সব মরে যাব যে! বাবুমশাই, ওসব তামাশা থাক। আমার ছেলেটা পড়াশুনোয় কেমন বুঝছেন? বাড়িতে কিছুই লেখাপড়ি করে না। একটা দস্তখত করতে পারলেই হল। আমি লেখাপড়ি জানি না বলে কত অসুবিধা দেখুন!'

'চেন্ন, লেখাপড়া না জানাই ভাল। আমার বাবা লেখাপড়া শিখেছিল বলেই তো দাদুর সমস্ত সম্পত্তি উড়ুপির মহাজনের পেটে গেল।'

'তা, আপনি নাকি সব ফিরিয়ে আনছেন?'

'মহাজন যদি দেয় তবে তো। আমার হাতে যদি টাকা আসে তবে তো।'

'ভগবান করবেন। এ বছর আপনার তামাক পাতা খুব জাঁকিয়ে হয়েছে। আমি আপনার বাগানখানা দেখেছি। কেমন মাছের সার এনে দিয়েছিলুম বলুন।'

'চেন্ন তোমার আনা সারেই যদি অত ভাল ফসল হয়, তবে তোমাকে সার করে দিতে পারলে কেমন হত বল ত।'

'এই মাস্টৃরের (মাস্টারের) কেবল তামাশা আর তামাশা। মাস্ট্রে, আপনি তো বাড়িতে বসে 'পিটীলু' (বেহালা) বাজান। ওটা কি আমি শিখতে পারব?'

'নিশ্চয়ই পারবে। কেন পারবে না? এস তুমি-আমি একটা বিনিময়-ব্যবসা করি। আমি তোমাকে পিটীলু বাজনা শেখাব, তুমি আমাকে জাল বুনতে শেখাবে কেমন?'

'এই মাস্ট্রুর জিবের ডগায় সব সময়েই তামাশা।'

রাম ও চেন্নয়ের কথাবার্তার মধ্যে বচ্চি খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে হাজির হল।

'বচ্চি, তোর মোটরগাড়ি নিয়ে কেন এলি? আমি যে ওষুদ এনে দিয়েছিলাম, পায়ে মালিশ করেছিস তো?'

'খোকাবাবু ঘরের লোক বলে কী ভিতরের বিষ না গেলে পা ভাল হবে না। আপনি তো বাইরে ওষুদ লাগাতে দিয়েছিলেন।'

'চেন্ন, তুমি বাজাবে পিটীলু, আর এই বচ্চির স্বামী কালো কী করবে জান? হাসপাতালের 'দাক্তারি' (ডাক্তারি)।' এই বলে রাম চেন্নকে শোনাল, কী ভাবে বচ্চির পায়ের গোড়ালিটা মচকে যায়, তার জন্য সে নিজে হাসপাতালে গিয়ে ওষুধ নিয়ে আসে, আর কালোর কথায় বচ্চি সেই ওষুধ না লাগিয়ে এখানে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসেছে।

'এই মেয়ে, বাবুমশাই অতদূর পায়ে হেঁটে গিয়ে তোর জন্য ওষুদ এনে দিল, আর তুমি সেই ওষুদটুকু পায়ে লাগাতে পারোনি না? বুঝলেন বাবুমশাই, আমাদের এই জেলেগুলির দেমাক বেড়ে গেছে বলেই তো এ বছর সমুদ্রে আর 'বৈগু' মাছ পড়ল না।'

রাম বলল, 'চেন্ন, আমাদের 'হরিবে' শাকের ঝাড়ে যে পোকা পড়েছে তাও বোধ করি এইজন্য?'

চেন্ন হাসল। বচ্চি বলল, 'খোকাবাবু, আপনার মা আপনাকে এক্ষুনি আসতে বললেন। আপনাদের বাড়িতে নাকি মংদর্তির পিসিমা এয়েছেন ছেলেপুলে নিয়ে।'

'কে, সুব্বিপিসি?'

'খোকাবাবু, আমি গরীব মেয়েমানুষ, বাজে বকি বলে রাগ করবেন না যেন। বুড়ো মাকে দিয়ে রান্নাবান্না করিয়ে আর কত কষ্ট দেবেন? আমাদের ভাগ্যে কি একটা বিয়ের ভোজ জুটবে না? এই তো আপনার পিসিমার মেয়েরা রয়েছে। তাদেরও আর অন্য সম্বন্ধ খুঁজতে হবে না, আপনার মায়েরও কষ্ট দূর হবে।'

'হ্যাঁরে বচ্চি, ওই কথা ভেবেই তো আমি সুব্বিপিসিকে খবর পাঠিয়েছিলাম,

রান্না করবার জন্য আমাদের বাড়িতে একটি মেয়ে চাই, মাসে বেতন দেব তিন টাকা।'

'তাই নাকি খোকাবাবু? এই কি রান্নার লোক নিয়ে এসেছে? মাসে তিন টাকা?'

'কেবল কি তাই? খাওয়ার জন্য তাকে রোজ যেতে হবে উডুপি মঠে, তাও বলে দিয়েছি।'

'এই খোকাবাবুর এখনও ছেলেমানুষি গেল না, বয়স হল এক কুড়ি।'

রাম উঠে বাড়ির দিকে দৌড়তে আরম্ভ করল। 'বচ্চি, তোর মোটরগাড়ি আস্তে আস্তে আসুক। আমি যাচ্ছি।' বাড়িতে রামের অভ্যর্থনার জন্য সুব্বি পিসি অপেক্ষা করছিল। রাম সদর দরজা থেকেই চিৎকার করে বলল, 'ও পিসি!' 'কী রে, ছিঁচকে চোর, দেশে এসেছ আজ তিন বছর হয়ে গেল। আমাদের বাড়িতে তোমার একবারও যাওয়ার সুযোগ হল না। আমাকেই আসতে হল। এই ছেলেমেয়েগুলি আসবে বলে বায়না ধরল। নিয়ে এলাম। অমনি সালিগ্রামের রথটাও দেখা হয়ে যাবে।'

সুব্বি তার তিনটি সন্তান নিয়ে এসেছে, পার্বতী, জানকী ও রামকৃষ্ণ। পার্বতীর বিয়ে হয়ে গেছে। জানকীর এখনও বিয়ে হয় নি, বছর দশেক বয়স তার। জানকীকে দেখে রাম কৌতুক করে বলল, 'ওহো, আমার গিন্নি এসেছে? আমি যখন ইস্কুলে যাব, তখন পকেটে গুঁজে নেওয়ার মতো একটি মেয়ে, না, না, গিন্নি এসেছে…'

'রাম, তোর সব তাতেই খেলা, সব তাতেই তামাশা। তোর মা যে এতকাল একা একা কষ্ট করল, তাতেও কি হয় নি? তাড়াতাড়ি একটা বিয়ে করে মায়ের কষ্টটা দূর কর। আমার মেয়ে জানকীর কথা বলছিস? ও এখনও ছোট।'

'ছোট হলে কী? সে তো রান্না করবে। আসলে তো সেই জন্যই স্ত্রীর দরকার হয়ে পড়ল। তাই না, পিসি?'

'রাম, তোর এই ফাজলামো দূর হবে কবে রে? তুই কি ইস্কুলে গিয়ে এই শিক্ষাই দিস ছেলেগুলোকে?'

'তবে আর কী সুব্বিপিসি? কোডিগ্রামের সব ছেলেপুলের গায়ে তোমাদের এই রামের হাওয়া লেগেছে।'

এমন সময়ে নাগবেণী এসে উপস্থিত হলে রাম বলল, 'মা, সুব্বিপিসিদের জলপান দিয়েছ ?'

'না বাবা, মুগডাল সেদ্ধ কর'ছি। ওরা মংদর্তির লোক…'

'হ্যাঁ মা, ও গ্রামের লোকের কাছে কফি এখনও খুব গরম বলে বোধ হয়!'

'পাগল! কফি বীজ বাড়িতে জমা করে রাখা আছে নাকি ?'

'বীজ নাই বা থাকল। গান্ধী কফি করতে পার না ?'

ইস্কুল নেই বলে রাম সময়ের কথা ভুলে গিয়ে পিসির সঙ্গে গল্প করতে থাকে। রান্না শেষ করে এসে নাগবেণী বলে, 'কী ব্যাপার? কারও কি খেতে টেতে হবে না ?' রাম বা সুব্বিপিসি কারও স্নান হয় নি। নাগবেণীর বকুনির পরে দুজনেই পুকুরে গিয়ে স্নান করে এল। সকলেরই খাওয়া হল 'হরিবে' শাকের 'পলদ্য' (একপ্রকার ব্যঞ্জন) দিয়ে। আত্মীয়-কুটুম এসেছে বলে একটি পদও বেশি হয় নি। পদের অভাব পূরণ হচ্ছে গল্পগুজব স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে।

দুপুরের খাওয়া শেষ হতে নাগবেণী ও সুব্বি গল্পে বসল। রাম এসে বলল, 'পিসি, আমাদের এখানে এবার তিন দিন থাকতে হবে। আমি এক্ষুনি বেরুচ্ছি উডুপির দিকে। আশা করি দুপুর রাতের মধ্যেই ফিরতে পারব। যদি না পারি, তবে ভো'র হওয়ার আগেই তামাক ক্ষেতে জল দেওয়ার জন্য এসে হাজির হব।' নাগবেণী বলল, 'খোকা, পড়ুমুন্নুরুর দাদুকে সঙ্গে নিয়ে যেও। ওঁর সঙ্গে মহাজনদের খুব জানা শোনা।' 'আচ্ছা' বলে রাম সমুদ্র পার দিয়ে চলতে চলতে পড়ুমুন্নুরু হয়ে উডুপিতে গেল।

রাম চলে গেলে নাগবেণী তার গৃহস্থালির কথা বলতে লাগল। ঠাকুর ঘরের দেয়াল ভেঙে পড়ায় শ্বশুরমশায়ের কিছু টাকা পাওয়া, বোম্বাই থেকে রামের দেশে ফিরে আসা, বাড়ি এসে নিজের হাতেই চাষবাস করতে থাকা, কোডিগ্রামের ইস্কুলে দশ টাকা বেতনে মাস্টারি পাওয়া, নাগবেণী সমস্ত কথা সুব্বিকে বিশদভাবে শোনাল। আরও বলল, 'কাজটা তো পার্মানেন্ট নয়। ট্রেনিং নিতে হবে যে। রামের সেদিকে খেয়াল নেই। ও বলে, মাস্টারি যতদিন চলে চলুক। যদি খাজনা-করা জমি উডুপির মহাজন ফেরত দিতে রাজী হয়, তবে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চাষবাস নিয়েই থাকবে।'

'কত টাকা দিতে হবে মহাজনকে ?'

'পডুমুন্নুরুর মামাশ্বশুর বলেছেন, আমাদের কষ্টের কথা বলে বাড়িটা ও বাড়ির আশেপাশের জমি যাতে দেড় হাজার টাকায় পাওয়া যায় সেই চেষ্টা করবেন। অত টাকাও আমাদের হাতে নেই। তবে এবছর তামাকটা ভালোই হয়েছে। দর যদি এই রকমই থাকে, তবে যেমন করে হোক টাকাটা জোগাড় করতে হবে। ঠাকুরঝি, তোমার বাবার কথা লঙ্ঘন করেছিলাম বলে আজ আমাদের এই দুর্দশা। অপরাধের প্রায়শ্চিত্তও তো কম হল না! ঠাকুর করেন, আবার যদি সম্পত্তিটা ফিরে পাই, কারও কাছে ঋণী না হয়ে থাকতে পারব।'

সুব্বি মনে মনে বলল, 'বাবার সম্পত্তি আবার যদি ফিরে আসে, ঠাকুর, তোমার কাছে মানত করছি।' নাগবেণীকে বলল, 'আচ্ছা বৌদি, ঐতু পূজারির নারকেল বাগানখানা পাওয়া যায় না? পেলে বড় ভাল হত।'

'পেলে তো ভালই হত। কিন্তু তার জন্য টাকা চাই না? বাড়ির জমি যদি আমরাই চাষ করি, তবে কিছু বেশি চাল ঘরে আসে। রামের তো চেষ্টার ত্রুটি নেই। বাড়ির পিছনে বালিয়াড়িতে কাজুবাদামের বীজ রুয়েছে। চারাগুলি বেশ বড় হয়ে উঠেছে। আর বছর দুয়েক পরে ফল ধরবে। দুতিন একর জমিতে হাওয়া গাছ ('গালিমর') লাগিয়েছে। তাতে কোনো শ্রম নেই। তবে এই তামাক গাছের জন্য জলটানার ব্যাপারটা বেশ কষ্টকর। তামাক পাতার গাছ যে কত জল খায় সে আর কী বলব, ঠাকুরঝি? একটি দিনও বাদ দেওয়া চলবে না। তবে তামাক পাতার মতো লাভ আর কিছুতেই নেই।'

সুব্বি জিজ্ঞাসা করল, 'বৌদি, তুমি জল টানতে পার?'

নাগবেণী বলল, 'পিসিমা যেমন খেটেছেন তেমন পারি না। তবে না করে উপায় কী? তাছাড়া, দুজনের রান্না শেষ করে বাকী সময়টা কাটাই বা কী করে?'

সেই রাত্রিতে সুব্বি তার বাপের বাড়ির পুরোনো দিনের কথা ওঠাল। সরস্বতী, পার্বতী, সত্যভামা এই মাটির জন্য যে কত কষ্ট করে গেছে সেইসব কথা বলে বলে কিছুতেই আর তৃপ্তি হয় না। 'আমাদের মংদর্তিতেই বা কী? সারাদিন কাজ আর কাজ। তবে ধার-কর্জ না করে কোনো রকমে দিন চলে যায়, এই আর কী।'

কথায় কথায় একসময়ে সুব্বি বলল, 'বৌদি, রামুর তো এই বছর চব্বিশ বয়স হতে চলল। এখন তো ওর একটা বিয়ে দেওয়া উচিত, কী বল? কোন্ ভাল মানুষ ওকে মেয়ে না দিয়ে পারে?'

'ঠাকুরঝি, বিয়ের কথা ওকে আমি বলতে পারব না। বললে ও কী উত্তর দেবে জান? 'মা, আমরা দুজনে মিলে যা খাই, সেই থেকে তো আরও একটি প্রাণীর জন্য বাঁচাতে হবে। পরে যে সব ছেলেপুলে জন্মাবে, তাদেরই বা গতি কী হবে?' এই সব কথা বলে।'

'তুমিও বেশ মানুষ বৌদি। কথায় আছে না যে দিকে হাওয়া বয়, সেদিকে পাল খাটায়। ছেলে যা বলে তাই শুনতে হবে? ওকি চিরকাল একলা থাকবে? গ্রামে কোনো গরীবলোক কি সংসার করে নি? টাকা পয়সা, অভাব অনটন এসব কি আমাদের হাতের জিনিস? যদি বিয়ে করে, এই বয়সেই করা উচিত।'

'সবই আমি বুঝি, ঠাকুরঝি। কিন্তু ছেলের কাছে বলতে আমার মুখ সরে না। আমার তো ইচ্ছা, এই সম্পত্তিটা হাতে এলে বাড়িতে একটি বৌও আসুক। অভাব অভিযোগ আছে ঠিকই, তবে মনে হয় মর্যাদার সঙ্গে কোনোরকমে থাকতে পারবে। অন্তত আমি যা কষ্ট পেয়েছি, তেমন কষ্ট হবে না। কিন্তু ঠাকুরঝি, রামের কাছে একথা বলার সাহস আমার নেই।'

'তুমি না পার, আমি রামকে বোঝাব। ও যদি রাজী হয়, আমাদের এক আত্মীয়ের একটি মেয়ে আছে, তাকে আনতে পার। ওরা ব্রহ্মাবরের লোক। কোনো ঝামেলা নেই। বছরে দুশো মুড়ি ধান। দুটি মাত্র মেয়ে-সন্তান। প্রথম মেয়ের বিয়ে হয়েছে। ছোটটির বয়স এই ষোল। গ্রামে বসে কিছু লেখাপড়াও করেছে। তোমার নন্দাইয়ের সঙ্গে তাদের খুব ঘনিষ্ঠতা। তাঁর বোনের কুটুম্ব ওরা। রাম যদি রাজী হয় আর ঠিকুজী মিলে যায়, তবে আর কী? রামের ঠিকুজী আমি দিয়েছি তাদের। তারা বলেছে ঠিকুজী তো ভালোই আছে।'

নাগবেণী বলল, 'ঠাকুরঝি, তোমার কথা শুনে আমার তো খুবই ইচ্ছা হয়। কিন্তু রামের মন ফেরানোই মুস্কিল। এখানে মাস্টারি করে দশ টাকা পায়। এই পাড়াগাঁয়ে কম কী? কিন্তু কাজটা তো পার্মানেন্ট নয়, বেশিদিন থাকবে না। তারা বলে ট্রেনিং নিতে হবে। রাম বলে, লেখাপড়া যথেষ্ট হয়েছে, আর না।'

সেই রাত্রিতে তারা দুজন যে কতক্ষণ ধরে কথাবার্তা বলেছে সে খেয়াল নেই। বেশি রাতে ঘুমিয়েছে বলে রাম যে কখন এসেছে টের পায় নি। রাম

এসে তাদের জাগাল। সে পড়ুমুন্নুরু থেকে রাত্রি থাকতে রওনা দিয়ে শুকতারা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি পৌঁছে ডাক দিল, 'মা'। সেদিন ভোরে সকলে মিলে তামাক ক্ষেতে জল দিয়েছে। সুব্বি, সুব্বির বড় মেয়ে 'না' বললেও শোনে নি। তাড়াতাড়ি কাজ করতে গিয়ে মাটির একটা মটকা ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। ক্ষেতে জল দেওয়ার ফাঁকে ফাঁকে রাম মাকে সব কথা শোনাল, যে কাজের জন্য গিয়েছিল, পড়ুমুন্নুরুর দাদুর সাহায্যে সেটা কী ভাবে শেষ করে এল এইসব কথা। 'মহাজন বলেছেন, দেড় হাজার টাকার এক পয়সা কমেও হবে না। তবে সে আরও কিছু জমি ছেড়ে দিতে রাজী হয়েছে। সাড়ে তিন মুডি নাবাল জমি, বসতবাটি, বালিয়াড়ি, আর তাছাড়া উপাধ্যায় বাড়ির সংলগ্ন পাঁচ একর বালিয়াড়ি দেবে বলেছে।'

নাগবেণী বলল, 'দেখতে অনেক জমি হল বটে, কিন্তু কী আছে ওই বালিয়াড়িতে? চারটে বন কেয়ার ঝাড় পর্যন্ত নেই।'

'মা, তোমার কথা মানলুম, এখন ওখানে কিছুই নেই। কিন্তু পাঁচ একর বালিয়াড়িতে কাজুবাদামের বাগান করলে, তুমি দেখে নিও, পাঁচ বছর পরে পঁচিশ মুডি বাদাম পাওয়া যাবে। আর ওর জন্য খরচই বা কী? একটা বেড়া লাগালেই হল। আজকাল কাজুবাদামের যা দাম, তা ধান-চালেও নেই।' এই বলে রাম মাকে আশ্বাস দিল।

তামাক ক্ষেতে জল দেওয়ার কাজ শেষ হতে রামের একমাত্র চিন্তা হল যে দুশ টাকার টান পড়েছে, কী ভাবে সেই টাকাটার ব্যবস্থা করা যায়। তামাক পাতা থেকে শ দেড়েক টাকা আসবে, অবশ্য ভাল দর পাওয়া গেলে। মহাজনের সঙ্গে আর ঝামেলা করা উচিত হবে না ভেবে সে স্থির করল যে মাধব মেসোমশাইয়ের কাছ থেকে বাকী টাকাটা ধার নিয়ে বাড়ির কাজটা শেষ করতে হবে।

বাড়ি ফিরে রাম খুব খুশি মনে তার সুব্বিপিসির সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। পিসি কিন্তু ভাইপোর কাছে বিয়ের কথাটা পুনরায় উত্থাপন করতে পারল না। মংদর্তি ফিরে যাওয়ার আগে বলল, 'রাম, তোর সম্পত্তির ঝামেলাটা আগে মিটে যাক। আমি আগামী মাসে আবার আসব, তখন তোকে সব কথা বলব।'

তামাক পাতা কাটার সময় হয়ে এল। তার আগে বাড়ির উঠোনে একটা

ছাপরা করা দরকার, তার চারিদিকে শুকোবার জন্য কাঁচা তামাকপাতাগুলিকে ঝুলিয়ে দিতে হবে। ছাপরার কাজ শেষ হওয়ার পরদিনই মায়ে পোয়ে দুজনে মিলে কাঁচি ধরল। কাটা পাতাগুলি আঁটি বেঁধে এনে ছাপরার চারিদিকে ঝুলিয়ে শুকাতে দিল। গত বছরের তুলনায় এ বছর পাতা হয়েছেও বেশি পরিমাণে, আর দেখতেও খুব চমৎকার। নানা জায়গায় খোঁজ খবর নিয়ে কষ্ট করে সে যে তামাকপাতার বীজ যোগাড় করে এনেছিল, তার সেই কষ্ট সার্থক হয়েছে। চেন্ন জেলে অবশ্য বলে গিয়েছে ওটা তার মাছের সার দেওয়ার ফলেই সম্ভব হয়েছে।

ইতিমধ্যে এ অঞ্চলের নামকরা তামাকপাতা ব্যবসায়ী আহমদ ব্যারি এসে হাজির। এসেই উঠোনের চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলল, 'মাস্টার মশাই, লটকে লট দিন, ওজন টোজনের ঝামেলা নেই। একটা আন্দাজের উপর দেবেন।' তামাক পাতার বাজারদর তখন বেশ চড়তির দিকে। আহমদ ব্যাপারীর অতিরিক্ত আগ্রহ দেখে রাম একটু হেসে বলল, 'ব্যারিসাহেব, লটে দিতে পারি। দরও সেই রকম, লটদর, কী বলেন?'

ব্যাপারি বলল, 'দেড়শ টাকা।' ছাপরা দেখেই ব্যারিসাহেব তামাক পাতার ওজন বুঝতে পারে। সে যা দাম বলেছে আসল দাম যে তার চেয়ে অনেক বেশি তাতে আর সন্দেহ নেই। রাম বলল, 'আড়াইশ টাকা।' ব্যারিসাহেব দর শুনেই প্রস্থান করলে রামের মনে হল যে দেড়শ টাকায় বিক্রি হলেও কোনো ক্ষতি ছিল না, খদ্দেরকে ছেড়ে না দিলেই ভাল হত। অপরাহ্ণেই ব্যারিসাহেব লোক মারফত খবর পাঠাল, দুশটাকা পর্যন্ত দিতে সে প্রস্তুত, তার বেশি নয়। রাম রাজী হয়ে গেল।

তামাকের দর দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে বলে ব্যারিসাহেব পরদিন এসে টাকাটা দিয়ে গেল এবং সপ্তাহখানেক পরে এসে তামাক পাতা ওজন করা হলে দেখা হল রামের লোকসান হয়নি। ব্যারিসাহেবেরও অবশ্য লাভ ভালই হবে। নাগবেণী একটু খুঁত খুঁত করল, 'আড়াইশ টাকাই পাওয়া যেত কি না কে জানে?' রাম তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, 'মা, দাম বেশি চড়েছে বলেই দুশ টাকা হল। ন্যায্য দর দেড়শ। গত বছর তো মাত্র একশ কুড়ি টাকা হয়েছিল।'

টাকা পাওয়ার সপ্তাহখানেক পরে রাম তার পিতামহ রাম ঐতালের

সম্পত্তির একটা অংশের পুনরায় মালিক হল। সম্পত্তি রেজিষ্ট্রি হওয়ার দিন নাগবেণীর উদ্বেল আনন্দের কথা বলে শেষ করা যায় না। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে 'উডুপিতে সঙ্গে নিয়ে যাব' লচ্চ এই কথা বলে নাগবেণীকে উডুপির বদলে ব্রহ্মাবরে নিয়ে গিয়ে নাগবেণীর নামে সম্পত্তি তার নিজের নামে লিখিয়ে নিয়েছিল। তার মাসখানেক পরেই সম্পত্তিটা হাত ছাড়া হয়ে গেল। নারায়ণ দাদু চেষ্টাচরিত্র না করলে ওর কোনো অংশই আর খাজনাতেও পাওয়া যেত না। এবং কোডিগ্রামে তাদের বাস করার আশাও চিরতরে শেষ হয়ে যেত। কিন্তু মাটিকে তারা ভালেবেসেছিল বলে আজ আবার তারা সেই মাটির আশ্রয়ই ফিরে পেল।

রামের আকাঙ্ক্ষা উৎসাহ সার্থক হয়েছে। মনটাও খুশি আছে মনে করে নাগবেণী ছেলের বিয়ের কথাটা তুলতে চাইল। আজ কাল করে সে কেবল উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করছে। কিন্তু রামের বিশ্রাম নেই। ভোরবেলায় তামাক ক্ষেতে জল দেওয়ার কাজ শেষ হয়েছে বটে, আর কী ফলানো যায়? নাগবেণীর খুব ইচ্ছা রোঁয়ার মাঠের পাশে একখানি তরকারি বাগান করে। রাম বলল 'এবারে আর তরকারি বাগানের দরকার নেই। তার চেয়ে উঠোনেই কিছু 'হরিবে' শাকের চারা লাগিয়ে দিই।'

নাগবেণী বলল, 'তরকারি না ফলালে চলবে কী করে, রামু? রোজ কেবল ভাত ও পানসে টক খেয়ে খেয়ে অরুচি ধরে যাবে না?'

'সে তুমি ঠিকই বলেছ মা। কিন্তু আমার মাথায় আর এক চিন্তা এসেছে। আমি ভাবছিলাম কী জান? আমাদের নতুন বালিয়াড়িতে প্রায় আট একরের মতো জমি আছে। আমার প্ল্যান হচ্ছে, ওখানে যদি দু'এক মুডি ধান ফলাতে হয় তবে বর্ষার আগেই মাটি কুপিয়ে ঠিক করে রাখা দরকার।'

'এই বালির মধ্যে কি ধান ফলাতে পারবি, বাবা? আগে যে বলেছিলি কাজুবাদামের বাগান করবি, তার কী হল?'

'সবই হবে মা। ধান হওয়ার মতো জমিগুলিতে কেবল রুয়ে দিলেই হল। কিন্তু লোক লাগিয়ে করতে হলেও এক একরের মতো জমিতে তামাক বীজ বুনব বলে ঠিক করেছি। বাকী থাকল খালি বালিয়াড়ি। সেখানে ঝাউয়ের চারা কিংবা কাজুবাদাম লাগালেই হবে।'

নতুন জমি পাট করবার জন্য রাম তার তিন মাসের বেতন ব্যয় করতে

উদ্যোগী ছিল। কেবল টাকা খরচ করে ক্ষান্ত নয় সে মজুরদের সঙ্গে বালি বয়ে নিতেও আদৌ ভয় পায় না। বৃষ্টি নামার আগেই দুই একরের মতো জমি সমতল করে ঠিক করে রাখবে এই তার সংকল্প। কিন্তু রোদের মধ্যে বালির কাজ করা খুবই শক্ত। কিন্তু বৃষ্টির জলে বালি আবার দ্বিগুণ ভারি হয়ে গেলে আরও শক্ত হবে। কাজেই সে বেপরোয়া হয়ে মজুরদের সঙ্গে থেকে নিজেও খাটতে আরম্ভ করল। জ্যোৎস্না রাত্রি হলে সে আর বাড়ি না গিয়ে বালিয়াড়িতেই শুয়ে থাকে। মাটির কাজ আধাআধি হয়ে এলে একদিন চেন্না জেলেকে ডাকিয়ে বলে দেয়, 'চেন্না, তোমার ছেলেকে আমি ভালো করে ইংরেজি শিখিয়ে দেব, তুমি আমায় একশ' টুকড়ি মাছের সার এনে দাও। এ বছর এখানেও তামাক লাগাব বলে ভেবে রেখেছি।'

'আরে মাস্ট্রে (মাস্টারবাবু)! আপনি ইংরেজি শিখে শেষে কিনা এই বালির মধ্যে শুকিয়ে মরছেন ? তবে আর আমার ছেলেকে ইংরেজি শিখিয়ে কী হবে ? মাস্টারবাবু কেবল যে আপনারাই ইংরেজি বলেন তা নয়। সন্ধ্যা হলে আমরা জেলেরাও একরকম ইংরেজি বুলি বলি।'

'হ্যাঁ, বোতল নিয়ে, না রে চেন্না ? তোমরা জেলেরা যদি তাড়ি খাওয়া ছেড়ে দিতে, তবে কি আর তোমাদের ভাতের অভাব হত ?'

'হুঁ, সেই যে আপনি গান্ধী লেকচার দিয়েছিলেন, তা কি ভুলে গেলেন মাস্টারবাবু ? আমরা তো সকলেই সেদিন তড়ি খাবনা বলে পণ করেছিলুম।'

'হুঁ, বোতলে বোতলে খাওয়া ছেড়ে এখন ঘড়ায় ঘড়ায় খেতে শুরু করেছিস। এই তো হল আমার গান্ধী লেকচারের ফল।'

'তাহলে বলছি, মাস্টার, শুনুন। তাড়ি পেটে না পড়লে আমাদের প্রাণটা শুকিয়ে যায়। ওর যা শক্তি তা তো মোষের দুধেও নেই। কিন্তু মাস্টারবাবু, এবছর আমাদের তাড়ি শরাব কিছুই নেই। থাকবে কেমন করে ? মাছ সব পালিয়ে গেছে। জাল টেনে টেনে হয়রান, মাছ আর পড়ে না। অমাবস্তিটা কেটে গেলে জাল ফেলে দেখব। আচ্ছা, দাদাঠাকুর, মাছ এই এক বছর আছে তো আর এক বছর নেই। ওরা যায় কুথা গো ?'

'কোথায় আর যাবে ? যায় তোদের পেটে।'

'এই দাদাঠাকুরের সঙ্গে দেখা হলেই কেবল তামাশা।' এই বলে চেন্না জেলে

চলে গেল। সূর্য হেলে পড়ে আকাশ রাঙা হতে রাম সূর্যাস্ত দেখার জন্য সমুদ্র পারে গেল।

অবকাশ সময়ে সে সমুদ্রের ছবি আঁকে। এঁকে এঁকে জমা করে রাখে। যতক্ষণ আঁকা চলতে থাকে মনে মনে বলে, 'এটা নোভা দেবীর কাছে পাঠাব।' আঁকা শেষ হয়ে গেলে বলে, 'বড় অস্পষ্ট হয়ে গেছে। তার কাছে আমাদের সমুদ্রের অত সুখ্যাতি করে এই রকমের ছবি এঁকে পাঠালে সে নিশ্চয়ই মনে মনে হাসবে।'

* * * *

'আগামী মাসে আসব' বলে সুব্বিপিসি সেই যে চলে গেছে, দুমাস ধরে আর তার দেখা নেই। অবশেষে নববর্ষের প্রথম দিন অপরাহ্ণে 'হরি হরি' বলতে বলতে সুব্বিপিসি এসে উপস্থিত হল। রাম বা নাগবেণী কেউ তখন বাড়িতে নেই। তাঁদের খোঁজে সে বালিয়াড়ির দিকে গেল। বচ্চি তখন হোন্নে গাছের বাগানে ঝরাপাতা ও কাঁচা ফলগুলি ঝাঁট দিচ্ছে। 'মাঠাকরুন আর খোকাবাবু ওই যে ওদিকে নতুন জমি তৈরির কাজ করছেন গো', বচ্চির কথায় সুব্বিপিসি সেখানে গিয়ে দেখে কাজের শেষে মুনিষেরা যেখানে ঝুড়ি-কোদাল রেখে গেছে তারই পাশে মা ও ছেলে বসে। রামের সর্বদেহ বালি মাখা। দুজনকে এইভাবে দেখে সুব্বির কৌতুক ও বিস্ময় জাগে। বলে, 'বৌদি, তোমাকে ও রামুকে যেন সরস্বতীপিসির প্রেতাত্মা এসে ভর করেছে। পিসিরও শীত গ্রীষ্ম বর্ষা এক হয়ে গিয়েছিল, তোমাদেরও তাই দেখছি...'

রাম বলে উঠল, 'কি সুব্বিপিসি, এত দিনে তুমি এসেছ? বলেছিলে কি না এক মাস পরেই তুমি আসবে? দ্যাখো, তোমাদের গাঁয়ের লোকেরা গোঁফে তা দিয়ে বসে থাকলেই খোরাকীর চাল বাড়িতে এসে হাজির হয়। কিন্তু এ যে দরিদ্র কোডিগ্রাম। মাথার ঘাম পায়ে ফেললেও চলে না।'

পিসি বলল, 'হ্যাঁ, তোমার পিসেমশাই, দ্যাখো গিয়ে, জমিটমি বর্গা দিয়ে বাড়ির ফটকের উপর বসে থেকেই খাওয়ার যোগাড় করে। দশ বিশ কোটি ধান-পান আছে। আর চিন্তা কী? জমিদারবাবুরাও আমাদের তুলনায় গরীব, কী বল?'

রাম উঠে দাঁড়াল। নাগবেণী ঝুড়িগুলো তুলতে সুব্বি তার হাত থেকে কেড়ে নিল। রাম বলল, 'পিসিমা! চলো যাই সমুদ্র দেখবে।'

'সমুদ্রের নামে ওর পাগলামিটা ছাখো। ওটা কাল দেখলে হবে না?' রাত্রির মধ্যে কি ওর জলগুলো শুকিয়ে যাবে? বাড়ি গিয়ে পুকুরে স্নান করে এস। এই বেশেই যেতে হবে না।'

'সত্যি পিসিমা, আমার এই বেশের কথা একেবারে খেয়ালই ছিল না। মাথার মধ্যে কেবল এই একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছিল—সমুদ্র যদি সত্যি সত্যি শুকিয়ে খালি হয়ে যায়? সমুদ্র নিশ্চয়ই শুকোবে না, কী বল?'

পিসি বলল, 'আমি বলি কি, রামুর পিপাসা পেলে ওকে একটু নোনা জল দিও বৌদি।'

তিনজনেই হাসতে হাসতে রক্তরাগরঞ্জিত আকাশকে পিছনে রেখে বাড়ির দিকে অগ্রসর হল। বালিয়াড়ির গাছগুলির আড়ালে তারা অদৃশ্য হতে না হতে সূর্যও অস্তমিত হল।

রাত্রিতে রাম সুব্বিপিসির কাছে নানা রাজ্যের কথা বলতে আরম্ভ করে। সুব্বির বয়স হলেও গ্রামের বাইরে কখনো যায় নি, শহর কাকে বলে চোখেও দেখে নি। রামের পরিহাস বুঝতে না পেরে সুব্বি তার গ্রাম্য সরলতা নিয়ে এমন দু'একটা কথা বলে বসে যাতে এই প্রিয় ভ্রাতুস্পুত্রটির কৌতুক আরও বেড়ে যায়। একথা সেকথার পরে মংদর্তির পালাগানের কথা উঠল। রামই ওঠাল। 'পিসি, তোমাদের গ্রামের পালাগান শোনার সুযোগ হল না। তবে আমাদের চেন্ন জেলে সেদিন বলল, জালে যদি মাছ পড়ে—অমাবস্যার পরে নাকি পড়তে পারে, তবে অরম ঠাকুরের সামনে নাকি মংদর্তির পালাগান দেবে বলে মানত করে রেখেছে।'

যাত্রাদল, পালাগান এসমস্ত বিষয়ে কথা বলতে সুব্বিপিসি কিছু মাত্র আগ্রহ প্রকাশ করল না। সে উদ্গ্রীব ছিল ব্রহ্মাবরের নাগপ্পা মশায়ের মেয়ের সঙ্গে রামের বিয়ের কথাটা তুলতে। কিন্তু তোলা আর হয়ই না। যতবারই সে রামকে পাকড়াও করবার চেষ্টা করে, ততবারই রাম বান মাছের মতো বেরিয়ে গিয়ে নানা কৌশলে কথার খেই ঘুরিয়ে দেয়। রাত বারোটা পর্যন্ত কথাবার্তা চললেও সুব্বি তার আসল কথাটা বলতে পারল না। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে তামাকক্ষেতে, খিড়কীর বাগানে 'হরিবে' শাক ও বেগুনচারার জল দেওয়ার কাজ শেষ করেই রাম নতুন জমিতে মুনিষদের কাছে গিয়ে নির্দেশ দিল কোন্ জায়গার কতটা বালি সরিয়ে কতটুকু কাজ শেষ করা দরকার। বাড়ি

ফিরেই স্নানাহার সেরে তাকে ইস্কুলের দিকে ছুটতে হল। রাম চলে গেলে সুব্বি এসে নাগবেণীকে বলল, 'বৌদি, আমি আর কতদিন তোমাদের কথার অপেক্ষায় থাকব?' তুমিই না হয় রামকে একবার বলে দেখো। ওরা খুব পীড়াপীড়ি করছে। আমিও আশা দিয়ে রেখেছি। কিন্তু মেয়ের বাপ-মা আর কত দিন চুপ করে বসে থাকবে বল। এই মেয়ে একশ মুডি ধান-পানের মালিক হবে বলে বিয়ের যুগ্যি ছেলে পেতে তাদের অসুবিধা হবে না। তবে আমার ইচ্ছা রামুর সঙ্গে যাতে বিয়েটা হয়।'

নাগবেণীর কাছে একশ মুডি ফসলের কথাটা কম নয়। অবশ্য নাগপ্পা মশায়ের অবর্তমানে সম্পত্তি মেয়েই পাবে কি না এবং পেলেও এত দূরে বসে তার দেখাশুনা করা সম্ভব হবে কি না সেটাও বিবেচ্য। তবু নিজেদের দারিদ্র্যের কথা ভেবে নাগবেণীর মন এই সম্বন্ধের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু রাম সম্মত হবে কি? অবশ্য পৈতৃক সম্পত্তির কিছু অংশ হাতে আসার ফলে হয়ত বিয়েতে কোনো আপত্তি তুলবে না। কিন্তু ব্রহ্মাবরের সম্বন্ধে সে মত দেবে কিনা কে জানে? মেয়ে দেখে যদি রামের পছন্দ হয়, তবেই ত সুব্বিঠাকুরঝিকে একটা কথা দিতে পারে। এই সমস্ত ভেবে নাগবেণী ছেলের সঙ্গে কথা বলার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় থাকে।

ইস্কুলের পরে রাম বাড়িতে না এসে সোজা তার নতুন জমির কাজ দেখতে গেল। কত বালি টানা হল, চারিদিকের বেড়ার কাজ কতটা এগোলো, বৃষ্টি নামার আগেই ওখানে পলিমাটি এনে জমা করা যাবে কিনা, মাছের সার কতটা দরকার হবে ইত্যাদি শত শত চিন্তা তার মাথায়। ওদিকে বাড়িতে বসে সুব্বি পরিহাস করে নাগবেণীকে বলছিল, 'ঠাকুরঝি, আমার কী মনে হচ্ছে জান? তোমার ছেলে ব্রহ্মাবরের নাগপ্পার মেয়েকে নয়, তামাকপাতার জমিকে বিয়ে করবে।'

ব্যাপারটা অনেকটা সেই রকমই বটে। জমি দেখে বাড়ি ফেরার পথে রাম ভাবছিল, এইভাবে আর এক সপ্তাহ কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলে দুই একরের মতো জমি সমতল হবে। এই বছরে এই ঢের। কিন্তু জমি তৈরি হলেই হল কি? তাতে সার ফেলতে হবে না?' সামনেই দেখে ঝাড়ু হাতে তার মা এগিয়ে আসছে। 'কোথায় যাচ্ছ মা?' 'ঝাউগাছের বাগানে শুকনো পাতা ঝাঁট দিয়ে রেখে আসি।'

'সুব্বিপিসি কোথায় ?'

'রান্নাঘরে। রাতের রান্নাটা আজ সেই করবে বলেছে।'

'তাহলে মা, চল যাই সমুদ্রে। কতদিন যাইনি বলোতো। নতুন মাঠে ফসল ফলাবার তাড়ায় ধীরে সুস্থে একদিন সমুদ্রপারে গিয়ে বসতে পারিনি। আজ যাই এস।'

সন্ধ্যা হতে আর একদণ্ডও বাকী নেই। আকাশ কালো করে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যাচ্ছে। সমুদ্রকাকগুলির উড়োউড়ি, ডাকাডাকি, তারই মধ্যে আবার 'কীং...' এই ধরনের তীক্ষ্ণ ধ্বনি তুলে বাজপাখিগুলির আনাগোনা। এই সমস্ত পাখির ভিড় দেখে রাম বলে উঠল, 'আজ আমাদের গাঁয়ের জেলেদের খুব পোয়াবারো।'

'কী করে বুঝলি ?'

'তা না হলে এত কাক, সমুদ্রকাক, বাজপাখি এসে ভিড় জমাত না।··· চেন্ন জেলের ভবিষ্যৎবাণীই ঠিক হল। বলেছিল, 'অমাবস্যির পরে দেখবেন, দাদাঠাকুর।' আজ তো দ্বিতীয়া, না মা ? ওদিকে চেয়ে দেখ, ওখানে অনেক জাল পড়েছে বোধ হয়।'

মাকে নিয়ে রাম সমুদ্রের দিকে অগ্রসর হল। জেলেরা জাল টানছে। কোটীশ্বরের মেলায় রথটানার মতো। জাল টানছে আর আনন্দ উৎসাহে হা-হা করে চিৎকার করছে। এত মাছ যে টেনে তোলা যায় না, টেনে তোলা হয়তো কুড়িয়ে শেষ করা যায় না। মাছ ধরার কাছাকাছি এসে 'ইস্ আমিও কিনা মাছ দেখতে এলাম' এই কথা মনে হতে নাগবেণী তাড়াতাড়ি পিছন ফিরে দূরে সরে গেল। রাম আরও এগিয়ে দেখল সারা কোডিগ্রামের জেলেরা ওখানে এসে ভেঙে পড়েছে। পাহাড়ের মতো স্তূপকরা মাছ। অনেক বছরের মধ্যে নাকি একদিনে এত মাছ জালে পড়েনি। মাছের সন্ধান পেয়ে খদ্দেরও এসে অনেক জুটেছে। সকলেরই বিশ্বাস, এই মাছের দাম কম করে হলেও পাচ-ছশ টাকার মতো হবে।

রাম নাগবেণীর কাছে ফিরে এসে বলল, 'মা, আমাদের চাষবাসে কিন্তু এমন হতে পারে না। যতই করি না কেন, ফসলের একটা সীমা আছে। পঁচিশ মুডির জায়গায় বড় জোর তিরিশ মুডি হতে পারে, তার বেশি নয়। জালে মাছ পড়ার মতো বিশ মুডি কি কখনও দুশ' মুডি হবে ?'

'কিন্তু রাম, জেলেদের মাছ ধরা সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটার মতোই বাড়ে কমে।'

'এবছর মংদর্তির একটা সঙ্‌ পালা না হয়ে পারে না অন্নম দেবতার মন্দিরে।। যাবে কি সেখানে।'

'মাগো, তাড়ির গন্ধে নাক ধরে যায়।'

'তা ঠিক। বেটাদের হাতে যখন পয়সা থাকে, ঘড়া-ঘড়া তাড়ি খায়।। আর যখন থাকে না, একমাত্র নোনাজলেই গতি।'

'খোকা, জেলেদের কথা থাক্‌। সুব্বিপিসি কেন এসেছে বলতে পারিস?'

'তা পিসিমাই ভালো বলতে পারে।'

'এসেছে তোর বিয়ের কথা বলতে। ব্রহ্মাবরের নাগপ্পামশায়ের নাকি একটি মেয়ে আছে। মেয়েটি নাকি ক্লাস এইট্‌-এ পড়ে ঠাকুরঝি বলে, তারা বেশ 'শ্রীমন্ত' (অবস্থাপন্ন লোক)।'

রাম হেসে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, তাদের মেয়ে কি 'হরিবে' শাকের ক্ষেতে, তামাক ক্ষেতে জল দিতে পারবে?'

'বাবা, আমিই কি জানতাম বাপের বাড়ি থেকে এখানে আসার সময়ে? মংগলুরে তো সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই জীবন কাটিয়েছি।'

'তোমার কথা সব মানি। কিন্তু, কোথাও কোনো মেয়ে সুখে আছে। তাকে এই বাড়িতে এই বালিয়াড়ির মধ্যে রোদে পুড়িয়ে লাভ কী, মা? আমরা যে রোদে পুড়ছি, এ-ই কি যথেষ্ট নয়?'

'তোর কথা সত্যি বলেই মেনে নিচ্ছি। কিন্তু খোকা, স্নেহ-ভালোবাসার জন্য আমার আপন লোক আছে এই ভরসা ছাড়া মানুষ কি বাঁচতে পারে?'

'হ্যাঁ, বাঁচতে পারে। যার বাঁচবার, সে বেঁচে থাকে। আপন লোক থাক বা নাই থাক।'

'ঠাকুরঝিকে কী বলব তাহলে?'

'এখন আর কিছুই বলতে হবে না। শুধু এইটুকু বোলো, আমিই একদিন মংদর্তি গিয়ে তার সঙ্গে কথাবার্তা বলব।'

'যা বলবি, এখন বলা যায় না?'

'কী যে বলব তা এখনও জানি না! পরে বোঝা যাবে।'

বাড়িতে রান্নাবান্না করে সুব্বি অপেক্ষা করে করে হয়রান হয়ে গেল। মায়েপোয়ে এখনও ফিরছে না। যখন তারা ফিরে এল, তখন শুক্লা দ্বিতীয়ার

চাঁদ অদৃশ্য হচ্ছে। নাগবেণী ছেলের সমস্ত কথা সুব্বিকে জানিয়ে দিয়েছে। রাম খেতে বসলে সুব্বি জিজ্ঞাস করল, 'তা হলে রাম, কবে যাবি আমাদের ওখানে সত্যি করে বল।'

'গেলেই হল।'

'গেলেই হল? তাদের কাছে একটা খবর পাঠাতে হবে না? নাগপ্পয়্যকে যা হোক একটা উত্তর তো দিতে হবে। এই তো বিয়ের লগন যাচ্ছে। মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, তাদের তো একটা চিন্তা-ভাবনা আছে।'

'আমি যাব বলেছি। বলি নি কি, পিসি?' এই বলে কেবল মুখের মিষ্টি দিয়েই রাম কথাটা শেষ করল।

ভাইপোর কথায় সুব্বিপিসি খুব নিরাশ হল, বিরক্ত না হয়েও পারল না। 'আচ্ছা, কেন ও এইসব পাগলামি করছে? চাষবাস করে বাড়ির জন্য কত কষ্ট করছে—সবই ভাল। কিন্তু তার পরে? ঘরে যে একটা প্রদীপ জ্বালাবার মতো লোকও থাকা দরকার একথা কি রাম বোঝে না?' মনে মনে এইসব কথা বলতে বলতে সুব্বিপিসি মংদর্তি চলে গেল।

রামের গবমের ছুটি আরম্ভ হতে বেশি বাকী নেই। ইতিমধ্যে দিনেরবেলায় সমস্ত বালিয়াড়ি জ্বলে পুড়ে যেন অঙ্গার হয়ে ওঠে। প্রখর রৌদ্রে মাঠের মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। চাষীরা বৃষ্টির জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। এমনি সময়ে একদিন অপরাহ্ণে রাম তার বালিয়াড়ির নতুন জমিগুলি দেখে সমুদ্রের দিকে যাচ্ছিল। যাওয়ার পথেই চোখে পড়ল পশ্চিম আকাশ জুড়ে ঘুরে ঘুরে কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে। দিনের আলো নিবে গিয়ে হঠাৎ চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঝড়ের প্রবল হাওয়ায় বৃষ্টির ফোঁটাগুলি একশ গজ ছড়িয়ে ছিটিয়ে এসে পূর্ব সমুদ্রের তীর স্পর্শ করল। বৃষ্টির আঘাত বেজেই চলেছে—চিটি চিটিলু...চিটিলু...চিটি চিটিলু...। বৃষ্টির আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য রাম ছুটে গিয়ে একটা তালগাছের বাগানে দাঁড়িয়ে পড়ে। কখন যে প্রবল হাওয়ায় তালগাছের পাতাগুলি মাথার উপর ভেঙে পড়ে এই ভয়ে মাঝে মাঝে সে উপরের দিকে তাকায়।

হঠাৎ-আসা বৃষ্টি তেমনি হঠাৎ থেমে গেল। কিন্তু এই আধঘণ্টার বর্ষণে জলস্রোত দেখে মনে হয় সমুদ্রই বুঝি উদ্বেল হয়ে উঠেছে। সামনের শুকনো টিলা ইতিমধ্যেই একটা বৃহৎ জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। আর সেই জলে চমৎকার

ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে লাল-হয়ে-আসা মেঘশূন্য আকাশ আর সারি সারি তালগাছ। একদিকে এই শান্ত ছায়ার ছবি; আর এক দিকে নিজের আবেগে নিজেই হেসে গড়িয়ে পড়ছে পশ্চিম সমুদ্র। রাম এদিক থেকে ওদিকে—প্রকৃতির শান্ত রূপ থেকে রুদ্র রূপের দিকে চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল। সেদিন সমস্ত রাত আর রামের মুখে কথা নেই, তার নির্বাক মৌন চোখের সামনে ভেসে উঠছে অপরাহ্ণের নৃত্যপর সমুদ্র আর আকাশ ও তাল গাছের ছায়া বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা টিলার সেই শান্ত জলরাশি।

পরদিন সকালে বারান্দায় কাগজ সাজিয়ে রাম গত অপরাহ্ণের স্বপ্নকে রূপ দিতে বসেছে।...ভূতের মতো সারি সারি তালগাছ মাটি থেকে আকাশ চিরে সোজা দাঁড়িয়ে আছে...সামনে পায়ের কাছেই আকাশের ছায়াপড়া বিশাল জলরাশি...আর একটু দূরে সমুদ্রসৈকত...সৈকতের ওপাশে ভীমোন্মত্ত হাস্যোচ্ছল তরঙ্গভঙ্গ...রাশি রাশি তরঙ্গের পশ্চাতে সোনালী আলোর খনি অস্তগামী সূর্যের লীলা। স্নানাহারের জন্য মা এসে যতক্ষণ না ডাক দিল, ততক্ষণ তার ছবি আঁকার তুলির বিরাম নেই। নাগবেণী ছেলের হাতের কাজ দেখে অবাক্ বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হাতের কাজ শেষ হলে রাম জিজ্ঞাসা করল, 'রান্না হল মা? এখন কটা বাজে?' মা ছেলেকে স্নান করতে বলে ভাত বাড়ল। রামের স্নান আহার সমস্তই যেন স্বপ্নের মধ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। খেতে খেতে বলল, 'মা, আজ শেষ হল আমার ছবিটা। বোম্বের মাদাম নোভাকে পাঠিয়ে দিতে হবে।'

আহার শেষ করে জামা কাপড় পরে রাম বলল, 'দু'এক দিন একটু ঘুরে আসি।'

'কোথায়? মংদর্তি?'

রাম বলল, 'যেখানে হয় সেখানে। আজ থেকে আমাদের গরমের ছুটি শুরু। কয়েক দিন পরেও ফিরতে পারি, আবার আজও ফিরে আসতে পারি।'

ছেলের পাগলামি মা ভালোভাবেই জানে। বলল, 'আচ্ছা, আয় গিয়ে।'

রাম সোজা মোহানার পথ ধরে নদী পেরিয়ে সেখান থেকে পড়ুমুন্নুরুর দিকে অগ্রসর হল। তশীলদার দাদু গৃহাগত রামকে খুব আদর অভ্যর্থনা করতে আরম্ভ করলে রাম বলল, 'আদর আপ্যায়ন করছেন করুন। আর একটা দরকারী কাজ আছে। আপনি একবার ব্রহ্মাবরে যেতে পারবেন?'

'কী ব্যাপাব ? রেজিস্ট্রি নাকি ?• এখন আবার কোন্ সম্পত্তি ?'

'যেতে যেতে আপনাকে সব বলব।'

তশীলদার দাদু উঠে দাঁড়ালেন। কথা বলতে বলতে দুজনে গিয়ে উপস্থিত হল ব্রহ্মাবরের নাগপ্পা মশায়ের বাড়িতে। সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করতেই দেখা গেল নাগপ্পার মেয়ে সরস্বতী উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে। আগন্তুক দুজনকে দেখে ঝাঁটা রেখে দিয়ে সরস্বতী এক পাশে সরে গেলে জনার্দন তশীলদার মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবা বাড়ি আছেন ?' 'হ্যাঁ, আছেন। বারান্দায় বসে আছেন বোধ হয়।' রামকে নিয়ে জনার্দন ভিতরে চলে গেলেন। নাগপ্পার সঙ্গে জনার্দানের অনেক দিনের পরিচয়। নাগপ্পা দেখেই সহাস্যে বলে উঠলেন, 'আরে, তশীলদারবাবু যে! অভাবিত ব্যাপার। আপনার গ্রাম ফেলে এই গ্রামে ?' রামকে দেখে চিনতে না পেরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইনি কে ? কোথায় চললেন আপনারা ? একটু জলপান এনে দিই ?' নাগপ্পা এইভাবে আদর আপ্যায়ন করলে তশীলদার হেসে বললেন, 'একটা সংখ্যা বলুন তো, নাগপ্পয্য।'

নাগপ্পয্য কিছুই বুঝতে না পেরে বললেন, 'পাঁচ।'

'পাঁচ ? হাতের মধ্যে কাজ।'

নাগপ্পা বললেন, 'জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? বলছেন কি হাতের মধ্যে কাজ।

'আর কী ? ছেলেমেয়ে পরস্পরকে দেখে নিল।'

'কী যে তামাশা করছেন ?'

'তামাশা নয়, নাগপ্পয্য। এ হল আমাদের কোডিগ্রামের রাম ঐতালের নাতি। এক হিসাবে আমারও নাতি, কারণ আমার ছোট বোন সত্যভামার পৌত্র।'

'ওহো। বুঝেছি, বুঝেছি। এই আসুন, বসুন।' এই বলে নাগপ্পয্য ব্যস্তসমস্ত হয়ে মাদুর এনে বিছিয়ে দিলেন। জনার্দন তশীলদার বললেন, 'এখানেই তাহলে জমাবন্দীটা করে ফেলি। রাম, ইনি আমাদের পুরোনো বন্ধু। তোমার সুব্বিপিসি যে বাড়ির কথা বলেছিল, এই হল সেই বাড়ি। আর মেয়েটিকে তো দেখেছই তুমি। এখন বিয়েটা কবে হবে স্থির করলেই হল।'

নাগপ্পয়্যর বোধ হল গোটা আকাশটাই বুঝি হাতের মুঠোয় পাওয়া গিয়েছে। ভিতরে গিয়ে গৃহিণীকে সমস্ত কথা জানাতে অতিথিদের জন্য তাড়াতাড়ি পাঁপড়, বড়া ও কফির আয়োজন করা হল। জলযোগে বসে নাগপ্পয়্য বললেন, 'তশীলদার মশাই, ঠিকুজীর যা মিল হয়েছে সে আর কী বলব?'...পরক্ষণেই মেয়েকে ডাক দিয়ে বললেন, 'সরসোতি, কফি নিয়ে এস।' মেয়েটির কাছে এই ধরনের ব্যাপার কিছু অপরিচিত ছিল না। আদেশমতো সে কফি নিয়ে এল। এবারে তার অন্যরূপ। পোশাকটার পরিবর্তন হয়েছে। আটপৌরে শাড়ি ছেড়ে জরীর কাজ করা একখানি দামী শাড়ি পরে, সুসজ্জিত বেণী ঝুলিয়ে, মাথা নীচু করে সরস্বতী কফি এনে দিল।

রাম হেসে বলল, 'তখন যে ড্রেসে দেখলাম সেইটেই আমার ভালো লাগে। প্রথমেই এই পোশাকে দেখলে আমি ভয় পেয়ে যেতাম।'

নাগপ্পয়্য চকিত হয়ে বললেন, 'কখন? কখন দেখা হল?'

তশীলদার বুঝিয়ে দিয়ে বললেন, 'মানে, আমরা যখন আপনার বাড়ির সদর দরজায় এসে পৌঁছলাম, আপনার মেয়ে তখন উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল। আমাদের বাবাজীর আবার গৃহকর্মের দিকেই বেশি ঝোঁক।'

সেদিন বাকী বেলাটা সেখানেই কাটিয়ে রাত্রি-যাপনেরও ব্যবস্থা হল। বিবাহের দিন একরকম স্থির। সোনা গয়নার কথা উঠতে রাম বলল, 'ওই একটা বিষয়ে আমি কিছু জানি না, আমার মাও কিছু জানেন না। এইটুকু বলতে পারি, আমাদের কোনো দাবি-দাওয়া নেই। আর, বিয়ের উৎসবটা চারদিন ধরে না চালিয়ে একদিনেই শেষ করা দরকার। কোনোরকম জাঁকজমক না করে শেষ হয়ে গেলেই যথেষ্ট।' রাত্রিতেও অনেকক্ষণ যাবৎ কথাবার্তা চলল।

সকালের কফিটা না খাইয়ে কি অতিথিদের ছাড়া যায়? সেটা শেষ হলে তশীলদার মশাই গেলেন কোডিগ্রামে, রাম গেল মংদর্তি। বেলা দুপুরের সময়ে সুব্বিপিসির বাড়িতে উপস্থিত হয়ে রাম বলল, 'পিসি, গুরুজনেরা স্থির করে দিয়েছেন আমাদের বাড়ির রামের সঙ্গে ব্রহ্মাবর গ্রামের নাগপ্প-মশায়ের কন্যার বিবাহ। আগামী সোমবার তুমি আমাদের বাড়িতে এসে পাঁপড়-বড়ার কাজটা সম্পূর্ণ করে দেবে।' সুব্বিপিসি বলল, 'এই বেটা চোর, আমাকে বাদ দিয়ে বিয়ে স্থির করে ফেলেছিস বুঝি!

সুবির ছেলেমেয়েরা পরদিন যাবে, সেইমতো ব্যবস্থা করে সুবি নিজে সেই দিনই অপরাহ্নে রামের সঙ্গে কোডিগ্রামে রওনা হল।

পরদিন সকাল থেকেই বিবাহের জোগাড় যন্ত্র শুরু হয়ে গেল। উঠোনে ছাপরা তোলার ব্যস্ততা, রান্নাঘরে ব্যস্ততা পাঁপড় ভাজার। পড়ুমুন্নূরুর তশীলদার দাদু দাওয়ায় বসে রামের অভিভাবকরূপে সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজকর্মের নির্দেশ দিচ্ছেন।

নাগবেণী একসময়ে হাসিমুখে ছেলেকে জিজ্ঞাসা করল, 'খোকা, মেয়েটির নাম আর তোর বট-ঠাকুমার নাম তো একই নারে?'

রাম হেসে জবাব দিল, 'আমারও তো নাম রেখেছ ঠাকুরদার নামে, না মা?'